শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

UNIVERSITY

উদ্ভাসিত ভারত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৪, ১৯৬৮ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র একবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুইয়ের সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক

আপনার নিজস্ব ব্যাংক

কষ্ট করে জমানো আপনার টাকা যেখানে সেখানে ফেলে রেখে বিপদ ডেকে আনবেন না।

পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে আজই আপনার জমানো টাকা নিশ্চিন্ত মনে রেখে দিন

পোস্ট অফিসে রাখা টাকা একান্ত গোপনে এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকে এবং বছরে শতকরা ৪ টাকা সুদে বাড়ে

শুধু তাই-ই নয়—
আপনি যতবার খুসী পোস্ট অফিসে টাকা রাখতে পারেন এবং আপনার ইচ্ছামত খরচ করার জন্য টাকা তুলতেও পারেন।

এ ব্যাপারে আপনার কাছাকাছি পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্থার পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রচারিত

১৯৬৭

ভারতীয়-বাটার রপ্তানি বাণিজ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বছর

৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

বিদেশী বহু বাধা সত্ত্বেও সাধারণভাবে অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ১৯৬৭ সাল ভারতীয় বাটা রপ্তানি বাণিজ্যে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। এ সাল বহু কুটো তাঁরা বিদেশের বাজারে বিক্রি করেছেন, তেমন আগে কখনো হয়নি। এবং এই সময়ে তাঁরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছেন কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি।

জাপান, হংকং, ইতালি এবং আরো অনেক বহু বড়ো আন্তর্জাতিক স্তরের কর্মব্যস্ততার তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে অর্জিত এই সাফল্য। শুধুমাত্র প্রতিযোগিতাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যানবাহনে পরিস্থিতির বহুল প্রচারিত অসুবিধা এবং পণ্যের সরবরাহ-সূচি বজায় রাখার জন্য উৎপাদন পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন।

ভারতীয় বাটার জুতো পশ্চিম ইওরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ বাজারে রপ্তানি হয়েছে।

পৃথিবীর সর্বত্র সকলের সেবায়—ভারতীয়-বাটা।

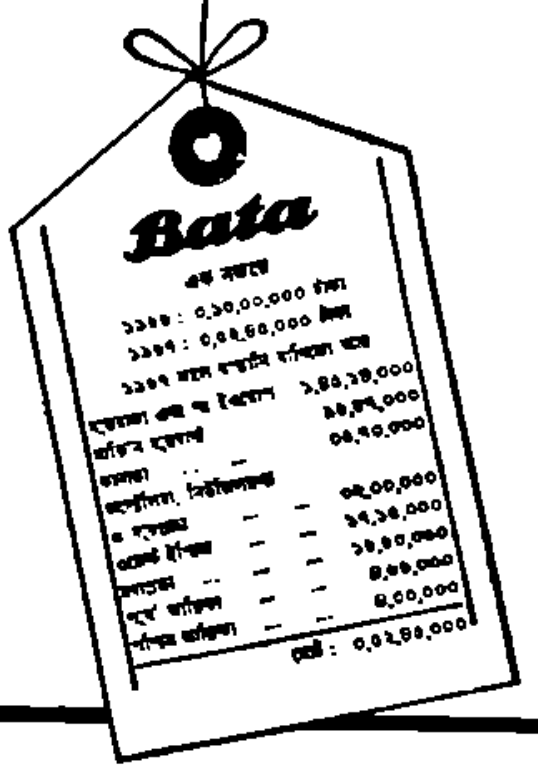

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	
বাংলার বিদুষী	
বাংলার মনীষী	
জীবন গড়া	
রাজর্ষি রামমোহন	
আচার্য জগদীশ	
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	
রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	
বিদ্যাসাগর	

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

আত্মকথা

বা

সত্যের প্রয়োগ

মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর

সচিত্র নূতন বাংলা সংস্করণ

মূল গুজরাটী হইতে অনূদিত

অনুবাদ : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

মূল্য : ১২·০০

*

কয়েকখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

গান্ধী-রচনা-সংকলন

মূল্য ৫·০০

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

মূল্য : ৩·০০

মোহনমালা

একখানি নিত্যব্যবহার্য গান্ধীবাণী-চয়নিকা

মূল্য : ৩·৫০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিজড়িত জীবনী

মূল্য : ৫·৫০ ও ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গান্ধীজীর অর্থ নৈতিক দর্শন

মূল্য : ৫·৫০

সম্পূর্ণ পুস্তকতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রকাশন বিভাগ,

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),

১১ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র : মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৪, ১৯৬৮

		১
	এক ফোঁটা আঁখি জল (কবিতা)	৩
	শ্রীমোহিনী মোহন গাঙ্গুলী কাব্যভাস্কর	
৩।	ভারতীয় ধ্বনিবাদ ও ফরাসী সিম্বলিজম্	৫
	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বিটি, ডি এস ই	
৫।	সৃজন ক্ষমতা	১০
	শ্রীগায়ত্রী যতি	
৬।	হারানো দিন (পূর্বানুবৃত্তি)	২২
	শ্রীমান	
৭।	মানব সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা	২১
	শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত	
৮।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৬৪)	২৪
৯।	প্রার্থনাকালীন ভাষণ	৩১
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত	
১০।	জাতীয় জীবনের আরেকটি সমস্যা	৩৪
	শ্রীভারতী	
১১।	সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি)	৩৭
	শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল	
১২।	সাময়িকী	৪১
	পট পরিবর্তন	
	আশ্রম সংবাদ	

UNIVERSITY

উদ্বোধন

মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৮ একবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

আমাদের—উদ্বোধন পত্রিকার—বিংশ বর্ষ শেষ হইয়া গেল। দ্বিমাসিক হিসাবে এই প্রথম এক বৎসর পত্রিকা নিয়মিতই প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন বৎসরের যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা সমবেত-মূর্তি শ্রীশ্রীনিতাগোপাল দেবকে আমাদের সকল সত্তার প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীনিতাগোপালই নূতন ভারতের, উজ্জ্বল ভারতের, উজ্জ্বল বিশ্বের চলার পথ-রেখার দার্শনিক প্রস্থাপক। বাস্তব জীবনের পথ-চলা হইতে সরিয়া যাইয়া বাস্তবাতীত সত্তাকেই একান্ত সত্য করিয়া ব্যক্তিগত জীবন-চেতনার বা জীবন-সাধনার যে তত্ত্ব সে তত্ত্বকে শিছনে ফেলিয়া শ্রীনিতাগোপাল সেই প্রায় আশী নব্বই বৎসর আগেই বলিয়াছিলেন, 'আমি বিশ্ব-নাগরিক'। অথচ তিনি ছিলেন এমন একজন যাহার জীবনের অধিকাংশ সময়টা সমাধি অবস্থায়ই কাটিয়াছে। অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'সোঽহম্'-এর সাধনায় তিনি আপৈশব সিদ্ধ কিন্তু বাস্তবকে মিথ্যা বলিয়া কিংবা বাস্তবকে কম ঘৃণা দিয়া তিনি সমাধিস্থ পুরুষ নন, তিনি একই সঙ্গে বাস্তব জাগ্রত বিশ্বের সুস্থ নাগরিক এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ এই অবস্থা বর্তমান যুগের সাধ্য। তাই উজ্জ্বলভারতের যাত্রারম্ভ দিনে তাঁহাকে আমাদের সকল সত্তার প্রণাম—আমাদের জীবনে তাঁহার ব্যাপকতা ও গভীরতা ফুটিয়া উঠুক।

শ্রীশ্রীনিতাগোপালের এই সামগ্রিক মানুষী স্বরূপকে যিনি দিবালোকে মনুষ্য সমাজে উদ্ঘাটিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, উপনিষৎ-ব্রহ্মসূত্র-গীতার অবধূত ভাষ্য রচয়িতা, নরনারায়ণ আশ্রম ও উজ্জ্বলভারত প্রতিষ্ঠাতা সেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে আজ উজ্জ্বলভারতের এই যাত্রারম্ভ দিনে আমাদের সর্বাঙ্গীণ প্রণতি নিবেদন করি। শ্রীনিতাগোপাল-প্রসাদে বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপর্যয়কে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেই তাঁহার ধ্যান-ক্ষেত্রে দেখিয়া বাস্তব ক্ষেত্রের পুনর্গঠন পথে এই বিশ্বের মধুরতা আস্বাদনের খোঁজ সেই সময়ই তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার অজস্র রচনায়, তাঁহার ভাষণে ও তাঁহার জীবনে।

শ্রীনিতাগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ যে কথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র হইতে দার্শনিক ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, সেই জীবন-চেতনাকে বাস্তব জীবনের রূপকার মহাত্মা গান্ধী ও জীবন-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পাওয়া যাইবে ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন আবেষ্টনে। গান্ধীজী রাজনীতির মধ্যে এই চিন্তাধারাকে রূপ দিতে এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—যদিও তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে কিংবা নিজেকে তিনি বুঝাইতে পারিয়াছেন খুব অল্প সংখ্যক লোকের কাছেই। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য ভাষায় বিচিত্র রহস্যময় জীবনের আস্বাদনকে যেভাবে বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে ঐ সামগ্রিক জীবনের কথাই। মানুষের কাছে এই দুইজন যে এক অনাস্বাদিত আহ্বান রাখিয়া গিয়াছেন, অনাগত কালে তাহাকে মানুষ সমাজ-জীবনে আস্বাদন করিবে। কিন্তু শোষণহীন সে সমাজ-ব্যবস্থাকে রূপ নিতে হইলে তাহাকে ভারতবর্ষীয় প্রস্থান ত্রয়ের—উপনিষৎ-ব্রহ্মসূত্র-গীতার—দার্শনিক কাঠামোর

মধ্য দিয়া বুদ্ধি ও বিচারের সামঞ্জস্যের জীবনে চোয়াইয়া আসিতে হইবে। আজ নূতন দিনের যাত্রাপথে আজ সমীক্ষার অবসরে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকেও প্রণতি জানাই। জাতির চিত্তে তাঁহাদের অবদান মূর্ত হইয়া উঠুক। রাজনৈতিক রূপটিই গান্ধীজীর সবটুকু রূপ নয়, কবিত্ব কবিত্ব হিসাবেও রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে পৃথক বস্তু নয়—মনুষ্যত্বের যে দুই চিত্র বা পরিকল্পনা তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন, পরবর্তী কালে তাহার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা স্থান বিশেষে পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইলেও তাঁহাদের অবদান ব্যর্থ হইয়া যায় নাই, যাইবে না। তাঁহাদের প্রেরণা ও পথচলা চিরদিন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

চলার পথের একবিংশ বর্ষারম্ভ দিনে আমরা তাঁহাদেরকেও আনন্দ-নমস্কারে জানাই—'উদ্বোধন-ভারত' পাঠ যাহাদিগকে আনন্দ দিয়াছে, জীবনের চলার পথের নিশানা জোগাইয়াছে। তাঁহাদের এই আনন্দ আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। যাঁহারা আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন কিংবা অন্য নানা ভাবে আমাদিগকে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আজ স্মরণ করি। বিশ্বের সকল মানুষের মত ইঁহারা আমাদের অস্তিত্বের ও বিবৃদ্ধির অধিকতর অপরার্ধ। আমাদের সেবাবুদ্ধি ইঁহাদের সহযোগিতাকে অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়া আনিবে জানি—তাই নিজেদের সেবাবুদ্ধি ও সঙ্ঘ-চেতনা বাড়াইবার অধিকতর প্রয়াস করিবার সংকল্প লইয়া আজ পুনরায় যাত্রারম্ভ করিলাম।

আবেষ্টনগত দুর্যোগ বিগত কুড়ি বৎসর হইতে বর্তমানে অনেক বেশী—ক্রমেই আরও বেশী হইবে তাহারই আভাস চারিদিকে। সমস্ত দেশের সমস্ত স্তরেই আজ দুর্যোগ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-বিপর্যয় যেভাবে আজ তীব্র হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এক প্রলয়ের মধ্যে আমরা পড়িতেছি অথচ জাতির চিত্তে সে প্রলয়ের মধ্য হইতে বাঁচিয়া আসিবার আকুতি ফুটিয়া উঠিতেছে না। দুর্যোগের এই পটভূমিকা হইতে কোন্ নূতন পথের বীজ আত্মপ্রকাশ করিবে? সেই নূতন বীজের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছেন শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-পদাম্বুসরণে শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ। সে বীজে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোন স্তরেই পারস্পরিক অস্তিত্ব নাই, একত্বে নিশ্চিহ্ন করিবার বা পদদলিত করিবার প্রয়াসে অপরের অস্তিত্ব বা বিলয় নয়—প্রত্যেকেরই প্রকৃতি ও অবস্থাগত পরিবর্তনের দ্বারা সে সবেরই উন্নয়ন, উদ্বর্তন। ব্যক্তি ও সমষ্টির এই পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রয়াসের মধ্যেই ব্যক্তি ও সমাজ সুস্থ থাকিতে পারে এবং উন্নতির পথে অগ্রসরশীল থাকিতে পারে। এ প্রয়াস শুরু করিয়া দিলে কেবল প্রত্যেকের আত্ম-অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যবোধ অনন্যতার স্বীকৃতি নূতন ধরণের গোড়ামী ও অসৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া সমাজকে আবার সেই অচলায়তনের পথেই ঠেলিয়া দেয়। অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতিই প্রমাণ করে না যে, যে যে-স্তরে—মানসিকতা কিংবা অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিকতার যে দিকেই হউক না কেন—আছে বা ছিল, সে সেই স্তরেই থাকিবে। প্রত্যেক অবস্থা বা ব্যক্তিকেই অপর 'সর্বে'র সঙ্গে সামঞ্জস্য করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের মাত্রা স্থির করিতে হইবে এবং সেই মাত্রানুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃতি ও অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়নই সকলের সাধ্য। এই সঙ্গেই সত্য যে, কোন অংশকেই সমগ্র বলিয়া ধরিয়া তাহারই ঐকান্তিক প্রতিষ্ঠাই সমগ্র সমাজের সমগ্র সত্য নহে। সীমাহীন শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের সত্যতা নাই। বাঁচ ও বাঁচাও (live and let live) মন্ত্রকে সার্থক করিতে হইবে—ইহাই আগামী দিনের মানুষের সাধ্য। সকলকেই মরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে—মরিতে প্রস্তুত থাকিতে না পারিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই—কেবল বাঁচিতে চাহিলে বাঁচা যায় না—কেননা আমার বাঁচার মত অপর সকলের বাঁচাও তো সত্য—আমিও যেমন বাঁচিব, তেমনি বিশ্বের প্রতিটি তৃণকণাও বাঁচিবে—আবার তাহারা যেমন বাঁচিবে তেমনি আমিও বাঁচিব। তাহাদের বাঁচিতে দেওয়া মানে আমার মরণ এক হিসেবে সত্য, আবার যেহেতু আমিও বাঁচিব সেজন্য তাহাদিগকেও

মরিতে হইবে। এইভাবে সকলকেই একবার করিয়া মরিয়া আবার বাঁচিতে হইবে। এইভাবে সমগ্র সমাজ ওতপ্রোত হইয়া আগাইয়া চলিবে। কিন্তু আজিকার বিশ্বের চারিদিকে কি চলিতেছে!—ব্যক্তি, দল বা জাতির স্বার্থের জন্য কি জঘন্য নোংরামি—সাধারণ মানুষের প্রাণের মূল্য বা অস্তিত্বের মূল্য সেখানে এতটুকুও নাই। কেবল পুঁজিতা বাদের আবরণে আজিকার সভ্যতা কোন্ মঙ্গলের জীবের সভ্যতা? এই পরস্পর অভিশপ্ত আত্মস্বার্থান্ধ সভ্যতার স্থানে ঐ পরস্পর পরিপূরকতাময় 'মানুষে'র সভ্যতার জন্ম হইবে—এ বিশ্বাস লইয়া আমরা চলিব। ভবিষ্যৎ মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দর্শন এই হওয়া হইবে—শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ তাহাই রাখিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বল ভারত এই সমগ্র মানুষের সমগ্র জীবনের দর্শন বহন করিয়া চলিয়াছে মানুষের দরবারে। মানুষের নিকট এ চিন্তাধারার প্রয়োজন আছে—সেইখানেই তাহার সার্থকতা। জয় হউক মানুষের—ব্যক্তি মানুষ ও সমষ্টি মানুষ উভয়েরই—জয় হউক এই সকলের—কোন অংশের নয়। জয় হউক এই বার্তা নিজেদের জীবন দিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেই 'মানুষ'দের—মানুষ হইয়াও যাহারা আরও কিছু।

এক ফোঁটা আঁখিজল

॥ শ্রীমোহিনী মোহন গাঙ্গুলী, কাব্যভাস্কর ॥

সব সাধনার সাধনা আমার এক ফোঁটা আঁখিজল—
আমারে ভাসায়ে অথৈ সাগরে নিয়ে চল্ নিয়ে চল্।
বন্ধি বেড়ার নাগপাশ হতে মুক্ত করিয়া মোরে—
ওরে ক্রন্দন, ওরে আঁখিজল, বেঁধে নেয়ে প্রেম ডোরে।
চাই না হাস্য দূরে পড়ে থাক—উন্মাদ কোলাহল—
নিয়ে চল্ মোরে দূর হতে দূরে এক ফোঁটা আঁখিজল।
নীরবে নিভৃতে কেটে গেছে দিন ধূলি রাঙা পথে পথে—
অমৃত ধারা ভুলে ডুবেছিনু লালসার লাল স্রোতে।
সংসার মহা সিন্ধু মথিয়া পান করি' হলাহল—
এতো কাল শুধু করিয়াছি বৃথা বাঁচিয়া থাকার ছল।
ওরে আঁখিজল তুলি' কোলাহল—তুলি মরুকলতান—
মহাসিন্ধুর বুকে নিয়ে চল্ শেষ করি গিয়ে গান।
মুছে যাক মোর যত ব্যথা মোর—কলুষ কালিমা রাশি—
নিয়ে চল্ মোরে দুর্গম পথে স্বর্গ প্রাচীর নাশি'
সব সাধনার সাধনা আমার এক ফোঁটা আঁখিজল—
এতেই ঘুচিবে বিষাদ কালিমা প্রাণ হবে নিরমল।
এতেই ফলিবে সোনার ফসল জীবন ক্ষেত্রে মোর—
এতেই টুটিবে চারিপাশে মোর আছে যে আঁধার ঘোর।
মুক্ত করিবে মুক্তির পথ, ভেঙ্গে দিবে অর্গল—
সব সাধনার সাধনা আমার এক ফোঁটা আঁখিজল।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জয়ন্তারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অনুভব—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—এই সমন্বয়ঘন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব একই সঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে।]

—সঃ—উঃ তাঃ।

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী-'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া দিবা একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকায় অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাধালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চকল বাহিরে মহদ্ভরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও যথা মানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের মহদ্ভরাজ হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রহ্মধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে স্বরাজ-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাধালরাজমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্য্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম রূপম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংবাবৃত। কৃষি-ক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত্ত হইবে হলধরেরই বেশে তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'।

উজ্জয়ন্তারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

ভারতীয় ধ্বনিবাদ ও ফরাসী সিম্বলিজম্

॥ শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বিটি, ডি এল ই ॥

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে আনন্দবর্ধনের যে স্থান, ফরাসী সাহিত্যে Mallarme-এর (১৮৪২—১৮৯৮) সেই স্থান। এঁরা দুজনেই কাব্যের জগতে বাচ্য অর্থ ছাড়া একটা বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মুখ্যতঃ পণ্ডিত ও দার্শনিক, অন্য একজন মুখ্যতঃ কবি। তবে দুজনেই সাহিত্যের মধ্যে একটা নূতন সম্প্রদায়ের গুরু ও ব্যাখ্যাতা। এই জন্যই সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণচৈতন্য Mallarme-কে "Anandavardhau of the nineteenth century" বলে অভিহিত করেছেন। (P. 147 Sanskrit Poetics: A critical and comparative study)

Remy De Gourmont তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন "Like Verlaine, he believed in the suggestive power of poetry ·····For his vehicle he created a new kind of language freed from many of the trammels of formal grammar and a new vocabulary like wise" (Decadence : Tr. W. A. Bradley)। এখানে "suggestive power of Poetry" "a new vocabulary" "freed from the trammels of formal grammar" প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদের মতবাদটিই ব্যক্ত হয়েছে।

Mallarme-র নিজের কথা থেকেই তাঁর মতবাদটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে। তিনি বলেছেন "As far as the context is concerned I feel that younger poets are nearer than Parnassains to the ideals of poetry. The latters still treat this subject as the old philosophers and orators did i, e, they present things directly, whereas I think they should be presented allusively... The Parnassians take something in their entirety and simply exhibit it...To name an object is largely to de-troy poetic enjoyment.. The ideal is to suggest the object. It is perfect use of this mystery which constitute symbol (Evolution of literature p. 21)

কাব্যের মধুরতম প্রকাশটা শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তির মাধ্যমেই যে ফুটে ওঠে, এই জিনিসটা যে ব্যঞ্জনা-বেদ্য এবং সেটা যে "শব্দের অভিধা বাচ্য নয়" (শব্দেরপি ন শব্দবাচ্যা :—লোচন ১।৪)। এই সমস্ত মতবাদগুলি উল্লিখিত উদ্ধৃতিটির মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

ধ্বনিবাদীরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে শুধু শব্দাভিধান ও যুক্তি সিদ্ধান্ত দিয়ে কাব্যকে বুঝতে পারা যায় না (১।৭ ধ্বন্যালোক, কারিকা) Mallarmeও এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন "The supreme musical moments are born of fleeting arabesques, and their bursting is more true, more central, more brilliant than any reasoning" (Mystery of Literature p. 32)

শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তির মধ্যে যে একটা রহস্য আছে, সেটা নিত্য প্রয়োজনের গদ্যের ভাষার মধ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না, সেটা অভিনব গুপ্তের মতই Mallarme লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন "Mystery is said to be music's domain. But written word also lays claim to it·····The written

word which is the ideal in noiseless flights from earth, regains its rights as it stands beneath that fall of virginal sounds. Both music and lyric call for the previous discarding the spoken word, of course, in order to prevent mere talking"

(Mystery in literature P. 32)

এই সব ব্যাপারে ভারতীয় ধ্বনিবাদের সঙ্গে ফরাসী সিম্বলিস্ট মতবাদের সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট।

আর একটা ব্যাপারে এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-সমীক্ষার ক্ষেত্রে একটা নূতন মতবাদের সৃষ্টি করে তাঁরা প্রাচীন মতবাদগুলির দাবী সম্বন্ধে খানিকটা অবিচার করেছেন, তাই দেখা যায় Mallarme সিম্বলিষ্ট কাব্য ছাড়া অন্যতর কাব্যের কাব্যত্বকেই স্বীকার করেন নি, আর আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিকেই কাব্যের প্রাণবস্তু বলে প্রচার করে ধ্বনিহীন কাব্যকে "চিত্রকাব্য" বা কাব্যের বাহ্য অলঙ্করণ মাত্র বলে তাকে প্রায় নস্যাৎ করেছেন। (ধ্বন্যালোক ৩।৪২) তবে এই জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামিটা ফরাসী সিম্বলিস্টরা যতটা দেখিয়েছেন, ভারতীয় ধ্বনিবাদীরা ততটা দেখান নি।

এখন এই সম্প্রদায়-গত কাব্য-সমীক্ষার ব্যাপারে কি রকম অবিচার হয়, তার দুই একটা উদাহরণ দেখা যাক্। আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন ধ্বনি-প্রধান কাব্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাব্য। যেখানে ধ্বনি আছে, কিন্তু ধ্বনিটা প্রধান রূপে উপস্থিত নেই, সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য এবং যেখানে ধ্বনি একেবারেই নেই, সেটা হচ্ছে কাব্যই নয় বা "চিত্রকাব্য"। Mallarmeও কাব্যের এই জাতীয় একটা শ্রেণী-বিভাগ করেছেন সিম্বলিজিমের তারতম্য অনুসারে।

কিন্তু আমরা জানি ভারতবর্ষে সাহিত্যের ইতিহাসে এমন বহু উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে, যেগুলি ধ্বনিপ্রধান সাহিত্য নয়। তেমনই ফরাসী সাহিত্যেরও এমন বহু প্রথম শ্রেণীর কাব্য আছে, যেগুলি সিম্বলিস্ট্ কাব্য নয়।

আমরা আগেই বলেছি যে সমস্ত কাব্যে ধ্বনি আছে, কিন্তু সেটা প্রধানরূপে নেই (অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্বের পরিভাষায় যেসব কাব্যকে গুণীভূত ব্যঙ্গের কাব্য বলা হয়—ধ্বন্যালোক), সেই সমস্ত কাব্যকে আনন্দবর্দ্ধন দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলে রায় দিয়েছেন। Mallarmeও ঐ কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গুণীভূত ব্যঙ্গের কাব্যটা কি সব সময়েই দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য হবে? Edgar Allan Poe, যিনি ফরাসী না হয়েও ফরাসী সিম্বলিস্ট্ মতবাদের একজন পূর্ব্বাচার্য্য হিসাবে গণ্য হন, তিনি নিজে গুণীভূত ব্যঙ্গের কাব্যকে ধ্বনিপ্রধান কাব্যের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কাব্যের যেটা মূল কথা, সেটা শব্দ না, সেটা হচ্ছে শব্দের রহস্য, যাকে বলা যায় "Mystery" বা 'suggestive indefiniteness of meaning'। এই "suggestive indefiniteness" সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "Give to it any undue decision, imbue it with any very determined tone and you deprive it at once of its ethereal, its ideal, its intrinsic and essential character' (C. M. Brown—The Background of Modern Poetry. P. 9. Oxford, 1946)

ধ্বনির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করবার জন্য গুণীভূত ব্যঙ্গের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্যের প্রতি কি রকম অবিচার করা হয়, সেটা নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারা যাবে। এই শ্লোকটি নিয়ে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে অনেক আলোচনা হয়েছে। শ্লোকটি নীচে উদ্ধৃত করা হলো—

"উপোঢ় রাগেন বিলোল-তারকং
তথা গৃহীতম্ শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া
পুরোঽপি রাগাৎ গলিতং লক্ষিতম্॥"

এর অনুবাদটা হবে এই রকম, যথা—

লোল-আঁখি-তারা নিশা-মুখে হবে
অনুরাগভরে চুমিল শশী।
বিগলিত প্রেমে ঘোমটা কামিনী
কালো শাড়ী তার গেছে যে খসি॥

এখানে একটা পরিষ্কার সন্ধ্যার সৌন্দর্যোজ্জ্বল চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা করা হচ্ছে সমাসোক্তি অলঙ্কারের মাধ্যমে। এর বাচ্য বা অভিধানিক অর্থ হচ্ছে রক্তিম গোধূলির আলো থাকতে থাকতেই পূর্বাকাশের অন্ধকারকে বিশ্লেষিত করে পূর্ণ সৌরভে চন্দ্রের উদয় হলো, আকাশে ফুটে উঠলো দুই একটি তারা। এই কথাটাই প্রকাশিত হয়েছে দুচারটি স্বার্থ-বোধক শব্দের সাহায্যে (যথা রাগ—রক্তিম বর্ণ এবং অনুরাগ; তারকম্—নক্ষত্রকে কিংবা চোখের তারাকে; নিশামুখ—রাত্রির আরম্ভ এবং নিশা নামক নায়িকার মুখ; তিমিরাংশুক—অন্ধকার এবং কালো শাড়ী ইত্যাদি)।

এই শ্লোকটির একদিকের অর্থ বা বাচ্য অর্থটার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বনিত হচ্ছে আর একটা অর্থ। সেটা হচ্ছে নিশা নায়ক নায়িকাকে শশী নায়ক নায়ক চুম্বন দিচ্ছে। অনুরাগে নায়িকার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, তার চোখের তারা বিলোল হয়ে উঠেছে, প্রেমের আবেগে সে লক্ষ্যই করেনি যে তার কালো শাড়ীটা কখন খসে পড়ে গেছে।

এখানে শ্লেষ সমাসোক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে নায়ক নায়িকার নিবিড় মধুর মিলনের বর্ণনা। সেটা বাচ্য অর্থের সাহায্যেই ধ্বনিত হয়েছে। কাজেই ধ্বনিটা এখানে প্রধান নয়, তাই এখানে ধ্বনিটা হচ্ছে "গুণীভূত ব্যঙ্গ" ধ্বনিত ধ্বনি। সুতরাং ধ্বনি কাব্যের মাপকাঠিতে এটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য।

কিন্তু এটা কি সত্যই দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য? এখানে স্বচ্ছ বাচ্যার্থের প্রবাহের নিম্নে দিয়েই বয়ে যাচ্ছে একটা ধ্বনিত অর্থ (নায়ক নায়িকার মিলনের কথা)। কিন্তু সেই ধ্বনিত অর্থটা বাচ্য অর্থকে বাধিত বা তিরস্কৃত করেনি বলেই কি এই চমৎকার শ্লোকটি অকাব্য হয়ে গেল?

এই জাতীয় গুণীভূত ব্যঙ্গের অনেক কাব্যই আছে যেগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। অথচ খাঁটি ধ্বনির বিচারে তাই করতে হয়। এই জন্যই অনেকে ধ্বনি জিনিসটিকে কাব্যের মাপকাঠি হিসাবেই মানতে চান না। এই হিসাবে অলঙ্কারবাদের মধ্যে ধ্বনিবাদের চেয়ে অব্যাপ্তি দোষটা কম হয়। তাই উদ্ভটের টীকাকার প্রতিহারেন্দুরাজ অলঙ্কারকে ধ্বনির সহকারী হিসাবে গণ্য না করে ধ্বনিকেই অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করেছেন। উদ্ভটের অলঙ্কার গ্রন্থে "ধ্বনির আলোচনা নেই কেন" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেছেন "এষু এব অলঙ্কারেষু অন্তর্ভবাৎ" (কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহ ৬। ১ বৃত্তি)।

তবে ভারতীয় ধ্বনিবাদীদের সম্বন্ধে একটা প্রশংসার কথা আছে। তাঁরা সৌন্দর্যের অভিধানে অগ্রসর হতে হতে যখন ধ্বনি-লোকের মধ্যে সৌন্দর্যের নূতন দিগন্তের সন্ধান পেলেন, তখনও তাঁরা তাঁদের পূর্বপরিচিত সৌন্দর্য লোকগুলির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখেছেন। নূতনের মোহে পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করেন নি। তাই নূতনের মোহ-জনিত গোঁড়ামির পাপটা তাঁরা ততটা করেন নি যতটা করেছেন ইউরোপীয় সিম্বলিস্টরা।

ধ্বনিবাদীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কাব্যের সমীক্ষায় আবেগ অনুভূতি রস প্রভৃতিকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাই আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা হিসাবে প্রচার করলেও রসের প্রয়োজনীয়তার কথাও বার বার স্বীকার করেছেন তাঁর ধ্বন্যালোকে এবং তাঁর উত্তর-সূরী অভিনব গুপ্ত রসবাদের সঙ্গে ধ্বনিবাদের সমন্বয় করেছেন "রসধ্বনির" ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়া। রসধ্বনির মূল কথাটা হচ্ছে বস্তুটার ধ্বনির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে একটু টেক্‌নিকাল অসুবিধা রয়ে গেলো "বস্তুধ্বনি" ও "অলঙ্কার ধ্বনি"র ব্যাপারে। অভিনব গুপ্ত সেই অসুবিধাটাকে প্রায় দু হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেন "এই বস্তুধ্বনি এবং অলঙ্কার-ধ্বনিও শেষ পর্যন্ত রসেই পর্যবসিত হয়" (বস্তুনোঽলঙ্কারধ্বনেরো রস-ধ্বনিপর্যন্তত্বমেবেতি লোচন ১। ৪)

এর তাৎপর্য হচ্ছে ধ্বনি-কাব্যের মধ্যে যখন একটা বিশেষ রকমের বিষয় বস্তুর বর্ণনার মধ্যেই অন্তত একটা বিষয় বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত ইসারা জেগে ওঠে, কিংবা একটা অলঙ্কারের মধ্য দিয়েই অন্ত একটা অলঙ্কারের দ্যোতনা ফুটে ওঠে, তখন সেটাতে কবির হৃদয়াবেগের নিছক উচ্ছ্বাসটিই লক্ষিত হতে থাকে। সেটা নিষ্প্রাণ নিরুত্তাপ

বুদ্ধি-সর্বস্ব সাহিত্য-কলার কারসাজি মাত্র নয়।

এই ভাবে ধ্বনি-কাব্যের সঙ্গে রসের কাব্যের একাত্মতার উপলব্ধি করে ধ্বনিবাদীরা সম্প্রদায়গত মতবাদের একদেশদর্শিতার দোষ কাটিয়ে উঠেছিলেন। ফরাসী সিম্বলিষ্টরা কিন্তু সেটা পারেন নি। তাই তাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুভূতির দিকে, কবির ব্যক্তি-মানসের অনুরণনের দিকে, রোমান্টিক লিরিক উচ্ছ্বাসের সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে দেখেন নি; লিরিক কাব্যের সৌন্দর্য্যকে স্বীকারই করেন নি। Mallarme ও স্পষ্টই বলেছেন, "If the poem is to be pure, the Poet's voice must be stilled and initiative taken by the words themselves..... and thus replace the audible breathing in lyric poetry of old..... and the poet must be absent" (Crisis in Poetry P. 40)

অথচ Wordsworth, Shelley, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি বড় বড় কবি এবং Pater Newman প্রভৃতি বিখ্যাত সমালোচকেরা সাহিত্যে কবির ব্যক্তি-মানসের অনুরণনের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার জোরের সঙ্গেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তত্ত্ব আলোচনায় যে ব্যক্তি আলোচনা করে সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ"। (জাপান যাত্রীর পত্র নং—২)

"সাহিত্যের ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন "বিজ্ঞান জিনিসটা ব্যক্তি-স্বভাব বর্জ্জিত; তার ধর্ম্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল অথচ সাহিত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে তার পক্ষপাত ধর্ম্ম; সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা" (শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৪।৩০০)

Wordsworth তাঁর Poetry and Poetic diction প্রবন্ধে বলেছেন কবির কাব্য-সৃষ্টির আদি কারণই হচ্ছে কবির শক্তিশালী অনুভূতির উচ্ছলন (overflow of powerful feelings); Shelley তাঁর Defence of Poetry প্রবন্ধে বলেছেন, মানুষ হচ্ছে বাতাসে বাজা বীণার মত, তার হৃদয়ের তারে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের যত আঘাত লাগে, তাতেই ঝঙ্কারে সে সেই সুরেই বেজে ওঠে, যে সুরে বাঁধা আছে তার মনের বীণা। এখানেও সেরা কাব্য সৃষ্টির ব্যাপারে কবির ব্যক্তি-মানসের অনুরণনের কথাই বলেছেন। অভিনবগুপ্ত জগতের আদি কবি বাল্মীকির কাব্য সৃষ্টির প্রসঙ্গে কবির পরিপূর্ণ হৃদয়কুম্ভ থেকে উছলে পড়া বিগলিত চিত্তবৃত্তির কথাই বলেছেন (লোচন ১৫)।

পেটার বলেছেন "It will be good literary art not because it is brilliant or sober, or rich or impulsive or severe, but just in proportion as its representation of that sense, that *soul-fact* is true" (Appreciations Style p. 7)

Newman বলেছেন "Literature expresses not objective truth but subjective, not things but thought" (Idea of a University)

কিন্তু ফরাসী সিম্বলিষ্টরা কাব্য সৃষ্টির ব্যাপারে কবির হৃদয়ের স্পন্দন শোনাতে চান না, শুনতেও চান না।

এই বিষয়ে আনন্দবর্দ্ধন অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির সাবধানতা প্রশংসনীয়। তাঁরা ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা হিসাবে প্রচার করলেও সাহিত্যের বিচারে রসকে বাদ দেন নি বরং এই কথাটাই বলেছেন রস জিনিসটা ধ্বনি দ্বারাই অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং লিরিক কাব্যের সঙ্গে ইঙ্গিত ইসারার (suggestion) কাব্যের কোনও বিরোধ নেই। শুধু তাই নয়, ধ্বনিবাদীরা গুণ রীতি অলঙ্কার প্রভৃতিকেও রসাভিমুখী করে ঐগুলির উপযোগিতাকেও স্বীকার করে ছিলেন। এই সমন্বয়ী উদারতা সিম্বলিষ্টরা দেখাতে পারেন নি।

তবে অনন্য-সাধারণ উদারতা ও সমন্বয়ী প্রতিভা সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে আনন্দবর্দ্ধন খানিকটা অবিচার করে গেছেন। সেটা হচ্ছে ধ্বনিহীন কাব্যের মূল্যায়নের ব্যাপারে। এই জাতীয় কাব্যকেই তিনি "চিত্র কাব্য" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এটা কাব্য পদবাচ্যই নয়।

ফরাসী সিম্বলিষ্ট Mallarmeও এই জাতীয় কাব্যকে অস্বীকার করেছেন। এই জাতীয় কাব্যকের তিনি Parnassion কবিদের কাব্য-কলা-সম্বন্ধে "to take something in its entirety and simply exhibit it" বলে নিন্দা করেছেন।

এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আনন্দবর্ধন ধ্বনিহীন যে সমস্ত রচনাকে "চিত্রকাব্য" বলে তাচ্ছিল্য করেছেন তার মধ্যে কি সুকাব্য থাকতে পারে না? এই প্রশ্নটিকেই অন্যভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। প্রশ্নটা হচ্ছে ধ্বনির প্রাধান্য কিংবা অন্যতপক্ষে ধ্বনির উপস্থিতিটা কি কাব্যের পক্ষে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়? তার উত্তর হচ্ছে "না, একান্তভাবে সেটা প্রয়োজনীয় নয়"।

এই বিষয়ে কুন্তক প্রভৃতির মতবাদটি চিন্তনীয়। কবিকে যে ধ্বনির কাব্য বা রসের কাব্যই লিখতে হবে, এমন কথা নেই। শব্দ ও অর্থের সার্থক মিলনে একটা বিচ্ছিত্তির সৃষ্টি করতে পারলেও একজাতীয় কাব্য হয়। অলঙ্কারটা সব সময়েই কাব্যের বহিরঙ্গ সাজ সজ্জার ব্যাপার নয়, কখনও কখনও অলঙ্কৃত বাক্যটাই কাব্য হয়ে ওঠে। তবে সব অলঙ্কারই সাহিত্যকে কাব্য করে তুলতে পারে না। "কবি-ব্যাপার"জনিত, কবি-কল্পনাজনিত সত্তিকারের "কাব্যালঙ্কারের" জন্যই কবির রচনাটা কাব্য হয়ে ওঠে। অলঙ্কার জিনিসটা সব সময়েই রস বা ধ্বনির পরিপন্থী নয়। রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন "সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করবার জন্য অলঙ্কারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ণন বিজ্ঞানের মতো নিরলঙ্কার হইলে তাহার চলে না"—সাহিত্যের তাৎপর্য্য (শঃ বাঃ সং ১৩৭৩)।

এখানে দেখা যাচ্ছে কাব্যকে কাব্য করে তোলবার জন্য ধ্বনি এবং অলঙ্কারকে পাশাপাশি দাঁড়িয়েই কাজ করতে হচ্ছে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, "অলঙ্কার জিনিসটা চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান বলীবোধের চরমতা—তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজ সজ্জাতেই নিজের দেহে অন্তপ্রকাশিত করে দেন"—(সাহিত্য বর্ষ, শঃ বাঃ সং ১৩৩২৭)

উপমা প্রভৃতির সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "মনের কোনও একটা ভাবপ্রকাশের ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়, তাতে অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়"—(সাহিত্যের প্রাথ শঃ বাঃ সং ১৩৮৪)

আসল কথা হচ্ছে কাব্য শুধু ইসারাই করে না, সে কখন কখন ছবিও আঁকে, গানও গায়। তবে সেই ছবি রং বা তুলির কারুকার্যই নয়, সেই গান শুধু তান লয় সুরের বাহাদুরিই নয় সেই গানের মধ্যে শিল্পীর বুকের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়, সেই ছবির মধ্যে আঁকা বস্তু-পটটি অধিকতর সত্য ও সজীবতর বাস্তব রূপে ফুটে উঠে। তাই যদি হয়, তাহলে শব্দার্থে ঝলমল করা কাব্য, যাকে কুন্তক বক্রোক্তির কাব্য বলেছেন, আবার অলঙ্কারহীন বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার কাব্য, যাকে ধ্বনি ও স্বভাবোক্তির কাব্য বলেছেন সেগুলিও কাব্য এই সব কাব্যের সৌন্দর্য্যকে আনন্দবর্ধন তেমন মূল্য দেন নি।

তাহলেও আনন্দবর্ধন বা ফরাসী সিম্বলিষ্টরা সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে সম্পদ দান করে গেছেন তার তুলনা হয় না। আমরা তাঁদের আলোচনা প্রসঙ্গে দুই একটি ভুল ধরছি বলেই আমরা খুব বড় হয়ে যাইনি, তাঁরাও ঐ সব ভুলের জন্য ছোট হয়ে যান নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে, "খুঁত বের করা খুব সহজ, তার জন্য বেশী ক্ষমতার দরকার করে না" (ছিন্ন পত্র ১৪নং). কিন্তু সৃষ্টি করার জন্য দরকার হয় সত্তিকারের ক্ষমতার। আনন্দবর্ধন অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির আলোচনা একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি—তার মধ্যে মিলিত হয়েছে কবির অন্তর্দৃষ্টি, দার্শনিকের যুক্তিবাদ, বৈয়াকরণের সংযম, এবং সাধকের উপলব্ধি; পৃথিবীর সাহিত্যে তাঁদের সমকক্ষ কাব্য-সমীক্ষক বেশী নেই।

কাব্যের প্রাণ-বস্তু কোথায় এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে গত কয়েক শ বছর ধরে পণ্ডিতরা নানা দিক দিয়েই অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অথচ ঠিক ভাবে ধরতে

পারছিলেন না কাব্যলক্ষ্মী-সৌন্দর্যের স্বরূপটি কি। এমন সময় আনন্দবর্ধন আবিষ্কার করলেন সৌন্দর্যের একটা নূতন তত্ত্ব। তিনি বল্লেন এ সৌন্দর্য নারী দেহের লাবণ্যের মত। এটা তার গঠন পরিপাট্যের মধ্যেও নেই, অলঙ্কার প্রসাধনের মধ্যেও নেই। বাস্তব জিনিস থেকেই তার উদ্ভব, অথচ সেটা বাস্তবাতীত পদার্থ (১। ৪ ধ্বন্যালোক)। তিনি নূতন দিগন্তের দরজা উদ্ঘাটিত করলেন। সেই উন্মুক্ত দরজা পথে দেখা দিল এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের জগৎ, সেটা শুধু ছায়া-ঘেরা রহস্যেরই জগৎ নয়, সেটা যেন সহস্রদল চক্রের দ্যুতি-বিচ্ছুরিত আলোকের জগৎ, সঙ্গে পক্ষিকুল-কূজিত সঙ্গীতের জগৎ, অশ্রু-ঝরা ধ্বনির জগৎ। এ জগতের সন্ধান আমরা আগে পাইনি, অভিধান ব্যাকরণ মীমাংসা ন্যায়-শাস্ত্রের যুক্তি পরম্পরার সাহায্যে এ জগতের সন্ধান এখনও পাওয়া যাবে না।

সৃজন ক্ষমতা

॥ শ্রীগায়ত্রী যতি ॥

পরমাত্মা যখন সৃজনের নেশায় মেতে উঠেছিলেন তখন সুপ্রোথিত হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ইহলোক ও জীবজগৎ। জীবাত্মাও যখন তার আনন্দময় বোধের পরিতৃপ্তির জন্য স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে এই একই জিনিষের অভিব্যক্তি দেখি।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও দেখতে পাই মানুষের মধ্যে দুটি ক্ষমতা পাশাপাশি চলে—একটা সৃজন ক্ষমতা, অপরটি ধ্বংস প্রবৃত্তি। সৃজনের নেশা মানুষকে যদি পেয়ে না বসত তবে সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, প্রগতি সবেই স্তিমিত হ'য়ে যেত।

এই সৃজনক্ষমতা ঠিক কি সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিষয়টি এত জটিল যে একে ঠিক সংজ্ঞা দিয়ে বোঝা যায় না। এই বিষয়টির উপর বহু মনোবিজ্ঞানী আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে টয়ান্বি, গেজেল্‌স, অ্যাণ্ডারসান, গিলফোর্ড এবং ক্রোচারের নাম উল্লেখযোগ্য। মাত্র ১০।১২ বছর যাবৎ এই বিষয়টির উপর আলোকসম্পাতের চেষ্টা করা হয়েছে। সমস্ত মনোবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে চিন্তাশক্তির সঙ্গে সৃজনক্ষমতার একটি বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে।

পূর্বে মনে করা হোতো বুদ্ধি হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। কিন্তু বর্তমানে মনে করা হয় সৃজনক্ষমতা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। সৃজনশীল ব্যক্তিদের জগতের লবন (salt of the world) বলা চলে। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা সংস্কৃতি ও প্রগতির ধারক ও বাহক।

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁদের বুদ্ধাঙ্ক (I Q.) ১৪০—১৬০ এর মধ্যে। কিন্তু এই বুদ্ধি যদি কোন কিছু সৃষ্টির কাজে না লাগে তবে সে বুদ্ধির গরিমা বৃথা। যাঁরা নাট্যকার, কবি, শিল্পী, গায়ক ইত্যাদি তাঁরা সাধারণতঃ ১২০—১৩৫ বুদ্ধাঙ্কের অধিকারী। তাঁদের বুদ্ধি সৃজনের সৌরবে ভাস্বর।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৃজনক্ষমতা মোটেই বুদ্ধির চেয়ে হেয় নয় বরং বুদ্ধির চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। চিন্তাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়—convergent ও divergent চিন্তা। যখন চিন্তাকে convergent রূপে দেখি তখন সেটা হয় বুদ্ধি আর যখন চিন্তাকে divergent রূপে দেখি তখন সেটা হয় সৃজনক্ষমতা। সাধারণতঃ বুদ্ধির ক্ষেত্রে speed ও accuracy বেশী দেখা যায়। সৃজনক্ষমতার বেলায়ও এগুলি বর্তমান থাকে তবে কিছুটা কম থাকে।

সৃজনশীল হতে হ'লে তাহলে গোড়াতেই কিছুটা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। যারা বুদ্ধিতে খুব খাটো তারা কোনো কিছু সৃষ্টির অযোগ্য।

বুদ্ধি ও সৃজনক্ষমতা কিছু দূর পর্যন্ত পাশাপাশি চলে কিন্তু তারপর হয়তো এমন একটা স্তর আসে যখন বুদ্ধির আর বিকাশ হয় না কিন্তু সৃজনক্ষমতা তখন ক্রমশঃই আরোহণশীল।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বেশীর ভাগ সময় জীবনে সাফল্য অর্জন করেন, কিন্তু স্রষ্টার ভূমিকা যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের জীবনের সাফল্য সব সময় তাঁদের ভাগ্যে জোটে না।

বুদ্ধির সঙ্গে সৃজনক্ষমতার আরও বৈসাদৃশ্য দেখতে পাই যে বুদ্ধির উপর আমাদের বিশেষ কোনো হাত থাকে না। বুদ্ধি জন্মগত ক্ষমতা, পরিবেশ কেবলমাত্র বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু সৃজন-ক্ষমতা আংশিকভাবে জন্মগত ও আংশিকভাবে পরিবেশগত।

আমাদের শিক্ষকদের সচেতন হ'তে হবে যে যারা স্বল্প মেধাবী তাদের হয়তো বুদ্ধিমান করা যাবে না, কিন্তু তাদের সৃজনকাজে নিয়োজিত করে তাদের এই ক্ষমতার বিকাশ সাধন করান যায়

সাধারণভাবে ৮—৯ বছরের শিশুরা খুব সৃজনশীল থাকে। কিন্তু আমাদের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা তাদের এই সৃজনক্ষমতার গলা টিপে বুদ্ধির বিকাশের জন্য তৎপর হয়। অবশ্য এই সৃজনক্ষমতা কার জীবনে কখন স্পষ্ট ও তীব্র হয় তা নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। যেমন কেউ বলেন কৈশোর সৃজনের শ্রেষ্ঠ সময়, আবার কেউ বলেন ৩০—৪০ বছর বয়স সৃজনের শ্রেষ্ঠ সময়, আবার কোনো কোনো কবি, শিল্পী ও নাট্যকারের জীবনে বার্দ্ধক্যও নিয়ে আসে সৃজনের সার্থক সময়। সমস্ত স্রষ্টাদের মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:—

(১) বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি, (২) শিল্পসৃষ্টি, (৩) সাহিত্য সৃষ্টি, (৪) আথ্লিক কৌশলসৃষ্টি, (Atheletic creativity) (৫) ধার্মিক সৃষ্টি, (৬) নৈতিক ও সামাজিক সৃষ্টি। এই বিভাগগুলির মধ্যে আমাদের কোন না কোন বিভাগে বিশেষ প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন প্রশ্ন হোলো আমরা জানব কি করে তার কোন্‌দিকে প্রবণতা রয়েছে?

সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সহানুভূতিশীল মন। তবেই তিনি ছাত্রদের সৃজনক্ষমতার হদিশ পেতে পারেন। এ ছাড়াও বর্তমানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য আমেরিকায় নানা প্রকার test উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও অবশ্য শিক্ষকের রিপোর্টের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। Test গুলির মধ্যে Minisota Creativity Test ও Flanagan's ingenuity Test উল্লেখযোগ্য।

শিশুর সৃজনক্ষমতা বাড়াতে হলে শিক্ষকদের কি করণীয় আছে?

প্রথমতঃ শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কার মধ্যে কি ধরণের সৃজন ক্ষমতা আছে সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন। সৃজনশীল শিশুর ব্যক্তিসত্তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাতে শিক্ষক যেন কুণ্ঠিত না হন।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক যদি নিজে সৃজনশীল না হন তবে সৃজনের কাজে তিনি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না। কাজেই শিক্ষককে সৃজনশীল হতে হবে।

তৃতীয়তঃ শিক্ষক যদি ছাত্রদের কাছে ভয়ের বস্তু হন, তিনি যদি বেত্রপাণি রক্তচক্ষু হন তবে ছাত্রদের মনে সৃজনের বীজ বপনে অক্ষম হবেন। আবার খুব বেশী মাখায় তুললেও ছাত্ররা তাঁকে মানতে চাইবে না। ফলে তিনি শুভাকাঙ্ক্ষী হ'লেও পরোক্ষ ভাবে অশুভ পথের আলোকবর্তিকা বহন করবেন। শিক্ষক নিজের ব্যক্তি-সত্তায় অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্তার প্রতি অবজ্ঞা করবেন না। ক্রমাগত অবজ্ঞার ফলে শিশুদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাবে, তারা সৃজনমূলক কোনো কাজে নামতে আর উৎসাহ বোধ করবে না।

চতুর্থতঃ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং সেইজন্য বহুমুখী ও নমনীয় পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উপর বেশী গুরুত্ব

দিতে হবে। শিশুদের বেশী স্বাধীনতা দিতে হবে। শিশুদের আবিষ্কারকের ভূমিকায় স্থাপন করতে হবে। তাই সমস্যা পদ্ধতি এ দিক থেকে শিক্ষকের হাতে মূল্যবান হাতিয়ার হতে পারে।

মাঝে মাঝে সেমিনার, আলোচনা চক্র, বিতর্ক ইত্যাদির আয়োজন করা চলতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে শিশুর মৌলিক চিন্তার বিকাশ হতে পারে। মৌলিক রচনার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। যান্ত্রিক পদ্ধতিকে খানিকটা বর্জন করতে হবে।

এইভাবে আমরা যদি শিশুর সৃজন ক্ষমতার উপর জোর দিই তাহলে তার সহজাত প্রকৃতিও খানিকটা চরিতার্থ হবে এবং তার সার্বিক বিকাশে সাহায্য হবে।

শিক্ষা-কমিশনগুলিতেও দেখি এই সৃজন মূলক কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই সৃজনক্ষমতা বিকাশের কথা বলেছেন। মুদালিয়ার কমিশন ও কোঠারী কমিশনেও এই সৃজন ক্ষমতা বিকাশের জন্য নানা প্রকার কাজের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলে একই চিন্তার প্রতিধ্বনি তুলেছেন। কাজেই আমাদের এই অতি মূল্যবান ক্ষমতাটির বিকাশসাধনে যথেষ্ট সচেষ্ট ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

হারানো দিন

॥ শ্রীমান ॥

[পূর্ব প্রকাশিতার পর]

অধ্যাপক চৌধুরী নীরবে শুনে যান কাহিনী। শর্বরী বলতে বলতে হঠাৎ বলে উঠেছে, কই, কোন কথা বলছেন না যে স্যর? কি ভাবছেন বলুন।

—কি আর ভাবব, শুনছি তোমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। আমার বলার আর কি আছে?

—বলার নাই বা কিছু থাকল, কিন্তু আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন তাই বলুন।

—সত্যি বলছি, কিছু ভাবিনি।

—নিশ্চয়ই ভেবেছেন, বলতেই হবে কি ভেবেছেন। অধ্যাপক চৌধুরী বিব্রত বোধ করেন। শর্বরীর সাথে না পেরে বলেন, হ্যাঁ ভেবেছি তোমার সম্বন্ধে কিছু।

—কিছুটা কি, তাই বলুন।

—বলছি, এত তাড়া কেন? লিট শেষ হলেই ত শুরুতে পারতে আমার মতামত।

—লিট আমার শেষ হয়ে গেছে।

—এঁ্যা, এত তাড়াতাড়ি?

—এই ঠাট্টা করতে শুরু করলেন বুঝি। না, আমি আর আপনার সাথে পারিনা। বলুন কি ভাবছেন।

—ভাবছি, তোমার যে বিশেষ গুণটি রয়েছে, তার জোরেই সর্বত্র মুক্তি পেয়ে এসেছ, কোথাও থমকে দাঁড়াতে হয় নি।

—বিশেষ গুণ? সেটা আবার কি?

—তোমার বিশেষ গুণ, তোমারই জানা নেই?

—না, নেই। এবার বলুন সে বিশেষ গুণটি কি?

—বলতেই যখন হবে, তখন বলে ফেলছি। বিশেষ গুণটি হচ্ছে, অনুরাগ-নিয়ন্ত্রণ। এই রাগী মেয়ের মুখের কাছে দাঁড়াবে কে? সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

শর্বরী একটু চিন্তা করে বলে, 'ঠিকই বোধ হয়

বলেছেন। আমি সত্যিই বোধ হয় রাগী। কিন্তু আমাকে লোকে multifaced বলে, তা জানেন কি?

—লোকে বলতে পারে, কিন্তু আমি ত শুধু একটি face দেখেছি।

শর্বরী রাগ করে দরজা পর্যন্ত চলে যায়। বলে, বেশ রাগীই যখন, তখন রাগ করেই চলে গেলাম।

—পারবে রাগ করে থাকতে?

—খুব পারব।

—কোন খবর না নিয়ে থাকতে পারবে!

—পারি কিনা দেখতেই পাবেন।

—চিঠি না লিখে থাকতে পারবে?

—খুব পারব।

—আমি হলে কিন্তু রাগ করে এমনিভাবে কখনো চলে যেতাম না।

—রাগের কারণ থাকলেও না?

—না, কখনো না।

শর্বরী অবাক হয়।

অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, তিক্ততা থেকে বিচ্ছেদকে আমি মেনে নিতে পারি না। যদি আমার সাথে কারও বিচ্ছেদ হবার মত অবস্থা হয়, তাহলে উভয়ে উভয়কে বুঝবার মত সময় ও সুযোগ সৃষ্টি করব। প্রতিকারের পথ তবু না পাওয়া গেলে, তখন আর হয়ত উপায় থাকবেনা, কিন্তু তাহলেও রাগ করে প্রথম পদক্ষেপ আমি করব না।

—তার মানে, নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিতে চান না, মানসিক শান্তি তাতে নষ্ট হবে, তাই না?

অধ্যাপক চৌধুরী ফুল এক্সপ্রেসের ফ্রি-টায়ার কামরার শুয়ে শুয়ে ভাবেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত শর্বরীর রাগ করে চলে যাওয়াটাই সত্যি হল। কিন্তু কেন এমন হল? এমন ত হবার কথা নয়। তার দিক থেকে অসংখ্য ত্রুটি থাকা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু শর্বরী তাকে জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলে দিল কি করে? কি করে সম্ভব হল? এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এর মূল্য কি কিছুই ছিল না। অধ্যাপক ভেবে কিছু কূল কিনারা পান না।

আর একদিনের কথা চৌধুরীর মনে পড়ে যায়। শুধু মনে পড়ে না, খুব বেশি করেই মনে পড়ে।

কি একটা কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক চৌধুরী অসঙ্কোচে শর্বরীকে বলেছিলেন 'আমি তোমাকে খুবই ভালবাসি শর্বরী'।

শর্বরী বলেছিল, আমি কিন্তু কোনোদিন আপনাকে বলিনি যে আমি আপনাকে ভালবাসি।

—সত্যিই তুমি বল নি। আমি শুনতে চাইও না সে কথা। তাতে আমার প্রয়োজন কিছু নেই। মুখে বলাটাই সব সত্যি হয় না। তুমি মনস্তত্ত্বের ছাত্রী, জান, মানুষ যখন সজোরে চিৎকার করে বলে ওঠে 'না', তখন তার অন্তরে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে বলে 'হ্যাঁ'। এই 'হ্যাঁ' 'না'-এর, অন্তর বাহিরের দ্বন্দ্ব যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিনই চলবে। তাই বলে আমি একথা বলতে চাই না যে দুই প্রান্তের সুর কখনোই মিলতে পারে না। পারে নিশ্চয়ই। তুমি বলেছ 'আমি কিন্তু কোনদিন বলিনি যে আপনাকে ভালবাসি'। একথা বলে তুমি যদি তোমার আসল মনের কথা 'আমি আপনাকে ভালবাসি না' এই কথাই প্রকাশ করতে চাও, তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই। আমার নিজের দিকের ভালবাসা নিয়ে আমি নিজেই অত্যন্ত স্বার্থপরের মতই আনন্দ পেতে চাই, এর মধ্যে আর কেউ এসে ভাগ বসাবার প্রয়োজন আমি দেখতে পাই না।

শর্বরী ইতস্ততঃ করে বলে, আপনি প্রায়ই বলেন, আপনি আমাকে ভালবাসেন, আপনার ভালবাসার সত্যিকার রূপটি কি, একবার বলুন।

—বলব বই কি! একবার যখন বলতে শুরু করেছি, তখন শেষ পর্যন্ত বলব বই কি। ভালবাসার স্বরূপ বলতে তোমাকে কি চোখে দেখি, তাই জানতে চাচ্ছ ত, তাই না?

—হ্যাঁ ঠিক, তাই।

অধ্যাপক চৌধুরী খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে থাকেন, কিছু বলতে পারেন না।

শর্বরী আবার তাগিদ দেয়।

—হ্যাঁ বলছি, একটু সবুর কর। তারপর অধ্যাপক

ইতস্তত: করে ধীরে ধীরে বলেন, আমি তোমাকে আমার মায়ের মত ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি বন্ধুরূপে, ভালবাসি ভগ্নীরূপে, আর—

—আর, আর কি ?

—বলব, মনে কিছু করবে না ?

—মনে করার কিছু থাকলে নিশ্চয়ই করব। কিন্তু সত্যি যা তা প্রকাশ করুন।

—আর, আর ভালবাসি তোমাকে স্ত্রীকে যে ভাবে ভালবাসে তেমনি করে।

শর্বরী চুপ করে থাকে। এমনিভাবে যে প্রফেসার চৌধুরী বলতে পারেন তা শর্বরী ভাবতে পারেনি।

শর্বরী চুপ করেই রইল। কি সে বলবে তা ভেবেই সে পাচ্ছিল না।

প্রফেসার চৌধুরী স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, শর্বরী, তুমি বোধ হয় আমার কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছ। ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই। আমি তোমার কাছে ভালবাসার চারটি রূপের কথা বলেছি। কোন একটি রূপে একভাবে তুমি আমার কাছে সত্যি নও। চারটি রূপের quintessence, অর্থাৎ সর্বসম্মিলিতরূপ তোমার মধ্যে দেখবার আশা নিয়েই তোমাকে ভালবেসেছি। এবার বুঝতে পেরেছ ?

—না।

—একটু ভেবে দেখতে চেষ্টা কর।

শর্বরী ইতিমধ্যে নিজের বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। সে বলল, একথা আপনি কি সত্যিই বলছেন।

—আমি মিথ্যা বলাটা ঘৃণা করি শর্বরী।

—মিথ্যা বলতে ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু ভুল করতেও ত পারেন, সে কথা স্বীকার করতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না।

—ভুল করে থাকলে আমি নিশ্চয়ই তা স্বীকার করব, বিশ্বাস করতে পার।

—একজন বড় ইংরেজ সাহিত্যের লেখক এ বিষয়ে কি বলেছেন জানেন ?

—না, বল।

—বলেছেন, প্রেম ও স্নেহ ভালবাসার মধ্যে যে টানা পোড়েন, তাতে জয় হয় প্রেমের। প্রেমের দিকেই মানুষ ঝুঁকে পড়ে। আপনি নিজে একবার ভাল করে ভেবে দেখুন। একটি চুম্বক লোহার দুই প্রান্তে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকে। মেরুগুলিতে আকর্ষণ বিকর্ষণ হয়। চুম্বক লোহার মাঝখানটায় থাকে উদাসীন অঞ্চল, সেখানে আকর্ষণ বিকর্ষণ নেই। কিন্তু প্রেম-ভালবাসার লৌহদণ্ডে উদাসীন অঞ্চল নেই, সবটাতেই হয়েছে টানা পোড়েন। তাতে জয় হয় প্রেমের। কারণ প্রেম বেশি শক্তিশালী। অতএব বুঝে দেখুন আপনি যা ব্যাখ্যা করেছেন তা ভুল।

—আমি তোমার ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারলাম না, শর্বরী। কারণ প্রেমের অতাধিক শক্তিতে আমি বিশ্বাসী নই। তা যদি হত, তাহলে তোমার জীবনের অন্ততঃ সাত আটটি প্রেমের কাহিনীর মধ্যে একটিও প্রেমের প্রভাব ও শক্তি বিস্তার করতে পারত।

—তা পারেনি, তার কারণ হয়ত সত্যিকার প্রেম তার মধ্যে ছিল না বলে।

—তা যদি বল, তাহলে সত্যিকার প্রেম, সত্যিকার স্নেহ ভালবাসা হৃদয়ের কাছে পরাজয় না মানলেও, ত্যাগ স্বীকার ত করতে পারবে, এ কথা ত বলা চলে।

—প্রেম কোন্ দুঃখে ত্যাগ স্বীকার করবে ? প্রেম যে স্বার্থপরতা, তা কি আপনি জানেন না। প্রেম কখনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না, করতে জানেও না। আপনি কিছুই জানেন না, তাই ও কথা বলছেন।

—আমার ধারণার সাথে তোমার ধারণা কখনো মিলবে না, অতএব এ প্রসঙ্গ বন্ধ করাই বাঞ্ছনীয়।

—প্রসঙ্গ বন্ধ করতে চান করুন, কিন্তু আপনার ভালবাসার ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হয়নি, একথা আমি বার বার বলব।

—একটা কথা শর্বরী, তোমার ও আমার মন উভয়েই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে। আমার দৃষ্টিকোণ জানা বুঝবার সময়কাল তোমার বয়সের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি, কিন্তু তাহলেও মানুষের দন্ত অভিজ্ঞতার উত্তরা-

বিষয়ে নিয়ে তোমার মানসিক পরিপক্কতা ও উৎকর্ষতা আমার সঙ্গে সমান্তরাল। কিন্তু পার্থক্য কোথায় জান? পার্থক্য হচ্ছে উভয়ের বয়সের ব্যবধানের মধ্যে। উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছি, কিন্তু হয়তো তোমার চেয়ে আমি পাঁচ ডিগ্রি বেশি হেলে ঘুরছি। অতএব উভয়ে সমান্তরাল পথে এলেও তাদের ব্যবধান বেড়েই যাচ্ছে। দুইটি ব্যক্তির মধ্যে বয়সের ব্যবধান না থাকলে maturity বা পরিপক্কতার পার্থক্যের জন্য তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই হচ্ছে জগৎ। কিন্তু তার মধ্যেই মানুষ adjustment করে নেয়। চিরকাল দ্বন্দ্ব নিয়েও মানুষ থাকতে পারে না, তাই চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে মানুষ থেমে যায়, একটা কার্যকরী পন্থা উভয়ে বেছে নেয়। বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

—আমি কিন্তু ও রকম জোর করে adjustment এর পক্ষপাতী নই।

—তোমার প্রস্তাব?

—আমার আবার কি প্রস্তাব থাকতে পারে? আপনার পক্ষ থেকেই এসেছে ভালবাসার প্রস্তাব, সংশোধনী প্রস্তাব যদি কিছু করবার হয়, তবে আপনিই করবেন। বিরোধী পক্ষ হিসেবে আমি আপনার সমালোচনা টুকু করেছি। এবার আপনি আপনার প্রস্তাব সংশোধন করুন।

—সমালোচনা যারা করেন তাঁরাই প্রস্তাব রাখেন।

—না, প্রস্তাব আমি রাখব না, শুধু এই বলব, যদি আমাকে ভালবাসতে হয়, তবে আমার আপনার প্রতি ভালবাসা নেই, এরূপ মনে করে তবে ভালবাসতে হবে।

—তা আমি মনে করব কি করে? আগেই বলেছি, তোমার সাহায্যেই মনের ভাব সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যায় না। ভালবাসি বললেই ভালবাসা হয় না, আর ভালবাসি না বললেই ভাল না বাসা হয় না। ভাল বাসা এক অদ্ভুত জিনিস, তার গভীরত্ব কে কবে নির্ধারণ করতে পেরেছে? আমার ছোটখাট প্রয়োজন সম্বন্ধে তোমার সচেতনতা কি কিছুই নয়? আমার জন্য পাগলা বুহুরের সম্মুখীন হওয়া, তাও কি কিছু নয়? তুমি কোনও দিন আমাকে ভালবাস বলে আমাকে কিছু বল নি, কিন্তু তাই কি সত্য? আচ্ছা, বেশ তাই যদি সত্যি হয়, হোক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার প্রস্তাবের কোন্ দুর্বিবোধ সম্বন্ধে আপত্তি তা পরিষ্কার করে বল।

—আমি কিছু বলব না

—বেশ, না বললেও বুঝতে পেরেছি তোমার আপত্তি কোন্‌খানে হতে পারে। আমি সে বিষয়ে নিশ্চয়ই ভেবে দেখব। কিন্তু আগেই বলেছি—এখনও বলছি, কোন একক গুণের প্রতীক হিসেবে তোমাকে ভালবাসার কথা বলি নি। তুমি সকল বিচ্ছুর মূল, সারবস্তু। তুমি প্রেম ও ভালবাসার সমন্বয়। এখন খুশী ত?

সবরী আনমনা হয়ে যায়। অধ্যাপক চৌধুরী পুনরায় প্রশ্ন করেন 'খুশী হয়েছ ত সবরী'?

—হ্যাঁ, খুশী হয়েছি।

—বেশ, আমিও খুশী!

সবরী হেসে বলে, খুশী হয়েছেন? কোনরূপ বাধা অনুভব করছেন না ত?

—ওটা আমার নিজস্ব কথা, সবরী। ওটা থাক। কিন্তু আমি সত্যিই খুশী হয়েছি। হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এবার ত তোমাকে যেতে হবে ঘরে।

—হ্যাঁ যাব, চলুন এগিয়ে দিয়ে আসবেন।

অধ্যাপক নিজের বাসে শুয়ে শুয়ে এমনি করে ভাবছিলেন কত কথা, কতদিনের খুঁটিনাটি কথা।

ঐদিনের কথাবার্তার পর হতেই সবরীর কিছু পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তার এ বাড়ীতে আসা গিয়েছিল কমে। কথাও সে বলত কম। কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভাবটাও চলে গিয়েছিল।

অধ্যাপক চৌধুরী দু'একদিন সবরীর আকস্মিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সবরী হেসে উত্তর দিয়েছিল mutifaceduessএর নমুনা দেখাচ্ছে। আপনি ত শুধু একটি faceই দেখেছেন। এবার থেকে আরও face দেখতে পাবেন।

—আমার কাছে যে ঐ একটি faceই ভাল ছিল। ওটাতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার নূতন

face রেখে কি করব ?

—কেন, নূতন face দেখলে কোনরাসতে অসুবিধা হবে ?

—বাজ করোনা শর্বরী। আমি তোমার বাজের পাত্র নই। তুমি যে কথার উল্লেখ করে আমাকে বাজ করছ, সে কথার অংশীদার কি তুমি নও ?

—আমি অংশীদার হতে যাব কোন দুঃখে !

—তবে যে সংশোধনী প্রস্তাব করলে ?

—আমি ত করি নি, ওটা ত আপনিই করেছেন ?

—তোমাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না শর্বরী, তুমি কি চাও, কি তোমার অভিপ্রায় সবই আমার কাছে অস্পষ্ট। এবার বুঝিয়ে বলবে কি হয়া করে ?

—এত সহজেই কি মানুষ মানুষকে বুঝতে পারে ? মানুষ যান্ত্রিক, তাই বলে 'আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি'। চিনতে পারা কি এতই সহজ ? যাক সে কথা, যা হবার তা হয়ে গেছে।

অধ্যাপক চৌধুরী শর্বরীর কথা মোটেই বুঝতে পারেন নি, বুঝতে পারেন নি কেন শর্বরী দূরে সরে যেতে চাইছে। তিনি যা বলেছেন, তা ত অতি সহজ সরল কথা, অতি স্পষ্ট কথা কারও সাথে তাতে clash নেই। শর্বরী তার পরম স্নেহের ধন, সে যে ভাবে চললে খুশী হয় সেই পথেই চলুক, তিনি কেন বাধা দেবেন ? শর্বরী ত তাঁর মনের কথা জানে, তবে কেন এই বিরাগ ?

এর পর আরও কিছু পরিবর্তন শর্বরীর জীবনে দেখা যায়। পরিবর্তন আরও জানা গেছিল অধ্যাপক চৌধুরীর করিমপুর অবস্থিতকালে। সাতদিনের জন্য শ্রীচৌধুরী গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে।

যাবার সময় অধ্যাপক চৌধুরী শর্বরীর কাছে বিদায় নিয়ে বললেন, ভাল থেকো। ক'দিন পরেই আবার দেখা হবে।

যথার্থই সাত দিন পর শর্বরীর সাথে অধ্যাপক চৌধুরীর দেখা হয়েছিল। শর্বরীর মধ্যে সাত দিনে অনেক পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। ভাল করে সে কথা বলত না, অন্যমনস্ক হয়ে থাকত, তর্ক করত না, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে অধ্যাপকের গৃহ হতে চলে যেত। অধ্যাপক চৌধুরী তাকে এগিয়ে দিতে যেতেন কিন্তু ঐ পথটুকুতেও কোন কথা হত না।

অধ্যাপক চৌধুরী অবাক হয়ে যেতেন। এ কি হল ? এদিকে নিজেই ঘনিষ্ঠতা করেছিলেন। এখন আর দোষ দেবেন কাকে ? ভাবলেন শর্বরীকে ভালবেসেছিলেন, বেশ ত, কিন্তু রুক্ষ আবরণ নিয়ে বসে থাকলেই ত চলত। কেন তিনি শর্বরীকে ও সব কথা বলতে গেলেন। এখন প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কিন্তু শর্বরী ত সাধারণ মেয়ে নয়, তার মধ্যে কেন সাধারণ মেয়ের মত সব ভাবধারার ওলট পালট হয়ে যাবে ? অধ্যাপক চিন্তা করতে থাকেন। একি শুধু শর্বরীর নিজস্ব চিন্তাধারার ফল, না বাইরের কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া ? কে জানে কি ! তিনি ভাবেন, যা হয় হোকগে, শর্বরী ভাল থাকুক, তার মঙ্গল হোক, তাহলেই তিনি খুশী।

অধ্যাপক চৌধুরী নিজের মনে শুয়ে শুয়ে কত কথাই না ভাবতে থাকেন। গাড়ী খুব ধীরে ধীরে চলছিল, বৃষ্টির মধ্যেও দূরে দুর্গাপুরের আলোক মালা দেখা যাচ্ছিল। সাগর উঠে বসেন। ভাবলেন, আর কতটুকুই বা সময়, আসানসোল এলে আবার দু'জন দুদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবেন। বিধাতাপুরুষের কোন্ ইঙ্গিতে তাঁরা এক আবর্তনীর মধ্যে এসে পৌঁছালেন, আবার কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁরা কেসে যাবেন কে জানে।

"আপনি কি আসানসোলে নামবেন ?"

চৌধুরী চমকে উঠে পিছন দিকে ফিরে তাকান।

একি, এ যে রূপা, দ্বিতীয় সংস্করণ ! তাড়াতাড়ি সাগর চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

রূপা বসল।

সাগর জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছিলেন ?

—বলছিলাম, আপনি কি আসানসোলে নামবেন।

—হ্যাঁ, তাই ত ভাবছি।

—কিন্তু আপনি কি আসানসোলের টিকিট কিনেছিলেন? আর ওখানকার টিকিট কিনলে ত নিশ্চয়ই এ গাড়ীতে উঠতে পারতেন না।

—ঠিকই বলেছেন, আমি আসলে অনেক দূরের যাত্রী, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আসানসোলে আমার জরুরি কাজ আছে, তাই নামব।

—প্রচুর টাকার ক্ষতি হবে, জানেন? ঐ টিকিট আপনার আর চলবে না। আড়াইশ মাইল না গেলে যাত্রা শুরু করা যায় না।

—তা হোক, আমাকে নামতেই হবে। আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

—তবে ত নামতেই হবে। আমি আপনাকে বর্ধমানেও নামতে চেষ্টা করতে দেখেছিলাম। সেখানেও বোধ হয় বিশেষ কাজ ছিল?

সাগর চৌধুরীর মুখে কথা যোগায় না। থতমত খেয়ে বলেন, 'হ্যাঁ দু জায়গায়ই কাজ, আসানসোলের কাজ শেষ করে বর্ধমানে ফিরে আসব।

—কিন্তু মনে করবেন না—শ্রী

—সাগর চৌধুরী

—কিন্তু মনে করবেন না শ্রীচৌধুরী। দূর পাল্লার যাত্রী হয়ে হঠাৎ কাছের জায়গায় জরুরী কথাগুলো পথে এসে মনে পড়ে গেল কেন, বলতে পারেন?

এদিকে অধ্যাপক চৌধুরী নিজের নাম হঠাৎ বলে ফেলে দিয়ে বেয়াদুব বনে গিয়েছেন। তাঁর নামটা ত রূপার কাছে অপরিচিত নাও থাকতে পারে। নিজের উপর নিজেরই রাগ হয়। কেন নামটা বলতে গেলেন?

কিছুটা সামলে উঠে রূপার কথায় উত্তর সাবধানে দেন। তাঁর মনে হচ্ছিল দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রথর বুদ্ধিমত্তার কিছুটা অংশ পেয়েছে।

বলেন, তবঘুরে মানুষ, আমার কাছে হরিদ্বারই বা কি, আর আসানসোলই বা কি? একদিন হরিদ্বারে পৌঁছলেই ত হবে।

—তা বটে তবঘুরের কোনও কিছু স্থির না থাকাটাই উচিত। কিন্তু আমি বলি কি এই বৃষ্টি বাদলে গাড়ী থেকে নাই বা নামলেন। কোথায় যাবেন? এখানে স্ত্রীপুত্র কেউ আছে?

—বলেছি ত তবঘুরে, স্ত্রীপুত্র কেউ নেই।

—তবঘুরে হলে স্ত্রী পুত্র থাকতে নেই? স্ত্রী পুত্রের ভয়েও ত পালাতে পারেন?

অধ্যাপক চৌধুরী রূপার কথায় থাবড়ে যান। কি জানি মেয়েটা কি ইঙ্গিত করছে!

রূপা বলে, যাকগে, আপনি যেখানে ইচ্ছা নামুন, আমি কিন্তু বলবার কে? কিন্তু যদি নামেন, ঐ ব্যাগটা আমাকে দিয়ে যাবেন, কেমন? ওখানে মায়ের ব্যাগে ছোলনাই তুলতে ইচ্ছা করে না।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেব। আপনি এখুনি বিছানা করে শুয়ে পড়ুন না কেন? আমি ঘুরে গিয়ে একটু বসব এখন।

—না, তা পারা যাবে না। দিদিরা রয়েছেন, ভাববেন, আপনাকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি জায়গা জুড়ে শুয়ে আছি। আচ্ছা, তার চেয়ে এক কাজ করুন না। আপনি আসানসোলে নাই নামলেন। আমাদের সাথেই চলুন, আমরাও হরিদ্বার যাচ্ছি। বেশ মজা হবে। আমি আপনার সাথে দিনের বেলা বেশ গল্প করতে করতে যাব। জানেন, আমার বুড়ো মানুষ খুব ভাল লাগে।

—আপনার

—আপনার নয়, তোমার বলুন।

—তা বেশ ত, 'তুমিই' বলতে এতক্ষণ চাইছিলাম। তোমার আমন্ত্রণে লোভ হচ্ছে। কিন্তু পারব না ভাই। আমার এখানে রয়েছে পরম প্রয়োজন।

তারপর কৌতুক করে অধ্যাপক বলেন, আচ্ছা, না হয় গেলাম তোমাদেরই সাথে। এদিকে তুমি খুব গল্প করলে আমার সাথে, ওদিকে বাবাজী আমাকে বসে বসে দিলেন শাপ। তখন কি হবে?

রূপা হেসে ওঠে। বলে, আপনার শাপের বয়স আছে নাকি?'

—না নেই, কিন্তু পর জন্মে যদি এর প্রভাব গিয়ে পড়ে তাহলে?

—তবেই ত মুস্কিল।

তারপর দু'জনে খুব জোরে জোরে হেসে ওঠে। কিউবিকল থেকে ভাক সোনা হাঁক দেয় 'রূপা'।

রূপা বলে, আমার নাম রূপা শুনলেন ত। আমি যাই। এখনি কিন্তু আসানসোলে নামবেন না। ওরা ডাকছে। কাল দেখা হবে। টা টা। একটু এগিয়ে গিয়েই রূপা ফিরে আসে। তারপর প্রায় চৌধুরীর কানের কাছে মুখ এনে বলে, আপনি কে আমরা অনেকেই চিনতে পেরেছি সাগরদা। কেন আসানসোলে নেমে যেতে চাইছেন, কেন মধ্যমানে নেমে যাচ্ছিলেন, বৃষ্টির জন্য নামতে পারেন নি, তা অন্যের চোখ এড়ালেও আমার চোখ এড়ায়নি। আপনি ভীরু, আপনি কাপুরুষ; তাই বাস্তবের সম্মুখীন হতে চান না। ছোট মুখে বড় কথা মাপ করবেন দাদা, আপনি অতীতেও বোধ করি এমনি ছিলেন। সে যাক, আমি এখন যাচ্ছি। আপনি কিন্তু আমাদের সাথেই যাবেন। কথা ঠিক রইল কিন্তু!

অধ্যাপক চৌধুরী রূপার কথায় আড়ষ্ট হয়ে যান। তাহলে তাঁর সব গোপনতাও ব্যর্থ হয়েছে।

রূপার কথায় মুগ্ধ তিনি হয়েছিলেন। হাঁ, শর্বরীর বোন বটে। এরা তাঁর কত আপন! বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠে আসে।

গাড়ী চলছিল। দুর্গাপুর ছেড়ে গেছে, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ত আসানসোলে এসে যাবে। রূপার আব্দার শুনলে চলবে না আসানসোলে নামতেই হবে। এবারের যাত্রা হবে শেষ আবার যাত্রা শুরু হবে, তবে কোন্‌খানে, কে জানে? গাড়ী অনেকক্ষণ ধরে চলল, তারপর হঠাৎ পথের মাঝখানে থেমে পড়ে রইল। অধ্যাপক চৌধুরী জানালা দিয়ে এদিক ওদিক তাকান। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। অসম্ভব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। অধ্যাপক চৌধুরীর বুকভরা অশ্রুর সাথে পাল্লা দিয়েই বোধ হয় বৃষ্টি পড়ছিল। চৌধুরীর কপোল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। শর্বরীর কাছে তিনি এমন কি অপরাধ করেছিলেন যে শর্বরী তাঁকে জীবন থেকে একেবারে মুছে ফেলল। তিনি তাঁকে গভীর স্নেহে ভালবাসতে চেয়েছিলেন। তবে? তবে কি হয়ে গেল।

গাড়ী ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে

—সাগরদা।

অধ্যাপক সাগর চৌধুরী চমকে ওঠেন। ফিরে তাকিয়ে দেখেন শর্বরী।

দশ বৎসরের ব্যবধান। শর্বরী রোগা হয়েছে। হয়েছে আরও সুন্দরী যদিও মুখখানি মলিন।

—সাগরদা, চিনতে পারছেন না বুঝি।

অধ্যাপক চৌধুরীর মুখে কথা ফোটে না। অতি কষ্টে বলেন, 'শর্বরী।'

শর্বরী চৌধুরীকে প্রণাম করে। চৌধুরী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, সেই আগের দিনের মত শর্বরীর মাথায় হাত বুলিয়ে চুমটা একটু টেনে দিয়ে অধ্যাপক বলেন, জীবনে সুখী হও শর্বরী।

—সুখী, তা হব বই কি? কিন্তু আপনি চলেছেন কোথায়?

—ভাবছিলাম, অনেক দূরে যাব। কিন্তু···

—কিন্তু কি, অতদূরে আর যাবেন না, না?

—হাঁ।

—জিজ্ঞেস করার অধিকার নিয়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন না, তাই জিজ্ঞেস করছি, কোথায় নামবেন?

—আসানসোলে!

—কেন?

—প্রয়োজন আছে?

—কি প্রয়োজন?

—এখনও ঠিক জানি না, তবে আমার সত্যি প্রয়োজন আছে।

—আমরা এ গাড়ীতে যাচ্ছি একথা আপনি আগে কারুর কাছে শুনে ছিলেন?

—না, নিশ্চয়ই না।

—আমি ভেবেছিলাম অন্য কথা, মনে করেছিলাম আপনি জেনেশুনে হরিদ্বারের টিকিট কিনেছেন।

—আমি বৃদ্ধ শর্বরী, ঐ জাতীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার

করতে চাইলে প্রায় দশ বৎসর আগেই করতে পারতাম। সে কথা থাক্, আজ আর তোমার সাথে ঝগড়া করব না।

—আমি বুঝি করিমপুরে সর্বদা ঝগড়া করেছি?

—তোমার কথা ত বলিনি, আমি নিজের কথা বলেছি, ঝগড়া করব না।

—কিন্তু করব না বললেই ত চলবে না। ঝগড়া করতেই হবে। এ আপনার রাশিফল, কোষ্ঠীর নির্দেশ। জানেন একবার আপনার রাশি ও জন্ম সময় জেনে নিয়ে জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম, জানবার ইচ্ছা হয়েছিল কেন আপনি জীবনটাকে নিয়ে ইচ্ছে করে ছিনিমিনি খেলছিলেন। জ্যোতিষীর কাছ থেকে অনেক ভবিষ্যৎ-বাণী আপনার সম্পর্কে শুনেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা একটিও মেলেনি।

—মেলেনি, জানলে কি করে?

শর্বরী নিঃসঙ্কোচে বলে, খবর রাখতাম!

—আমার খবর রাখতে?

—রাখতাম বই কি?

—আচ্ছা, জ্যোতিষীর কাছে কি শুনেছিলে?

—শুনেছিলাম রাজা না হলেও কাছাকাছি হবেন। চাকুরীতে প্রভূত উন্নতি হবে, ছেলেমেয়েরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিছুই হয় নি। কিন্তু অতীত জীবন থেকে এ জীবন পর্যন্ত দুটি বিষয়ে আপনার কোষ্ঠীর সাথে জীবনের সাথে হুবহু মিলেছে।

—সেটা কি?

—সেটা হচ্ছে আপনি চিরকাল অবুঝ ও ঝগড়াটে।

—তর্ক করবার মত সময় নিশ্চয়ই উভয়েরই নেই। কিন্তু একটু বুঝিয়ে বলবে কি?

—দশ বছর আগেকার কথার জের টেনে কথা কাটাকাটি করার সময় নেই। তবু শেষ কথা বলছি, আপনি চিরকাল অত্যন্ত অবুঝ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃও বটে। জীবনে হয়ত একটা বিষয়ে যে pattern করেছেন তাই যান্ত্রিক ভাবে আপনি ধরে চলেছেন। কোনরূপ এদিক ওদিক হবার যো ছিলনা। কিন্তু মানুষ ত গতিশীল জীব। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে তার জীবনের গতিপথ বিভিন্নমুখী হবে। কিন্তু আপনি অত্যন্ত অবুঝ ছিলেন, সেকথা কোন দিন স্বীকার করতে চান নি। তার ফলেই হয়েছে আপনার এ বিচিত্র জীবন। ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার প্রভাব থেকে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম। আপনি ভেবেছিলেন আপনার মনের গোপন কথাটুকু আপনি মিথ্যের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখবেন। কিন্তু তা আপনি পারেননি সত্যের কাছে পরাজয় ঘটেছে।

—সত্যিই কি তাই?

—হ্যাঁ, তাই। হরিদ্বার যাচ্ছিলেন, নিশ্চয়ই দেব-দর্শনে। দেব-দর্শনের ফাঁকে ফাঁকে একবার দশ বৎসর আগেকার কথা চিন্তা করে দেখবেন, আমি যা বলেছি তা সত্য কিনা।

—আমি তা ভেবে দেখব, কথা দিচ্ছি, কিন্তু আমি ভাবছিলাম কি জান শর্বরী, ভাবছিলাম, মানুষ জীবনে কেন অসহায় বোধ করে, কেন অপরের উপর নির্ভর করতে চায়। এই দুর্বলতার জন্যই তাকে প্রচুর মাশুল দিতে হয়। আজ তুমি আমাকে যে কথা বলে গেলে তার উত্তর আমার দেবার মত থাকলেও, সুযোগের অভাবে তা আমি দিতে পারলাম না, এই ক্ষোভই আমার রয়ে গেল। ভবিষ্যতেও থাকবে। জীবনে আমাকে নিয়ে তুমি খুব বিব্রত বোধ করেছ, সে কথা বুঝতে পেরেছিলাম, আমার জন্য তোমার অস্বস্তির অন্ত ছিল না। সময়াভাবে আজ আমি সব কথার জন্য, আমার সব কিছু ত্রুটির জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। তুমি ছাত্রী ছিলে, তাই ক্ষমা আর চাইলাম না। আমার সম্পর্কিত অতীতকে তুমি ভুলে যেও, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

—আসানসোলে সত্যিই নামবেন? কেন? আমার উপর রাগ করে?

—না, রাগ করে নয়। তোমার সাথে ঝগড়া অনেক করেছি, কিন্তু রাগ আমি কখনো করিনি।

—আমি কিন্তু উল্টোটা করেছি। আপনার উপর রাগ অনেক করেছি, কিন্তু ঝগড়া করিনি। কিন্তু আজ করব।

—কি রকম ?

পর্ণশ্রী একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলে—বাবা আপনাকে অনুরোধ করে গিয়েছিল আমাদের সাথে যাবার জন্য। কিন্তু আমি সেই অনুরোধ রাখতে করতেই এসেছি।

অধ্যাপক চৌধুরী হেসে বলেন, সেই পুরানো অনুশাসন ? অর্থাৎ তোমার সাথে কথা যেন না বলি, চরিত্রের বাঁধুনি নেই ইত্যাদি !

—সব মনে রেখেছেন যে ! হাঁ, তাই। আমার জীবন থেকে আপনাকে মুছে দিয়ে ছিলাম, একেবারেই মুছে। সেই মুছে যাওয়া স্থানে আর দাগ পড়বে না, বুঝেছেন ?

—কেন ?

—কেন ? আবার দাগ ফেলতে ইচ্ছে হয় নাকি ?

—সে কথা বলছি না।

—তাহলে শুনুন, ভগবানের কি ইচ্ছা জানিনা, আজকের রাতেই আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল। একটা নূতন জীবনের খোঁজে আজই আমি পা বাড়িয়েছি। এই মুহূর্তে আপনাকে আমি কাছে চাই না। তাই আজ আপনাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। আর কথা বলবার সময় নেই। আসানসোল প্লাটফরমে ট্রেন প্রবেশ করছে। আপনাকে এক্ষুণি নামতে হবে, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, মনে করুন আপনাকে পিছু ডাকবার কেউ নেই, পর্ণশ্রী আপনার কেউ নয়।

ট্রেন তখন থেমেছে। অবিরাম বৃষ্টি। সাথে আশ্বিনের প্রচণ্ড ঝড়।

পর্ণশ্রী অধ্যাপক সাগর চৌধুরীকে প্রণাম করল।

পুরোনো অভ্যাস মত অধ্যাপক তাঁর ছাত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভাল থাকো, সুখী হও।

দু'জনেরই চোখে জল

সাগর চৌধুরী ঝোলা কাঁধে, ব্যাগ হাতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই রেলগাড়ী হতে নেমে পড়লেন। দ্রুত পদে এগিয়ে গেলেন।

পর্ণশ্রী দরজায় দাঁড়িয়ে। গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল।

অধ্যাপক চৌধুরী যেন অনেক দূর থেকে পর্ণশ্রীর উচ্চ কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেলেন 'সাগরদা'।

চৌধুরী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, নিশ্চয়ই ভুল শুনছেন। বৃষ্টির জল চোখের জলের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল।

ইঞ্জিনের হুইসিল বেজে উঠল।

"স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা সতীত্বের আদর্শ অসতীর নেই বলে তার সারা জীবনের কর্মও তাকে সতীত্ব প্রদান করবে না; বরং ঐ কর্ম তাকে আরও পাকা অসতী করে তুলবে। অসতী স্ত্রীর যেমন কর্মের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি, তেমন হয়ত সতীর নেই; কেননা অসতীর সব অসতীপণা যে ঐ কর্মের ঘটার ভিতরে চাপা দিতে হবে। সতীর কার্যকলাপ হল তার স্বামীর সঙ্গে এক-প্রাণতা বা অদ্বৈতভাবের ফল; পক্ষান্তরে অসতীর কর্মবাহুল্য ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সতী-স্ত্রীর ভরসা তার নিশ্চয়াত্মিকা অদ্বৈত বুদ্ধি, অসতী স্ত্রীর ভরসা তার কর্মের বিরাট আয়োজন।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

মানবসমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা

॥ শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ॥

মানবসমাজতত্ত্বের অর্থ ও প্রকৃত রূপ :—

একক ভাবে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যেমন অন্যান্য প্রাণী জন্মগ্রহণ করে। তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি জন্মের সময় একই প্রকারের থাকে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা ও যোগাযোগের ফলে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। মানুষ এককভাবে থাকতে পারে না। সে সমাজে দলগতভাবে বাস করে এবং পারস্পরিক ক্রিয়া ও সহযোগিতার ফলে বৃদ্ধি পায়। এই দলগত পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করে এবং ব্যক্তিদ্বারা দল বা সমাজ প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে বর্ত্তমান সামাজিক বিষয়বস্তু অনেক জড়িত হয়ে থাকে। এই সমস্ত ঘটমান সামাজিক বিষয়বস্তু ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াই হচ্ছে মানব সমাজ-তত্ত্বের বিষয়বস্তু। শিক্ষাব্রতী সমাজতত্ত্ব বুঝতে হলে আমাদের সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি ও তার কার্য্যক্ষেত্র প্রথমে বুঝতে হবে। মানবসমাজতত্ত্ব হচ্ছে বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান অংশ।

বর্ত্তমানে সমাজতত্ত্ব বলতে আমরা যা বুঝতে পারছি, তা হচ্ছে কিছুকাল ধরে এই বিষয়ের চিন্তাধারার পরিণতি। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক Auguste Comte ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতাবলীর মধ্যে সমাজতত্ত্ব কথাটি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। তাঁকেই সমাজ-তত্ত্বের (Sociology) জনক বলা যেতে পারে। তিনি Positive Philosophy বা Positivism নামে এক দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করেন এবং 'Course De Philosophic Positive' নামক গ্রন্থে তাঁর দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। সেখানে তিনি 'Sociology' বা সমাজতত্ত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন যে মানব প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে জানতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে জানতে পারা যায়। তিনি বলেন যে মানবসমাজতত্ত্ব হচ্ছে একটি মৌলিক বিজ্ঞান কারণ এটা যথারীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ। অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক ক্ষেত্রে যেমন উপাত্ত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা যায়, সেরূপ সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রেও মানবজাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন স্বীকৃত সত্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগ্রহ করা চলে। J. S. Mill ছিলেন Comte এর সমসাময়িক একজন দার্শনিক। তিনিও সমাজতত্ত্ব বা Sociology কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং মানবজীবনে তার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন।

হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক। তিনি এই নতুন বিষয়টি অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে ১৮৭৬ খৃঃ Principle Of Sociology' বলে একটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি Darwin, Lamark প্রভৃতি জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বিশ্বাস করতেন যে সমাজ হচ্ছে একটি organism বা সজীব পদার্থ এবং ব্যক্তি হচ্ছে তার একটি cell বা একটি অণুকোষ, অর্থাৎ সমাজরূপ দেহের মধ্যে ব্যক্তি হচ্ছে একটি দেহকোষ। বিভিন্ন দেহকোষগুলি যেরূপ দেহকে কার্য্যকরী করার জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকে, সেরূপ বিভিন্ন ব্যক্তিও সমাজকে সক্রিয় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের কাজ করে থাকে। যেমন করে দেহের অণুকোষগুলি অন্যান্য অণুকোষের সাহায্য ব্যতীত এবং সমগ্র দেহের পট-ভূমিকা ছাড়া কাজ করতে পারেনা, সেরূপ ব্যক্তিও সমাজরূপী দেহের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করে এবং সমগ্র সমাজের গতি পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত কাজ করতে পারে না। জীবদেহ ও জীবকোষের

= 70634

প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে তিনি ব্যক্তি ও সমাজের ব্যাখ্যা করেন এবং আরও বলেন যে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সমাজে ব্যক্তির কাজ অনগ্রসর সমাজের ব্যক্তির কাজ হতে অপেক্ষাকৃত বিভিন্ন ধরণের।

Comte এর আরও একজন সমসাময়িক দার্শনিক ছিলেন Fredric Le Play তিনি সমাজসম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করার পথ দেখিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই সমাজতত্ত্ব চিন্তাজগতে স্থান পেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এই বিষয়টির অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়। এর প্রকৃতি, কার্যক্ষেত্র ও পদ্ধতি—সকল দিকেই এর সম্প্রসারণ ঘটে এবং এককথায় বলা যায় যে, এর বিষয়টা অধ্যয়নের জন্যে সুবিন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর নিজস্ব অনন্যতা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ের গবেষণায় বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাজতত্ত্ব বিষয়ক বহু স্বীকৃত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কিত বহু মূলনীতি সাধারণ সূত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই সব সাধারণ সূত্র সমাজ প্রশাসন ও সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নূতন সাংগঠনিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সমাজতত্ত্বের আসল প্রকৃতি কি এবিষয় জানতে হলে আমরা সহজভাবে Moore এবং Cole এর শরণাপন্ন হতে পারি। তাদের মতে সমাজতত্ত্ব বা sociology'র কার্যক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের একাধিক ক্ষেত্রের আচার আচরণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা। একাধিক ক্ষেত্রের আচরণের অর্থ হচ্ছে মানুষের অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সাথে আচরণ এবং অন্যান্য দল সম্পর্কিত আচরণ। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সমাজতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে সামাজিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অন্তর্গত হচ্ছে কৃষ্টি, বিভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতি, ক্রীড়াদলের, ধর্মীয় দলের ও অর্থনৈতিক দলের ও শিক্ষাসংক্রান্ত দলের আচরণ সম্পর্কিত। অর্থাৎ প্রতিটি দলীয় সংস্থার ও ব্যক্তির বিভিন্ন আচার আচরণই হচ্ছে সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে Duncan, Bogardus, Eldrige, Maciver, Merril প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই কথা বলেছেন। Duncan তাঁর Background of Sociology নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, "Sociology is the scientific study of the processes of interactions of persons and the patterns these form in relation to Biological, Psychological, and Cultural influences"। Duncan যা লিখেছেন তা পূর্ব কথারই পুনরুক্তি। তাহলেও তিনি পারস্পরিক ক্রিয়াকে বিশদ করে বলেছেন যে পারস্পরিক ক্রিয়াগুলি থেকে যে প্যাটার্ন বা ছাঁচের ধারা তৈরী হয়, সেগুলি জীববিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও কৃষ্টিসম্পর্কিত। Merril এবং Eldrige বলেছেন যে, সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্র হচ্ছে মানসিক আচরণ সম্পর্কিত। ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের সাথে কিরূপ আচরণশীল এবং প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন তাই অধ্যয়ন করা হচ্ছে সমাজতত্ত্বের কাজ। মানুষের দেশাচার, প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদি যা মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়, সে সব মতবাদ ও প্রতিষ্ঠান, ওগুলি থেকে দানাবেঁধে ওঠে এবং তাদের মধ্যে কি জাতীয় পরিবর্তন বিভিন্ন ধরণের পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে সাধিত হয়, তাই সমাজতত্ত্বের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে আর একটি সত্য সমাজতত্ত্ববিদেরা উপলব্ধি করে থাকেন। অতীত ও বর্তমানের কর্মধারাকে ভিত্তি করে তাঁরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে পূর্বাভাষও দিতে পারেন। সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি কোন্ কোন্ শক্তির প্রভাবে মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ঐ সব পরিবর্তন ব্যক্তির আচার আচরণ ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে। Ginsberg'ও ঠিক এই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সমাজতত্ত্বই

হচ্ছে সমাজকে অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিষয়। Robbins বলেছেন যে সমাজতত্ত্ব সমগ্র ব্যক্তির (whole man) অর্থাৎ তার সামাজিক, কৃষ্টিগত ও মৌলিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্যক্তিকে তার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দিকের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় না, তার সমগ্র জীবনের পটভূমিকায় বিচার করা হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মতে সামাজিক সম্পর্কই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষেত্র। সমাজতত্ত্ব কৃষ্টিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত, কারণ ঐ সব বিষয় ব্যক্তির জীবনে সামাজিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

সর্বশেষে সমস্ত সমাজতত্ত্বকে সংক্ষেপিত আকারে আমরা যদি প্রকাশ করতে চেষ্টিত হই, তাহলে বলতে পারি যে মানুষ হচ্ছে একটি সামাজিক জীব। সে জন্মের পর থেকেই একটি দলের অধীন হয়ে যায়। পরে সেই দলের প্রভাব তার ওপর বিস্তার লাভ করে এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। অনেক সময় দেখা যায় সে দলত্যাগ করে অন্য দলে গিয়ে মিশে যায়। তার অর্থ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে দলের মধ্যে বৃদ্ধপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই দলের চাইতে আর একটি দল তার ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, ফলে সে তার দল পরিত্যাগ করে তার পছন্দসই দলে গিয়ে ভিড়েছে। ব্যক্তি যেভাবে বাস করে এবং জীবন পরিচালনা করে তার মধ্যে তার দলীয় সম্পর্কের ছাপ দেখা যায়। সমাজতত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত ও দলীয় আচরণের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান —পরিবারগত ও সম্প্রদায়গত, পেশাগত, ধর্মীয়, জাতিগত ও রাষ্ট্রগত প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যামূলক মনোভাবের ব্যাখ্যাও করতে পারে। দলীয় জীবনের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাও সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। শুধু তাই নয় সমাজতত্ত্ব মনুষ্য সমাজের মধ্যে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যথা প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা, উপযোজন ও উপলব্ধিকরণ ইত্যাদি, সেগুলির বিশ্লেষণ করে থাকে এবং তাদের ফল হিসেবে ব্যক্তিকে কৃষ্টির অভিমুখী ও তার সামাজিকীকরণ করে। সমাজতত্ত্ব সামাজিক পরিবর্তন পরীক্ষা করে দেখে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দিকে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের দেশে সামাজিক সমস্যার অন্ত নেই। আমাদের দেশে আছে প্রথমতঃ দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের সাথে যুক্ত আছে নানারকম অপরাধ-মূলক কর্মসম্পাদন, বালকবালিকা কিশোর কিশোরীদের নানারকমের কর্তব্যে অবহেলা, ত্রুটি ও অন্যান্য ব্যভিচার। সমাজতত্ত্ব এ সকল বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করে থাকে এবং ব্যক্তিকে সমস্যার মধ্যে থেকে উদ্ধার করে এবং সুপথে চলবার ইঙ্গিত দেয়।

ক্রমশঃ

"আমরা আলোচনা করিব শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে পরা ও অপরা ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং এই দুই বিভাগের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া প্রকৃতির যান্ত্রিক (mechanical) রূপকে জীবন্ত যন্ত্রের (organism) রূপে গড়িয়া তুলিলেন, যাহার ফলে প্রকৃতি ও চৈতন্যের সহজ সমন্বয় সম্ভব হইল। শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতির ও পরাপ্রকৃতির ভেদ সুস্পষ্ট। অপরা প্রকৃতিরই বিবর্তিত রূপ পরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'জীবভূতা'; পরা প্রকৃতি জীবনভূতা, জীবভূতা।..."

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৬৪)

ঠাকুর, বিশ্ব-মানবের সামনে তুমি যে-পথের খোঁজ দিয়েছ, তাহা মহান প্রাণের পথ, তাহা ব্রহ্ম-পথ—অন্যু এব পন্থাঃ। এ পথে কেহ আজ পর্যন্ত আনাগোনা আরম্ভ করে নাই। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি বুকে বুক মিলাইয়া এই পথ বহিয়া চলিয়াছি, চলিব। তুমি বল আমি শুনি, আমি বলি তুমি শোন উদ্বোধন পত্রিকার কত বিজ্ঞ বিজ্ঞ লেখকের নাম বাহির হইয়াছে যাঁহারা মা সারদামণির শতবর্ষ জন্মন্তী উপলক্ষে লিখিয়াছেন। তোমার তো কেহ নাই। কে লিখিবে তোমার নূতন পথের কথা? যাহা পারি আমি করিব, অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হইতে রক্ষা করিও যতটুকু শক্তি আছে তাহা লইয়া শান্ত সমাহিত হৃদয়ে চলিব। সব হইবে। কেননা তুমি আছ আমার সহায়, বিশ্ব আমার সহায়। রেণু ১টায় বাহির হইয়া গোষ্টাকিল, ব্যাঙ্কে যায়, টাকা জমা দেয় (শত বার্ষিকীর), জগদীশ প্রেসে যায়, + টাকার চেক দেয়, অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা বলে, হিন্দুস্থানে প্রুফ দেখাইতে যায়, ক্যালকাটা কেমিক্যালে যায়, নীলাম্বর-বাবুর শ্বশুরের সঙ্গে ৮টায় মোড় হইতে বেহালা কোন অফিসে যায়। ফেরে ৬টার পর। আমি ৮টার পর মঠে যাই, ফিরি ৮টার পর।…আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী রাধাগোবিন্দ রায় সভাপতি, আমি বক্তা, বিষয় শ্রীনিতাই-গোপাল ও সর্ব জাতি সমন্বয়।…নীলুর পরীক্ষা ২৮শে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বড় শ্রম করিল। পাশ হইলে বাঁচি, ওর শ্রম ও উদ্যম সার্থক হউক, ওর সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পুরস্কার কি ঠাকুর দিবেন না?

৩০শে এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার 'কথা' আছে সর্বক্ষেত্রে বিপ্লব আনিবার মত—ধর্মে দর্শনে নর নারীর সম্বন্ধে, সমাজের ক্ষেত্রে। তোমার কথা তুমি কও, বিশ্ব শুনুক; সেই কথা শুনিতে শুনিতে বিশ্বের হৃদয় মথিত হউক, নূতন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক। তোমার কথা আছে, বিশ্বেরও সেই কথা শুনিবার প্রয়োজন আছে। তবে কেন তুমি বলিবে না, আর বিশ্ব শুনিবে না? তোমার কথা বলিবার মত আমার কণ্ঠ দেও, কণ্ঠের জোর দেও, কোটি কণ্ঠের শক্তি দেও। একবার বলিষ্ঠান কনফারেন্সে যেমন বলিয়াছিলাম, তেমন করিয়া বলিতে দেও। মানুষ পাগল হইয়া উঠুক। আমাকে ধন্য কর। তোমার কথা আমার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া তুমি কও। আমাকে সেই সৌভাগ্য দেও। কত তোমার কথা। কে-ই বা বলিবে, আর কে-ই বা তাহা শুনিবে? কথার প্লাবন আনিয়া দেও, জ্ঞান-প্রেমের প্লাবন আনিয়া দেও। রেণু ছেড়টার বাহির হইয়া ক্যালকাটা কেমিক্যাল হইয়া হেদোর অফিসে গিয়া হেদোর কার্ড লইয়া, ঢাকেশ্বরী, স্টাণ্ডার্ড এ কিছু টাকা দিয়া এম বি সরকার হইতে ১ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন লইয়া তাহার মায়ের ওখান হইতে কিছু খাইয়া যায় বাবা কোঁড়া ওঠার জন্য সুধাংশু ডাক্তারের নিকট হইতে প্রেসক্রিপশান আনে। ওষুধ আনিয়া ২বার খায়। আমি ৪টার পর মঠে যাই। গোপার বুদ্ধি বড় বহির্মুখ, এদিকে ও দিকে—কখন পিওন চিঠি দিয়া গেল ইত্যাদির দিকে। পড়ার দিকে মনোযোগ তাই কম। মঠে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন—যোগেন্দ্র সরকার, শেষ সময়ে তাঁহার স্ত্রী, ভাবিনীবাবু, রমাপতিবাবু, নীলরতনবাবু, ফিজীশ, কালো, প্রভুর ও সুধাংশু বসু, দেবানন্দ ইত্যাদি। ঠাকুর যে কাজময়

অকামময় সর্বাতিক্রান্ত বৃত্তির সমন্বয়, তাঁহার জীবনে যে পুরাণের শুচি ও তন্ত্রের অশুচির সাধনা মূর্তি ধারণ করিয়াছিল, তিনি যে গোল করতাল ও পাঠাবলি একত্র চালাইয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয় আমরা তাঁহার দর্শন আলোচনা না করিলেও বিশ্ব তাহার নিজ প্রয়োজনে তাহা করিবে, সব কিছু আমাদের হাত-ছাড়া হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা 'নিমিত্তমাত্র' হইলে কলত লাভ করিব, ধন্য হইব। কোনও কিছুর বাড়াবাড়ি নিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে নাই। তাঁহার নিত্য-দর্শন হইবে ব্যবহার ক্ষেত্রে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। শঙ্করাচার্যের ছিল পরমার্থ ক্ষেত্রে শুধু অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা। তাই জাতি-দর্শনই নিত্য-দর্শন।

১লা মে

ঠাকুর, মানব-জীবনের অন্তর্ভুক্ত পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে তুমিই মাত্র টিকিয়া থাকিবে, কেননা তুমিই সর্বসমন্বয়-মূর্তি, যাবতীয় বিরুদ্ধ বৃত্তি, বিরুদ্ধ ধর্ম, বিরুদ্ধ আশ্রমের সমন্বয়-মূর্তি। কে আছেন যিনি বর্তমান যুগের সমস্যাগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করিয়া তাহার সমাধান দিয়াছেন? ...তুমি সমস্ত দর্শন ও জীবন লইয়া সর্বসম্প্রদায়ের মাঝখানে দণ্ডায়মান। সব দল লইয়া তোমার এক অখণ্ড দল। তুমি বিশেষ কোন দল গড়িতে আস নাই। তোমার জয় হউক। মাখনবাবু আসেন তাহার জন্মীপতি সহ।... নবদ্বীপের রায় আসে। কিছুপরেই বিকুসাদর মহেন্দ্র আসে। গীতা শ্রবণে যাই। ৬টার পর আলোচনা আরম্ভ হয়। পুরুষোত্তম-তত্ত্ব আলোচনা হয়—'যাবিমৌ পুরুষৌ লোকে'—প্রকৃতির challange accept করিয়া যিনি ব্রহ্ম তিনিই পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম G. C. M., পুরুষোত্তম L. C. M.। গীতায় escapism বা পলায়নপরতা নাই। 'যোধিষ্যমাণ মনসি সংগ্রামে'—ইহাকে স্বীকার করিয়া আবেষ্টনকে পরিপাক করাই পুরুষোত্তম-যোগ। পালানো যায় না। 'যদা সংহরতে চায়ং' ও 'বিষয়া বিনিবর্তন্তে' শ্লোকদ্বয় আস্বাদন করি। 'রসবর্জম্' বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করি। এড়ানো অসম্ভব। পরিপাক করাই গীতার সাধনা। 'Face Nature'। প্রায় ৭ টার শেষ হয় বিদায় নেই। ...সৃষ্টির জন্য ক্ষিতীশের ঘরে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রফুল্ল বসু, সুধাংশু, নীলরতনবাবু, তারিণীবাবু, ক্ষিতীশবাবু। মঠের সাম্প্রদায়ের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হয় আবহাওয়ার পরিবর্তন করা এ পর্যন্ত ডিসিপ্লিন রক্ষা করিয়া সংসঙ্গ লইয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া পথ নাই। আগে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কোন পরিবর্তন আনা যায় না। আমার পূর্বজীবনে বরিশালে একদিন হরতাল হইবার উল্লেখ করি। ট্রামে আসি তখন ১৲ টাকা দিয়াছিল। ৯৷৷ টার পর এখানে ফিরি।

২রা মে

ঠাকুর, আমার জীবনের গতিপথে তুমিই আমার কর্তা, প্রভু; সকল ছোট-বড় কর্মের, সকল ভয়-না-করার সাক্ষী তুমি, তুমিই আমার নিরাপদ স্থান, শরণ, সুহৃৎ। এতদিন গতিপথ ছিল শুধু মায়াপথ। আজ সেই পথ ব্রহ্ম-মায়া সমন্বিত পথ। সে পথে আমি আজ বড় একা। সবাই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আমি আজ পরিত্যক্ত, অভিযুক্ত এক দল 'ব্রহ্ম'-উপাসনার নামে এই পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, আর এক দল মায়ার টানে সংসারে ফিরিয়া গিয়াছে। কে এই হতভাগ্যার সঙ্গে থাকিবে? তুমি আমার, আমি তোমার। আমার নিরাশ প্রাণের আশা তুমি, সকল দিক দিয়া ব্যর্থ আমার সার্থকতা তুমি। ...বেণু ২টার পর প্রেসে যায়, আগামী রবিবারের বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া আনে। পরে আবার ট্রামের monthly করিয়া শৈলেন সেনের স্ত্রীর ওখানে যায় আগামী রবিবার সভায় গান গাহিবার অনুরোধ জানাইতে। ...আজ রণজিৎ বসু আসে। সে পাবিস্তান জাতীয় ব্যাঙ্কের ইন্‌সপেক্টার হইয়াছে। যে ব্যাঙ্কের শেষে নিয়োগ পত্র পাইবে। সে ব্যাঙ্কের লোক ছিল, হৃদয় ছিল।

আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন তারিণীবাবু, রমাপতিবাবু, ধীরেন ব্যানার্জী, কিতীশবাবু, রণজিৎ বাবু, নীলরতনবাবু, সুধাংশু ডাক্তার। ...কনোগ্লেটেড ট্রিন এর জন্য বহু চেষ্টা ও তোড়-র কাছে দরখাস্ত করা হয়। উহা প্যাথেস ষ্টেশনীর কাছে লাগিবে। সকালে ধীরেন ডাক্তার আসে, সন্ধ্যায় শিশির আসে। ...মাখন-বাবুও আসে..., বিমল আসে...। ...চিঠি আসিয়াছে।...

৩রা মে

ঠাকুর, আমার মাথা গুঁজিবার স্থান তোমার ঐ রাতুল চরণ। কি আমার আর আশ্রয় আছে এই বিশ্বে? তুমি ছাড়া আমার চলিবার মতন, আমার অস্তিত্ব রক্ষা করিবার মতন কি আর আছে? আমার পথ-চলার শক্তি তুমি। তুমি আমি এক হইব, তোমার মাঝে মহানির্বাণ লাভ করিব। তোমার দেহ আমার হউক, আমার দেহ তোমার হউক। তোমার আমার মধ্যে দেহ-বিনিময়, প্রাণ-বিনিময়, মন-বিনিময়, জ্ঞান-বিনিময়, আনন্দ-বিনিময় হউক। আমার জীবনে এই মালা-বদল সাধনা সিদ্ধ হউক। বেলু সকালে বাহির হইয়া সুবোধ ডাক্তারের ডিসপেনসারী ...সুহৃৎবাবু, হরিদাসী-অম্বা, পরে মঠে ওখানে হইয়া...ফেরে ১১॥ টার পর। ...আমি ও প্রতিভা ৪টার পর মঠে যাই।

৯টার পর ফিরি। ...বেলু ও প্রতিভার কাছে 'নির্বীজ সমাধি'-র কথা বৈকালে আলোচিত হয়। যাহার জীবনে যত জটিলতা, তাহার বীজ তত গভীর। সেখানে জটিলতার বহিঃপ্রকাশ থাকায় সমাধান সহজ। যাহাদের জীবন সহজ, তাহাদের অবিদ্যা-বীজ সহজে ধরা পড়ে না। তাই ধ্বস্ত করাও কঠিন। ব্রহ্মজ্ঞানেও বীজ থাকিয়া যায়। ভগবৎ-জ্ঞানেই তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বস্ত হয়। জটিলতম জীবনে বীজ ধ্বস্ত করিবার সুযোগ বেশী, কেননা সেখানে বীজের খোঁজ পাওয়া খুব সহজ। জটিলতম জীবনের সমাধানই নির্বীজ সমাধান, কুরুক্ষেত্রের সমাধানই নির্বীজ সমাধান। প্রস্রাবে ২দিন হইল জ্বালা। আজ একমাত্রা ওষুধ দেয় সুধাংশু। এতদিন conium ও causticum চলিয়াছে। ৪ঠা মে

রাধারাণী আমার, তুমি জীবনের নির্বীজ সমাধান-মূরতি, সমাধি-মূরতি। সমস্যা যত জটিল ও ব্যাপক, তাহার বীজ তত গভীর। গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত বীজকে জ্ঞানের আগুনে প্রেমের আগুনে ধ্বস্ত করিয়া, ভাবিত করিয়া শুদ্ধ রূপে তুমি উদ্ভাসিত। সহজ সরল সমস্যার বীজ ভাসা ভাসা; তাহার সমাধান হয় ব্রহ্মরূপে। আর গভীরতম প্রদেশের সমস্যার সমাধান হয় পরমাত্মরূপ-ভগবৎ-পুরুষোত্তম রূপে। যাহার জীবন যত জটিলতম ঘটনার ভিতর দিয়া আগাইয়া যাইতে পারে, সেই জীবনের অবিদ্যা-বীজ ততখানি ধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বীজের শুদ্ধ, শুদ্ধতর, শুদ্ধতম রূপ রহিয়াছে। ঠাকুর আমার, তুমি সর্বশুদ্ধতম বীজের নির্বীজ সমাধি। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। ...মঠে আজ রাধারমণবাবুর ১০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ লাগে। আমি প্রত্যেক বারের কোম্পের টাকা হইতে ১০% মন্দিরের জন্য রাখিয়া দিবার কথা জোর দিয়া বলিয়াছি। ঠাকুরের খাওয়া যেমন দরকার, থাকার স্থানও তেমনি চাই। উদ্বোধনের মঠে নিয়া যাই, বিতরণ করি। তারিণীবাবু রাধাগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করে, জাতিদর্পণ দিয়া আসে। আশু লাহিড়ী আসেন সন্ধ্যার পর। তাঁহাকে একখানি জাতিদর্পণ, একখানি সমন্বয় মূর্তি, অভিভাষণ ও ঠাকুরের বাণী দেওয়া হয়। সুশীলা ঠাকুরের প্রসাদ একটি বাটিতে করিয়া দেয়। আমি ঝুলাইয়া নিয়া আসি। ৯টার পর পৌঁছি। শিশির আসে ৮৸ টায়। ...আজ নাকি মঠে অনেকের দীক্ষা হইয়াছে। অথচ ইহা ট্রাস্ট ডীডের বিরোধী। এখানে কে কাহার কথা মানে? চিন্তার কোনও ধারা ইহাদের নাই। কাজেই কোন সুসংবদ্ধ পথও ইহাদের সামনে নাই। কি যে ইহাদের ঠাকুর, কি যে সাধনা—আমি তো বুঝি না। বাহিরের কাজ না থাকুক, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা তো থাকিবে, সাধারণ ভদ্রতা ও শিষ্টাচার তো থাকিবে? ঠাকুর, ঠাকুর, রক্ষা কর ইহাদের হাত হইতে তোমার সন্তানদিগকে। কাহারও উপর তোমার শক্তি ভর না করিলে এখানে কে কাহার

কথা শুনিবে? সকলেই স্বয়ং। তারিণীবাবুর লোক মতি ঠাকুরের প্রসাদ ট্রাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

৫ই মে

রাধারাণী আমার, জটিলা কুটিলা পরিবৃতা তুমি, জটিলতম কুটিলতম আবেষ্টনের সহজ সমাধান তুমি আমার পরাণ পুতলী, প্রাণবল্লভা; পথে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম তোমাকে। তোমাকে বুকে লইয়া একা চলিয়াছি কোথায় তোমাকে রাখিব? তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিবার জন্য সারা জীবন পথে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিত্যগোপাল আমার, তোমাকে লইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিয়াছি—তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। কে তোমাকে নিবে? তুমি যে বর্তমান বিশ্বের সর্ব সমস্যার সমাধান, তাহা কে বুঝিতে চায়? আমি তোমাকে লইয়া বিপন্ন। বিপদ্ভঞ্জন, আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। কলিকাতার বুকে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প রক্ষা কর। তোমার কথা আছে, জীবন আছে, আর তুমি চলিবে না? যাহারা চলিতেছেন, তাঁহাদের বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয় কি এমন যোগ্যতা? ...৭টায় পূর্বে চিদানন্দ আসে। ...খিদিরপুর যাই। ...আসিয়া দেখি পাবনার ইন্দুজ্যোতি মজুমদার আসিয়া একটু চিরকুটে ...লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আবার আসিবেন। মাখনবাবু ৩৫ টাকা (ম. ও. যোগে) পাঠান। রেণু ৬টার পর প্রেসে যায় ...। ৬টায় মহেন্দ্র আসে। বিজয় সে ও আমি সীতাভবনে যাই। ...কবি নরেন্দ্রনাথ দেব বলেন: হরিদাস আমাদের বংশের জামাতা। সেজন্য গৌরবান্বিত। সে ধনী হইয়াও ধনভোগ করে নাই। মানুষের কল্যাণ ছিল তাহার ব্রত। কল্যাণ চক্রবর্তী .....তাপস সেন। বিভেশ গুহ ঠাকুর বলেন, আজ কাল যুবক যুবতী কেন্দ্রচ্যুত, হরিদাসের কেন্দ্র ছিলেন অশ্বিনীকুমার, জগদীশ, কালীশচন্দ্র। দেব-প্রসাদ ঘোষ বলেন, হরিদাসের dynamism ছিল, তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িতে জানিতেন। অতীন্দ্র চক্রবর্তী বলেন—আমরা যদি তাঁহার আদর্শ ধরিয়া রাখি তবেই তিনি বাঁচিবেন। আমি সভাপতির ভাষণে 'তোমার অসীমে প্রাণমন লহে' আবৃত্তি করিয়া যদি সম্প্রতির কথা, পুত্র কন্যাদের পিতাকে ঘন করিয়া আস্বাদন করিবার কথা, fourth dimension এ অতীতকে বর্তমানে পাওয়া। ট্যাক্সীতে আসি, মহেন্দ্র, মহেন্দ্র ও মনিকা চলিয়া আসি। খুব বৃষ্টি হইতেছিল, বড়ে আর যাওয়া হয় নাই। আজিকার আলোচনা বেশ জমিয়াছিল।

৬ই মে

'রাধাভাবদ্যুতি' গৌর আমার, 'কচিং স্বাং মা বন্ধে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্'—রাধার দ্যুতি প্রকট করিয়া নিজের ছবি আবৃত করিলে—পোষণমূর্তি তোমাকে প্রণাম। প্রকৃতিকে পোষণ তুমি কর নাই। তাই আজ নিত্যগোপালরূপে ধরার বুকে সর্ব ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-বিদ্যাপীঠ গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছ। যে একত্ব-অনুভূতি ছিল প্রকৃতির ওপারে, সর্বের বাহিরে, তুমি সেই অদ্বৈত উপলব্ধিকে ঘন করিয়া আস্বাদন করিলে ও করাইলে প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রে—তাই সর্বদর্শনসমন্বয়, সর্বধর্মসমন্বয়, সর্বজাতিসমন্বয় তোমাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। পোষণ ঘন হইলেই সম্ভব হয় সর্বসমন্বয়। তোমার জয় হউক। ৮টার পর ইন্দুজ্যোতি মজুমদার আসেন। ২ ঘণ্টা আমাদের যায়েন। পুরুষোত্তম-দর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা হয়—রাসলীলার তাৎপর্য—divine কামের কথা, বর্তমান ব্রহ্মচর্যের কি রূপ হইবে, সমস্ত দার্শনিক বিবাদের কি করণীয়, শ্রীনিত্যগোপাল যে ইহার একটি মীমাংসা দিয়া গিয়াছেন—ইত্যাদি আলোচিত হয়। তাঁহাকে শ্রীনিত্যগোপাল-দর্শনে ও জীবনে অভিভাষণ, ঠাকুরের বাণী ও উজ্জলভারত দেওয়া হয়। রবিবারের সভায় যোগদানের কথা বলা হয়। রেণু ১০টায় বাহির হইয়া ইনজেকসান দিয়া ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এ বিল ও ব্লক দিয়া ১২টার পূর্বে ফেরে। আবার ২টায় যায় আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতীতে, আগামী রবিবারের সভার বিজ্ঞাপন ছাপাইবার বিষয়-বস্তু দিয়া আসিবার জন্য। ফেরে ৭॥ টায়। আমি ৪। টার পর মঠে যাই। সন্ধ্যার পর যোগেন সরকার

আসেন—তাঁহার সঙ্গে বুদ্ধ-দর্শন, নিত্যগোপাল-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি উদ্বোধনকে সরস করিবার কথা বলেন। আমি গীতার 'এষা তে অভিহিতা সাংখ্যে', 'ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন', 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ', 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা', 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' শ্লোকাবলী উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেই যে এইসব স্থানে নিত্যগোপালের দর্শন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যাকরণ ও অন্যান্য দর্শনের আলোচনা আসিয়া পড়ে। ইহা তো ঠিক জনসাধারণের ব্যাপার নয়। আমার 'Teacher Training Class' খোলা ছাড়া উপায় নাই। তাহারা যেভাবে নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আমাকে তাহার অভাব দিয়াই আমার কথা বলিতে হইবে। এখানে ফিরি ১০টার একটু পূর্বে। আজ প্যাডেল আরম্ভ করা হয়। পার্বতীবাবুরা সব গোলবাগের উদ্যান দিতেছেন। এখানে শান্তি আনয়ন করা খুব কঠিন। ঠাকুরের জীবন ও দর্শনের সঙ্গে যাহারা যুক্ত নয়, তাহারা মঠে কি করিয়া থাকিবে? ঠাকুরের বই তাহারা পড়িবে না, কোন্ করিয়া মঠে থাকিবে, ইহা কতদিন চলিতে পারে?

৭ই মে

প্রকৃতির মান প্রতিষ্ঠা করিয়াই তুমি পুরুষোত্তম। তুমি পা ধরিয়াছিলে, মাথায় রাখিতে চাহিয়াছিলে—'স্মরগরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনং'—মান কিন্তু দেও মানোনি। সীতারূপে একদিন তুমি আত্মমান রক্ষার জন্য ধরণীর গর্ভে আত্মগোপন করিয়াছিলে। আজও কি সে মান ঘুচিলনা? ক্ষমা কর, ক্ষমা কর দেবী—এই বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ধারা রাধা বলিয়া ধূলায় লুটাইতেছেন। আজ সেই গৌরই নিত্যগোপাল হইয়াছেন প্রকৃতির মান প্রতিষ্ঠিতে—সর্বধর্মন সমন্বয়, সর্বজাতি সমন্বয় প্রচারিতে, একদিন রচনার স্বাস্থ্য পূরণ করিতে, রজ-নিরপেক্ষ মাধুর্য গৌরব স্থাপন করিতে। আমাকে তোমাকে বুকে লইয়া অভিযান করিবার মত বল দেও, বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও। সকালে কিছু সময়ের জন্য চেতলা যাইবার ও ফিরিবার পথে ইন্দুজ্যোতিবাবু উঠিয়া যান। তিনি দর্শনে ও জীবনে, পড়িতেছেন। 'নিরাকার' শব্দের অর্থ নিরাকার, সাকার ও আকার করার সার্থকতা কি? তিনটি শব্দই তো রহিয়াছে। উপনিষদে সর্বত্র ছড়ানো অক্ষর প্রভৃতি শব্দের মধ্যে সবগুলি অর্থ থাকিলে সব সম্প্রদায়ের ঐক্য সম্ভব, নইলে অক্ষর অক্ষর প্রভৃতির বিভিন্ন অর্থ লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে পারে, উঠিয়াছেও। তাই নিরাকার অর্থ তিনটি হওয়া সঙ্গত যাহা ব্যাকরণ উহা অনুমোদন করে। নিত্যগোপাল তাহাই করিয়াছেন। সুধাংশু ১০টার পর আসে। পড়াশুনা করিবার জন্য সে সকালে আসিয়া বৈকালে যাইতে চায়। ঠাকুরের দর্শন আলোচনা করিতে যদি সকল ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও। আর বেশী সময় নাই, এখন চেষ্টা করা উচিত। রেণুকে রবীন্দ্র-উৎসবে যাহাদের নিয়া যাইবার কথা ছিল ৪৷৷ টায়, তাহারা আসে ৭৷৷ টার পর। রেণু যায় নাই। আমি মঠে যাই ৫৷৷ টার পর। আলোচনা হয় সন্ধ্যায়। যোগেন্দ্র সরকার আসেন। জাতি-দর্পণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। বই পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, subtle যুক্তি, rational আলোচনা। এত সংহিতার কথা তিনি প্রাচ্য বিদ্যার্ণবের কাছেও শোনেন নাই। নীলরতনবাবুদের সামনে ইন্দুজ্যোতি-বাবুর সঙ্গে সকালের আলোচনা উপস্থিত করি। ...ঠাকুরকে লইয়া কি করিব, দিন রাত্রি ইহার জন্য ভাবনা।...

৮ই মে

ঠাকুর, তুমি সেই করে তোমার ভক্তদের মারফত তার ষোলে জানিয়াছিলে—'ঠাকুর ভাবাবেশে বলিলেন, শরৎ মনোহর পুকুরে এসে থাকুক'। তোমার মঠে আসিয়া তোমার সেবা করিবার সাধ আমার ছিল। তাহা হয় নাই। আমি প্রবেশাধিকার পাই নাই। পথে পথে তোমার কথাই বলিয়াছি রাজ-নীতির ক্ষেত্র হইতে। তোমার নামে তোমার স্থান হইতে বলা হয় নাই। তাই বলা সমগ্র হয় নাই।

ইহা আমি বুঝতেছি। কিন্তু চুকিবার সুযোগ তো দিলে না। রাজনীতি করি বলিয়া প্রথমে অস্পৃশ্য ছিলাম। আজ প্রবেশাধিকার দিয়াছ শতবাধিকীকে আশ্রয় করিয়া। বড় দেরে আসিয়াছি। অন্তত ২০ বৎসর আগে আসিলেও কিছু করিতে পারিতাম। যৌবন-জোয়ারে ভাটা লাগিয়া যাওয়ার পর আসিলাম। তোমার দর্শন নিয়ে বহিয়া চলিয়াছি বিশ্ব-দরবারে প্রতিষ্ঠার জন্য। আমাকে সুযোগ দাও। দেহ অসাড় হইয়াছে, আঘাতে আঘাতে দেহ মন পীড়িত। তুমি আমাকে যত্নবৎ ব্যবহার করিয়া তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তোল। তোমার জয় হউক। ...আমার যাওয়ার পর পাণ্ডেল সাজানো হয় ঠাকুরের ছবি ও প্রচার পত্রের দ্বারা। শতবার্ষিকীর মান মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি আছি ইহা ত্রিগুণানন্দকে বুঝাইয়া বলি। আমার সকলের সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে হইতেছে। ৪টার অল্প একটু পরে রাধাগোবিন্দ রায় আসেন। তিনি বাঁকুড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এখন Taibal Welfare Minister। মাইকের বন্দোবস্ত ছিল। শান্ত সেন 'প্রেমপাথারে শ্রীনিত্যগোপাল' গানটি গায়। পরে আমি সভাপতিকে অভিনন্দন জানাই। বেণু 'সর্ব-জাতি সমন্বয়' প্রবন্ধের ঠাকুরের লেখা অংশ পাঠ করার পর ভাষণ দেই। তাহার পর আশুতোষ লাহিড়ী কিছু বলেন। তাহার পর ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বক্তৃতার কিছু ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর যোগেন্দ্র সরকার। পরে সভাপতি মহাশয়। সভাপতির ভাষণ ভাল হইয়া ছিল। মন্দিরে ৪টাকা প্রণামী দেন। ...মঠে কেবল অভিযোগ। কৃষ্ণানন্দের শিষ্য ননী ভট্টাচার্য অভিযোগ করিয়াছে কেন শ্রীকৃষ্ণানন্দকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইবে না। যাহারা স্বেচ্ছায় আসিল না, তাহাদের কে ডাকিবে? ডাকাডাকি করিবার কেহ থাকিবে না। যে ছুটিয়া আসিবে, সে-ই করিবে। ইন্দুজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় উপস্থিত ছিলেন। শেষের দিকে বেশ লোক হইয়াছিল। ওখানে তো লোকের আসিবার কোনও সংস্কার নাই। আজকার সভায় বিজ্ঞাপন আনন্দ বাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার, যুগান্তর, বসুমতীতে বাহির হইয়াছিল। সভার পরে আলোচনা হয়। ফিরি প্রায় ১০টায়।

২৪ মে

ঠাকুর, জাগো মহাসাধক নিদ্রা হতে, তোমার কথা তুমি কও, নিজের ভাষায়। বিশ্ব আজ তোমার কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে। বিশ্বে আজ অনৈক্যের বেদনা, শোষণের জ্বালা। পারস্পরিক হানাহানির কলঙ্কে ম্লানমান। তুমি স্থাপন কর সেখানে মৈত্রী সাম্য স্বাধীনতা। তুমি শোষণমুক্তি, মর্ত ক্ষেত্রের শোষণের মূর্তিমান প্রতিবাদ তুমি। আজ তোমার যে বড় প্রয়োজন আমাকে নিমিত্তমাত্র কর, তোমার যন্ত্ররূপে স্বীকার কর, ব্যবহার কর। আমাকে কৃতার্থ কর। তোমাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করিবার মত বল দেও, বুদ্ধি দেও, ধন দেও, জন দেও। আমি যে বড় একা ঠাকুর। কি রকম উদ্যম হইয়া করিতেছে, তুমি কি তাহা দেখ না ঠাকুর। ...আমি প্রায় ৪টায় মঠে যাই। রমাপতিবাবু নীলরতনবাবু প্রভৃতির সামনে আজ অনেক আলোচনা হয়। ঠাকুর ও তাঁহার প্রবর্তিত বৈপ্লবিক দর্শন ও চিন্তাধারা এক। চিন্তাধারাটা বুঝিলে এবং তাহা মনে প্রাণে নিলে ঠাকুর আপনাআপনি ফুটিয়া উঠিবেন। ম্যাগ্‌নেটের দৃষ্টান্ত দেই। লোহার molecule গুলি এক রকম করিয়া ওয়াইণ্ডিং করিলে চুম্বকত্ব প্রকাশিত হয়। 'পরম মনোহরপুকুরে এসে থাকুক'—এই টেলিগ্রামের কথা বলি। 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি', 'প্রবর্তে কীর্তনং'—শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করি। দ্বৈত-অদ্বৈতের ঠোকাঠুকি হইতে কে রক্ষা করিবে ভারতবর্ষকে নিত্যগোপালের দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয় ছাড়া? 'আমি তো তোমারে চাই নি' গান গাহিয়া খুব কাঁদি। 'ঠাকুর, তুমি আমাদের কবে পাইবে'—ইহাই হইবে আমাদের প্রার্থনা। যে কথা লইয়া ঠাকুর আসিয়াছিলেন তাহা বুঝিলেই ঠাকুর

আমাদের জীবনে আসিয়া উঠিবেন। রংপুরের তুলেন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। রংপুরে একদিন বলিয়া ছিলাম—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যত charge কর, আমি তাঁহাকে বেকসুর খালাস করিয়া দিব। আমার ঠাকুর সমগ্র জীবন লইয়া আসিয়াছিলেন। যিনি ৫ হাজার বৎসর পূর্বের শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই নিত্যগোপাল ইহা আমার জীবনে অনুভূত তাঁহার কৃপায়। শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মঠে থাকিয়া মঠের সুখদুঃখের সহিত যুক্ত থাকিবেন না—ইহাতে তাঁহাদের শিক্ষণ কি শিখিবেন? ইহা কি দীর্ঘদিন চলিতে দেওয়া উচিত? তারিণীবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

১০ই মে

ঠাকুর, সকলের সব আছে, আমার তুমি ছাড়া কি আছে? আমার ধন নাই, জন নাই, তুমি আছ—ইহাই আমার একমাত্র বল। তোমাকে বুকে লইয়া কত ঠোলিয়া চলিয়াছি। কেউ তো তোমাকে চেনে না। কেমন করিয়া তোমার পরিচয় প্রদান করিব? তোমার আত্ম-পরিচয় আমার জীবনের আমার বাণীর মধ্য দিয়া দেও। আমি তোমার আমি হইব। ওগো আমার আমি, তোমাকে কর্মীর তন্ময়তা, জ্ঞানীর একাগ্রতা, ভক্তের একান্তানুভূতিদ্বারা আমার আমি বলিয়া পাইতে চাই। কলিকাতায় তোমার নামে তোমার তত্ত্বে প্রাণন আনিবার মত বলবল দেও, জনবল দেও। তোমার জয় হউক। ...সন্ধ্যার সময় আজ আর বিশেষ-কোন আলোচনা হয় নাই। রমাপতি বাবু নীলরতনবাবুকে বলি, 'আমাকে যদি পাগল করিয়া দিতেন, আমি টাকাকড়ি সব আদায় করিতে পারিতাম। কংগ্রেসে কি না করিয়াছি? আমি আপনাদের সেবা করিতে আসিয়াছি। কোন অভিসন্ধি আমার নাই। এই মঠ যাহাতে সগৌরবে দাঁড়াইতে পারে, সর্বত্র যাহাতে ইহার মহিমা ছড়াইয়া পড়ে তাহার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিব। আমি ট্রাষ্টী হইব না'। ৮টার পর চলিয়া আসি। ট্রাম পর্যন্ত নীলরতনবাবু ও রমাপতিবাবু আসেন। ঠাকুর ছিলেন সহজ মানুষ। আমিও সহজ মানুষ হইতে চাই। জীবনকে সংস্কারদ্বারা ভারাক্রান্ত করিতে চাই না। প্রেসে জ্যৈষ্ঠ মাসের পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয়

১১ই মে

ঠাকুর, আমার জীবন-ধন, আমার সারা দিন রাত্রির ধ্যান কি করিয়া তোমার জীবন ও দর্শন বিশ্বমানবের দরবারে পৌঁছাইব। অথচ তদুপযোগী শক্তি কই, ধন জন কই? আমার তো কিছু নাই। তবে কি আমার এই ইচ্ছা অতি-ইচ্ছা? তাহাও তো বুঝিতেছি না। তুমিই তো শুনাইয়া গিয়াছ—আমার যখন যাহা দরকার ভগবান অন্তর্যামী রূপে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। 'পরম মনোহর পুরুষে এসে যাকুক'—এই স্বপ্নদৃষ্ট তোমার তারবার্তারই বা অর্থ কি? তোমার মঠে যে বিশৃঙ্খলা, উহার মধ্যে কে আমাকে মানিবে? আমি কি করিব? কে আমার কথা শুনিবে? মানাইবার মত শক্তি ও যোগ্যতা যদি দেও, তবে সবই হইতে পারে। সত্যই কি তুমি আমাকে মঠের জন্য ডাকিয়াছ?... ৮টায় যথেষ্ট পণ্ডিত মহাশয় আসেন। তাঁহার সঙ্গে পুরুষোত্তম দর্শনের সাধন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি, 'শ্রবণং কীর্তনম্' শ্লোক আলোড়িত হয়। Self centred সাধনা হইলে কর্মীর দেহে জ্ঞান-সাধনা হয় না, জ্ঞানীর দ্বারা কর্ম-সাধনা হয় না, ভক্তের দেহে কর্ম-জ্ঞান সাধনা সম্ভব হয় না। সাধনা যখন ঊর্ধ্বমূল, তখন দেহ-প্রাণ-মন সব flexible হয় বলিয়া সে সব সাধনার রস আস্বাদনে সামর্থ হয়।

ক্রমশঃ

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭২)

২৯, ১২, ৫৮। ওঁ নমো ভগ...ওঁ মানুষের ভিতরে দুটো দিক আছে, একটা ভাল লাগার দিক, একটা বোঝার দিক। ভাল লাগার দিকটা হচ্ছে প্রাণ, আর বোঝার দিকটা হচ্ছে প্রজ্ঞা। সাধারণ মানুষ ভাল লাগাটাকেই ভাল বলে বুঝতে চায়। বুদ্ধিতে বোঝে মানুষ অনেক কথা—কিন্তু ভাল লাগে না। যা ভাল লাগে, তা বুদ্ধিতে টেকে না। গোপালা হয়তো বোঝে লেখাপড়া করা ভাল, কিন্তু করতে ভাল লাগে না।... ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেকে ভাল লেগেছে...গান্ধারীর ভাল লাগে নি...। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—সুন্দর হলেই শিব হয় না... আমি মনস্তত্ত্ব দিয়ে সাধনপন্থা বলব...। নিত্যগোপালকে ভাল লাগে কি না বুঝে দেখ। বুদ্ধিতে বোঝ সমস্ত ভাল ইত্যাদি, কিন্তু প্রাণে ভাল লাগে কি না।... নিত্য-গোপালকে ভাল লাগবে কি করে? নিত্যগোপালকে ভাল লাগতে হলে চিন্তায় কর্মে আচারে ব্যবহারে মুক্ত হতে হয়। আসক্তি বিদ্বেষ ঘৃণা—জীবনে জড়তা—নিয়ে নিত্যগোপালকে ভাল লাগবে না। আজকাল rationalisation খুব চলে—এর মানে যা ভাল লেগে বসে আছে, তাকে ভাল বলে প্রমাণ করা: এটা আজকের দিনের রোগ—যে যা বোঝে বা করে সে তাতে যে ভাবে হোক সমর্থন করবে...সংসারে বনে না তো কারোর সঙ্গেই, তাতে কি কেউ সংসার ছাড়ে? প্রশ্ন হচ্ছে—ভাল লাগাবে কি করে?—ভাগবত বলছেন, মাতালের সঙ্গে থাকলে যেমন মদের নেশা লাগে, তেমনি ভগবানকে যাদের ভাল লাগে তাদের সঙ্গ কর—ভগবানকে ভাল লাগতে থাকবে। ভাগবত এই সঙ্গ করার উপর খুব জোর দিয়েছেন।...মানুষের ভাল লাগে রসের কথা—যেমন গল্প উপন্যাস আজ্ঞা সিনেমা মানুষের কেমন ভাল লাগে—ভাগবতে তাই পুরুষোত্তম-জীবন কথার মধ্য দিয়ে, রসের ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাল কথা, আদর্শের কথা বলা হয়েছে।...ঋষিরা বলছেন...পুরুষোত্তম-কথা বল...যা খাদ্য খাদ্য পদে পদে ...আমরা উত্তম শ্লোক পুরুষোত্তমকে আস্বাদন করব...আমরা রসজ্ঞ...আমরা প্রাণ ঢেলে শুনব ...সেই ভাল লাগাটা আমাদের বুদ্ধিকে প্রভাবিত করবে। সত্যিকারের ভাল লাগা...যখন বুদ্ধিকে পর্যন্ত প্রভাবিত করবে, তখনই সে ভাল লাগা স্থায়ী হবে, সার্থক হবে।...কৃষ্ণ-কথা হৃৎকর্ণরসায়ন কথা...। কৃষ্ণ বলছেন আমার বীর্য সম্বন্ধে যারা সম্যকভাবে জানেন, তাঁরা আমাকে বুঝতে পারতে পারেন।...হৃদয় দিয়ে বুদ্ধিকে control করতে হবে—দেহের ক্ষেত্রেও হাই ব্লাড প্রেসার হলে সমস্ত দেহই দুর্বল...। ভাল লাগাতে হবে যখন প্রাণের ভাল লাগা ও বুদ্ধির ভাল লাগা মিলে যাবে তখনই সাধনার সিদ্ধি...। নিত্যগোপাল আমার বড় ভাল...সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ তিনি...। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গেছ কি গেছ...হারিয়ে লাগি রহয়ে তাই—বলত বলত ধনি যাই...একজনের ভাল লাগার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিকে শুদ্ধ কর...শুষ্কতর্ক বুদ্ধি চালিও না... একথা সত্য যে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস—অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ...। নিত্য-গোপাল আমার সোনার মানুষ...। প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ...। সব পথ-হারাকে তিনি পথ দেখিয়েছেন...প্রতিভা রেণু মিনু পার্বতী বিশ্বাস বিষ্ণু কালী সকলকেই তিনি পরম আশ্রয়ে এনেছেন...। একদিন যেদিন এই কলকাতার বুকে পথ হারিয়েছিলাম সেদিন এক বিচক্ষণ টানে তিনি আমাকে তাঁর পায়ে

নিয়ে ফেলেছিলেন" বলেছিলেন, তার কি, টেনে তুলব— আমার অর্থ পরমার্থ সব এইখানেই

১, ১, ১৯৫৭ ওঁ নমঃ তত্ত্বমসি ওঁ নমো নিত্যগোপালায় ওঁ হ্রীং বস্ত্র-ভূষণ-ভূষিত-ভূষিত-ভূষিত-ভূষিতায় ভক্ত-পরাধীন-জগৎ-পুরুষায় নমঃ নিত্যগোপালের নমো। শ্রীনিত্যগোপাল মানুষ হওয়ার যে-ভরসা নিয়ে এসেছেন তাতে আছে যে আমরা এমন ভাবে সংসারে বড় হতে চাই যাতে অপরের সাধ্যকারের স্বার্থে আঘাত না লাগে। নেহরু সম্বন্ধে ডঃ জানটাদ বলেছিলেন যে তিনি নিজের নেতৃত্ব করতে পারেন ....আমার কাজ সম্বন্ধে কেউ কি বলতে পারে তা নিজেই টের পাই—মানুষমাত্রই এমন একটা অন্ধতা আছে শ্রীকৃষ্ণ বলে গেলেন—নিজে বড় হও, আঘাত কাউকে করো না। ...ব্রিটিশদের একজাকটটির ইন্টেলিজেন্স আমার সম্বন্ধে বলেছেন ওর মধ্যে মানুষ ঢুকেছে ...পরমপ্রভু ও নিত্যগোপাল.... আমি line of least resistance-এ চলি... আপাততঃ এটা দুর্বলতা মনে হতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি জিতি... অন্যে ভুল করতে পারে, কিন্তু ভুল ধরাতে গেলেই তো লাভ হয় না।...এ সংসারে জোর গলায় ঘন্টা চলবে না...নিজের জীবনের পথে এগিয়ে যাও... ভারতবর্ষ বিপদে পড়বে না, পাকিস্তানই বিপদে পড়ছে.... আমাকে সুস্থ রাখার জন্য একজন বলে আছেন.... কমন প্যাসেজ (common passage) অতুলবাবুই বন্ধ করেছেন...আমাদের জায় থেকে ব্রিটিশরাই মাটি কেটে নিয়েছে—ওরাই আগে আক্রমণ করেছে... প্রাণধারার কিছুতেই লোকসান হয় না—ঠেলাঠেলির মধ্যে নিত্যগোপাল নেই... তিনি যে-বুদ্ধি নিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা করছেন, সেই বুদ্ধি তোমরা দেখ—বড় হতে গিয়ে অপরকে আঘাত করো না...। ঘরের ধূলি সেইভাবেই ব্রহ্মধূলি হতে পারে, ঘরের মানুষ ব্রহ্মমানব হতে পারে।

২, ১, ৫৭—ওঁ নমো...ওঁ॥ কথাশিল্পী শরৎবাবু একস্থানে বলেছেন, গাইতে তো জানে, থামতে জানে তো? কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গান গায় তো সাহই, বক্তৃতা দিচ্ছে তো দিচ্ছেই, কর্মী তার কাজ করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, গল্প করছে তো করছেই—চারাদিকের আবেষ্টন সম্বন্ধে খেয়ালই নেই সব এতে নষ্ট হয় উপনিষদের ব্রত মীমাংসার আছে—যদি মনে কর কথা কয়েই চলবে, তবে মূঢ়া স্ত্রী তোমাকে আক্রমণ করবে বেশী হাঁটলে বাত হয় চক্ষু যদি বলে আমি কেবল দেখেই যাব—চোখ বেশীদিন দেখতে পারবেনা, মন যদি বলে আমি মননই করব—তাহলে বেশী মনন করা চালাতে পারবে না... কাজের সংযম যে না জানল সে বেশী দিন কাজ করতে পারবে না...। বারবার বলি নিত্যগোপাল সংযম-মূর্তি। কলকাতায় আর কোন কাজ ছিল না—উজ্জীবনভারত ঠিকমত চলত... এখানে অন্য কাজও অনেক.. উজ্জীবন ভারত ছুঁতে হয়েছে... self life ও cosmic life মেলাতে হবে... ...গাছে জল দিচ্ছ তো দিচ্ছই, সিম তুলছি তো তুলছিই.. একদিকে গেলে আর এক দিক ভেসে যায়... । সীতা প্রচারিত হয়েছিল সেই মানুষটির কাছে যিনি সব্যসাচী—তাঁর দুহাত ধনু হাত যার সমান তালে চলত ... । সংসার সন্ন্যাস সমান তালে চালাতে হবে... । কর্মের সৌষম্য, কর্মের মাধুর্য, কর্মের পুরুষোত্তম-রূপ প্রস্থাপন করতে হবে। ...কোথায় যাচ্ছি ছাড়িয়ে যাচ্ছি—সব সময় সচেতন থাকতে হবে... । আমার সব সময়ে তোমাদের এই ছন্দ সম্বন্ধে ঠিক ভাষায় বোঝ বা কঠিন ভাষায় বোঝ বলতে হচ্ছে... । তোমরা খাটছ খুবই—তবু ছন্দের কথা তো বলতে হয়। ..নিত্যগোপাল...তুমি এমন এক ছন্দময় জীবন যাপন করে গেছ...তোমায় নিয়ে আমি বিপদেই পড়েছি... । সব দিকে দৃষ্টি দিতে হবে... । গরুর প্রয়োজনও সার... এ সংসারে সবই সার... । নিত্যগোপাল, আমায় তুমি মানুষ কর... । কত কাল মানুষকে এই ছন্দের কথা বলতে আমায় ঝগড়া করতে হবে? হয় আমায় শান্ত করে যাও,

নয়···তোমার চরণতলে টেনে নাও। ···আমি কোনো দিকে নাই···তোমায় ডাকি···। পথ সব সময়ই থাকে···পথ খুঁজে বের করে নিতে হয়···। কখনও মানুষের উপর জোর, কখনও নারায়ণের উপরে, কখনও কর্মচারীর উপরে, কখনও মনিবের উপরে···।

৪. ১. ৫৭—ওঁ নমো···ওঁ। জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যার খবর আমি রাখি না—আমাকে বিপদে ফেলার জন্য কত ঘটনা···নির্বোধ আমি তা জানি না—কেউ-ই জানে না···যত বড় বুদ্ধিমানই হউক কেউ নিজের ভবিষ্যৎ জানে না···। কত আলোচনা আমার সম্বন্ধে হচ্ছে, হতে পারে—ঘরেও পারে, বাইরেও পারে···। তিনি আমায় একবার নয়, দুবার নয়—শতশত বার রক্ষা করেছেন। আমি শুধু অর্পণ করে পড়ে থাকতে চাইব···আমি নির্বোধ—তবু রক্ষা পেয়ে এসেছি—যতটুকু অর্পণ করতে পেরেছি তারই জন্য। ···সমাজের ভিতরে থাকলে সমাজ অনেকটা রক্ষা করে···। আমি সব দেওয়াল ভেঙে একটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছি ···। জাতি আমায় রক্ষা করে না, আমি জাত মানি না···, কুলশীল আমায় রক্ষা করে না—বর্ণাশ্রমী কুল বিধান আমি মানি না, তথাকথিত কুলশীলের মূল্য আমার কাছে নাই—অথচ তিনিই আমায় রক্ষা করেন কেননা মানুষ-জাত আমি মানি, মানুষ-কুল, মনুষ্যত্বের শীলতা আমি বিশেষভাবে মানি···। ঘরিশালে সেই কংগ্রেসের দলাদলি···কত যে ফাঁদ তাঁরা আমায় ধরবার জন্য ফেলেছে, তার তো সীমা নাই···কিন্তু সব থেকেই তো পিছলে বেরিয়ে এসেছি? কার জন্য? তিনি আছেন—তাঁর জীবন-তত্ত্ব অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করে এসেছি···(গানের সুরে বলে গেলেন) —আমার হাত ধরে···আমায় নিয়ে যেতার হাত ধরে ...মুখখানি সে ঘরে মুছায়...আমি জানতে এলাম তাই —কে বলে যে আপনার নাই (গান করতে করতে বললেন) আমার নিতাগোপাল আমায় নিয়ে যেতার হাত ধরে...আমি বুঝিনা কিছু, দেখি না কিছু...সারাটি জীবন ভরিয়া ঘটনার আবর্তনে আমায় নিয়ে যেতার··· আমায় নিয়ে যেতার হাত ধরে—আমার নিতাগোপাল আমার স্বামী, আমার জীবন-বল্লভ প্রাণ-প্রেষ্ঠ···আমি অযোগ্য, আমায় নিয়ে যেতায়—জটিল কুটিল ঘটনার মাঝে, আমার সকল না জানার মাঝে...আমায় তুমি চালিয়ে নাও···। নিতাগোপাল আমার নিত্যসঙ্গী... আমি শরণাগত···আমার কিছু নাই তুমি ছাড়া, আমার নিতাগোপাল, মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ...নিতাগোপাল, নিতাগোপাল।

৭. ১. ৫৭। ওঁ নমো ওঁ। শ্রীনিতাগোপাল সত্যিই প্রচুর আমাদের দিয়ে গেছেন—এত দেওয়া কেউ দেয়নি। কিন্তু দিলেই যে মানুষ পায় না ও রক্ষা করতে পারে না—এই রহস্যটা আমাদের জানতে হবে···। ভগবানই যেনেওয়ালা—তিনি অজস্র দিচ্ছেন, অজস্র স্নেহ করছেন—ঝোলা না হলে কিন্তু এসব রক্ষা করা যায় না। জীবের ধর্ম যতই পাক, ততই চাক, ততই নাই পাক—শিবের ধর্ম যতই পাক ততই সংযত হয়। ···ধনীর বাড়ীর নিমন্ত্রণে অজস্র দিতে পারে—কিন্তু আমার পেট বুঝে তো খেতে হবে...। অজস্র কৃপা পেয়েছি—ভোগ করতে বাকি নি, তাঁর স্নেহ বিস্মৃত হই নি—তাই প্রচলিত পথে না চলেও মর্যাদার সঙ্গে এতদূর আসতে পেরেছি, তাই শ্রীনিতাগোপাল-প্রসাদে নূতন যুগের জীবন-দর্শন যা পেয়েছি—তা বহন করে চলতে পারছি। ...দেখেছ মানুষের কাছ থেকে সামান্য পেলেও আমি কি রকম করে সেটা বার বার বলি—তাই আমার সাধনা ফুরায় না···। তোমরা কি আমার কাছ থেকে যে স্নেহ পাও, তা-ই মুখ ফুটে বলতে পার? বলতে যে পার না, সেইটেতে বিকল হবে...।

জাতীয় জীবনের আর একটি সমস্যা

॥ শ্রীভারতী ॥

কিছুদিন আগে পণ-প্রথার অনিষ্টকারিতা ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে কোনো এক সৈনিকে কয়েকটা লেখা পড়েছিলাম। তাতে কোনো এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন, 'পণ-প্রথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় মহিলাই পাত্র ও তার অভিভাবকদের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। মনে হয় তারা সকলেই নিঃসন্দেহ যে একমাত্র পাত্রপক্ষই পণ-প্রথা চালু রাখার জন্য দায়ী'।

এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই পুরুষ বা মহিলা অথবা পাত্র বা পাত্রী পক্ষ কাউকেই একতরফা দায়ী করা চলে না। এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী আমাদের কিছুত ধরণে গড়ে ওঠা সোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই। তবে সহজ বুদ্ধিতে এ কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাপ এবং মা দুজনেই পরিবারের কর্তাকর্ত্রী হলেও নিয়ম অনুসারে বাবাই পরিবারের মাথা। এ ক্ষেত্রে বাবা যদি নিজের মনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন যে আমি কোনো কারণেই ছেলের বিয়েতে পণ নেবো না, তবে সেটা পরিবারের জন্য সবাই মেনে নেবেন এটাই সুস্থ পরিবারে আশা করা যায়।

অবশ্য এমন পরিবারও আছে যেখানে আদর্শশূন্য স্ত্রীর আধিপত্যই বেশি। এই সব মহিলা শুধু পুত্রবধূর রূপ গুণই কামনা করেন না, তার সঙ্গে প্রচুর নগদ অর্থ, বিস্তর দান সামগ্রী এবং বেশি বেশি স্বর্ণালঙ্কার পাবার জন্যেও উঠে পড়ে লাগেন। এ সব ক্ষেত্রে কর্ত্তার নিজ মতে দৃঢ় থাকা সবসময় সম্ভব না-ও হতে পারে, কারণ পারিবারিক শান্তি রক্ষার জন্যে অনেক অপ্রিয় ব্যবস্থাকেও মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হয়।

আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। মা যেখানে উদার ও পণ-প্রথার বিরোধী, সেখানে অর্থলোলুপ স্বামীর কাছে তাকেও হার মানতে হয়। স্বামী স্ত্রী দুজনেই যদি এই প্রথার কুফল সম্পর্কে একমত হন তবেই সেটা সহজে কার্যকর হয়। তবে এ রকম আদর্শবাদী পিতামাতার সংখ্যা হয়ত কম। যারা আছেন তাদেরও কেউ কেউ পুত্রের বিয়েতে কোনো দাবি দাওয়া উত্থাপন করেন না সত্য কিন্তু কন্যার বিয়ে দিতে গিয়ে কন্যার ভবিষ্যৎ সুখের আশায় পাত্র পক্ষের চাহিদা মেটাতে বাধ্য হন। এখানে প্রায় ক্ষেত্রেই পিতামাতার স্নেহশীলতা তাদের আদর্শের কাছে হার মানে। অবশ্য কন্যার সুখই যদি প্রধান বিবেচ্য হয় তবে এ কথাটাও আমাদের চিন্তার মধ্যে আনা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র অর্থ, বিদ্যা ও প্রতিপত্তিই মানুষকে সুখী করতে পারে না। যে কাঁচা বুদ্ধি আজ ছেলের বিদ্যা ও উপার্জনকে দেখিয়ে ছেলের বাজারদর স্থির করেন, তার সহৃদয়তা সম্পর্কে আমরা কতটা নিশ্চিন্ত হতে পারি? ছেলেও যদি সেখানে বাপ বা অভিভাবকদের সমযোগী হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। সত্যকার শিক্ষা এবং বিদ্যা মনকে উদার ও প্রশস্ত করে এবং অর্থলোলুপতার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় না। কন্যার অভিভাবকেরা যদি এ দিকটা তলিয়ে দেখেন তবে কন্যার সুখের জন্য আদর্শকে বলি দেবার চেষ্টা থেকে বিরত হতে পারেন।

এসব ক্ষেত্রে শিক্ষিতা এবং বয়স্কা মেয়েদেরও কিছু করণীয় আছে। তারা নিজেরাই এখানে পিছিয়ে যেতে পারেন এবং অভিভাবকদের সাবধান করে দিতে পারেন। স্নেহলতা বাপকে বাঁচাবার জন্য আগুনে পুড়ে মরেছিল; জলজ্যান্ত আগুনে পুড়ে না হোক পণ-প্রথার রাক্ষুসে কামড়ে অনেক মেয়েকে আজো জলে পুড়ে মরতে হচ্ছেই। পণ-প্রথা লোপ না পেলেও দিনকালের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু সংখ্যক মেয়েরা নিজের

পায়ে দাঁড়াতে শিখেছেন, তা ছাড়া বয়স বাড়লে কিম্বা বিয়ে না হলেও এ যুগে আর নিন্দা হয় না। যদিও বিবাহের প্রয়োজনকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না তবুও বহুনিন্দিত প্রথাটাকে বর্জন করতে হলে এ ছাড়া আর উপায়ও হয়ত নেই।

বিবাহ ব্যাপারে আরো একটি প্রথার পীড়নে বর ও কন্যাপক্ষ দুইই উদ্যত হতে বাধ্য হন। সেটা হল সামাজিক প্রেস্টিজ রক্ষার দায়। লোক-লৌকিকতা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারের উৎসবে একটা মোটা অঙ্ক আমাদের খরচ না করেই উপায় থাকে না। যারা পারেন তারা করুন কিন্তু অনেকের পক্ষেই এটা একটা মস্ত দায়। এই বৃহৎ টাকার অঙ্কের অভাবের জন্যও অনেক ক্ষেত্রেই যথা সময়ে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। আবার বহু ক্ষেত্রে এই দায়ে মেটাবার দরুণও পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছ থেকেই এই টাকাটাও আদায় করে নেন। হতভাগা কন্যাপক্ষকে তাই বাধ্য হয়ে দু তরফের ব্যয় তারাই বহন করতে হয়। সাহস করে দু চারজন যদি এই প্রাণান্তকর ব্যয় বাহুল্যকে বর্জন করে সামাজ ও নিজেদের সাধ্যায়ত্ত-ধারী সীমায় একে আবদ্ধ রাখেন, তবে ক্রমে অনেকেই যে এ পথে অগ্রসর হবার ভরসা পাবেন তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। 'করিতে পারি না কাজ সদা ভয় সদা লাজ' এ থেকে আমাদের কি কোনোদিনই মুক্তি মিলবে না? আজকের এই অসহনীয় দুর্দিনের দিকে তাকিয়েও কি এই ভুয়া প্রেস্টিজের মোহকে পরিত্যাগ করা চলে না? সরকারী আইন অবশ্য একটা রয়েছে কিন্তু লুকিয়ে সেই আইনকেও অনেকেই অগ্রাহ্য করে চলেছেন। এটাও একমাত্র এই দুর্ভাগা দেশেই বোধকরি সম্ভব।

আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত পণ-প্রথাবিরোধী ভদ্রলোকের প্রবন্ধ থেকে এখানে আরও দুএকটি উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন বোধ করছি। যেমন তিনি লিখেছেন— 'এই বিংশ শতাব্দীর যুগে যখন মেয়েরা সব ব্যাপারে সমানাধিকার লাভের জন্য ব্যাপকভাবে সংগ্রামে মেতে উঠেছেন, তখন জাতীয় জীবনের এই একটি ক্ষেত্রে যে তারা (পাত্রীরা) বেশি সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন বা পাচ্ছেন সেদিকে তাদের দৃষ্টি যায়নি কেন'?

'কেন পাত্রীপক্ষ এবং আধুনিক শিক্ষিতা পাত্রীরা পণের বিনিময়ে উচ্চতর মানের পাত্র পাওয়ার দাবি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে চান না? কতজন মেয়ে আজো শিক্ষা দীক্ষা, বয়স, চাকুরী, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তার অপেক্ষা নিম্নতর মানের পাত্রকে স্বামীরূপে বরণ করতে চান? কতজন পাত্রীপক্ষই বা রাজি হন নিম্নতর মানের পাত্রের কাছে বিবাহ দিতে?'

'পাত্রীপক্ষ যদি অন্ততঃ সমমানের পাত্র নির্বাচন এবং চাকুরে মেয়েদের যদি বেকার ছেলেদের সাথে বিয়ে দিতে দ্বিধা না করেন তবে পণ লেনদেনের প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠবে না এবং অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য।'

একটা দুই নিয়ন্ত্রণ বা প্রথাসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বিষয়টাকে নানা জনে নানা দিক থেকে ভাবছেন। ব্যাপারটা যথেষ্ট জটিল, তাই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকাও খুবই স্বাভাবিক। এখানেও তাই মতান্তর আছে।

মেয়েরা এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে বাপ ভাইকে পীড়ন করে ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধে আদায় করে নিচ্ছেন বা এদিকে দৃষ্টি দিতে চাইছেন না এটা ভাবার মধ্যে কোনো সত্য আছে কিনা জানি না। বরং মেয়েরা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল কোনোদিক থেকেই এ যাবৎ সম্পত্তি লাভের অধিকার পান নি বলে অনেক সময়েই অর্থনৈতিক জীবনে তাদের অনেককেই অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। এ নিয়েই বা নিজের জন্যে ক'জন মেয়ে অভিযোগ তুলেছেন? প্রকৃত কথা মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে থেকেই গতানুগতিক ব্যবস্থা হিসেবে কতকগুলো প্রথা দীর্ঘকাল ধরে নির্বিচারে চালু হয়ে এসেছে এবং এসব ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই যা হয় তেমনি এই পণ-প্রথাও বোধশক্তির মধ্যে এক ধরণের অসাড়তা সৃষ্টি না করে পারে নি। যার ফলে এ নিয়ে ভাবনাটা কারো পক্ষেই খুব একটা জোরদার হয়ে উঠতে পারছে না। যদিও হওয়া খুবই উচিত বলেই

আমরা মনে করি।

এ যুগের শিক্ষিতা ও সচেতন মেয়েরা অবশ্যই সম্ভাব্য স্থানগুলোতে সমানাধিকার লাভের জন্য আজ সচেষ্ট। বহুকাল যাবৎ থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, সেই বঞ্চনার নিগড় থেকে স্বভাবতঃই তারা মুক্তি চাইছেন। দীর্ঘকালের অবরোধ, অশিক্ষা, আর্থিক দৈন্য এবং আরো নানা অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামও তাই অপরিহার্য; এবং এই সাংগ্রামিক চেতনা যথার্থ পথে যতই ব্যাপকতর হতে থাকবে ততই সামাজিক অনেক কুপ্রথা এবং কুসংস্কার থেকেও দেশ মুক্তি পাবে। পণ-প্রথাও স্বাভাবিক ভাবেই তখন হালে পানি পাবে না।

সমানাধিকার এবং সমমান কথাটা নিয়েও খানিকটা ভুল বোঝাবুঝি প্রায়ই হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক বা জৈব নিয়মেই পুরুষ ও নারীর দৈহিক ও মানসিক গঠন ভিন্ন, তাই আপাতদৃষ্টিতে মেয়েরা যথেষ্ট স্বনির্ভরশীল হলেও মানসিক দিক দিয়ে স্বভাবতঃই তারা চিরকালই পুরুষের শক্তি ও পৌরুষের উপর প্রত্যাশী। এই দৈহিক ও মানসিক নিয়মানুসারেই কন্যা বা কন্যার অভিভাবকেরা কন্যার চাইতে জ্ঞানে গুণে ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর পাত্র কামনা করেন। যে-কালে কন্যা-পণ দেবার প্রথা ছিল সেকালেও এই নিয়মই চলিত ছিল।

তাছাড়া পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষের অগ্রাধিকার দীর্ঘকাল থেকেই সবদিকেই নিজেদের বড় মনে করে এসেছে। আমরাও কন্যার থেকে পুত্রের দিকেই নজর দেই বেশি। এই অবস্থায় স্ত্রীটি যদি সবদিক দিয়েই স্বামীর চাইতে উচ্চ মাপকাঠির হয় তবে শুধু যে স্ত্রীই স্বামীর উপর প্রভা ও নির্ভরশীল হতে পারবে না তাই নয়, স্বামীও এ সব ক্ষেত্রে হীনমন্যতার যন্ত্রণায় ভুগবে এবং এর ফলে দাম্পত্য শান্তি নিশ্চয়ই বিঘ্নিত হবে।

কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন থেকে যাবে আমাদের দেশে শিক্ষিতা এবং চাকুরে মেয়ের সংখ্যা কত? এদের চাইতে অশিক্ষিতা, অল্পশিক্ষিতা এবং ঘরে বসা মেয়ের সংখ্যাই কি আজো সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজে অনেক বেশি নয়? তাদের কি উপায়?

সমস্যা একটার সঙ্গে আরেকটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটার সমাধান হয় না। কেন আজকের দিনের ছেলেরা এত বেকার? কেন সুস্থভাবে প্রাণধারণের এবং সংসার পালনের মত অর্থ অনেকেই উপার্জন করতে পারে না যার ফলে বিবাহ করা তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে? শিক্ষার ব্যাপারে কেন দেশ এত পিছিয়ে আছে? কেন প্রকৃত সৌন্দর্য ও সদ্‌গুণের দিকে না তাকিয়ে এক পক্ষ শুধু শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং অপর পক্ষ শুধু রূপ ও রূপা (অবশ্য শিক্ষাও) খোঁজেন?

এই সব কেন-র সমাধান কোথায়? লেখক কথিত বিবাহে বড় জোর শিক্ষিতা মেয়েরা বাইরে কাজ করে অর্থাগমের পথে স্বামীকে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। যাকে লেখক সমমান বলেছেন এসব ক্ষেত্রে হচ্ছে তাই। এবং এ ক্ষেত্র যে ক্রমশঃই বর্ধিত হচ্ছে এ তো আমরা প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয় বিশেষ করে খাদ্যের অনটন ও মহার্ঘ্যতা দিনকে দিন যেরকম ভুগে উঠছে তাতে করে এই মিলিত উপার্জনই কি দাম্পত্য জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি আনতে পারছে? এ ছাড়াও মেয়েদের সন্তান পালন, তাদের সুশিক্ষা দান এবং গৃহসংসারের লাবণ্য সৃষ্টির জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বাইরের উপার্জনকে সম্বল করাটাই ঠিক পথ কি না এ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অথচ উপায় নেই, ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রশ্নও আজ অবান্তর। জীবিকার কঠিন সংগ্রামে আজ সবাইকেই নামতে হচ্ছে আর এর ফলে জীবনের অন্য সব প্রয়োজন এবং সমস্ত রস-মাধুর্যই স্ত্রী পুরুষ এবং বিবাহিত অবিবাহিত নির্বিশেষে সকলের জীবন থেকেই লুপ্ত হতে চলেছে।

প্রকৃত কথা সর্বপ্রকার দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ভরপুর এই সমাজ ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে বর্তমান অর্থনীতি ও শিক্ষানীতির কেতরকার প্রচণ্ড গলদরাশি যতদিন না দূর হবে ততদিন কোনো দিকেই কোনো ভরসা নেই, তবে সাধারণ মানুষ জাগছে এইটাই শুভ লক্ষণ। ব্যক্তিগত এবং মিলিতভাবে সকলেই এবং বর্তমান সরকারও যদি সর্ব প্রকার দুর্নীতি রোধের প্রয়াসে এক কঠিন সংকল্প নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে চলতে পারেন তবে অবশ্য নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। সেই ততদিন যত শীঘ্র আসে ততই মঙ্গল। পণ-প্রথার যন্ত্রণাও সেদিন বুদ্বুদের মত সহজেই মিলিয়ে যাবে।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় অবশ্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার দেখিয়াও দুই হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আবৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অদ্বৈত-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত

সুতরাং ঐ শঙ্করাচার্যের মতানুসারেই জগৎ সত্তা প্রতিপন্ন করা হইল। আত্মবোধের সপ্তম শ্লোকানুসারে জানা যায় ভ্রমবশত শুক্তিকাকে রজত বোধ হয়, কিন্তু সেই ভ্রম অপসারিত হইলে আর শুক্তিকাকে রজতবোধ হয় না সত্য, কিন্তু তখন শুক্তিকাকে শুক্তিকাবোধ অবশ্যই হয়। তখন অবশ্যই শুক্তিকাও মিথ্যা বোধ করিবার কোন কারণই থাকে না। সুতরাং উক্ত বিচারানুসারে বুঝিতে হয়, ভ্রমবশত যাহাকে জগৎবোধ করা হয়, তাহা সত্য, কিন্তু তাহা জগৎ নয়। ভ্রমবশতই তাহাকে জগদ্দর্শন করা হয়, ভ্রমবশতই তাহাকে জগৎ বোধ করা হয়; বাস্তবিক তাহা অজগৎ। কিন্তু শঙ্করাচার্যেরই মতানুসারে 'ব্রহ্ম জগৎ সর্বমিতি' স্বীকার করিলে জগৎ যে অসত্য ইহা ত প্রতিপন্ন হয় না; তদ্দ্বারা জগৎ সত্যই প্রতিপন্ন হয়। আত্মবোধের সপ্তম শ্লোকানুসারে জগৎ নাই, অথবা কোন কারণবশত তাহা থাকে না বুঝিবার কোন কারণ নাই। শুক্তিকা যেমন মিথ্যা নয়, তদ্রূপ রজত মিথ্যা নয়। ভ্রমবশত শুক্তিকাকে রজত-দর্শন বা বোধই মিথ্যা। কিন্তু উক্ত শ্লোকানুসারেই রজত মিথ্যা বুঝিবার কোন কারণ নাই। ভ্রমবশত যাহাকে জগদ্দর্শন করা হয়, অথবা ভ্রমবশত যাহাকে জগৎ বোধ হয়, সেই ভ্রমাত্মক দর্শন অথবা সেই ভ্রমাত্মক বোধ মিথ্যা বটে, কিন্তু উক্ত সপ্তম শ্লোকানুসারে জগৎ মিথ্যা বুঝিবার কোন কারণই নাই। ঐ শ্লোকানুসারে রজত যেমন সত্য তদ্রূপ এই জগৎও সত্য।

অষ্টম সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সচ্চিদাত্মকমদ্বয়ং তে নিত্যো বিভো বিকল্পিতাঃ।
ব্যক্তয়োঽবিবিধাঃ সর্বা ঘটকে কটকাদিবৎ॥"

উক্ত শ্লোকে নিজে শঙ্করাচার্যই যে নিত্য বিভু, সে পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহার উক্ত শ্লোকে বিভু তিনি ব্যতীত অপর কেহ বোধ হয়। উক্ত শ্লোকেও শঙ্করাচার্যের দ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্যও নিত্য বিভু স্বীকার করিতেন বোঝা যায়। আত্মবোধের উক্ত অষ্টম শ্লোকে,—

"সচ্চিদাত্মস্বরূপাভ্যাং নিত্যো বিষ্ণুঃ বিলক্ষিতঃ।
বাক্যবৈচিত্র্যবিধয়ঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ

বলায়, বাক্য বিবিধ-সর্ব্ব ও নিত্য-বিষ্ণু অভেদই বুঝিতে হয়। কারণ তাঁহার মতে নিত্য বিষ্ণু যেন হাটক, আর সেই হাটকে বিকাশিত বাক্য বিবিধ-সর্ব্ব যেন কটকাদি। হাটকই কটকাদি বিবিধপ্রকার সমস্ত অলঙ্কারে হয়। সুতরাং, হাটক এবং কটকাদি বিবিধপ্রকার সমস্ত অলঙ্কারে প্রভেদ নাই। নিত্য-বিষ্ণুই বাক্য-বিবিধ-সর্ব্ব হইয়াছেন সুতরাং নিত্য-বিষ্ণু এবং তাঁহাতে বাক্য-বিবিধ-সর্ব্বে কোন প্রভেদ নাই। যেমন হাটক না থাকিলে কটকাদি অলঙ্কার সকল বিকাশিত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণু না থাকিলেও বাক্য বিবিধ সর্ব্ব বিকাশিত থাকিতে পারে না। বৈতাবৈত মতেই বিষ্ণু সত্য। সুতরাং তিনি যে সকল হইয়াছেন সে সকলও সত্য।

নবম সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতো বিষ্ণুঃ।
তদ্ভেদাদ্ ভিন্নবদ্ভাতি তত্ত্বজ্ঞানেকবদ্ভবেৎ।"

উক্ত শ্লোকানুসারেও শঙ্করাচার্য্যের বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত শ্লোকেও তিনি নিজেই হৃষীকেশ এবং বিভু বলেন নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে হৃষীকেশ বিষ্ণু যে অপর, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। অষ্টম শ্লোকের আলোচনায় নিত্য-বিষ্ণুই সমস্ত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারাই আকাশ, নানোপাধি, এবং সেই নানোপাধি-বশত যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাও সেই নিত্য-বিষ্ণু প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব সেই জন্য একই বহু এবং বহুই এক বলা যাইতে পারে। যেমন এক বীজই বৃক্ষ হইলে, সেই একেই বহুর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ একই নিত্য-বিষ্ণু-হৃষীকেশ বিভু বহুপ্রকার বহু হইয়াছেন বলিয়া, সেই একই বহুপ্রকার বহু। সেইজন্য সেই একই বহুপ্রকার বহু দৃষ্ট হইতেছে। পুরাণ তন্ত্রানুসারেও সেই একই বহু-রূপী। কোন কোন পুরাণানুসারে বিষ্ণুই-হৃষীকেশ। পূর্ব্বোক্ত অষ্টম শ্লোকানুসারে সমস্তই নিত্য-বিষ্ণু প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়া, হৃষীকেশ বা ইন্দ্রিয় সমূহও সেই নিত্য-বিষ্ণু বলিতে হয়। আর তিনিই যে ঈশ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব তিনি অবশ্যই হৃষীকেশ। হৃষীকেশ বা ইন্দ্রিয়সমূহ ত নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে, সুতরাং নিত্য-বিষ্ণু-হৃষীকেশ নিশ্চয়ই সগুণ সক্রিয়। হৃষীকেশ অর্থে ইন্দ্রিয়সমূহের ঈশ্বর স্বীকার করিলেও উক্ত নবম শ্লোকে কেবল ঐ হৃষীকেশ শব্দ ব্যবহারেই দ্বৈতবাদ স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ শব্দ দ্বারা ঈশ এবং হৃষীকেশ বিভিন্ন, ইহাই স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে বিষ্ণু শব্দ প্রয়োগ করায় এক এবং বহু স্বীকার করাও হইয়াছে। কারণ বিভু শব্দ কেবল-বাচক নহে। বিভুর যে বহু বিভূতি আছে। সুতরাং ঐ বিভু শব্দ ব্যবহার করায়, এক-বিভু এবং তাঁহার বহু বিভূতিও স্বীকার করা হইয়াছে।

দশম সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"নানোপাধিবশাদেব জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
আত্মন্যধ্যোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদি ভেদবৎ।"

পূর্ব্বোক্ত অষ্টম শ্লোকানুসারে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সমস্তই নিত্য-বিষ্ণু। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রকারেণ ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ।"

উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলা হইয়াছে। অতএব নিত্য-বিষ্ণু ব্রহ্মাত্মাই যে সমস্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? অতএব নানোপাধিও তিনি,—জাতি, নাম ও আশ্রমও তিনি;—তোয় এবং রস-বর্ণাদিও তিনি,—ভেদও তিনি, আরোপও তিনি,—সুতরাং উক্ত সকলগুলিই উত্তম এবং প্রয়োজনীয় বলিতে হয়। উহারা সৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে বলিয়া, উহারাও সৎ। উহাদের প্রয়োজন না থাকিলে, উহাদের বিদ্যমানতাই দেখিতাম না। তাহা না হইলে নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মা ঐ সকল হইতেনই না। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই নানোপাধি রহিয়াছেন। সুতরাং সেই নানোপাধিও সত্য। নিত্য-

বিষ্ণু ব্রহ্মাত্মাই অস্তি-নামাখ্য রহিয়াছেন, সুতরাং সেই অস্তি-নামাখ্যের প্রকৃতিও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই ভোক্তা রহিয়াছেন, সুতরাং সেই ভোক্তাও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই ধন-ধর্মাদি রহিয়াছেন, সুতরাং সেই ধন-ধর্মাদিও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু ব্রহ্মাত্মাই আরোপ রহিয়াছেন সুতরাং সেই আরোপও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই ভেদ রহিয়াছেন সুতরাং সেই ভেদও সত্য। তবে ঐ সকল কখনও ব্যক্ত রহে এবং কখনও বা অব্যক্ত রহে।

একাদশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"শঙ্কীকৃত মহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে।
পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ ১২॥
অনাদ্যবিদ্যা নির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥ ১৩॥"

পূর্ব্বোক্ত দশম শ্লোকের মীমাংসা-সম্বন্ধে আলোচনায় নিত্য-বিষ্ণু ব্রহ্মাত্মাই সমস্ত প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং তিন প্রকার শরীরও তিনি ব্যতীত অপর কিছু বলা যায় না। সুতরাং কর্ম্মও তিনি বলিতে হয়। সুখ-দুঃখও তিনি বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে সুখ দুঃখও তিনি প্রমাণ করা হইলেও সে সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তির আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন,—যেমন মদ মদ্যকে মত্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ অবশ্যই দুঃখ দুঃখকে কাতর করিতে পারে না। তদ্রূপ অবশ্যই সুখও সুখজনিত ফলভোগ করে না। ঐ প্রকার আপত্তি যে পক্ষের, সেই পক্ষের আপত্তিতে প্রতিবাদ করিয়া অপর পক্ষ বলেন যে, যিনি সমস্ত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই মদ্যপায়ীও বটেন, তিনি নিশ্চয়ই সুখী এবং দুঃখীও বটেন। সুতরাং তাঁহার মদ সুখ এবং দুঃখভোগও হইতে পারে। উক্ত তিন প্রকার ভোগ-জনিত, ত্রিবিধ ফলও তিনি ভোগ করেন।

দ্বাদশ সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বোক্ত একাদশ সিদ্ধান্তে আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়োদশ শ্লোকে অনাদি-অনির্ব্বাচ্য-অবিদ্যাকেই কারণ-শরীর বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে কারণ-শরীরও নিত্য-বিষ্ণু ব্রহ্মাত্মা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মা-ব্রহ্মই অনাদি। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের আত্মা নাত্মবিবেক নামক গ্রন্থের মতে, এবং তাঁহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ শ্লোকানুসারেও কারণ-শরীর অবিদ্যা ও অনাদি। যাহার আদি নাই তাহা নিশ্চয়ই নিত্য। ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা উভয়েরই আদি নাই, সুতরাং উভয়েই নিত্য। শ্রুতি ও বেদান্তে দুই প্রকার নিত্যের বা সত্যের নির্দ্দেশ নাই। সুতরাং এক প্রকার নিত্য বা সৎই স্বীকার করিতে হয়। তবে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ষষ্ঠত্রিংশ শ্লোকে—'সর্ব্বমাত্মেতি' বলিয়াছেন বলিয়া, আত্মা-ব্রহ্ম ও অবিদ্যা অভেদ স্বীকার করিলে, আর দ্বিতীয়-নিত্য বা সৎ স্বীকার করিতে হয়না। তবে আত্মা-ব্রহ্মই অনাত্মা-অবিদ্যা স্বীকার করিলে ঐ আত্মা-ব্রহ্মকে আর শ্রুতি-বেদান্তানুসারে নির্ব্বিকার বলা হয় না। উক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকানুসারে অনাদি-অবিদ্যা-অনির্ব্বাচ্য। যাহা নির্ব্বাচন করা যায় না, তাহা নিশ্চই অজ্ঞেয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনাত্মা-অবিদ্যাকে নির্ব্বাচন করা যায় না, সুতরাং তাহা জানিবার উপায়-জ্ঞানও নাই। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মা-ব্রহ্মকেও জানা যায়। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানও হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বোঝা যাইতেছে, অনাত্মা-বিদ্যা জ্ঞানাতীতা। তবে তাঁহার মতে জ্ঞেয়-আত্মা-ব্রহ্ম অপেক্ষা অজ্ঞেয়-অনাত্মা-অবিদ্যার শ্রেষ্ঠতা আছে নাকি যে তাহা নির্ব্বাচন করিবার কোন উপায় নাই?

ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"শঙ্কোষাধিযোগেন তত্তদ্রূপ ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাধিযোগেন স্ফটিকো যথা॥"

এক স্বচ্ছাকারে অপর আকার প্রতিবিম্বিত হইতে পারে।

এক স্বচ্ছ জড়ে অপর জড় প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। স্ফটিক স্বচ্ছ জড়,—তাহাতে নীলবস্ত্রাদি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে শ্রুতি-বেদোক্তপ্রকারে আত্মাকে অজড় অনাকার বলা যাইতে পারে, সুতরাং জড়-অন্নময়-কোষ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেই পারে না। তোমার চক্ষুর্দ্বিতেই অনাকার আকাশ বিদ্যমান। তাহাতে কোন জড়ই ত প্রতিবিম্বিত হয় না। তবে অনাকার-অজড় আত্মাতেই বা কোন্ জড়াকার কি প্রকারে প্রতিবিম্বিত হইবে? এক অনাকার অন্য অনাকারে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। অনাকার-আকাশে কি অনাকার বায়ু প্রতিবিম্বিত হয়? অতএব সেইরূপ অনাকার-আত্মাতে অনাকার-মন, অনাকার-প্রাণ, অনাকার-বিজ্ঞান বা বুদ্ধি এবং অনাকার-আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইতেই পারে না। আমি-আত্মাতেই বাক্‌শক্তি রহিয়াছে। কিন্তু আমি আত্মাই ত বাক্‌শক্তি বোধ করি না। আমি-আত্মাতেই মন রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাই ত মন বোধ করি না। আমি-আত্মাতে প্রাণ রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাই ত প্রাণ বোধ করি না। আমি আত্মাতেই বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু আমি আত্মাই ত বিজ্ঞান বোধ করি না। আমি-আত্মাতেই আনন্দ রহিয়াছে, কিন্তু আমি আত্মাই ত আনন্দ বোধ করি না। আমাতে নিয়ত যাহারা রহিয়াছে, আমি তাহাদের সঙ্গে আপনাকেই অভেদ-বোধ করি না, তবে আমাতে কিছু প্রতিবিম্বিত হইলে, আমি আপনাকে তাহা বোধ করিব কেন? সেই জন্য বলি, আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্দ্দশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্যের—

"পঞ্চকোষাদিযোগেনতত্তন্ময় ইব স্ফটিকঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা।"

বলা সঙ্গত হয় নাই।

চতুর্দ্দশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"বপুরাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং মুক্তাফলাতঙঃ।
আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাতত্তুলং যথা।"

তণ্ডুল যে আবরণে আবৃত থাকে, সে আবরণও যাহা, তণ্ডুলও যে তাহাই। তণ্ডুল যাহার বিকাশ, তণ্ডুলের আবরণও যে তাহারই বিকাশ; সুতরাং উভয়ে অভেদ। তণ্ডুল এবং তণ্ডুলের আবরণ যেভাবে অভেদ, আত্মা এবং পঞ্চকোষও কি সেইভাবে অভেদ? তণ্ডুল এবং তণ্ডুলের আবরণ যেমন একেরই দ্বি-প্রকার বিকাশ, তদ্রূপ আত্মা, এবং তাঁহার পঞ্চপ্রকার আবরণ বা কোষও কি একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ? উক্ত পঞ্চদশ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন তণ্ডুল, সেই আত্মার আবরক পঞ্চকোষ যেন তুষাদি। সুতরাং তণ্ডুল এবং তাহার তুষাদি যে প্রকারে অভেদ, যে প্রকারে তাহারা একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, সেই প্রকারে উক্ত পঞ্চদশ শ্লোকানুসারে আত্মা এবং তাঁহার আবরক পঞ্চকোষ, অভেদ এবং একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ।

পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ষোড়শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ॥"

পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ শ্লোকানুসারে বুদ্ধিও পঞ্চকোষাদির অন্তর্গত। ঐ শ্লোকানুসারে শুদ্ধাত্মাতেই পঞ্চকোষাদি প্রতিবিম্বিত হয় বোঝা যায়। সুতরাং ঐ শুদ্ধাত্মাতে বুদ্ধিও প্রতিবিম্বিত হয় স্বীকার করিতে হয়। ঐ শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, আত্মা কোন কোষেই প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। কারণ ঐ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন স্ফটিক—স্ফটিক শ্বেতবর্ণ, সুতরাং তাহা অন্য কোন বর্ণেই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। ঐ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন শ্বেতবর্ণ স্ফটিক এবং পঞ্চকোষাদি যেন নীল প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণবিশিষ্ট, সুতরাং ঐ পঞ্চকোষের কোন কোষেই শ্বেত স্ফটিকবৎ শুদ্ধাত্মা প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। অতএব ঐ পঞ্চকোষের অন্তর্গত স্বচ্ছ বুদ্ধিতেও আত্মা প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। উপরোক্ত ষোড়শ শ্লোকানুসারে ঐ স্বচ্ছবুদ্ধি যেন শ্বেতবর্ণ বিশিষ্টস্বীকার করিলেও শ্বেত-স্ফটিকবৎ শুদ্ধাত্মা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

পট-পরিবর্তন: বাঙলাদেশের রাজনৈতিক পট আবার পরিবর্তিত হইল—ঘোষ-মন্ত্রীসভা টিকিল না। জল অত্যন্ত ঘোলাটে হইয়া যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইল। বাংলাদেশ সকল দিক দিয়াই প্রমাণ করিয়া দিতেছে কোন্ অধঃপাতে সে গিয়া পৌঁছাইয়াছে।

কেন এমন হইল? কি ইহার সমাধান? কী যে একটা গভীর বেদনা সমস্ত দেশের চিত্ত হইতে গুমরিয়া উঠিতেছে—কোথায় সে বেদনার আশ্রয়? একক কোনো ব্যক্তি বা দলকেই দোষ দিয়া লাভ নাই। ঘটনাকে আরও গভীরে যাইয়া, ঘটনার আরও উর্ধ্বে উঠিয়া ঘটনাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত জটিলতার পিছনে কি শুধু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিরই অভাব? যাহা এতদিন যবনিকার অন্তরালে ছিল, যার বিলম্বিতের শেষ অধ্যায়ে সেই লোভ, সেই স্বার্থান্ধতা ক্রমশ নগ্ন আকারে দেখা দিয়াছে, যাহা সমস্ত ভাবনাকে স্তব্ধ করিয়া দিতে চায়। কোথাও বুদ্ধিবিবেচনার অভাব, কোথাও তীব্র স্বার্থ-বোধ। পথ পাওয়া গেল না!

রাজনীতি ক্ষেত্রে কূটনীতিকতার স্থান একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া সম্ভব না হইলেও ইহা সত্য যে জাতির চিত্ত যে আজ এমন করিয়া শূন্য হইয়া গেল তাহার কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষ। যে অবস্থাটা বর্তমানে চলিতেছে তাহা সামঞ্জস্যের দীর্ঘকাল সচেতনতা নয়, তাহা অন্ধ গোঁজামিলের ব্যর্থ দোঁড়ানি। ঐ দুইয়ের সামঞ্জস্যময় একটা সামগ্রিক চিত্র যদি জাতির সামনে উপস্থিত করা যায় তাহা হইলে এ শূন্যতা ঘুচিবে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও রাজনীতি ছিল—কূট-নীতিকতাও ছিল বলা চলে—তথাপি তিনি ছিলেন এমন একটি সমগ্র তত্ত্বের মূর্তি যেজন্য তাঁহার কূ[illegible] ব্যক্তি বা সমষ্টির কল্যাণ-বোধকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্ত্যের কর্ম-প্রবণতা—যাহা অন্তরের প্রাণ—আর ভারতবর্ষের সততা যাহাকে নিঃশ্রেয়স বলা যায়—কি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্মিলিত হয় নাই? সৎ হইলেই কর্ম ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হইবে, কিংবা কর্মের পথে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলেই অসৎ হইতে হইবে, স্বার্থ আর লোভের ক্রীড়নক হইয়া ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ বিসর্জন দিতে হইবে—এই কাটাই সমস্ত ব্যর্থতা বা শূন্যতার গোড়ার কথা। আমরা বড় শোনা কথা নির্বিবাদে মুখস্ত করি এবং মুখস্ত করা কথা নির্বিবাদে প্রয়োগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। সৎ হইতে হইলে বনে যাইতে হইবে এবং সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে অসৎ হইতেই হইবে—এই মুখস্ত করা কথাগুলি আমরা একটুও বিবেচনা করিয়া দেখি না। এত তো আমরা কৃষ্ণ-পূজা করি, কৃষ্ণের জীবনের দিকে একবার তাকাইয়া দেখি না কেন? তিনি কি নিজে বনবাসী ছিলেন? কিংবা অর্জুনকে কি তিনি বনে পাঠাইয়া ছিলেন? না অর্জুন বনে যাইতে চাহিলে 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' বলিয়া তাহাকে ধমক দিয়াছিলেন, তাহার বনে যাইবার পথ করিয়া দেন নাই। কৃষ্ণ কি কম আধ্যাত্মিক ছিলেন? আমরা কি বনে যাইয়া তাঁহা হইতে বেশী আধ্যাত্মিক হইতে পারিব? আধ্যাত্মিক হইতে হইলে বনে যাইতে হইবে—এ ধারণা আমাদের ভুলিতেই হইবে, আবার আধ্যাত্মিক না হইলেও আমাদের চলিবে—আমাদের জড়বাদীর মত কর্মের পিছনে ধাওয়া করিলেই চলিবে এ ধারণাও আমাদের ভুলিতেই হইবে। কর্ম করিলেও আমাদিগকে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ সৎ হইতে হইবে—এ ধারণা ভুলিয়াছি বলিয়াই জড়বাদের কুৎসিৎ রূপ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অন্তরেন মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ জড়বাদী—অজড়বাদের কোন পিছটান বা ক্ষুধা তাহাদের নাই। জড়বাদের নিরন্ন

মানিয়া তাহারা চলে একথা বলা চলে। কিন্তু একান্ত জড়বাদে যে জীবনের সমস্যার সমাধান নাই এ কথা যেখানকার চিন্তাশীলরা বুঝিতেছেন। আর আমরা একদিন একান্তভাবে জড়বাদী ছিলাম—আমাদের বাস্তব জীবনের সব কিছুর তুলাই চলত বাস্তবাতীত সত্তার মাপকাঠিতে—সেই আমরা প্রতিক্রিয়ায় আজ এমন নোংরা জড়বাদী হইয়াছি—তাহারই জন্য আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ এই চরম দুরবস্থা। অন্য দেশ তবু নিজের পেটটাকে রক্ষা করিতে জানে—তাহারা পরের রক্ত চুষিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। আমরা পরের রক্ত চুষি না, নিজের দেশের রক্ত চুষিয়া পরম সন্তোষে থাকিতে পারিব মনে করি। তাই সর্বত্র এই দুর্গতি। গণতন্ত্রের নামে জন-প্রতিনিধিদের আজ যে কুৎসিৎ নগ্ন রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহার পিছনে কূটনীতিকতার অভাব যতই থাকুক—সততার অভাবই বড় কথা। কৃষ্ণের মত আমাদিগকে সৎ হইতে হইবে, রাজনীতিও করিতে হইবে, প্রয়োজনে ততখানিই কূটনীতি অবলম্বন করিতে হইবে যাহা সমষ্টিকল্যাণকে আচ্ছন্ন না করে। বাস্তব জীবনকে কতকগুলি চোর ছ্যাচড়ের হাতে ছাড়িয়া দিয়া বনে যাইয়া আধ্যাত্মিক হওয়াকে কৃষ্ণ বেশী বড় বলেন নাই—অর্জুনকে সেরকম হওয়া হইতে তিনি প্রাণপণে বিরত করিয়াছিলেন। বাস্তব জীবনে সৎ হইতে হইবে, রাজনীতির জীবনে সৎ হইতে হইবে—তাহা না হইলে ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। সৎ হওয়া মানে কল্যাণ-বুদ্ধি—সমষ্টি কল্যাণ-বুদ্ধি—হারাইয়া না ফেলা, সৎ হওয়া মানে সমষ্টিকে ব্যক্তি হইতে কিংবা ব্যক্তিকে সমষ্টি হইতে পৃথক বুদ্ধিতে না দেখা। সৎ হওয়া মানে ব্যক্তি বা দলের স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকা। কৃষ্ণ-জীবনই আজ আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত যাঁহাকে দেখিয়া আমরা রাজনীতি করিব। জড়বাদীর রাজনীতি করিতে যাইয়াই আমাদের এই বর্তমান দুর্গতি—আমরা অবশ্য জড়বাদী হইয়াছি। আবার কৃষ্ণের মতই আমাদিগকে আধ্যাত্মিক হইতে হইবে। বর্তমান রাজনীতিকে এবং ভবিষ্যৎ ভারতবাসীকে যদি সুস্থ হইতে হয় তাহা হইলে এই সামগ্রিক চিন্তাটি সর্বাগ্রে শিশু বালক যুবক বৃদ্ধ সকলের সামনে উপস্থিত করিতে হইবে—দৃষ্টান্ত রাখিতে হইবে কৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ সমষ্টি-কল্যাণ স্থাপন করিতে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, দুর্যোধনের মত ব্যক্তি-ভোগের জন্য নয়। আজিকার সব দুর্যোধনের স্বার্থান্ধ ভোগ-লালসা যখন সমস্ত আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে, তখন সমষ্টি-কল্যাণবোধময় সামগ্রিক কৃষ্ণ-জীবন ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব ছাড়া আজ বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সামনে আর পথ নাই। আজিকার শিশু কিশোরের সামনে আধ্যাত্মিকতাকে এই অর্থে এবং বাস্তব জীবনে সৎ হওয়ার মধ্য দিয়া সমষ্টি কল্যাণ বোধকে যদি প্রস্ফুটন করা না যায়, তাহা হইলে এ প্রলয় হইতে ভবিষ্যতে যেমন রক্ষা পাওয়া যাইবে না, তেমনি আজিকার প্রবীণ রাজনীতির কাছেও কৃষ্ণ-জীবন অনুধাবন করা ছাড়া আর পথ নাই।

বর্তমান রাজনৈতিক দুর্যোগ আকাশ হইতে পড়ে নাই, যেদিন স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে পথের সততার উপর জোর না দিয়া যেন তেন প্রকারেণ স্বাধীনতা লাভকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম, জাতির সর্বাঙ্গীণ জীবনকে গঠনকর্মের মধ্য দিয়া পরিশুদ্ধ করিবার ব্রতকে ছোট বলিয়া বুঝিয়া একান্তভাবে জড়বাদীর আন্দোলনের পথেই স্বাধীনতালাভ সহজ পথ বলিয়া বুঝিয়া ছিলাম, সেই দিনই দুর্নীতির বীজ যাহা মানুষের চরিত্রে সকল সময়ই আছে, তাহা মাটি ভেদ করিয়া সন্তোষে গজাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আজ তাহাই বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া সমাজ-জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাই এ দুর্নীতিকে দূর করিতে হইলে কৃষ্ণ-জীবনের সামগ্রিকভাবে সঙ্গে লক্ষ্যস্থলকে যে পথই সৃষ্টি করিয়া তোলে এ কথাও জানিতে ও শিখিতে হইবে। যে কোন পথে একই লক্ষ্যস্থলকে পাওয়া যায় না। পথ-অনুযায়ী লক্ষ্যস্থল সৃষ্ট হইয়া উঠে। সব পথেই কালিঘাটে যাওয়া যায় বটে কিন্তু সব পথে একই মায়ের দর্শন মেলে না। চোর যে মন লইয়া কালীঘাটে যে কালীকে দর্শন করে, ব্যবসায়ী যে মন

লইয়া যে কালীকে দর্শন করে, কোন কর্ম বর্জিত ভক্তির পথে যে কালীর দর্শন পাওয়া যাইবে, আর জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিপ্রেম মিশ্রিত সামগ্রিক জীবন সাধনায় যে কালীর দর্শন পাওয়া যাইবে, এই সব কালী একই কালী নয়। পথের বিভিন্নতায়, মনের বিভিন্নতায় কালী বিভিন্ন অবস্থাই হইবেন। আজ প্রয়োজন দৈহিক মানসিক সকল বৃত্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠনের মধ্য দিয়া জ্ঞান-কর্মভক্তিপ্রেম মিশ্রিত প্রাণসত্তা দ্বারা বাস্তব জীবনের উত্তরণ—যেখানে 'তোমাকে তোমাকে করব এবং', যেখানে 'তাজেন ভুঞ্জীথা'—উপনিষদের এই মহাবাণী সার্থক। বাস্তব জীবনকে নূতন করিয়া কৃষ্ণ-জীবনের দৃষ্টান্তে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা ছাড়া ভারতবর্ষ 'হয় বাঙ্গলা দেশ আর কিছুতেই বাঁচিতে পারিবে না—বর্তমান রাজনৈতিক দুর্যোগের সমাধান একমাত্র রাজনৈতিকতার মধ্যেই নাই, নেতাদের এ কথা আজ বুঝিবার দিন আসিয়া গিয়াছে।

আশ্রম-সংবাদ : ব্রাহ্মসূত্র-উপনিষৎ-গীতার অবধূত-ভাষ্য-রচয়িতা এবং নরনারায়ণ আশ্রম ও উদ্বোধন-কার্যালয় প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৫ তম জন্মোৎসব বিগত ২৮শে নভেম্বর ছিল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য সেদিন শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন ও দর্শন আলোচনার বাহির হইতে অল্প কয়েকজন আসিয়াছিলেন। এজন্য বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার তাঁহার জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে আবার আলোচনা-সভা হইয়াছিল। সেদিন শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন, শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করিয়া সমন্বয়-ঘন সামগ্রিক জীবন-চেতনা যে আজ কত প্রয়োজন তাহা বুঝাইয়া বলেন।

এই দিনই নরনারায়ণ মহিলা শিল্প কেন্দ্রের সাম্বৎসরিক প্রদর্শনী অন্তে প্রদর্শিত সেলাইয়ের পুরস্কার এবং লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমার প্রমাণ-পত্র প্রদান করা হয়। শ্রীবিজন মহানবীশ, শ্রীঅরুণ রায়, শ্রীব্রতব্রত সান্যাল তাঁহাদের সুকণ্ঠে কয়েকটী সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে আনন্দ দিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান অন্তে রেডিয়ো আর্টিষ্ট শ্রীসুধিকা দত্ত দেড় ঘণ্টা কাল তাঁহার অতি সুন্দর কণ্ঠে ভক্তিমূলক সঙ্গীতদ্বারা সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগাইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যা ০৮০ পয়সা, বার্ষিক পাঁচ টাকা

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
Printer's Name Nationality Address	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5. Editor's Name Nationality Address	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	Renu Mitra M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, Renu Mitra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 16th February, 1968.

Sd. Renu Mitra,
Signature of the Publisher.

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন করার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

With best Compliments of

MOTOR & MACHINERY MANUFACTURERS LIMITED

Registered & Head Office :
3/1, KRISHNA BEHARI SEN STREET,
CALCUTTA-7

—0—

Manufacturers of :—
A. C. Electric Motors for all purposes, Agricultural Pumping Sets, Motorised Polishing Lathes & Grinders, Special motors for Textile & Jute Industries
AND
Battery Charging Sets.

Factory :
10, Jawpur Road, South Dum Dum,
CALCUTTA-30

Branches At :

DELHI
8, Sundar Nagar, Mathura Road,
New Delhi-11

MADRAS
55, Linghi Chetty Street,
Madras-1

PATNA
S. V. Verma Road,
Patna-1

JAIPUR
C-18, Bhagwandas Road,
Jaipur.

BOMBAY
336-A, Kalba Devi Road,
2nd Floor, Bombay-2

POONA
7, Modibagh, Ganesh Khind Road,
Poona-16

NAGPUR
'Mangal Bhawan'
Pandit Malvia Road,
Sitabuldi, Nagpur-1

AHMEDABAD
'Amar House'
4638/3, Relief Road,
Ahmedabad-1

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

CALCUTTA CENTRAL

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্ম-অনাত্ম
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

প্রতি সংখ্যা ৹৮৹ পয়সা,
চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৪-৭৫, ১৯৬৮-

সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র

বার্ষিক পাঁচ টাকা
একবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুইয়ের সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

দেশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ
সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন

পশ্চিমবংগ সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা।
ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

ওয়েস্টবেংগল পশ্চিমবংগের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

প্রতি সংখ্যা : বারো পয়সা।
ষাণ্মাসিক : তিন টাকা।
বার্ষিক : ছয় টাকা।

পশ্চিমবংগাল নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী।

ষাণ্মাসিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

- গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন।
- চাঁদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে।
- ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।
- পত্রিকা বিক্রির জন্য ৩৩½% কমিশনে এজেণ্ট চাই।

তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবংগ সরকার
রাইটার্স বিল্‌ডিংস, কলিকাতা-১।

ডব্‌লিউ. বি. (আই অ্যাণ্ড পি. আর) অ্যাড ১২৭৩ /৬৮

যেখানেই যান
সকলেরই মুখে বাটা
স্যানডাকের সুখ্যাতি

বাটা স্যানডাক পায়ে দেবা মাত্রই পাবেন নতুন ও পরিতৃপ্ত এক অভিজ্ঞতা। এর গড়ন আর উপকরণ, নির্মাণ আর নকশা সব কিছুতেই অনন্ত সজীবতা। তাই যেখানেই জনসাধ দেখবেন স্যানডাক সকলের পুরোভাগে। বাটার উন্নত বৈশিষ্ট সংমিশ্রণ কেমিলনে তৈরি, এতে জুতোর গড়ন আর উজ্জ্বলতা ধরাবরই একরকম থাকে, সব সময়ই মনে হয় যেন নতুন কেনা, ধুলো-ময়লা-কাদায় একটুও মলিন হয় না। সদ্য-কেনার উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে মেটেই ঝামেলা নেই, ভেজা ন্যাকড়ার দু-এক ঝাপটা, ব্যস্, ধুলো-কাদা, ময়লা দাগ নিমেষে উধাও। নতুন যুগের এই নতুন জুতো আপনাদের সকলকে চমৎকার মানাবে। আজই সপরিবারে আসুন বাটার দোকানে।

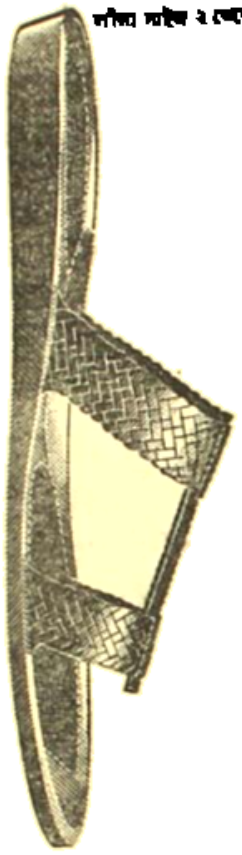

লীলা সাইজ ২ থেকে ৪ ২.৪৩

কুমার সাইজ ১০ থেকে ৩ ৪ থেকে ৯
২.৫০ ১০.২৩

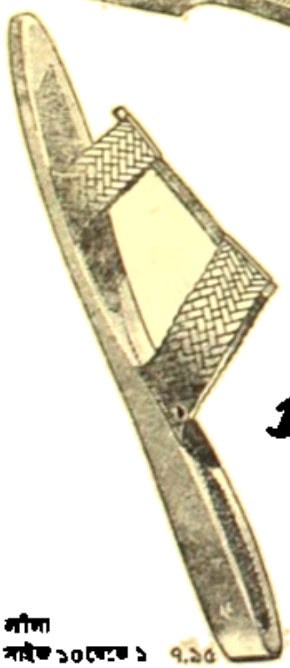

জেলা সাইজ ৫ থেকে ৮ ৬.১৫
৯ থেকে ১২ ৭.১৫

লীলা
সাইজ ১০ থেকে ১ ৭.১৫

Bata স্যানডাক্

কেমিলন

নতুন যুগের নতুন জুতো

বাটা-মনুমেন্টাল-বিল্ডিংকে
বিশ্বের প্রতিফলন প্রস্তুত

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·১৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	
বাংলার বিদুষী	
বাংলার মনীষী	
জীবন গড়া	
রাজর্ষি রামমোহন	
আচার্য জগদীশ	
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
যুগাচার্য। বিবেকানন্দ	
রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	
বিদ্যাসাগর	

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

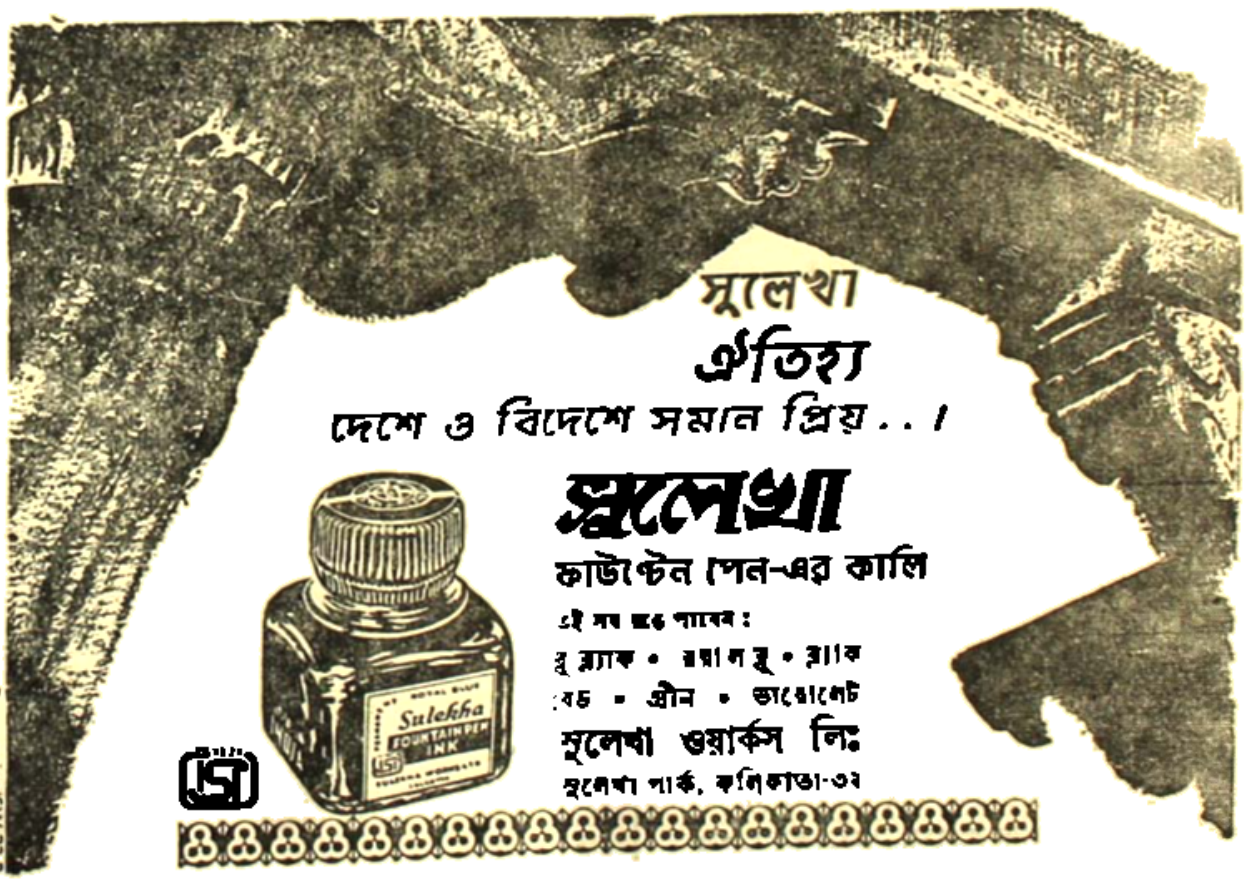

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

আত্মকথা

বা

সত্যের প্রয়োগ

মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর

সচিত্র নূতন বাংলা সংস্করণ

মূল গুজরাটী হইতে অনূদিত

অনুবাদ : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

মূল্য : ১২·০০

*

কয়েকখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

গান্ধী-রচনা-সংকলন

মূল্য ৫·০০

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

মূল্য : ৩·০০

মোহনমালা

একখানি নিত্যব্যবহার্য গান্ধীবাণী-চয়নিকা

মূল্য : ৩·৫০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিজড়িত জীবনী

মূল্য : ৫·৫০ ও ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গান্ধীজীর অর্থ নৈতিক দর্শন

মূল্য : ৫·৫০

সম্পূর্ণ পুস্তকতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রকাশন বিভাগ,
গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),
১১ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

*

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ

কলিকাতা ৪

With Compliments of

SAKARLAL AMBALAL

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

উজ্জ্বলভারত

চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৭৪-৭৫ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৮ একবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

ভারতীয় গণ-তন্ত্রের স্বরূপ

॥ শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ॥

ভারতীয় সংবিধানে গণ-তন্ত্র-সম্মত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধান রচিত হওয়ার পরে সাধারণ নির্ব্বাচনের মারফৎ ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় গণ-তন্ত্রের রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু গণ-তন্ত্র মানে কি? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গণ-তন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হচ্ছে—Government of the people, for the people and by the people—(জনগণের গভর্ণমেন্ট, জনগণের স্বার্থে পরিচালিত গভর্ণমেন্ট, জনগণের দ্বারা পরিচালিত গভর্ণমেন্ট)। কিন্তু এই সংজ্ঞা অনুসারে গণতন্ত্র যেমনটি হওয়া উচিত, ঠিক তেমনটি এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোথাও হয়নি, যদিও দুনিয়ার বহু দেশই দাবী করে যে সেখানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রকৃত কথা এই যে গণতন্ত্র এখনো কোনো একটা চরম রূপ নেয়নি কোথাও—এক এক দেশে এক এক রূপ নিয়ে গড়ে উঠছে। গণ-তন্ত্র কোন্ দেশে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করবে তা নির্ভর করে সে দেশের ইতিহাসের ধারা এবং সম-সাময়িক আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপরে। তাই ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে স্থানীয় অবস্থা অনুসারে গণতন্ত্র বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। তবে এদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে কারো সঙ্গে কারো মিল আছে, আবার কতগুলি বিষয়ে মিল নেই। ইংলণ্ডের গণতন্ত্রে রাজার স্থান আছে, আমেরিকার গণতন্ত্রে নেই। কিন্তু উভয় দেশেই এখন সাধারণ নির্ব্বাচনের সময়ে দুইটি মাত্র দল একক সংখ্যা পরিষ্ঠতা লাভের জন্যে ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং যে দল একক সংখ্যা-পরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে, সেই দল দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে এক দলের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। পরের নির্ব্বাচনে হয়তো অপর দল ভোট-যুদ্ধে জয়লাভ করে দেশের শাসন-ক্ষমতা করায়ত্ত করে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কোনো দলই একাদিক্রমে বেশী দিন শাসন-ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারে না। একাদিক্রমে দুবারের বেশী কোনো দলকেই কখনো বড় ক্ষমতাসীন থাকতে দেখা যায়নি। এত দিন ধরে এই ঐতিহ্যই সেখানে গড়ে উঠেছে। সে সব দেশের ভোট-দাতারা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কার্য্যসূচী বিচার করে ভোট দেয়। কোনো দলই ক্ষমতাসীন হয়ে দেশের সর্ব্ববিধ সমস্যা সমাধান করতে পারে না। তাই দেশের জনগণ কিছুদিন পর পরই গভর্ণমেন্ট পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই কারণেই একটা দল খুব বেশী দিন ক্ষমতাসীন থাকতে পারে না। এর ফল মোটের উপর দেশের পক্ষে ভালই হয়। কোনো দল হয়তো একটা কোনো বিশেষ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারলো না। এ অবস্থায় পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে যদি অপর দল জয় লাভ করে ক্ষমতাসীন হয়, তবে তারা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে নূতন পথে সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু একটা দল খুব বেশীদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে তার ফল ভাল হয় না। প্রথমতঃ দেশ-শাসনের ব্যাপারের যাবতীয় ক্ষমতা একটা দলের অন্তর্ভুক্ত

লোকদের কুক্ষিগত হয়ে ওঠে। তার ফলে অন্যান্য দলভুক্ত লোকেরা ক্ষমতা-প্রয়োগের কোনো সুযোগ পায় না বলে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ তাদের মনের মধ্যে জমতে থাকে। ক্রমে তারা মরিয়া হয়ে উঠে' আইন কানুন এবং শাসন-শৃঙ্খলার সীমানা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করে। তার ফলে গণতন্ত্রই ক্ষুণ্ণ হয়—গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র থাকে না—উচ্ছৃঙ্খল তন্ত্রে পরিণত হয়। যেমন, গণতন্ত্রে সবগুলি রাজনৈতিক দলকে এই একটা অলিখিত আইন মেনে চলতে হয় যে তারা কেউ ইচ্ছা করে—জেনে শুনে—দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করবে না। যারা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, তারাই তো দেশে রাজনীতির চর্চ্চা করে, কিংবা দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তারাই যদি এই অলিখিত আইন না মেনে লঙ্ঘন করতে থাকে তবে সে দেশে গণতন্ত্র চলতে পারে না—অচিরেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোনো একটা দল যদি বেশী দিন ক্ষমতাসীন থাকে, সে দলের সবাই কম বেশী ক্ষমতা-গর্বী হয়ে ওঠে। দলের কর্ত্তা-ব্যক্তিদের ক্ষমতার মত্ততায় পেয়ে বসে—তাদের মধ্যে বড়ত্বের অহঙ্কার (Superiority Complex) জাকিয়ে বসে। তার ফলে এক দিকে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ যোগ থাকেনা, অন্য দিকে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আচরণে তারা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই। কিন্তু দলের পক্ষে তার ফল হয় মারাত্মক। দলে দলাদলি আরম্ভ হয়ে যায় এবং ক্রমে দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ নির্ব্বাচনে দলের পরাজয় এবং ক্ষমতার আসন থেকে পতন। প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই তারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেহেতু দলের সবাইকে এমন ভাবে ক্ষমতার মত্ততায় পেয়ে বসে যে, পায়ের তলা থেকে কখন যে মাটি সরে গেছে, তা কেউ টের পায় না—ঘটনাটা ঘটে যাবার পূর্ব্বে বুঝতে পারে না।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এরূপ অবস্থা হলেও হোতে পারে। কিন্তু যে দলের পূর্ব্ববর্ত্তী ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশের অবস্থা অন্যরূপ। সে সব দেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু দলের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং সাধারণ নির্ব্বাচনে অনেক দল ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। নির্ব্বাচনের পরে কোনো একটা দলের পক্ষে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতাসীন হওয়া সম্ভবপর হয় না। তার ফলে কয়েকটার মিলিতে সংটা কিংবা আরো অধিক সংখ্যক দল এক সঙ্গে মিলে দেশের শাসন চালাবার ভার গ্রহণ করে গণতন্ত্রের এই যে দুটি প্রকার-ভেদ, এর মধ্যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, বলা কঠিন—উভয়েরই পক্ষে বিপক্ষে বলার অনেক কথা আছে। এক দলের শাসন-কর্ত্তৃত্ব বেশী দিন স্থায়ী হলে, তা স্বৈরাচারী শাসনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কিন্তু সম্মিলিত মন্ত্রী-সভা কর্ত্তৃক পরিচালিত গভর্ণমেণ্ট অধিক দিন অধিকতর গণ-সম্মত রীতি নীতি বজায় রেখে চলতে পারে। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে এরূপ গভর্ণমেণ্ট বেশী দিন স্থায়ী হয় না। নিজেদের ভিতরে মতভেদ ও মনোমালিন্যের ফলে দু এক বছরের মধ্যেই তার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তার ফলে এরূপ গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘ স্থায়ী কোনো গঠন-মূলক কাজে হাত দিতে পারে না।

ভারতবর্ষে গণ-তন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, কি হওয়া উচিত, সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়—আমাদের বিবেচ্য বর্ত্তমানে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কি হ'তে পারে। বৈজ্ঞানিক ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা। আমাদের এখানে গণতন্ত্র কি রূপ নেবে, অন্যান্য দেশের মতই তা নির্ভর করে আমাদের দেশের ইতিহাসের ধারার উপরে। আমাদের ইতিহাস হচ্ছে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ইংরেজ রাজত্বের অধীনে বাস করে আমরা স্বকীয় চেষ্টায় ১৯৪৭ সালে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তা করতে আমরা ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নাম দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তার পতাকা তলে ৬০ বছর ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা ভাবে লড়াই করেছি। বহু দুঃখ কষ্ট বরণ ও সহ্য সহিষ্ণুতার আত্ম দানের ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়েছে। তার ফলে দাদা

ভারতবর্ষে আমরা একটা রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি, যা কোনো দিন ভারতবর্ষে ছিল না। রাজনৈতিক ঐক্য মানে কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে সমগ্র ভারতের এক মতে, এক নেতৃত্বে, এক যোগে কাজ করা।

এই রাজনৈতিক ঐক্যই আমাদের একমাত্র অস্ত্র, যার বলে আমরা স্বাধীন হয়েছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে এ দেশের লোকের সাহায্য ছাড়া এ দেশের গভর্নমেন্ট চালানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। তখন এদেশের অবস্থা এমনি যে সাধারণভাবে সমস্ত দেশ কংগ্রেস ও গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে একতাবদ্ধ। আর এ দেশের মুসলমান জনগণের অধিকাংশ মোসলেম লিগ ও জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ। তার মানে শাসন-ব্যাপারে ইংরেজের পক্ষে এ দেশের লোকের সাহায্য পেতে হলে কংগ্রেস ও মোসলেম লিগের সমর্থন অত্যাবশ্যক তাই ইংরেজ কংগ্রেস ও মোসলেম লিগের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে দেশটাকে দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগের শাসন-কর্তৃত্ব কংগ্রেসের হাতে এবং অপর ভাগের শাসন-কর্তৃত্ব মোসলেম লিগের হাতে ছেড়ে দিয়ে এ দেশ থেকে বিদায় নিল। যদিও এ কথা বলাই বাহুল্য যে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিল বলেই বিদায় নিয়েছিল। সে আলোচনা থাক—তা আমাদের বক্তব্য বিষয় নয়।

এই ভাবে এ দেশের শাসন-কর্তৃত্ব কংগ্রেসের হাতে এসেছে। কংগ্রেস তখন সত্যই সমগ্র দেশের অভিন্ন জনপ্রিয় শক্তিশালী সংস্থা—জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে পেয়ে আড়াই বছরের মধ্যে সংবিধান রচনা করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তার মানে কংগ্রেস সংবিধান অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেশের জনগণকে ভোটের মারফৎ যে কোন দলের হাতে রাষ্ট্রীয় শাসন-ক্ষমতা তুলে দেবার অধিকার দিয়ে দিয়েছে।

সাধারণ নির্বাচনে বহু রাজনৈতিক দল ভোটের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কংগ্রেসও একটি দল হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী বলেছিলেন—কংগ্রেসকে আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে না চালিয়ে "লোক-সেবক-সঙ্ঘ" নাম দিয়ে কংগ্রেসকে একটা সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হোক। তাঁর মতে কংগ্রেস জন-জাগরণ সংঘটিত করে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। এখন ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কংগ্রেসের কাজ নয়। এখনো ৭ লক্ষ গ্রামের অধিবাসী যুদ্ধের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের কাজ বাকী রয়েছে। সেই কাজ সুসম্পূর্ণ করে তুলবার জন্যে কংগ্রেসকে সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামে গ্রামে কাজ করতে হবে। সেই জন্যে কংগ্রেসের যে বেশমত সংগঠন রয়েছে, তাকে "লোক-সেবক-সংঘ" নাম দিয়ে এক নূতন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা উচিত। আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও গান্ধীজী এ সম্পর্কে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের নামে এক চিঠি দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তাঁর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে পারেনি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেস ছিল মত নির্বিশেষে দেশের জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের মিলিত প্রচেষ্টার প্রতীক—একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান—যাকে বলে একটা ন্যাশনাল। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পরে কংগ্রেসের দেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা মানেই হচ্ছে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মতো ক্ষমতা দখলের জন্যে ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। তাই কংগ্রেসকেও তাদের মতোই একটা দল হয়ে উঠতে হবে—সকল মতের মিলিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটা জাতীয় সংস্থা হয়ে থাকা চলবে না। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ কারী প্রত্যেক দলের একটা নিজস্ব আদর্শ ও সেই আদর্শ রূপায়নের উপযোগী একটা নিজস্ব কর্ম-পন্থা থাকে এবং সেই কর্ম-পন্থার ভাল মন্দ বিচার করে জনগণ কোন্ দলকে ভোট দেবে, তা ঠিক করে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন কর্ম-পন্থাকেই সব রাজনৈতিক দল দেশের একমাত্র জাতীয় কর্ম-পন্থা বলে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা,

সকল দলেরই যদি একই কর্মপন্থা হয়, তবে আলাদা আলাদা দলের অস্তিত্বের সার্থকতা বা যৌক্তিকতা থাকে না। কাজেই এ অবস্থায় কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকরী থাকতে পারে না—তাকেও একটা বিশিষ্ট আদর্শ ও একটা বিশিষ্ট কর্ম-পন্থা অবলম্বন করে আর দশটা পার্টির মধ্যে অন্যতম পার্টি হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিয়ে নূতন দল গড়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হ'তে সাহস পেলেন না—হয়তো সমীচীনও মনে করলেন না। কংগ্রেস নাম নিয়ে না দাঁড়িয়ে তাঁরা আর কোন্ নাম নিয়ে দাঁড়াবেন? তাঁরা চোখে অন্ধকার দেখলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা কংগ্রেসকে অব্যাহত রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং কংগ্রেসের নামেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে বলে স্থির করলেন। তদনুসারে তাঁরা—বিশেষ করে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু—কংগ্রেসকে একটা পার্টি হিসেবে গড়ে তুলবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তাঁরা পার্টির আদর্শ ঠিক করলেন "সমবায়মূলক সাধারণ-তন্ত্র" প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের সভ্য হওয়ার প্রতিজ্ঞা পত্রে এই আদর্শের কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হ'লো। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে অবশ্য বলা হয়েছে আমাদের আদর্শ হচ্ছে গণ-তান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র। তার মানে গণতান্ত্রিক পথে সমাজ-তন্ত্র—স্বৈরতান্ত্রিক পথে নয়। অর্থাৎ কমিউনিষ্টরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে স্বৈর-তান্ত্রিক পথ গ্রহণ করে থাকে, সে পথে নয়। যেহেতু আমরা মনে করি, সে পথে প্রকৃত সমাজ-তন্ত্রে পৌঁছানো অসম্ভব। সমবায়মূলক সাধারণ-তন্ত্রে পৌঁছাবার পথ নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক পথ এবং সেই পথই হচ্ছে সমাজ-তন্ত্রে পৌঁছাবার পথ। সেই পথে চলে যদি আমরা এ দেশে সমবায়মূলক সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবেই আমরা অচিরে সমাজ-তন্ত্রে পৌঁছাতে পারবো। তাই আমরা আমাদের আদর্শের কথা নূতন করে বলতে গিয়ে রাজনৈতিক ভাষায় বলেছি—গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র।

রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের নিজস্ব নীতি ও কর্মপন্থা যা-ই স্থিরীকৃত ও গৃহীত হয়ে থাকুক না, জনগণ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে তার নীতি ও কর্মপন্থা বিচার করে নয়—কংগ্রেস বলেই কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে—কংগ্রেসের নামেই ভোট দিয়েছে। এত দিন স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে কংগ্রেসের যে অপরিসীম অবদান, তার ফলে সারা দেশে কংগ্রেস অনন্য-সাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, এবং সেই প্রতিষ্ঠার জন্যেই জনগণ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। কংগ্রেসের আদর্শ কি, নীতি কি, কর্মপন্থা কি, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। জনগণ ৫০ বছর ধরে কংগ্রেসের পতাকা তলে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে—তারা কংগ্রেসকে চেনে—তার প্রতি আস্থা আছে। তাই তারা ভোট যুদ্ধে কংগ্রেসকে জিতিয়ে দিয়েছে। জিতিয়ে দিয়েছে তো এমন ভাবেই জিতিয়ে দিয়েছে যে আর কোনো দল কংগ্রেসের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ও কেন্দ্রে সর্বত্র কংগ্রেস একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা তো লাভ করলোই, অধিকন্তু সে গরিষ্ঠতা এত বেশী যে বিরুদ্ধ দলগুলি সর্বত্র একেবারে শক্তিহীন পঙ্গু হয়ে রইলো। জনগণ এই যে কংগ্রেসকে জিতিয়ে দিয়েছে, শুধু একবার নয়, দুইবার নয়, চারবার পর্যন্ত। তার মানে কংগ্রেস প্রদেশে কেন্দ্রে সর্বত্র প্রায় বিশ বছর ক্ষমতাসীন রয়েছে। এত দীর্ঘদিন একটা পার্টির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার দৃষ্টান্ত গণতন্ত্রের ইতিহাসে নেই—এ একেবারেই অনন্যসাধারণ।

কংগ্রেস এত দীর্ঘদিন ক্ষমতাসীন থাকার ফলটা কি দাঁড়িয়েছে? একদিকে আমাদের দেশ যথেষ্ট লাভবান হয়েছে, অপর দিকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি ও লোকসানের কারণ হয়েছে। কংগ্রেসের তরা-ডুবী হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। দেশ লাভবান হয়েছে এই দিক থেকে যে সদ্য স্বাধীনতা লাভের পরে প্রায় বিশ বছর ধরে দেশে একটা স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট অব্যাহত রয়েছে। তার ফলে দীর্ঘদিন শাসন শৃঙ্খলা অটুট অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়েছে। ইংরেজরা এবং আরো

অনেক দেশের লোকেরা মনে করেছিল যে ইংরেজের শাসন চলে গেলে এ দেশ থেকে শাসন-শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হবে। জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে জনগণের মধ্যে বিভেদ এত বেশী যে এ দেশের লোকেরা কখনো পরস্পরে মিলে মিশে চলতে পারবে না। তার ফলে এদেশে অরাজকতার রাজত্ব হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি জনগণের আস্থা এত বেশী এবং কংগ্রেসের আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে তারা এতটা অভ্যস্ত যে কংগ্রেস-শাসনের আওতায় জনগণ মোটামুটি ভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মিলে মিশেই চলেছে—অরাজকতা ঘটতে দেয়নি। আর একটা লাভ হয়েছে এই যে একই দলের শাসন এত দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকায় তিন তিনটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যে বার বার গভর্নমেন্টের পরিবর্তন হতে থাকলে কোনো পরিকল্পনাই কার্যকরী করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তিন তিনটা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়ার ফলটা যে কি দাঁড়িয়েছে, এ প্রশ্নের জবাবে নিশ্চয়ই এ কথা বলা যায় যে নবভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়েছে। যে কোনো নিরপেক্ষ পরিদর্শক যে এ কথা সানন্দে স্বীকার করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এত দিন পর্যন্ত আমরা নব সৃষ্টির প্রসব বেদনার দুর্ভোগটাই শুধু ভুগেছি—সুফল লাভের দিন এখনো আসেনি। অন্ততঃ পাঁচটা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা পূর্ণ হলে তবেই সুফল ভোগ করবার দিন আসবে।

পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের শাসন-কর্তৃত্ব এত দীর্ঘ দিন অব্যাহত থাকার ফলে দেশের পক্ষে আর একটা সুফল ফলেছে অতি অল্প দিনের মধ্যে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন। এ ব্যাপারে অবশ্য পণ্ডিত জওহরলালের নিজস্ব কৃতিত্ব যে অপরিসীম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা হিসেবে দীর্ঘ দিন ধরে যদি পণ্ডিত জওহরলালের পিছনে সমগ্র দেশের অকুণ্ঠ সমর্থন অটুট না থাকতো, তবে এত অল্প দিনের মধ্যে ভারতের এই অনন্যসাধারণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ যে সম্ভবপর হতো না, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এত দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমতাসনে থাকার ফলে প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেসের যে কি বিষম ক্ষতি হয়েছে, তা বলবার নয়। কংগ্রেস এতদিন পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তির আয় থেকে নবাবী করেছে—স্বাধীন দেশের উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি—অযোগ্য নবাব পুত্রের দুষ্কার্যের দুর্নামই শুধু অর্জন করেছে। প্রথমতঃ কংগ্রেস পূর্বের মতো আজো বিভিন্ন মতবাদের মিলিত প্রতিষ্ঠানই রয়ে গিয়েছে—একটা পার্টি হয়ে উঠতে পারে নি। অতীত গৌরবের উত্তরাধিকারী হিসাবে কংগ্রেস নির্বাচনে ভোট পায় বলে কংগ্রেসের পক্ষে তার নীতি বা কর্মপন্থা সম্বন্ধে জন-গণকে ওয়াকিবহাল করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। এমনকি সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরাও এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল ও তাঁর দুচার জন পার্ষদের ছাড়া অন্যান্যরা যে কংগ্রেস দলের এই নূতন আদর্শ কতটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ আজকের দিনে প্রকাশ্যে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা চলছে, তাতে আমার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে। এ সম্বন্ধে এই যে আমাদের অবস্থা, অর্থাৎ কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে কংগ্রেস-কর্মীদের অজ্ঞতা, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে—কার্যক্ষেত্রে এপর্যন্ত তার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি। ক্ষমতা লাভের রাজনীতি হচ্ছে প্রধানতঃ ভোটের রাজনীতি। সেই ভোট যখন কংগ্রেসের নামের জোরেই পাওয়া যায়, তখন আর কংগ্রেসের নীতি বা কর্মপন্থা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? সমবায়মূলক সাধারণ-তন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র—এই কথাগুলির মানে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেস-কর্মীরা কি বোঝেন, তা নিজেরা মনে মনে ভেবে দেখবেন।

দ্বিতীয়তঃ কোনো দল দীর্ঘ দিন ক্ষমতাসীন থাকলে, সে দলের যে কি অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে পূর্বের

আলোচনায় যে সব কথা বলেছি, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তার প্রত্যেকটা কথাই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেকার কংগ্রেস দলকে প্রযোজ্য। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই এমন ভাবে ক্ষমতার মোহে ও ক্ষমতার মত্ততায় পেয়ে বসেছিল যে, আমরা জন-সাধারণের সঙ্গেও আচারে-ব্যবহারে অনেকটা বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলাম। তার ফলে যা হবার, তা-ই হয়েছে। ফলে তাহন লাগা সত্ত্বেও আমরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি নি। তা ছাড়া, দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি, তাদের নিজেদের মধ্যে বহু বিষয়ে তীব্র মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যে তারা কংগ্রেসকে ক্ষমতার আসন থেকে নামিয়ে দেবার কাজে সকলে মিলে একতা-বদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো, কংগ্রেসের পক্ষে এ অবস্থা একটা অভিনব গুরুতর অবস্থা। কিন্তু আমরা এ বিষয়েও কিছু মাত্র হুঁসিয়ার হইনি। তার কারণ, আমরা সর্ব্বদাই মনে এই কথাই মনে করেছি যে কোটবুদ্ধে আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করা কোনো দলের পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিশেষ কোনো অযোগ্যতার ফলেই যে এরূপ হয়েছে, আমি সে কথা বলিনে। যে হেতু সে কথা ঠিক না-ও হতে পারে। আমি এ কথাই বলি যে এরূপ অবস্থায় পড়লে, অর্থাৎ দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে যে-কোনো দলের এরূপ অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বর্ত্তমান কংগ্রেসে আজকের দিনের পক্ষে অযোগ্য নেতাও থাকতে পারে। কংগ্রেস এখনো একটা সুসঙ্ঘবদ্ধ পার্টি হয়ে ওঠেনি বলে বিভিন্ন মতবাদের লোক এখনো কংগ্রেসে জাঁকিয়ে বসে আছে। যে নেতা মুখে সমাজ-তন্ত্রবাদের কথা বলেন, কিন্তু মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করেন না, তিনি নিশ্চয়ই আজকের দিনে কংগ্রেসের নেতা হওয়ার অযোগ্য। এ ছাড়া অন্য রকমের অযোগ্যতাও থাকতে পারে। আজকের দিনে কংগ্রেস যখন আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নয়, আমি মনে করি, অযোগ্য নেতা কাজ-কর্ম্মের ভিতর দিয়েই ধরা পড়ে যাবে এবং তার ফলে সরে যেতে বাধ্য হবে।

গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে ও কেন্দ্রে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে অন্যান্য বারের মতো এবারেও এক দলের অর্থাৎ কংগ্রেস দলের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশ ছাড়া অপর সাতটি প্রদেশে কোনো দলই একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেনি। তার ফলে এই প্রদেশ গুলিতে বহু দলের মিলিত মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হয়েছে। এ কথা বলা যায় যে সাতটি প্রদেশে অন্তত জনগণ এক দলের শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেই জন্যেই এই সাতটি প্রদেশে তারা কোনো দলকেই এমন ভাবে জিতিয়ে দেয়নি যে কোনো দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। দুনিয়ার বিভিন্ন গণ-তন্ত্রে এই দুই রকমের শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত দেখা যায়—একটা দলের শাসন কিংবা একাধিক দলের সম্মিলিত মন্ত্রী-পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত শাসন। বর্ত্তমানে অবস্থার চাপে ও প্রয়োজনের তাগিদে ভারতের বিভিন্ন স্থানে উভয় প্রকারে গণ-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে কোন্ ব্যবস্থাটা চলবে কিংবা দুটাই চলবে কিনা, বর্ত্তমানে তার পরীক্ষা চলছে। ফলটা নির্ণয় করবে এই সম্মিলিত মন্ত্রী-পরিষদ কতদিন এক সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারবে এবং কতটা জন-প্রিয়তা রক্ষা করতে পারবে, তার উপরে।

যদি দেখাদিন এদের শাসন জন-প্রিয়তা রক্ষা করতে পারে, তবে কংগ্রেসকেও হয়তো কোন জায়গায় সঙ্কট-জনক পরিস্থিতি দেখা দিলে কোনো না কোনো সম্মিলিত মন্ত্রী-পরিষদে যোগ দেবার কথা চিন্তা করতে হবে। যদি দেখা যায় যে কোথাও এমন অবস্থা হয়েছে যে কংগ্রেস ছাড়া সেখানে মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করা যায় না এবং জন সাধারণের দিক থেকেও কংগ্রেসের মন্ত্রী-পরিষদে যোগ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তাগিদ রয়েছে, তখন হয়তো কংগ্রেসের সম্মিলিত মন্ত্রী পরিষদে যোগ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কংগ্রেস যে এতদিন একচ্ছত্র শাসন কর্তৃত্ব চালাবার পরে সহজে ও-পথে পা বাড়াবে না—সর্ব্বত্র আবার একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভের জন্যেই যে চেষ্টা করতে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে

উপরে লিখিত অবস্থায় যদি কংগ্রেসকে কখনো পড়তে হয়, তবে হয়তো কংগ্রেস সম্মিলিত মন্ত্রী-পরিষদে যোগ দিতে বাধ্য হবে।

তাই ভারতবর্ষে সম্মিলিত মন্ত্রী-পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হতে চলেছে কি না, তা এখনই সঠিক নির্ণয় করা সম্ভবপর না হলেও ইঙ্গিত সে দিকেই বটে।

পরিশেষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে চাই। আমাদের আজ বিগত দিনের পুরোধো প্রতিষ্ঠা ও অবদানের উপরে নির্ভর করা চলবে না। স্বাধীন দেশের গণ-তান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক দল হিসেবে যথা যোগ্য স্থান লাভ করতে হলে কংগ্রেসকে আর platform হিসেবে থাকলে চলবে না এক-মতাবলম্বী সুসংবদ্ধ পার্টি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে—প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। পার্টির মত, পথ, কর্মসূচী ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি কংগ্রেস দলভুক্ত ব্যক্তির পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে হবে। দলের কাজ-কর্ম—দলের সংগঠন সম্পূর্ণ গণ-তন্ত্র সম্মত পথে চালাতে হবে। সর্বোপরি প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীকে কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। সকলকে বুঝতে হবে—সমবায় সাধারণ তন্ত্রের পথে গণ-তান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ আমরা গ্রহণ করেছি, সে আদর্শ আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আদর্শ—বুঝতে হবে, এই আদর্শের পথটাই হচ্ছে হাই-ড্রোজেন বোমার নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে দুনিয়ার বাঁচবার একমাত্র পথ। তাই আমাদের আদর্শ হচ্ছে দুনিয়াকে বাঁচাবার আদর্শ—মনুষ্য জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার আদর্শ এবং দুনিয়ার একমাত্র আমরাই এ আদর্শের ধারক ও বাহক। এর চেয়ে বড় আদর্শ আর কি হতে পারে?

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি

॥ শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ॥

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব সমাজতত্ত্বেরই একটি অংশ। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব একটি পৃথক বিষয় হিসাবে গুরুত্বলাভ করেছে। এই বিষয়টির ধীরে ধীরে গুরুত্বলাভের সম্পর্কে কয়েকজন পণ্ডিতের নাম করা যেতে পারে। তাঁরা হচ্ছেন জর্জ পেন (George Payne), জন ডিউই (John Dewey), ডেভিড্ সেডিন (David Suedden), সি. সি. পিটার্স (C. C. Peters), ফ্রেডরিক ই. বোলটন (Fredric E. Bolton), লয়েড এলেন কুক (Lloyed Allen Cook), এলিসন ডেভিস্ (Allison Davis), ডলার্ড (Dollard), ডার্কহাইম (Durkheim), ম্যাক্স ওয়েবার (Max Waver), কার্ল মানহিম (Carl Manhim), স্যার ফ্রেড ক্লার্ক (Sir Fred Clarke) অটওয়ে (Attoway) ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে দু'জনের নাম শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রসিদ্ধ কারণ তাঁরাই শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের প্রসারক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ই. জর্জ পেন (E, George Payne) এবং জন ডিউই (John Dewey).

সমাজতত্ত্বের জনক বলা হয় Comte-কে, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের জনক হচ্ছেন জর্জ পেন। তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করে বলেছেন যে শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সমাজতত্ত্বের নীতি ও সংগৃহীত সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিংবা ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়

তাহলে তা ভাল করে বুঝতে পারা যাবে যদি ব্যক্তির উপর সমাজের বিভিন্ন শক্তির প্রয়োগ বুঝতে পারা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সামাজিক পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ওপরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ভর করে থাকে। তিনি শিক্ষাপ্রধান সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন, Educational Sociology সম্বন্ধে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং ১৯২৮ খৃঃ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক "The principle of Educational Sociology" নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি দলগত জীবনের ওপর শিক্ষার প্রভাব এবং শিক্ষার ওপর দলগত জীবনের প্রভাব সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন শিক্ষা এক প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে কি করে সামাজিক দোষত্রুটি পরিহার করতে সক্ষম হয়, সন্তোষজনক ও অভিপ্রেত প্রতিষ্ঠানসমূহকে রক্ষা করতে পারে এবং সমাজকে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিক জন ডিউই সমাজতত্ত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার পরিণতি হিসেবে তিনি "The School and Society" এবং "Democracy and Educatien" নামে দুটি পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার দুটি দিক বর্তমান। একটি হচ্ছে মনস্তত্ত্বের দিক, অপরটি হচ্ছে সমাজ-তত্ত্বের দিক। তিনি প্রকৃতপক্ষে সমাজতত্ত্বের দিকের ওপরেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "All Educations proceeds by the participation of the Individual in the Social Cousciousness of the race"। বস্তুতঃ পক্ষে শিক্ষা দানা বেঁধে উঠতে পারে যদি শিক্ষার্থীরা পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন করে ও শিক্ষালাভ করে। ডিউই বলেছেন যে শিশু যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করে, সেই সম্প্রদায়ই শিশুর কর্মপ্রেরণা যোগাবে। তিনি শিক্ষায় সামাজিক ধর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিদ্যালয়ে তিনি একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশ রচনা করে সেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে বলেছেন। বিদ্যালয়ের বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে বলে জন ডিউই বিশ্বাস করতেন।

ভারতের অতীত ও মধ্যযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষার ও সমাজের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগ দৃষ্ট হয়। শিক্ষা সমাজের চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু ঐরূপ অবস্থা বৃটিশ যুগে দেখা যায় নি। শিক্ষাকে ঐ যুগে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছু আগে থেকেই গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাকে সমাজভিত্তিক করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে নীরব সমাজ-বিপ্লব সাধন করতে অগ্রসর হন। সমাজ যেমন শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সেভাবে শিক্ষাও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে তিনি শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে শ্রেণীহীন শাসন ও শোষণহীন সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে-শিক্ষা সমাজের পুষ্টিসাধন করতে সক্ষম নয় সে-শিক্ষা নিরর্থক শিক্ষা।

কে. জি. সাইদাইন (K. G. Saiidain) শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবেশ ও সমাজকে উপেক্ষা করে শিক্ষার কাজ অগ্রসর হয় তা নিরর্থক ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা। ঐ শিক্ষাদ্বারা সমাজের কোন উপকার সাধিত হতে পারে না। অতএব কোন শিক্ষা-পরিকল্পনা করতে হলে গতিশীল সমাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তা করতে হবে।

আমরা এ পর্যন্ত শিক্ষাপ্রধী সমাজতত্ত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমরা এখন শিক্ষা-প্রধী সমাজতত্ত্বের অর্থ ও তার ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ব্রাউন (Brown)-এর মতানুযায়ী ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং সামাজিক দল ও তাদের আচার আচরণের সঙ্গে অর্থাৎ কৃষ্টিমূলক পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক

জীবনদেবতা শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

যে-ভারতবর্ষ একদিন বিশ্বকে, বস্তু-জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে অত্যন্ত নিপুণ ছিল, যে-ভারতবর্ষে শত শত হাজার হাজার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্ববস্তুর উর্দ্ধে উঠে জীবনযাপন করে গেছেন, আজও যে-ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে বিশ্বকে তুচ্ছ করতে পারেন—এই জড় জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—এমন অনেক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে, সে-ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের বাস্তব জীবন এমন গভীর ভাবে স্বার্থ আর বিদ্বেষে আচ্ছন্ন কেন? আজ ভারতবর্ষের—বাংলাদেশের—রাজনৈতিক সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবনের যে কোন দিকে তাকালে কি চেনা যাবে যে এই ভারতবর্ষই সেই সব মহাপুরুষদের উত্তরাধিকারী? সেই সব মহান ব্যক্তিত্বগুলি কি তাঁদের কোন প্রভাবই রেখে যেতে পারেননি ভারতবর্ষের সর্ব সাধারণের বাস্তব আগ্রহ জীবনে?

কেন এমন হল?

এমন হয়েছে প্রতিক্রিয়ায়। যে-বস্তু-জগৎকে মিথ্যা বলেছি, মায়া কুহকিনী বলেছি, ঘৃণা করেছি, তাকে তার উপযুক্ত সম্মান মর্যাদা দেই নি—প্রতিক্রিয়ায় সে আজ অতিমূল্য ঘাড় ধরে আদায় করে নিচ্ছে, এজন্য আজ ভারতবর্ষে প্রবল জড়বাদের হাতে আচ্ছন্ন হয়ে তার যত বিকৃতিরই থাবক বাহক হয়ে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে বের হবার পথ করে নেবার মত অবস্থাও আজ সে হারিয়েছে। তত্ত্ব ভারতবর্ষের অনেক ছিল, কিন্তু যে চিন্তা ও জীবনগুলি জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে জীবনের বাইরে তত্ত্বকে লাভ করবার প্রেরণায় সারা জীবন ছুটেছে, বাস্তব জীবনটাকে কি ভাবে চালালে তার জন্য ভাবনা ছিল না—তত্ত্ব-জীবন আর বাস্তব জীবন মেলে কি না তাও বেবে দেখেনি, সেই চিন্তা ও আচরণের পথে ভারতবর্ষ বর্তমান দুর্গতিতে নেমে গেছে। অনেক মহাপুরুষদের প্রভাব তার বাস্তব জীবনকে পবিত্রতর করতে এই জন্যই পারেনি।

শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের পরম দেবতা—যে কোন মানুষই তাঁকে একটা বিশেষ স্থান দান করে থাকেন। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ ভারতবাসীর আগ্রহ জীবনে কতটুকু স্থান জুড়ে আছেন? কিছুই না। তিনিও শুধু আধ্যাত্মিক দেবতা—তাঁর নামজপ খুব ঘটা করে হয়ে থাকে, খুব ধুমধামে পূজা উৎসব কীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক কিছুই হয়ে থাকে—কিংবা আর কিছু না হোক ঘরের কোণে পুতুলের মত জামাকাপড় পরে তিনি বসে থাকেন—অর্থাৎ বড় করেই হোক, কিংবা ছোট করেই হোক—তিনি শুধু আধ্যাত্মিক দেবতা, পুতুল দেবতা। তিনি কি আগ্রহ? আমাদের আগ্রহ জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র সমস্যা সমাধানে তাঁর কি কোন অবদান আছে? নেই, সত্যিই নেই। অতীত কালে ভারতবর্ষে যত মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই জন্মগ্রহণ করুন না কেন তাঁদের প্রত্যেককেই আত্মিক মুক্তিদাতা হিসেবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, এমনকি গতিধর্মের প্রবর্তক মানব-দরদী বুদ্ধদেবকেও একমাত্র আধ্যাত্মিক দেবতা করে ফেলা হয়েছে যতটুকু স্থানই এই ভারতবর্ষে তাঁর থাকুক না কেন। ভিক্ষায়ে জীবন যাপন করে প্রব্রজ্যা পথের পথিক হবার মুখর করা যে-বুলি ভারতবর্ষের রক্তের মধ্যে, সেই বুলি পরম বিজ্ঞের মত আওড়াচ্ছিলেন বলে বিষাদযুক্ত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কত রকম করেই ধমক দিয়ে 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' 'ত্যজোত্তিষ্ঠ' প্রভৃতি কত যে-সব কথা বলেছিলেন, ভারতবর্ষ ঠিক সেগুলিকে তার তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার চিবন্তন খাতেই ভাস্ত করে হাজার হাজার বছর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে সেই এক জায়গাতেই দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁকে

পুতুলদেবতা করে রেখেছে। এই হাজার হাজার বছরের শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো বহু পুতুল-দেবতা-পূজার ঐতিহ্যিক ভারতীয় জীবন-চেতনাকে বদলে এইসব ব্যক্তিত্বগুলি যে পুতুল-দেবতা নয়, তাঁরা যে আমাদের বাস্তব জীবন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম, আধ্যাত্মিকতা বলতে যে বীর্যহীন বৈরাগ্যকেই বুঝায় না যেখানে বাস্তব জীবনই সর্বতোভাবে অনুপস্থিত, সেই সবকথা আজকের দিনের ভাষায় বলতে এলেন আজ থেকে ১১৩ বৎসর আগে সমন্বয়-মূর্তি ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব। বর্তমান যুগের সাধ্য এমন সামগ্রিক জীবন-চেতনার কথা নিয়ে এসেছেন বলেই শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'টাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব'। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে অর্থে সেখানে ঐশ্বর্য বীর্য যশ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্য একই সঙ্গে সম্ভব ও সত্য। আজকের দিনে শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীকৃষ্ণের এই সামগ্রিক সমন্বয়-তত্ত্ব সর্ব মানুষের—সে শুধু ভারতবাসীর নয়—সামনে তুলে ধরতে এসেছেন। প্রত্যেক মানুষ এইভাবে বীর্যবান বৈরাগ্যবান জ্ঞানবান হওয়ার সাধনা করলে সে পথে যে ঐশ্বর্য যশ ও শ্রী-র সন্ধান মেলে তাই-ই ভাগবতী শ্রী—অন্যথা জ্ঞান ও বৈরাগ্যহীন ঐশ্বর্য বা বীর্যের শক্তি-মদে মানুষ নিজেরই শক্তির অধীন হয়ে পড়ে যেখানে ব্যক্তিগত বা সামগ্রিক কোন কল্যাণই নেই।

জাগ্রত জীবনের মানদণ্ডে আজ আদর্শকে স্থির করতে হবে—জাগ্রত জীবনকে মারার ক্ষেত্র বলে ছোট মনে করি বলেই সেখানের সমস্যা সমাধানের জন্যে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই না আমরা। তাই ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণ এবং আরও অনেককে আধ্যাত্মিক পুতুল-দেবতা করে পূজা করলেও বর্তমান জাগ্রত জীবন-সমস্যা সমাধানের জন্য বহির্ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের শরণাপন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে এমন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সে সব বহির্ভারতীয় চিন্তাবিদেরা একটা এটিথেসিস আজ জোরের সঙ্গে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু সিন্থেসিস্—সমন্বয়ধর্মী সামগ্রিক জীবন-চেতনা—তাঁদের সেই এটিথেসিসে নেই। তাই চিরন্তন দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব নিয়ে সে চিন্তাধারা কোন স্থায়ী কল্যাণ বা শান্তি আনন্দের অধিকারী নয়। বাস্তব জীবনটাকে যতখানি অগ্রাহ্য বা মূল্যহীন বলে ভারতবর্ষের তথাকথিত অধ্যাত্মবাদ একদিন ঘোষণা করেছিল ততখানি শক্তিহীন অসত্য দেহধারী জীবের পক্ষে সে নয়—এটা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান সাক্ষ্য দেবে—সত্যকে স্বীকার করবার দৃষ্টি থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমার জীবনকে যদি শুধু বস্তুগতই করি—বস্তু-বিশেষকে ছাড়িয়ে যাবার মত চিৎ শক্তি যদি বস্তুরই অন্তরে নিহিত না থাকে বলে জানি ও মানি, তাহলে আসক্তি বিদ্বেষের অন্তহীন শ্রেণীবন্ধে কোনদিন বাস্তব জীবনে কল্যাণের শান্তি ও আনন্দকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এই তত্ত্ব তাঁর জীবন দিয়ে রেখে গেছেন। সামগ্রিকতার অখণ্ডত্ব তাঁর জীবনে ছিল বলেই তাঁকে এক একজনে এক এক রকম করে দেখতে পেয়েছিলেন, আবার সামগ্রিক ভাবেও পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব-বোধের একজন হয়েও কারো কারো কাছে তিনি আত্ম প্রকাশ করেছেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর এই সামগ্রিক দিকটিকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়—'আমার চোখের সামনে তুমি 'মানুষ' রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছ তোমার দার্শনিক প্রতিভা লইয়া, তোমার করুণা ও কারুণ্য লইয়া, তোমার রৌদ্র তেজ ও দীপ্তি লইয়া'।

এই তত্ত্বকে জীবনে অধিগত করলে মানুষ কত সুন্দর হতে পারে, সর্ব মানুষের কাছেই তার কী যে একটা মোহময় রূপ ফুটে ওঠে—তার দৃষ্টান্ত সেই পাঁচ হাজার আগেকার বৎসরের মানুষটী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার সেই প্রাণ-ভোলানো শ্রীমন্মহাপ্রভু, আবার এই একশ তের বৎসর আগেকার শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল। এই মোহময় রূপের মধ্যে মানুষের প্রতি, বস্তু-জগতের প্রতি আসক্তিও নেই, বিদ্বেষও নেই—আছে একটা গভীর প্রেম। এ প্রেম এমন জিনিষ যা বস্তুর রসাস্বাদনচতুরতার সঙ্গে বস্তুকে ছাড়িয়ে যাবার শক্তি একই সঙ্গে প্রদান করে, যা বস্তুকে ভোগ করে

না, ভজনা করে। তাই ব্রজগোপীরা তাঁকে পরম আপন জন জেনেও তিনি যে অখিলাত্মার আত্মা এ কথাটী উপলব্ধি করতে ও তা আচরণ করতে পেরেছিলেন, তাই পরম প্রেমিক মহাপ্রভু আবেগেনগত প্রয়োজনে ঘরবাড়ী ছেড়ে গেলেও স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কগুলিকে কত সম্মানই দিয়ে গিয়েছিলেন, তাই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবনের বহু সময় সমাধি—নির্বিকল্প সমাধি—তে কেটে গেলেও বস্তু-জগতের খুঁটিনাটিতে অনন্যসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে তিনি বিচরণ করতে পারতেন। কোন কিছুরই প্রতি আসক্তি বা বিদ্বেষ কোনটাই ছিল না বলেই তাঁরা এত সুন্দর ছিলেন। আরও সুন্দর হয়ে ছিলেন তাঁরা এজন্য যে তাঁরা সর্ব মানুষকে, সর্ব কিছুকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। কোন মানুষকে কিংবা কোন বস্তুকেই কিন্তু তাঁরা দয়া করতেন না, ছোট বলে হীন বলে জেনে তাদের করুণা দেখাতেন না—প্রত্যেক ছোট বা সামান্যও যে তার ছোটত্ব বা সামান্যত্ব সত্ত্বেও নিজের মধ্যে একটা পূর্ণত্ব নিয়ে অনন্য—এই তত্ত্বটা স্বীকার করতেন বলেই মানুষকে বা বস্তুকে তাঁরা যে দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করতেন তা যাকে বলে 'দয়া করা' তা নয়—তাতে ছিল হৃদয়ের স্বীকৃতি, যা বলতে চায়—'তুমি যাই হও, যত ছোট বা সামান্যই হও, তোমাকে আমার সত্তা পেতে চায়, পেয়ে খুশী হতে চায়—আমার মধ্যে তোমার জন্য এই যে প্রয়োজন-বোধ এই প্রয়োজন-বোধই প্রমাণ করে ছোট হলেও তোমার নিজের মধ্যে তোমার একটি স্বয়ংপূর্ণতা আছে যা'ই তোমাকে এ বিশ্বে অনন্য করেছে'। হৃদয়ের যা সকল সত্তার এই প্রয়োজনবোধের এই স্বীকৃতি দিতে বুদ্ধিমান মানুষ পারে না—কিন্তু যারা পুরুষোত্তম, ছোটর মধ্যেও যে ব্রহ্মের প্রকাশের একটা পূর্ণতা আছে, সেইটে তারা হৃদয় দিয়ে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের এই অনন্যসাধারণ একটা দিকের খোঁজ দিয়ে যান। এইজন্য শ্রীনিত্যগোপাল লিখলেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ'...; শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ লিখলেন, পূর্ণ মানে এ নয় যে তার বাইরে কিছু নেই, পূর্ণ মানে complete in itself—নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ। অথচ সামগ্রিক কল্যাণ-বোধই তাঁদের প্রজ্ঞার সাধারণ মানদণ্ড বলে তাঁদের ছোটদের সে স্বীকৃতিতে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা, কোন ছন্দহীনতা থাকে না। বহির্ভারতীয় অত্যাধুনিক চিন্তাধারায় ছোটর মূল্য স্বীকৃতির যে পথ, আগেই বলেছি তা পুরুষোত্তম-প্রজ্ঞা-মিশ্রিত হৃদয়বানের রস-মিশ্রিত নয়—তাই তা মানবিক স্তরকে কোনদিনই পিছনে ফেলে এগিয়ে আসতে পারছে না, পারবেও না। অবতার-জীবনে এই যে ছোটর স্বীকৃতি, অকৃতিজনেরও ব্রহ্ম-মূল্য-আস্বাদনের এই যে হৃদয়ের পথ—সেই হৃদয়ের পথে, সেই সামগ্রিকতার আস্বাদনের পথে বর্তমান যুগ-চিন্তাধারা চালনা করিয়ে দেবার জন্যই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আবির্ভাব। এই পথে যেদিন গণ-জাগরণের ও গণ-জীবনের বিবর্তিত রূপের প্রকাশ ঘটবে সেইদিন ভারতবাসীর বাস্তব জীবন সুন্দর হবে—বর্তমান স্বার্থ ও লোভের ক্লেদপঙ্ক থেকে খানিকটা সুন্দরতর জীবনের সুস্থির বাতাসে ভারতবাসী মুক্তি ও আনন্দের স্বচ্ছতা লাভ করবে। বহির্ভারতীয় সত্যভাব বিশ্বও কাটবে এই পথেই। সেদিন আসবে যেদিন কৃষ্ণ গৌর আর নিত্যগোপাল আর পুতুল-দেবতা ঘরে ঘরে ঘরে ঠাকুর-ঘরের শোভাবর্ধন না করে আমাদের বাস্তব জীবন-সমস্যার সমাধানের পথ-প্রদর্শক হবেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের এইজন্যই অবতরণ—নইলে বহু-দেবতা-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে আর দেবতার ভিড় বাড়ানর প্রয়োজন তাঁর ছিল না। শ্রীনিত্যগোপাল ব্যক্তিগত মুক্তি-বোধকে শুধু সমষ্টিগত করেছেন তা-ই নয়—এ মুক্তি সমাধির স্তরে, বেহুঁসের স্তরে, সকল কিছু নিবৃত্তির স্তরে নয়—সকল কিছুর আগরণের স্তরে। ভগবানের দেওয়া এ দেহের সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি জাগ্রত থাকবে—যে যার কাজ হুঁস রেখে করবে অথচ কেউ মাত্রাহীন হয়ে পড়ে নিজের অধিকার ও সীমা-বোধকে যেমন লঙ্ঘন করবে না, তেমনি অপরের অধিকার ও সীমাকেও মর্যাদা দিয়ে চলবে—অনাঘাদিতপূর্ব এই

অন্তর খোঁজ দেওয়াতেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের প্রয়োজন।

আমরা তথাকথিত ভক্তেরা কৃষ্ণের গৌরের নিত্য-গোপালের তথাকথিত মধুর রূপটাকেই দেখেছি, কিন্তু তাঁরাই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জন করতে পারতেন, তাঁদের দামগ্রিক জীবনের এ দিকটা দেখি নি। কৃষ্ণ দুর্যোধন সদৃশ লোকদের অন্যায়কে সহ্য করে তো চুপ করে ধ্যানে বসেন নি, গৌর তো কাজির অবরদস্তিকে মুখ বুজে নিয়ে ঘরে বসে কৃষ্ণ নাম নেন নি, নিত্যগোপাল আবার আভিজাত্যের, সামাজিক কৌলীন্যের বা রাষ্ট্রীয় অধীনতার কোন অত্যাচারকেই নীরবে মেনে নেন নি। তাই তাঁর জীবন-দর্শনে কারো প্রভাবে কারো অস্তিত্ব নেই। এইখানে দাঁড়িয়েই শ্রীনিত্য-গোপাল লিখলেন তাঁর সর্ব সমন্বয়ের বাণী—'নিত্য অনিত্য সমন্বয়। আত্মা অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়।···জড় অজড় সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালকে সম্বোধন করে লিখছেন, 'তুমি সর্ব দর্শন, সর্ব জাতি, সর্ব বৃত্তি সমন্বয়ের কি অদ্ভুত বারতা শুনাইয়া গিয়াছ। ইহাই তো বর্তমান যুগ-সমস্যা। যুগ-সমস্যা যিনি সমাধান করিতে পারেন, তিনিই যুগের ভগবান। আমার কাছে তুমি তো তাই'।

সর্ব সমন্বয়বাদী শ্রীনিত্যগোপাল অবধূত। অবধূতের লক্ষণ তিনি দিচ্ছেন 'অবধূত যোগীর ন্যায় যোগনিয়মের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগ-পরায়ণও নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন, বীরের ন্যায় বলপ্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নহেন, তপজপাদি মন্ত্রসাধকও নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণবও নহেন, তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়ম নিষেধের অনুবর্তী বা বিদ্বেষী নহেন। তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন'। অত্যন্ত কঠিন কথা হল! অত্যন্ত সহজ বলেই অত্যন্ত কঠিন। কোন কিছুতে তিনি একান্ত নন—এ অতি কঠিন অবস্থা—অথচ তিনি নিরানন্দময় নির্জীব নিষ্ক্রিয়বাদীও নন—তিনি পরম আনন্দ স্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য! পরম আনন্দিত হওয়া যে কত কঠিন তা তো সকলেরই জানা আছে। কোন কিছুতে একান্ত না হয়েও সব কিছুতে আনন্দিত হওয়া সত্যিই খুব কঠিন। শ্রীনিত্যগোপাল তা পেরেছেন। সমাধিতেও তিনি আনন্দিত, বুথানেও তিনি আনন্দিত। সমাধিতেও তিনি পটু, বুথানেও তিনি নিপুণ। চারদিকে দুর্যোগ—দুর্যোগ নানা রকমের—অহীনতা আর আদর্শহীনতার মাত্রাহীন দৌরাত্ম্যে 'আমি আনন্দিত' একথা বলার শক্তি কয় জনের আছে? সমস্ত দুর্যোগের মধ্যে থেকেও নিষ্ক্রিয়বাদের বীর্যহীনতা কিংবা সংসার বা বাস্তবকে মিথ্যা বলার ভীরুতা থেকে যিনি মুক্ত ছিলেন, সেই নিত্যগোপাল পরম আনন্দস্বরূপ বিরাজ করে গেছেন। নিন্দা দুঃখ অপমানেও তিনি আনন্দিত থাকতে পারেন, আনন্দিত করতে পারেন। কোন কৌলীন্যবোধ বা হীনতা-বোধের কোন কমপ্লেক্স তাঁতে ছিল না। আজকের দিনে এ বড় দুর্লভ বস্তু। তাঁর পদানুসারী হতে পারলে তাঁর এমন আনন্দের খোঁজ আমরাও নিশ্চয় পাব।

শ্রীনিত্যগোপাল চিরন্তন বিপ্লবের কথা বলেছেন কিন্তু সে বিপ্লব বলতে উচ্ছৃঙ্খলতাই শুধু বুঝাননা, গোলমালের সৃষ্টি করে দেওয়াই সেখানে উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে যেমন প্রতি মুহূর্তে একটা ধ্বংস একটা ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সৃষ্টিও হয়ে চলেছে—যারই জন্য এর রূপ রস অনুরান—তেমনি মনুষ্য-সৃষ্ট কালচার বা সভ্যতা, তা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয়ই, -র মধ্যেও যাতে কালের পরিণামে জঞ্জাল না জমে, সৃষ্টিকে রক্ষা করতে তামসিকতা যেমন দরকার অথচ সে তামসিকতার মাত্রা জানা না থাকলে সেই-ই আবার সৃষ্টির ধ্বংসের কারণ হয়, সেজন্য সেই তামসিকতা থেকে আত্মরক্ষা করতে প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকতে হয়, জীবনের গতিকে অটুট রাখতে হয় স্থিতিকে না হারিয়ে ফেলে—এগুলি সবই বলেছেন শ্রীনিত্যগোপাল।

এগুলিই তো বিপ্লবের কথা। কিন্তু এ তো শুধু ধ্বংস নয়—এ বিপ্লবে বিনিময়ে গড়ার অন্তরাল জমতে না দিয়েও এক নিত্য নূতন সংগঠনের অনুরাগ প্রাণ-স্রোতকে নিত্যগোপাল বইয়ে দিতে এসেছিলেন। এ সাধন-পথে 'আবেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া চলিবার কথা হয়। আবেষ্টন যেন পাইয়া না বসে। অথচ আবেষ্টন আত্মারই মত তুল্য সত্য। আবেষ্টনকে সার্থক পরিণাম করিলে সে আগাইয়া দিবার জন্য নূতন আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া লয়। আবেষ্টনের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ক্লাশের বইগুলিও তো ছাত্রদের আবেষ্টন। ঐ বইগুলির মধ্যে রহিয়াছে আগাইয়া যাইবার সূত্র নিহিত। এই বিষয়টাই তো বিস্ময়কর। কোথায় শয়তান? কোথায় মায়া জাল? চতুর্দিকে প্রতি বস্তুর বুকে ছড়ানো রহিয়াছে জ্ঞান ও আনন্দ। যে কুশলী সে জ্ঞানানন্দই সংগ্রহ করে 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্যা ধীরঃ'—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ।

এই পথে যাওয়া বাংলা দেশের বুকেই এমন একজন ছিলেন, যিনি আমাদের বাস্তব জীবনের মানুষে মানুষে সম্পর্কজনিত সর্ববিধ সমস্যার দিক্ দর্শন করতে পারেন, যিনি সামাজিক জীবনের অসাম্য ঘুচাবার দর্শন দিয়ে গেছেন, আচরণও করে গেছেন, এতদিনের উচ্চাবচের সামাজিক কাঠামো যা আজ ভেঙে গেছে বহির্ভারতীয় চিন্তাধারার সংঘাতে, তা যে ভেঙে যাওয়া উচিত যিনি তা বলেছিলেন প্রায় আশী বৎসর আগে এবং সেখানে কোন্ কাঠামোর উপরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, সে-ই বা হবে তাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার মূল ভিত্তি এসবই যিনি রেখে গিয়েছিলেন, আমরা আজ যেগুলি অনুধাবন করে আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থাদি সমস্যাগুলিকে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় দিক থেকেই সমাধান করতে পারি—এই সেই শ্রীনিত্যগোপাল এই আমাদের অত্যন্ত কাছে, আমাদেরই বাংলাদেশের ঘরের কোণে ছিলেন—এ কথা ভেবে অপরিমিত আনন্দ হচ্ছে, ভরসা হচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে তাঁর রেখে-যাওয়া পথ সকলের কাছে একদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—এইটে ভেবে সোয়াস্তি পাচ্ছি। তিনি ছিলেন জীবনের দেবতা—জাগ্রত জীবনের জাগ্রত দেবতা; পুতুল-দেবতা নন, কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তিদাতা নন। এমন শ্রীনিত্যগোপালের ১১৪-তম জন্মদিনে আমরা তাঁকে প্রণাম করি, তাঁর সর্বক্ষেত্রে বিপ্লবী জীবন-চেতনার স্পন্দন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক—জাগ্রত জীবনে মানুষ একই সঙ্গে ব্রহ্মাস্বাদন ও বিশ্বরূপ হওয়ার আস্বাদন লাভ-বাসনায় রওনা হোক। এই পরম বাসনা নিয়ে তাঁকে প্রণাম করি—তিনি প্রকাশিত হোন, তাঁর তত্ত্ব পরিস্ফুট হোক—স্বরূপে বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ করে ব্যক্তি সমাজ সুস্থ হোক। জয় শ্রীনিত্যগোপাল, জয় শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ, জয় সর্ব মানুষের, জয় বিশ্বের সকল স্পন্দনের।

"আমরা আলোচনা করিব শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে পরা ও অপরা ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং এই দুই বিভাগের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া প্রকৃতির যান্ত্রিক (mechanical) রূপকে জীবন্ত যন্ত্রের (organism) রূপে গড়িয়া তুলিলেন, যাহার ফলে প্রকৃতি ও চৈতন্যের সহজ সমন্বয় সম্ভব হইল। শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতির ও পরাপ্রকৃতির ভেদ সুস্পষ্ট। অপরা প্রকৃতিরই বিবর্তিত রূপ পরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'জীবভূতা'; পরা প্রকৃতি জীবনভূতা, জীবভূতা।..."

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৬৫)

'যৎ করোষি যদশ্নাসি' শ্লোক আস্বাদিত হয়—'ন তু পৃথগ্ ব্যাপারঃ এব কর্তব্যঃ'। 'যাহাই যাহা ধর্ম, যাহার যাহা অভ্যস্ত-স্বভাব বশতঃ করিতে হয়, সব-কিছু নারায়ণে অর্পণ করিয়া চলাই পুরুষোত্তম-সাধনা। এখানে সাধনার জন্য দেশ-কাল-কর্ম-স্বভাবের কোন বাছাবাছি নাই, কোনও উচ্চ-অবচের স্থান নাই। সকলের সহিতই পুরুষোত্তমের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। পণ্ডিত মহাশয়কে 'ধর্মনে ও জীবনে', ব্রহ্মসূত্রের বঙ্গ খণ্ড, ঈশ-কেন উপনিষৎ ও অভিভাষণ দেওয়া হয়।...আনন্দবাজার বৃপান্তর বসুমতীতে গত রবিবারের সভার রিপোর্ট পাঠানো হয়। ৪টার পর মঠে যাই। ভাবিনীবাবু আসেন নাই।—র শিশু -র স্ত্রীর সঙ্গে পুকুরে সাধান-মাখা কাপড় কাচা বিষয়ে জল লইয়া বচসা হয় সুশীলার সঙ্গে।....র সঙ্গে সেবানন্দের ঝগড়া,—বাবুর বিরুদ্ধে... ইত্যাদি অভিযোগ শুনিয়া প্রাণ বড় আকুল। কি আমি করিতে পারি এই অনাচারের? ৯টায় আসি।...

১২ই মে

ঠাকুর, আমার বিচ্ছিন্ন দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার লইয়া আমার সমস্যার আর অন্ত নাই। আমি সর্বতো-ভাবে বিপন্ন। আমার দেহ লয় হউক তোমার দেহে, আমার দেহ তোমার হউক; আমার প্রাণ-মন-বুদ্ধি লয় হউক তোমার প্রাণ-মন-বুদ্ধির মাঝে; আমার প্রাণ তোমার হউক, মন তোমার হউক, বুদ্ধি তোমার হউক, তোমার আমিই আমার আমি। আমাকে স্বীকার কর, অঙ্গীকার কর, আমার সারা জীবনের শরণ তুমি, আশ্রয় তুমি, বুক জুড়াইবার স্থান তুমি। তোমার আসন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আমার সার্থক হউক। তোমার দর্শন ও জীবন যে মানুষের বড় প্রয়োজন, ঠাকুর। তুমি প্রকাশিত হও। সকালে বঙ্কিম পণ্ডিত আসেন তাঁহার এক পুত্র সহ। প্রারব্ধ কর্মের কথা, প্রত্যেক মানুষের ব্যষ্টি কর্মের সঙ্গে যে বিশ্বকর্ম জড়ানো রহিয়াছে, তাই কাহারও কোন কর্ম যে নিখুঁত ফল উৎপাদন করিতে পারে না তাহার আলোচনা হয়। পণ্ডিত মহাশয়কে এখানে আসিয়া এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব জন সমাজের কাছে ছড়াইয়া দিবার কথা বলি। ইহাতে অর্থ-পরমার্থ দুইই মিলিবে। ইহা এত অভিনব যে, ইহা না চলিয়া পারে না। গুছাইয়া বলিতে হইবে।...মঠের আমূল সংস্কারের কথা হয়। গুরুভাইগণের আপন আপন শিষ্যগণের প্রতি অতি মাত্রায় দৃষ্টি থাকার ফলেই সাধারণ লোকে প্রশ্রয় পায় না ইহা চিদানন্দও স্বীকার করে। যোগেন্দ্র সংকার আসেন। তিনি বলেন,...নিত্যগোপালের প্রচার ক্ষেত্রী হইয়া গেল। ইহা বড় uphill work। আমি বলি,—'প জমজম, ফে টিমটিম, নি চুপ'। আজই বুঝি নিত্য গোপালের কথা বলিবার দিন আসিয়াছে। রমাপতি সকালে উজ্জয়ন্তারতের জন্য ৩ টাকা দিয়া যান।...যদি জ্ঞানবাবু ভাল না আসেন তবে রেণু রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে যাইবে ঠিক হইয়াছে।..

১৩ই মে

ঠাকুর, একটা নূতন বিশ্ব, নূতন সৃষ্টি গড়িয়া তুলিতে তুমি আসিয়াছ। কিন্তু কাহাকে আশ্রয় করিয়া তুমি উহা সম্পন্ন করিবে? আমি তোমার ঐ গুরুতম প্রয়োজনকে আমার সকল দেহপ্রাণমন দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাই। এক কথায় আমি তোমার প্রকৃতি হইতে চাই, যোনি 'মহৎব্রহ্ম' হইতে চাই। আমার

সঙ্গে তোমার এই সম্বন্ধ তুমিই তো একদিন সর্বজনসমক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছ। তুমি আমি আমি তুমি—এক-তত্ত্ব, এক-প্রাণ, এক-মন, এক-বিজ্ঞান, একানন্দ। তোমাকে বিশ্বজনের মাঝে প্রচারিত দেখিবার জন্য আমার যাহা সাধ্য করিব। আমায় শক্তি দেও, বল দেও, ধন দেও, জন দেও। তোমার কথা তোমার জীবন তো না চলিয়া পারে না। সকলের কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। তোমার কথা বলার সময় সমাগত। বেণু তাহার ক্লাশ IV-এর বই লিখিবার উপাদান সংগ্রহ করে। জ্ঞানবাবু আসিলও না, চিঠিও দিল না ···কি করিয়া যে ঠাকুরের দর্শন ছড়াইয়া দিব, ভাবিয়া কূল পাই না। মঠের সব re-actionary। অতীতের সব কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ইহারা আছে ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার, সন্ন্যাসীর সংস্কার, ঠাকুর-পূজার প্রচলিত আচার লইয়া। আমার প্রাণ ইহার মধ্যে হাঁপাইয়া উঠে। গুরুগিরি ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি ইহাদের স্বভাবগত। তাই দুর্নীতি ও দৌর্বল্য ইহাদের রক্তে রক্তে। উহার যে আমূল সংস্কার চাই। প্রচলিত সাধন ভজনেই ইহাদের নিষ্ঠা, অথচ তাহাও করে না। একূল ওকূল কিছুই এদের নাই। একটা অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা, ক্ষুদ্র লোভ, সাম্প্রদায়িকতা ইহাদের মজ্জাগত। ঠাকুর, যাহা হয় তুমি কর। ডাকিয়াছিলে যদি, শক্তি তো দিলে না ইহার একটা কিছু করিবার মত। তোমার কাছে ছাড়া বলিবার আমার আর কেহ নাই। সরোজিনী দিদির মেয়ে খুকী আসিয়াছিল। বৈকালে 'ভক্তিযোগ দর্শনের' হিসাব ঠিক করিবার জন্য রমণী আসে বেণুর কাছে। সেবানন্দ তাহার পত্রিকা দিয়া যায়।

১৬ই মে

ঠাকুর, দর্শন-ধর্ম-জাতিবারা ছিন্ন বিছিন্ন এই বিশ্বকে এক-বিশ্বে গড়িয়া তুলিবার উপযোগী একটী প্রাণ-ধারা, বিপ্লব-ধারা বিশ্বের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত হইতেছে—যাহা বিশ্বের ব্যষ্টি-সমষ্টিসহ পরিবার সমাজ রাষ্ট্র নূতন রূপে গড়িয়া তুলিবে পারস্পরিক বিনিময়-ধর্ম সহায়ে, antagonistic ও complementary-র সমন্বয়দ্বারা। তুমি সেই প্রাণ-ধারার মূর্ত বিগ্রহ। তোমার শ্রীচরণ হইতে সেই প্রাণ-ধারার জন্ম। এই সর্বাত্মপ্লাবন প্রাণ-ধারার মাঝে ডুবিবার মত বল দেও। তবে তুমি বিশ্বের এই প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবে? নইলে বিশ্বের জ্বালা তো জুড়াইবে না। বর্তমান সকল সমস্যার, সকল সঙ্কটের সমাধান তুমি। তোমাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই এই যত সমস্যা। 'প্রকাশিত হও'। টেলিফোন আনার জন্য বেণুর বাহির হইবার ইচ্ছা ছিল। শরীর ভাল নয় বলিয়া যাওয়া হয় নাই। সুধাংশু আজ আসে নাই। ৪টার পর আমি ও বেণু মঠে যাই। সন্ধ্যার পর বেলঘরিয়ার সনৎকুমার গুহ নামে এক ভদ্রলোক 'জড়-অজড় সমন্বয় কি' প্রশ্ন করেন। আলোচনার মধ্যে যোগেন সরকার, রমাপতি ঘোষ, সুধাংশু, কিতীশ, মাঝে মাঝে তারিণীবাবু ছিলেন। জড়ের কোনও প্রকাশ—কৌমার বৈশোরকে—আশ্রয় না করিয়া কি 'অজড় আমি' দাঁড়াইতে পারি? বাল্য-কৌমার কিছু নাই, 'আমি আছি' ইহার কোন মানে হয় না। বাল্য-কৌমারহীন 'আমি' নিছক অনুমান। অজড়ের দাবী জড়ের দাবী স্বীকার করিয়া যে 'আমি' তাহাই সত্য আমি। বৈকুণ্ঠের ঠাকুরের অবতরণের কথা, Law of excluded middle-এর কথা, Ladder system না থাকার কথা, প্রতি অংশের স্বয়ংপূর্ণতার কথা আলোচনা করি। সনৎকুমারবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও ধর্ম ও রাজনীতি মিলাইতে পারে নাই। অস্পৃশ্যতা যে মায়া-বাদের ভিত্তিতে গঠিত একটী সামাজিক কাঠামোর ফলে দূর হয় নাই, ভারতের সমাজ-ধর্ম সব যে মায়াবাদের ভিত্তিতে গড়া, এখানে একটা দার্শনিক বিপ্লব সংগঠিত না হইলে কোনও সংস্কার সম্ভব হইবে না, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ও যে মায়াবাদের দর্শন দিয়াছেন—ইহা সনৎবাবু স্বীকার করেন। তিনি অনেক কিছু পড়াশুনা করিয়াছেন। বলরাম বাবের (নিম্বার্ক সম্প্রদায়) ভাগবত কিনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। কিন্তু কোথায়ও সন্তোষজনকভাবে বৈতাবৈতের সমন্বয় পান নাই। ৯টার পর বিদায়।···সনৎ-বাবু 'সমন্বয়-মূর্তি নিতাগোপাল' কিনিয়া নেন। ১৭ই মে

ঠাকুর, তুমি স্থিতি-গতি সমন্বয় প্রচার করিয়াই বর্তমান যুগ-স্রষ্টা। যেদিন হইতে স্থিতি ও গতি পরস্পর-বিরুদ্ধ, যেদিন হইতে স্থিতির উপর বিশ্ব বিশেষতঃ ভারত সভ্যতা গড়িয়াছে, সেই দিন গতির ক্ষেত্র হইতে প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। এ দিকে গতি-ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া স্থিতিতে তাহার পরিবর্তন করিবার আয়োজন চেষ্টা চলিয়াছে। বিশ্বে প্রথম প্রগতির আন্দোলন আনেন বুদ্ধদেব। কিন্তু স্থিতিধর্মী constitution না বদলাইবার ফলে তাহাও স্থিতির কবলে পড়িয়া গেল। তারপর নানক, কবীর, চৈতন্য, রামমোহন, কংগ্রেস, গান্ধী সকলেই গতিময় আন্দোলনের প্রবর্তক, কেহই ধার্মনিক বিপ্লবের নূতন গঠন স্থাপন করেন নাই। তুমি তাহা করিয়াছ। তাই তুমি যুগ-স্রষ্টা। তোমার জয় হউক। তোমার দেব-দুর্লভ চরণ ঘরে ঘরে স্থাপন করিবার উপযোগী সুযোগ, বল, ধন ও জন দেও। ৮।৯টার পর রথ ও মাথা আগে ৬টী আম ও ৪টী দানাদার লইয়া ২ মাস পর, মায়ের ওখানে যাইবে। মানুষ হইবার কথা বলি। 'সমন্বয়-মূর্তি নিতাগোপাল' বই দেওয়া হয়। সুধাংশু আসে। ৬টায় সহস্রদল বিদায় গীতা-ভবনে যাই। আমার গীতার একটী শ্লোক 'রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ' শ্লোক ব্যাখ্যা করি। গীতায় escapist mentality নাই, আছে গতিক্ষেত্রে স্থিতির প্রতিষ্ঠা। রূপ-রস-গন্ধের দিকের কবাট বন্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে গুটাইয়া ভিতরে চলিয়া আসার সাধনার 'বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে', কিন্তু 'রসবর্জম্'। তাই রূপের সামনে দাঁড়াইয়া নয়নকে এমন কৌশলে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে চক্ষু ও রূপের সম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে। এই শ্লোকটী কৃষ্ণ-জীবনের ছবি, এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বের পরিপূর্ণ আস্বাদন কৃষ্ণ-জীবন। ইন্দ্রিয় রাগদ্বেষমুক্ত হইবে, স্বাধীন থাকিবে, রূপ-রসকে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বলিয়া মুক্তি দিতে হইবে। মুক্ত ইন্দ্রিয় ও মুক্ত ইন্দ্রিয়ার্থের সম্বন্ধই ব্রহ্মধাম। 'গোপীনাম্ নয়নোৎপলার্চিততনুম্'—ব্যাখ্যা করি। 'ঈশাবাস্যমিদং' মন্ত্রটীও ব্যাখ্যা করি। গীতাভবন হইতে বিদায় মঠে যাই। যোগেন সরকারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিতে রাজী হইয়াছেন। রেণু ৭টায় মঠে যায়। চেক নিয়া আসে। মনা আসিয়াছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

১৬ই মে

ঠাকুর, তোমাকে আমি যে ভাবে লইয়াছি, সে ভাবে তো তোমার অনেক কেহ তোমাকে নিতে চায় না। কাহারও ঠিক? আমি কি তোমার উপর আমার মতবাদ চাপাইয়া তোমাকে চালাইতে চাহিতেছি? আমি তোমাকে লইয়া কি করিব? তোমাকে ইহারা যে চক্ষে দেখেন তুমি যদি তাহাই হও, তবে কি সেই তুমি বিশ্বের মাঝে চলিবে? তুমি কি শুধু নামেই 'সাকার পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানানন্দরূপী নিতাগোপাল'? তোমাকে ইহারা যেমন করিয়া রাখিতে চায় বা দেখিতে চায়, তাহাতে কি তোমার বর্তমান যুগে 'পূর্ণ ব্রহ্ম' হওয়া চলে? তুমি সর্ব দর্শন, সর্ব জাতি, সর্ব বৃত্তি সমন্বয়ের কি অদ্ভুত বারতা শুনাইয়া গিয়াছ। ইহাই তো বর্তমান যুগ-সমস্যা। যুগসমস্যা যিনি সমাধান করিতে পারেন, তিনিই যুগের ভগবান। আমার কাছে তুমি তো তাই। রেণু ৯টায় বাহির হইয়া লেক ডিপোজিট প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া এখানে ফেরে ৬.৩০টার পর। সুধাংশু আসে। আবেষ্টন পরিপাক করিয়া চলিবার কথা হয়। আবেষ্টন যেন পাইয়া না বসে। অথচ আবেষ্টন আত্মারই মত তুল্য সত্য। আবেষ্টনকে সার্থক পরিপাক করিলে সে আগাইয়া দিবার জন্য নূতন আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া লয়। আবেষ্টনের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। স্কুলের বইগুলিও তো ছাত্রদের আবেষ্টন। ঐ বইগুলির মধ্যে রহিয়াছে আগাইয়া যাইবার সূত্র নিহিত। এই বিশ্বটাই তো বিদ্যালয়। কোথায় শয়তান? মায়া আল? চতুর্দিকে প্রতি বস্তুর বুকে রহিয়াছে জ্ঞান ও আনন্দ ছড়ানো। যে কুশলী সে জ্ঞানানন্দই সংগ্রহ করে 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরঃ'। ৭টার পর মঠে যাই। তারিণীবাবুকে সেই এক হাজার টাকার (চুরী হইয়া যাওয়া) ১০ টাকা দিয়া আসি। বুদ্ধ মন্দিরে যাওয়া হয়

নাই। মঠের সব reactionery। কোন মহারাজ কি শিষ্যদের কাছে ঠাকুরের বই বিক্রয় করেন? কে নিত্যগোপাল লইয়া ব্যস্ত? ১৩১১ সনে প্রথম সংস্করণ ভক্তিযোগ ছাপা হইয়াছিল, পরে ১৩৬০ সনে দ্বিতীয় সংস্করণ। অথচ সহস্র সহস্র প্রতিশ্রুত হইয়াছে! কি বেদনার কথা! নিত্যগোপাল ইহাদের হাতে পড়িয়া কি লাঞ্ছনাই না পাইতেছেন! যাহা হয় তুমি কর। ইন্দুভূষণবাবু আসিয়া ছিলেন বৈকালে। দেখা হয় নাই। ৮-টার পর আসি। তারিণীবাবু কাল সন্তোষ যাইবেন।

১৭ই মে

'পদপ্রান্তে রাখ সেবকে' বিশ্বনাথ বিশ্বস্রষ্টা নিত্যগোপাল, আমি বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলাইয়া তোমাকে পাইব, আমাকে পাইব। তোমার ও বিশ্বজীবনের মাঝে আমি তোমাকে খুঁজিয়া পাইব। তোমার বাহিরে, বিশ্বের বাহিরে বিচ্ছিন্ন আমির অস্তিত্ব কোথায়? তোমার ও তোমার বিশ্বের ভিতরেই আমি সত্য আমি। তুমি আত্মা-সর্বভূত সমন্বয়, স্থিতি-গতি সমন্বয় পুরুষোত্তম তোমার তত্ত্ব বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী শক্তি, ধন জন দেও। তুমি বৈপ্লবিক দর্শন লইয়া আসিয়াছ নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিবারি সংকল্প লইয়া। আমাকে তোমার মাঝে তুমি করিয়া লও, সৃষ্টির প্রয়োজনে লাগাও, ধন্য কর। রেণু সকালে বাহির হইয়া মণি সেন ও তাহার মেশোমহাশয়ের বাসা হইয়া প্রায় ১১টায় ফেরে।...আমি ৫৬টায় বাহির হইব এমন সময় সেদিন গীতাভবনে যে বিনোদ চক্রবর্তী (৭৩ বৎসর বয়স) মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইয়াছিল, তিনি আসেন। এখানে তাঁহার সঙ্গে কথা বলি, মঠে যাওয়া হয় না। রেণু সুধাংশুর কাছে যায় বুকের সেই ব্যথার জন্য। চিরানন্দকে গ্রাহকদের কাছে চিঠিটার প্রুফ দিয়া আসিবেও। সকালে হীরালাল আসিয়া ছিল, আগামী রবিবারের জনসভায় বিজ্ঞাপনের প্রুফ দেখাইয়া নিয়া যায়। কিছুক্ষণ কথার পর বিনোদবাবু চলিয়া যান। তাহাকে 'সমন্বয়-মূর্তি', অভিভাষণ, বাণী ও গীতার ছোট অবধূত ভাষ্য (রিপ্রিন্ট বাঁধান নয়) দেওয়া হয়। তিনি গ্রাহক হইবেন বলিলেন।...রেণু মঠ হইতে ফেরে প্রায় ৯টায়।... নীলরতনবাবু ও রমাপতিবাবুর সঙ্গে রেণুর ঠাকুর সম্বন্ধে কথা হয়। রেণু বলে যে আমার ঠাকুর ও ইহাদের ঠাকুর কত পৃথক। সত্যই তো, ঠাকুরের রূপ, সমাধি, চোখের জল, কীর্তনে বিহ্বলতা, অপরিসীম স্নেহে সকলেই মুগ্ধ ছিলাম, তাঁহার সখা রূপ, বিশ্বরূপ, সর্বক্ষেত্রে বিচরণকারী একটী নিরঞ্জন রূপের খোঁজ তো কেহ রাখি নাই। আজ আমার কাছে কেন কেমন করিয়া যে এই বিশ্বনাগরিক রূপে উদ্ভাসিত হইলেন, আর ইহাদের কাছে হইলেন না, তিনিই জানেন। আমি যে বড় দুর্বল, মনে মনে রিক্ত। আমি কেমন করিয়া সামলাইব? তাঁহাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিব?

১৮ই মে

ঠাকুর, তুমি আমার সহজ মানুষ, নিরঞ্জন, নির্লেপ, নির্বিকার—অবধূত সমস্ত কিছুর সঙ্গে লিপ্ত থাকিয়াও তুমি নির্লেপ, সমস্ত বিকার গায়ে মাখিয়াও তুমি নির্বিকার। আমার কাছে তুমি সহজ বেশে ধরা দিলে। আর সকলেই তো 'এটা নয় ওটা' একটী বিকৃতির দিক লইয়া আছে। আমাকে তো কোন বিকৃতি দেখাও নাই। আমার চোখের সামনে তুমি 'মানুষ' রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছ তোমার দার্শনিক প্রতিভা লইয়া, তোমার তারুণ্য ও কারুণ্য লইয়া, তোমার রৌদ্র তেজ ও দীপ্তি লইয়া। ওগো আমার পূর্ণ অনন্ত—কোথায় তোমাকে ইহারা লইয়া আসিয়াছে, লইয়া চলিয়াছে? কেউ তোমার বই পড়ে না! কেন তুমি এত সম্পদ রাখিয়া গেলে? এত বড় আয়না, এত গ্রন্থ আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম না! তোমাকে কেহ চেনে না! অথচ তোমাকে চিনিবার মত সব-কিছু ছিল। আমরা অপদার্থ। আমাদের সঙ্গে করিয়া লও। তোমার মহাপ্রকাশের কাজে লাগাও। ১০টার পর ঘুমুম আসে কালী ও দীপক সহ।...আমি ৫টার পর মঠে যাই। আগামী রবিবারের সভার বিজ্ঞাপন দিয়া যায় হীরালাল। বিষয়—'বুদ্ধদেব ও শ্রীনিত্যগোপাল'। সকালবি

আমি, বক্তা শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও যোগেন্দ্র সরকার। মঠের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয় রমাপতিবাবু ও নীলরতনবাবুর সঙ্গে গুরুভ্রাতাগণ মত রকমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছেন মঠে এবার ১৮ টাকা ইলেকট্রিক বিল হইয়াছে। উৎসবের মধ্যে পাখা ঘুরিয়াছে —,—,—, এর ঘরে। এখনও -এর ঘরে পাখা চলিতেছে। তারিণীবাবু অবশ্য বলেন, উহারা ফিরে। এত ছোট ব্যাপারে চাওয়াও যায় না, পাওয়াও হয় না। গুরু-ভ্রাতাগণের সঙ্গে লড়াই করিবে কে? তাঁহারা যে যার নিয়া আছেন। ঠাকুরের বই ৪০ বৎসরে এক edition বিক্রয় হয় না। অথচ ইহাদের বই এর সংস্করণ হয়। ৮॥ টার পর আসি। যোগেন সরকার আসেন। ৪॥ টার পর বিনোদ চ্যাটার্জী কোর্ট ফেরত আসেন। প্রকৃতি কাল কর্ম যে আমার মতে অনন্ত, তাহা আলোচনা করি।...

১৯শে মে

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের সর্বস্ব। তুমি ছাড়া আমার কি আছে আশ্রয় করিবার মত? মন আমার নাই, জনও আমার তেমন নাই। তুমি আছ, তাই আমি আছি। বাহিরের দিকে আমার তৃপ্তির কি আছে? তুমি আমার তৃপ্তি। তোমাকে বুকে লইয়া, তোমার দর্শন সকল দেহে প্রাণে মানিয়া আমাকে ঝড়ের মত উন্মাদের মত ছুটিতে দেও। তোমাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিব, ইহা আমার সংকল্প। তোমার আশীর্বাদ আমি পাইয়াছি, তোমার চরণ আমার নিকট অর্পণ করিয়াছ। তোমার দর্শন আমার অন্তরে তুমি অন্তর্যামী রূপে প্রকট করিয়াছ। আমার ভয় কি? তোমার সন্তানদের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তোমাকে বিশ্ব দরবারে স্থাপন করিবই। আমাকে তদুপযোগী শক্তি দেও, বল দেও, সুযোগ দেও। সাময়িকীর দুইটী অংশ লিখি—পল্লী পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রে গীতা। বেশু আজ আর বাহির হয় না। বুকের চিনিচিন ব্যথা প্রায় একরূপই আছে। বৈকালে খুব জলঝড় হয়। মঠে আর যাওয়া হয় না। 'পথের ডাক'-এর কথা চলিতে থাকে। কত মানুষ ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কয়-জন আর পথে রহিল? হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন না হওয়ায় কত ছোট ছোট গাঁটের টানে পড়িয়া রহিল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমদের মত। 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ' সেই পথ। আজও সে ডাক থামে নাই। বাহির হইয়াছি, চলিব জীবন ভরিয়া. কেহ আসুক বা না আসুক। সত্যব্রতরা সঙ্গে ছিল, ছাড়িয়া গিয়াছে। বুক ভাঙিলে পারিত। সত্যব্রতর চেয়ে কাহারও উপর তো বেশী নির্ভর করি নাই। তাহার চেয়ে প্রিয় তো কেহ ছিল না। সে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি আজও পথে দাঁড়াইয়া দাপাদাপি করিতেছি। দুর্যোগ ঠেলিয়া চলিয়াছি। 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' যে তিনি। তাঁহার বুকে বুক মিলাইয়া চলিব—এই মাত্র জানি। 'তোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার'। আমার নিয়া কি টানাটানি তাঁর? আমার কিছু আবরণ তিনি সইবেন না। আমি নিরাবরণ দিগম্বর, সহজ।...আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, যুগান্তর অমৃতবাজার, বসুমতীতে আগামী রবিবারের সভার বিজ্ঞপ্তি ছাপাইবার জন্য এখান হইতে পোষ্টকার্ড দেওয়া হয়।...

২০শে মে

তুমি আর আমি, আমি আর তুমি বুকে বুক মিলাইয়া প্রাণের কথা কহিতে কহিতে মহা দুর্যোগের ভিতর দিয়া প্রাণ-পথ বহিয়া চলিয়াছি—সূর্য অস্তমিত, চন্দ্র নিভিয়া গিয়াছে, মেঘে তারকা ডুবিয়া গিয়াছে, বায়ুর ফুৎকারে সকল পথিকের আলো নিভিয়া গিয়াছে, সকলের সব বাণী স্তব্ধ—শুধু তুমি আমি প্রাণের আলোতে পথ দেখিয়া চলিতেছি। সঙ্গে কেহ নাই। যে যার পথে বসিয়া পড়িয়াছে সঙ্গীরা। এক তুমি এক আমি এই পথে পথিক। পথের এ পারে ও পারে চলিয়া পড়িয়া আছে শত শত পথিক। মাঝখানের পথে ঐ প্রাণ-পথে লোক কেহ নাই। এই পথে তুমি আর আমি নূতন পথ-যাত্রা করিয়াছি। শুধু তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—এক দেহ, এক প্রাণ,

এক মন, এক বিজ্ঞান এক আনন্দ অদ্বৈত।...দাঁতের ব্যথা আর বৃষ্টিও—তাই মঠে যাওয়া হয় নাই। সুধাংশু ১২টায় একবার আসে। সারা জীবন মানুষের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি, কিন্তু চাহি নাই, 'অণুপ্রাবিশৎ'। মানুষের যদি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকিত, তবে অনায়াসে আমার উপর নির্ভর ও বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিত। আমার কাছে মানুষের মান-ইজ্জৎ, মন-বুদ্ধি সব নিরাপদ ছিল। কাহাকেও তো অতিসন্ধি নিয়া ভালবাসি নাই। তাহাদের কাছে আমি নিজকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম! তাহারা বিচার করিয়া, বুদ্ধির শানিত ছুরিতে আমাকে আঘাত করিয়াছে। আমি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। আমি আঘাত করি নাই। ইহাই আমার সারা জীবনের ইতিহাস। আমি নির্বিচারে ভাল বাসিয়াছি। কে কি ছিল—ইহা আমি খুঁজিতে যাই নাই। যে অবস্থায় পাইয়াছি, সেই অবস্থায়ই বুকে তুলিয়া লইয়াছি। আজ বিচারে বিচারে আমি জর্জরিত; কিন্তু আমি বিচার করিয়া কাহাকেও কোলে লই নাই। আগে বিশ্বাস, পরে বিচার—ইহাই আমার নীতি। সারা দিন আজ এই আলোচনাই হয় প্রতিভা ও মুকুলের সঙ্গে। কেহ আমাকে নিল না, আমি সকলের হইতে চাহিয়াছিলাম। সন্ধ্যায় মাখনবাবু আসেন।...ইউনিয়ন ড্রাগের মালিক রেণুর লেখা পড়িয়াছে। উহা তাহার ভাল লাগিয়াছে। ভাল ব্যবহার করিয়াছে। ৮০৲ টাকার চেক দিয়াছে। সত্যব্রত সকালে আসিয়াছিল।...

২১শে মে

শ্রীনিত্যগোপাল, মদনমোহন আমার, বিশ্বের সকল বৃত্তিতে, ভোগ্য-ভোগের সকল সম্বন্ধের মধ্যে প্রকাশিত হও, প্রতিষ্ঠিত হও। দিন যে এক এক করিয়া চলিয়া গেল। আর কবে আসিবে? তোমার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লইয়া সারা জীবন চলিলাম। স্বপ্ন কি স্বপ্নেই পর্যবসিত হইবে? আমার জীবনে স্বপ্ন বাস্তব হউক। সারা দিনের ধ্যান তুমি, তুমিই আমার সব। গৌরব আমার তুমি, আমার বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা তুমি। আমার আশা-ভরসা তুমি। তুমিই আমার বিলাস। তোমাকে লইয়া আমি যে একেবারে একক হইয়া পড়িলাম। আমার তুমি বিশ্বরূপ, মদনমোহন, শুধু ঠাকুর বাড়ীর ঠাকুর নও। তুমি আমার জীবনে, জীবনের প্রতি স্পন্দনে, সকল আচরণে। এমনটী না হইলে আমার ষোল আনা প্রাণ জুড়াইত কেমন করিয়া? তুমি আমার অন্তরে বাহিরে, উর্দ্ধে অধস্তে, দক্ষিণে বামে, সামনে পশ্চাতে। তোমার জয় হউক।...'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকা হইতে সুধনের বুদ্ধদেবকে মাল্যদান উপাখ্যানটী পড়ি। হরিদাস ভট্টাচার্যের 'এহিপস্সসি (এস দেখ) পথ' পড়ি। বুদ্ধদেবের জন্মদায়িনী (অখিল নিয়োগীর লেখা) বেশ লাগিল। ঠাকুরেরও 'বর্তমান ভজন', প্রত্যক্ষ সাধনা (এহিপস্সসি'-র সাধনা)। বুদ্ধ-শঙ্কর সমন্বয়-মূর্তি আমার শ্রীনিত্যগোপাল! বৈকালে চিন্তানন্দ আসিয়াছিল। সে ম্যানেজার মহানির্বাণ মঠ ট্রাষ্ট বোর্ড নামে 'confidential' বলিয়া এক পত্র দিয়াছে। শতবার্ষিকীর কিছু হিসাব মঠের account এ লেখা হইয়াছে। তাহা ৭ দিনে বুঝাইয়া না দিলে জেনারেল কমিটিতে আলোচনা হইবে—এই ultimatum সে দিয়াছে। এই ব্যাপার শতবার্ষিকীর ব্যাপার। শতবার্ষিকীর executive এ ইহার কোন আলোচনা হওয়ার পূর্বে মুখ-সম্পাদকের নিজের দায়িত্বে এই চিঠি লেখা হঠকারিতার পরিচয়। এইরূপ ধৃষ্টতা অমার্জনীয়। তাহিরীবাবু ভুল করিলে তাহাকে দিয়া তাহা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে executive এ আলোচনাও হইতে পারে। সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্ট কাহারও কি ব্যক্তিগত দায়িত্বে এইরূপ চিঠি লেখার অধিকার আছে? চিঠির মধ্যে তাথাগত ভুল ৭।৮টী তো হইবে। ১০টার পর আসি। আজ মঠের executive-এর সভা। যমাপতিবাবু আমার কাছে চিঠি দিলেন। আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করি।

২২শে মে

ঠাকুর, তোমার মঠে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া কোন কাজ হইবার নয়। সেখানে চলিতেছে পরস্পরের দোষ-দর্শন, রূঢ় নিষ্ঠুর সমালোচনা ও সঙ্ঘর্ষ।

কোনও দুইটী মানুষ সেখানে এক নয়। না আছে আইন, না আছে হৃদয়। প্রয়োজন মত আইন, প্রয়োজন মত হৃদয়ের দাবী। আমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। এমন বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে যে আর পারি না ঠাকুর। ডাক দিয়াছিলে। পারিলাম না তোমার প্রতিষ্ঠার পথে কিছু করিতে। আমার যে কিছু নাই। নাই ধনজন, নাই তেমন প্রতিষ্ঠা। আমি কেমন করিয়া সকলকে মানাইয়া চলিব? আমাকে পথ দেখাও, শক্তি দেও। ...আমি রেণু কুসুম ও গোপা মঠের জন্য ৪।টায় রওনা হই। চুনী মিত্র ও তাহার ভাই বক্তৃতা শুনিতে যায় বাগজ দেখিয়া। ইন্দুজ্যোতিবাবু যান।... বিনোদবাবু সভায় যান। ৪।টায় অনেক করে স্বামী-নন্দের সঙ্গীতের পর সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে আমার কিছু বলার পর রেণু রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy হইতে dynamism অংশটী পড়ে। পরে যোগেনবাবু উদ্বোধনের 'ভগবান বুদ্ধ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে যোগেনবাবু বক্তৃতা দেন। পরে চুনী মিত্র বলে যে বুদ্ধ নৈরাত্মবাদী বা নিরীশ্বরবাদী নন। ইহার পর কৃষ্ণানন্দ অনেকক্ষণ বলেন। তাহার পর আমি বলি—বেদ ঈশ্বর সনাতন স্থিতি একত্ব লইয়া সমাজে যে গোলামী চলিয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহার মূর্তিমান প্রতিবাদ ছিলেন। শ্রীনিত্যগোপালও তাহার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। মানুষের মহিমা বুদ্ধ প্রবর্তন করেন। ঈশ্বর-সেবার ঘনীভূত প্রকাশ মানুষের সেবা—ভাগবত ইহা বলেন। 'প্রাণেন দেব' শ্লোক, 'ন কাময়ে' শ্লোক ব্যাখ্যা করি। ব্রহ্মের সঙ্গে অদ্বৈত ভাবাপন্ন হইয়া (গোলামের মত নয়) ব্রহ্মের সঙ্গে ভক্তিভাবে যুক্ত হইতে হইবে। বুদ্ধ ও শ্রীনিত্যগোপাল সগোত্র। আজিকার বক্তৃতা আমার কাছে ভাল লাগিয়াছে।...

২৩শে মে

ঠাকুর, বুদ্ধ আমার, শঙ্কর আমার, তুমিই বুদ্ধ শঙ্কর সমন্বয়-মূর্তি। বুদ্ধের প্রাণ ও শঙ্করের প্রজ্ঞা তোমার জীবনে মূর্ত। বুদ্ধ হইয়াও তুমি আর কিছু, শঙ্কর হইয়াও তুমি আরও কিছু। বুদ্ধের মৈত্রী তোমার জীবনে সর্ব সম্প্রদায় সমন্বয় পর্যন্ত, সর্ব মতবাদ সমন্বয় পর্যন্ত প্রসারিত, বুদ্ধের করুণা আজ সর্বজাতি সমন্বয় মূর্তিতে উদ্ভাসিত। ওগো বুদ্ধরূপী শ্রীনিত্যগোপাল, তোমার জয় হউক। বুদ্ধ-ভগবানকে তুমি ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তস্তরে প্রবেশ করাইবার জন্য অবতীর্ণ। তোমার অবতরণে সব সম্প্রদায়, সব মতবাদ একটী new orientation লাভ করিবে। সর্ব দর্শন-রস সম্ভব হইবে। ...অমৃতবাজারের প্রধান রিপোর্টার কালীপদ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা সেখানে—(রাইটার্স বিল্ডিংস এ)। লিখিয়া দিলে 'সমন্বয়-মূর্তি নিত্যগোপাল', ঘরে বাইরে ও শেষ প্রশ্নের সমালোচনা ছাপাইয়া দিবে বলিল। ৬টায় ফেরে। পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করে। এখানের ড্রেন মাঝে মাঝে বন্ধপ্রায় হইয়া যায় তাহার কি করা যায় তাহার আলোচনা করিবার জন্য। আমি ৭টায় পর মঠে যাই। সে দিনকার চিদানন্দের চিঠি...সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একজিকিউটিভকে না জানাইয়া চিঠি লেখা ভুল হইয়াছে স্বীকার করিল। এখানে সকলেই স্বেচ্ছাসেবক, কাহারও উপর কোন জোর জুলুম চলে না। পারস্পরিক সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া না চলিলে এখানে কোন কাজ হইবে না। Ultimatum দিবার পথ কল-কারখানায় চলে, মঠে চলে না। তাহার ঐ চিঠিটা সুদূর প্রসারী কুফলের সম্ভাবনায় ভর্তি...। ঐ প্রসঙ্গ উঠিলে এখানের মাথা গরম লোকেরা সব পণ্ড করিবে। এখানে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হইবে, কাজ করাইয়া লইতে হইবে। যাহার সঙ্গে ঝগড়া তাহার সঙ্গে মিলিয়াই ঝগড়ার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।...

২৪শে মে

শ্রীনিত্যগোপাল, সখা আমার, বন্ধু আমার, আমার একাকী এই পথ-চলার মধ্যে তুমিই আমার সাথী। তুমি বল, আমি শুনি, আমি বলি তুমি শোন। তুমি প্রাণে প্রাণে কথা কও। আমি তাহা ভাষায় রূপ দিব। আমার মুকত্ব বন্ধকণ্ঠ দেও, আমি বিশ্বের কাছে তাহা পৌঁছাইব। তোমার কথা আছে—কেন তাহা বলিবে

না? পারস্পরিক সম্বন্ধে লিপ্ত বিশ্ব আজ তোমার মৈত্রীর বাণী শুনিয়া সম্বদ্ধ হইবে—এই মৈত্রী সর্ব দর্শন সমন্বয়, সর্বধর্ম সমন্বয় গড়িয়া তুলিবে। তোমার মৈত্রী, তোমার করুণার জয় হউক···। রেণু প্রতাপ শুভরাত্রের কাছে ফোন করে...বক্তৃতা দিতে পারিবে কিনা জানিবার জন্য। সুধাংশু কুসুম জয়ার বাসায় যায়, সেখান হইতে মধুর ওখানে যায়; আমার কোনও প্রসঙ্গ তারা তোলে নাই ···। মধু অভিযোগ করিয়াছে আমি চারদাদী দের বাড়ী মাসে একবার যাই, তাহার ওখানে যাই না। মধু আমার কোনও কথা শোনে নাই। এখান হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আমিই তাহাকে হাসপাতাল হইতে আনাইয়া ছিলাম। আমি যাহার জন্য যতদূর পারি করিয়াছি। কেহ কি আজ আমার সঙ্গে আছে? কেহ কি জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা, আপনি কেমন আছেন?' খাই কি না খাই, আছি কি নাই—কে খোঁজ নেয়? দেহে মনে আর কুলায় না। বেহালা এক বৎসর যাই না। ইহার মধ্যে একবার মাত্র টাইফয়েড-এর সময় সত্যব্রতকে আনিতে গিয়াছিলাম। আর যাওয়া হয় নাই। যাই মঠে, আমার বিশ্রাম-স্থান ঠাকুরের চরণতল। যাহাদের সঙ্গে জীবন জুড়িয়া দিয়াছিলাম, তাহাদের সঙ্গে এই পৃথক হওয়া কত বড় বেদনাদায়ক, তাহা আমিই শুধু বুঝি। আমাকে সহিতে হইবে, সহিয়াছি। কাহারও বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ত্যাগ করি নাই। ঠাকুর আমার আছেন—এই মাত্র জানি।···

২৪শে মে

ঠাকুর, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এই দেহ প্রাণ মন অনেক দূর বহিয়া আনিয়া তোমার চরণ তলে ফেলিয়া দিলাম। তুমি আমার আশ্রয়। তোমাকে এমন করিয়া বুঝিলাম যা তুমি বুঝাইলে যাহা আর কাহারও বুঝার সঙ্গে মেলে না। এদিক দিয়াও আমি একান্ত একাকী! ইহাদের আলোচনা ও আমার আলোচনা কত পৃথক। ইহাদের কাছে তুমি যাহা তাহাতে যে আমার মন উঠে না। তাহা কত পরিচ্ছিন্ন। আমার তুমি সর্ব ক্ষেত্রের, সর্ব দেশের, সর্ব কালের, সর্ব মানবের, অনন্ত অসীম নিবিকার। পুত্র কন্যা দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ইহাদের কেউ নই, ইহারাও আমার কেউ নয়। মেয়ে অভিযোগ করে, আমি তাহার কাছে যাই না। যাওয়ার পথে সে-ই তো বাধা সৃষ্টি করিয়াছে! যাইতে তো আমি চাই। যাইতে দিতেছে কে? ডাকে কে আমায়? আমাকে দিয়া জয়ারও কোন প্রয়োজন নাই। বেশ আছি। সুখে থাকুক সকলে। আমার ছুটি। তুমি আছ আমার জীবনে। তাই আমি আছি।···আমি প্রায় ৬টায় মঠে যাই। সুশীলা ঠাকুরের অনেক কথা—সত্যেন সরকারের জীবন মরণ অসুখের সময়ের কথা, অপরূপের কথা—বলে। প্রায় ৯টায় ফিরি। রেণু মেয়েদের সভায় পড়িবার জন্য প্রবন্ধ লেখে। আজিও উজ্জলকান্তের কন্যার ছাপা হইল না। কবে যে আসিবে জানি না। ইহারা কি কর্মকে কর্ম হিসাবে মর্যাদা দেয়? সংসারটা এইরূপ হইয়াছে। ভালবাসাকে ভালবাসা হিসাবে মূল্য দিলে কি কেহ কাহাকে শোষণ করিতে পারিত? ভালবাসার স্থান অধিকার করিয়াছে আত্ম-প্রিয়পরায়ণতা। ভালবাসা পারস্পরিক মর্যাদা দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ আজ লোভী।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় গ্রন্থই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের মূল তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততত্ত্বই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং শ্রুতীতি বহবঃ শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

কারণ একপ্রকার শ্বেতপদার্থে অন্য প্রকার শ্বেত পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইতেই পারে না। শ্রুতি বেদান্তানুসারে আত্মা স্বপ্রকাশ, সেই স্বপ্রকাশ আত্মার প্রকাশের কারণ স্বচ্ছ বুদ্ধিও হইতে পারে না। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের বিংশ শ্লোকের প্রথম চরণানুসারে "আত্মাপ্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে"। সুতরাং আত্মারই প্রকাশকতা এবং স্বচ্ছতা আছে। আমি-আত্মা দেহস্থই বোধ করি, কিন্তু আমি-আত্মা ত বুদ্ধিস্থ অথবা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত বোধ করি না। আমাতেই বুদ্ধি আছে বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি বুদ্ধিতে আছি বুঝি না। উক্ত ষোড়শ শ্লোকানুসারে আত্মা সদা সর্বত্রে বর্তমান। তুমিও ত আত্মা। তবে আত্মা যদি সর্বত্রই বিদ্যমান, তাহা হইলে তুমি-আত্মা সর্বত্রই আছ বোধ কর না কেন?

ষোড়শ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণং।
তদ্বৃত্তি সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা ॥"

অসি নিজে কি ছেদন করে? কিন্তু ছেদন করিতে হইলে ছেদন-কর্ত্তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ছেদন কর্ত্তা নিজে ইচ্ছানুসারে অসিদ্বারায় ছেদন করিতে পারেন। অসি যেমন ছেদন করিবার কর্ত্তা নহে, তদ্রূপ দেহও কর্ম-কর্ত্তা নহে, মনও কর্ম-কর্ত্তা নহে এবং প্রকৃতিও কর্ম-কর্ত্তা নহে। সকল প্রকার কর্ম-কর্ত্তা স্বয়ং আত্মা। ছেদন-কর্ত্তার ছেদন করিবার যন্ত্র যেমন অসি, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-প্রকৃতি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার কর্ম-কর্ত্তার নানা প্রকার কর্ম করিবার নানা প্রকার যন্ত্র মাত্র। আমি যদি 'সোঽহং' বলি তাহা হইলে ঐ প্রকার বলিবার কর্ত্তা কি আমি-আত্মা নই? ঐ প্রকার বলিবার কর্ত্তা কি বাক্‌শক্তি? উক্ত সপ্তদশ শ্লোকানুসারে 'আত্মা রাজবৎ সদা' স্বীকার করিলে, আত্মাও সগুণ সক্রিয় স্বীকার করিতে হয়, কারণ প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে রাজা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নহেন। রাজ-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া রাজ কর্মচারী যে সকল কর্ম করিয়া থাকেন, সে সকল তাঁহারা রাজার আজ্ঞানুসারে অবশ্যই করিয়া থাকেন। আত্মাকে 'রাজবৎ' বলায় যদি বুঝিতে হয়,

দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রকৃতি প্রভৃতি সেই আত্মা রাজার বিবিধ কর্মচারী, তাহা হইলে সেই আত্মা রাজার কথিত ঐ সকল কর্মচারী অবশ্যই সেই আত্মা-রাজার আজ্ঞানুসারেই তাঁহার প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে তাঁহারই নানা কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে আত্মা-রাজার আজ্ঞা দিবার শক্তি আছে, যে আত্মা রাজার ক্ষমতা দিবার শক্তি আছে তিনি অবশ্যই সগুণ সক্রিয়। উক্ত সপ্তদশ শ্লোকেই আত্মাকে 'সাক্ষিবৎ' বলা হইয়াছে। আত্মা সাক্ষী স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া, আত্মা সগুণ সক্রিয় বটেন বিচারালয়ে যাঁহারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রত্যেককেই সাক্ষী বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই যে সগুণ সক্রিয়, তাহা অনেকেই জানেন। দ্রষ্টা এবং জ্ঞাতাকে সাক্ষী বলা যাইতে পারে। দ্রষ্টা জ্ঞাতা কখনই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নহেন, দ্রষ্টা দর্শন করেন সুতরাং সেই দর্শন করাও কার্য। যিনি জানেন, তিনিও কার্য করেন। যিনি জানেন, তাঁহাকেই জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে। পরমহংস শঙ্করাচার্য উক্ত সপ্তদশ শ্লোকে তিনি-আত্মাই 'সাক্ষিবৎ' এবং 'সাক্ষিণং' বলেন নাই। সুতরাং তাঁহার উক্ত শ্লোকে দ্বৈতবাদই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সপ্তদশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ব্যাপৃতেষিন্দ্রিয়েষাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনাং।
দৃষ্টতেহন্নেষু যাবৎসু যাবদ্বিদ্ব যথা শশী।"

উক্ত শ্লোকে বহু বচনান্বিত 'বিবেকিনাং' শব্দ প্রয়োগ করায় প্রকারান্তরে শঙ্করাচার্যেরও বহু আত্মা স্বীকার করা হইয়াছে। যে প্রমাণানুসারে বিবেকী আত্মা সেই প্রমাণানুসারে অবিবেকীও আত্মা। শ্রুতি বেদান্তানুসারে এক আত্মা। শ্রুতি বেদান্তানুসারে একই আত্মার প্রকাশ নানা দেহে। একই আত্মা সর্বদেহে প্রকাশিত বলিয়া দেহীও বহু নহেন। সেই আত্মা নানা দেহে অবিবেকসম্পন্ন হইলেও এক অবিবেকী আত্মা বলাই উচিত। সেইজন্য বহু অবিবেকী আত্মা বলা উচিত নয়, কিম্বা কেবল বহু অবিবেকী বলাও উচিত নয়। কারণ সেই একাত্মাই ত বহু-দেহে অবিবেক-সম্পন্ন হইয়াছেন। অতএব তিনি একই অবিবেকী। আপনি কর্ম না করিলে কি কাহারও বোধ হইতে পারে তিনি নিজে কর্ম করিতেছেন? সুষুপ্তিকালে কেহই কর্ম করে না। কৈ, সে অবস্থায় কর্ম না করিয়াও কর্ম করেন বলিয়া কাহারও ত বোধ হয় না? আত্মা যখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়, তখন তিনি আপনাকে কখনই সগুণ সক্রিয় বোধ করেন না। আত্মা যখন সগুণ-সক্রিয়, তখনও তিনি আপনাকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বোধ করিতে পারেন না। কারণ যতক্ষণ বোধ করা হয়, ততক্ষণও কর্ম করা হয়। আত্মা যখন সগুণ-সক্রিয়, তখন তিনি আপনাকে সগুণ সক্রিয়ই বোধ করেন। আপনাকে সগুণ-সক্রিয় বোধ করিয়াও যদি বলা হয়, আমি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সে কথা অবশ্যই অসত্য। এই জগৎ হইতে মেঘমালাও বহু দূরস্থ, এবং শশীও বহু দূরস্থ। সুতরাং কেহ ভ্রান্তিক্রমে সেই মেঘমালা ধাবিত হইলে শশী ধাবিত হইতেছে, দর্শন এবং বোধ করিতে পারেন। তবে নিজে কোন কর্ম না করিয়াও কি ভ্রান্তিক্রমে নিজেই কর্ম করা হইতেছে বোধ হইতে পারে? ঐ প্রকার বোধ করাও যে কর্ম। ঐ প্রকার বোধ যিনি করেন, তিনি কখনই অকর্মী নহেন। যিনি ঐ প্রকার বোধ করেন তিনিও ত আত্মা। তবে আত্মাকে অকর্মী অব্যাপারী কি প্রকারে বলা যায়? তোমার ঐ দেহ ত অখণ্ড। তোমার ঐ দেহের কোন অংশ ছেদন করিলে কি তোমার দেহের সর্বাংশেই ছেদন করা হইতেছে বোধ কর? ঐ দেহের একাংশ ছেদন জন্য কি তোমার ঐ দেহের সর্বাংশেই বহুণা বোধ কর? তাহা কখনই কর না। তবে তোমার ইন্দ্রিয়গণ কর্ম করিলে, তাহারা স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেই বা তাহাদের কর্ম করায় তুমি কর্ম করিতেছ, তাহারা স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেই বা তাহারা যে সকল ব্যাপারে ব্যাপৃত, সে সকল ব্যাপারে তুমিই ব্যাপৃত, ইহা তোমার বোধ হইবে কেন? তুমি ও তোমার ইন্দ্রিয়গণ হইতে বহু দূরস্থ নহ। আর তুমি তোমা হইতে বহু দূরেও অবস্থান

করিতে পারে না। তবে ইন্দ্রিয়গণ কর্ম করিলে তুমি কর্ম করিতেছ, তোমার এ বোধই বা হইবে কেন? আমি কর্ম করিলেও যদি আমি কর্ম করি না বলা হয়, তাহা হইলে, আমি যে আছি বোধ করিতেছি, তাহাও অসত্য তুমি অনায়াসেই বলিতে পার। শঙ্করাচার্য তাঁহার নির্বাণষট্‌ক ও আত্মষট্‌ক অনুসারে সম্পূর্ণ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। অথচ এই দুই গ্রন্থে যে সমস্ত ভাব আছে সে সকলও তাঁহাতে উদয় হইয়াছিল। তখনও কি তিনি সগুণ সক্রিয় ছিলেন না? ঐ দুই গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী যখন লিখিয়াছিলেন, তখনও কি তিনি সগুণ সক্রিয় ছিলেন না? যিনি আত্মষট্‌কে বলিতেছেন,

"নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গ-
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্য ক্ষেত্র বিত্তাদি দূরে,
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহং ॥ ১
রজ্জ্বজ্ঞানান্ভাতি রজ্জুর্যথাহি,
স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ ॥
আপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জু
র্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহং ॥ ২
মত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদত্রাহ বিশ্বং,
সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপকল্পং।
আদর্শান্তর্ভাসমানস্য তুল্যং,
মদ্যদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোঽহং ॥ ৩
আকাশাদীনং বিশ্বমাত্মন্ সত্যং,
সত্তাজ্ঞানানন্দ রূপে বিমোহাৎ।
নিদ্রামোহাৎ স্বপ্নবন্নিত্য সত্যং,
শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহং ॥ ৪
নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো
দেহস্যোক্তাঃ প্রাক্তনাঃ সর্বধর্মাঃ
কর্তৃত্বাদি চিন্নভাতি নাহং
স্বাত্মন্যেব স্বাত্মনো মে শিবোঽহং ॥ ৫
নাহং দেহো জন্ম মৃত্যুঃ কুতো মে,
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎ পিপাসা কুতো মে।
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে,
নাহং কর্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥ ৬

তিনি সগুণ-সক্রিয় নহেন, কি প্রকারে বলা যায়?

অষ্টাদশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের একোনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্তন্তে সূর্যালোকং যথা জনাঃ।"

সূর্যের সহিত আত্মার তুলনা করিলে আত্মাকেও সগুণ সক্রিয় বলিতে হয়। কারণ সূর্য হইতে আলোক প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং সূর্যকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় কি প্রকারে বলা যায়? সূর্যালোকে যাহা থাকে, তাহাই উষ্ণ হয়। সুতরাং সূর্যালোকেরও গুণ কর্ম আছে। সূর্যালোক আশ্রয়ে যাঁহারা কর্ম করেন, তাঁহাদের সুখ দুঃখ কিম্বা শোকের সহিত সূর্য কিম্বা সূর্যালোকের কোন সংস্রবই নাই। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির সকল কর্মের সঙ্গেই আমি-আত্মার বিশেষ সংস্রব আছে। আমি আত্মাই ত কখন সুখ, কখন দুঃখ এবং কখন বা শোক ভোগ করিয়া থাকি। তবে ঐ তিন, ঐ সকলের কর্মই বা কি প্রকারে বলা যায়? ঐ সকলের কোনটীই ত কখন সুখ সম্ভোগও করে না, কখন দুঃখ-সম্ভোগও করে না এবং কখন শোক-ভোগও করে না; ঐ সকল আমি-আত্মাকেই সম্ভোগ করিতে হয়। সুতরাং আমি-আত্মাতেই সুখ, দুঃখ এবং শোক বিকাশিত হয় স্বীকার করিতে হয়।

একোনবিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"দেহেন্দ্রিয়গুণান্ কর্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি,
অধ্যস্যতেঽবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ॥"

গগন আপনাকে নীল বোধ করে না। দূরস্থ গগনকে তোমারই নীল বোধ হয়। আর যে সচ্চিদাত্মা অমল, তাঁহারই বা দেহেন্দ্রিয়গণের গুণ-কর্ম-সকলকে তাঁহার গুণ-কর্ম-সকল বোধ করিবার কারণ কি আছে? কাহারও গাত্রাবরক জামাকে কি গাত্র বোধ হয়? তদ্রূপ সচ্চিদাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়গণ ও দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়গণের গুণ-কর্ম-সকল ঐ অমল সচ্চিদাত্মাকে আবৃত করিয়া

থাকিলেও ঐ সচ্চিদাত্মার আপনাকে দেহ, ইন্দ্রিয়গণ অথবা শুদ্ধ-বুদ্ধ সকল বোধ করিবার কোন কারণই নাই যদি বল, ঐ প্রকার বোধ সচ্চিদাত্মার হয় না, তোমার নিজের হয়, তাহাও বলিতে পার না কারণ শঙ্করাচার্যের অনেক গ্রন্থানুসারেই সেই সচ্চিদাত্মা তুমি তুমি-সচ্চিদাত্মাই ঐ উপাধিনটী যে বহুকালের আবৃত রহিয়াছে, তাহা ত বুঝিতেছ, তুমি কি ঐ উপাধির এবং তাহার আবরণ, অভেদ-বোধ করিতেছ? তুমি অপরের আবরণ এবং অপর অভেদ-বোধই কর না, তবে তোমার কোন্ প্রকার আবরণকে তুমি স্বয়ং, কি প্রকারে বোধ করিবে? তাই বলি, তোমার আবরণ,—দেহেন্দ্রিয়ের গুণ এবং কর্ম্মনিচয়, তোমার নিজের গুণ এবং কর্ম্ম নিচয় বলিয়া বোধ হইতে পারে না। আর অমল-সচ্চিদাত্মা যে তুমি, তোমার আবরণ আছে কিম্বা হইতে পারে, কি প্রকারেই বা স্বীকার করা যায়?

বিংশ সিদ্ধান্ত

বোধ গ্রন্থের একবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অজ্ঞানোন্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
বল্গাতেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদির্যথাম্ভসঃ॥

চন্দ্র-প্রতিবিম্বের সহিত আত্মার তুলনাই হইতে পারেনা। কারণ আত্মা ত কিছুর প্রতিবিম্ব নয়? বরঞ্চ চন্দ্রের সহিত আত্মার তুলনা করিলে কতক পরিমাণে সঙ্গত হয়। জল এবং অন্যান্য স্বচ্ছ পদার্থেই চন্দ্র প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়। সেই জন্যই শ্রুতি বেদান্তমতে প্রতিবিম্ব মিথ্যা। উক্ত একবিংশ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন চন্দ্র-প্রতিবিম্ব। তবে কি শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মা মিথ্যা? চন্দ্রে প্রকাশকতা আছে, চন্দ্র কিরণ বিকীর্ণ করে, অতএব চন্দ্রও সগুণ-সক্রিয়; কিন্তু চন্দ্র-প্রতিবিম্বে প্রকাশকতা নাই এবং তাহা কিরণ বিকীর্ণও করে না, তাহা সম্পূর্ণ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। শঙ্করাচার্য্যও আত্মবোধের একবিংশ শ্লোকে ঐ প্রকার নির্গুণ নিষ্ক্রিয়ের সহিতই আত্মার তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারই মতে আত্মাকে একপ্রকার অ-কিছুই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আর উক্ত একবিংশ শ্লোকেই 'অজ্ঞানোন্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি' বলায় আত্মা অকর্ত্তাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। জড়েরও ত কর্ত্তৃত্ব নাই। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মার কি অকর্ত্তা-জড়ের মতন কোন কিছু? অকর্ত্তা-জড়কে কর্ত্তা-অজড় যে কোন প্রকারে ব্যবহার করিতে পারেন। অকর্ত্তা-জড় কর্ত্তা-অজড়ের সম্পূর্ণ অধীন। উক্ত একবিংশ শ্লোকানুসারে মানসোপাধিই কর্ত্তা। উক্ত শ্লোকানুসারে মানসোপাধিরই কর্ত্তৃত্ব উক্ত শ্লোকানুসারে অজ্ঞানবশতঃ ঐ মানসোপাধির কর্ত্তৃত্বকে অকর্ত্তা-আত্মার কর্ত্তৃত্ব বলিয়া বোধ হয়। ঐ প্রকার বোধ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অকর্ত্তা-আত্মারই হয়। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মার আত্মবোধ হয় স্বীকার করিলে, ঐ প্রকার বোধ অন্য কিছুর হয় কি প্রকারেই বা স্বীকার করা যায়? শ্রুতি-বেদান্তানুসারে বোধ বা জ্ঞান বহু নহে। বোধ বা জ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার করিলে, বোধ বা জ্ঞানও অনাত্মা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং শ্রুতি-বেদান্তানুসারে বোধ বা জ্ঞান কেবল আত্মারই হইয়া থাকে। শ্রুতি, বেদান্ত এবং শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আমিই আত্মা। আমি কত প্রকার কর্ম্মই করিয়া থাকি, সুতরাং আমি অকর্ত্তা কি প্রকারে? আমি-আত্মা কোন কর্ম্ম না করিলে, আমি-আত্মা নানা প্রকার কর্ম্ম করি, আমি আত্মার বোধই হইত না। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে ক্ষুধার উদ্রেক বোধ হয় না। যদি ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও ক্ষুধার উদ্রেক বোধ হইত, তাহা হইলে ঐ প্রকার বোধ নিয়ত হয় না কেন? তদ্রূপ আমি যখন কর্ম্ম করি, তখনই আপনাকে কর্ত্তা বোধ করি। আমি সুষুপ্তিবশতঃ যখন কিছু করি না, তখন আমি কর্ত্তা, ইহাও বোধ করি না সুতরাং নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, আমি যখন কর্ম্ম করি, তখনই আমাকে আমার কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়; এবং আমি যখন কর্ম্ম করিনা, তখন আমাকে কর্ত্তা বলিয়া আমার বোধ হয় না।

ক্রমশঃ

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি

॥ শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ॥

(৫২ পৃষ্ঠার পর)

ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের মূল কথা। এই পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তি একজন সক্রীয় সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। অটওয়েও (Ottoway) বলেছেন যে ক্রমবর্ধমান শিশুর ওপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব নিয়েই শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট। তিনি আরও বলেছেন, ব্যক্তির শিক্ষাক্ষেত্রে তার সামাজিক জীবন এবং সামাজিক সম্পর্ক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ১

অটোয়ের মতে শিশুর বিকাশ সমাজ ও কৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে হবে। শিক্ষার্থী তার দল থেকে বিচ্যুত হয়ে একক ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে না। সে একজন সক্রীয় সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। তখন সে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় হয়।

কার্টার (Cartar) শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন যে, সমাজতত্ত্বের সে সব দিকগুলি সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখতে হবে যেগুলো শিক্ষাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ২

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আর এক জন পণ্ডিত খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি হচ্ছেন রৌকেক (Roucek)। তিনি বলেছেন যে সমাজতত্ত্ব যখন শিক্ষার মৌলিক সমস্যার মধ্যে এসে প্রযুক্ত হয় তখনই সমাজতত্ত্ব হয় শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব। তিনি বলেছেন, প্রথমতঃ সমাজতত্ত্ব ক্ষেত্রবিচার করে দেখে, সমাজের কাঠামোকে এবং তাকে তারপর বর্ণনা করে। পক্ষান্তরে শিক্ষা ঐ অবস্থাকে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিস্ফুট করে তোলে এবং তাদের মধ্যে যে সব ত্রুটি বর্তমান আছে তা শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব অপসারণ করে। ৩

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমাজতত্ত্বের সে সব দিক

১। Ottoway—"The Sociology of Education may be defined briefly as a Study of the relations betwen Education and Society. It is thus a social study and in so far as its method is scientific, it is a branch of social science. It is concerned with Educational aims, methods, administration, curriculum, its relation to the economic, political, religious, social, and cultural forces of the society in which they function. In the Education of the individual it concerns the influence of social life & social relationship on the development of personality."

২। Carter—"The study of those phases of Sociology that are of significance for Educative process especially the study of those that point to valuable programmes of learning and control learning process."

৩। Roucek :—"It is Sociology applied to the solution of fundamental educational problems. One—Sociology examines the field, knows its structure and describes its functioning, the other—Education attempts to enlighten and improve the same order.

যেগুলি শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে প্রযুক্ত সে সব বিষয় নিয়েই হচ্ছে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের কাজ। বলা বাহুল্য, শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব শিক্ষার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ—যেখানে শিক্ষাদান কার্য চলে—সেগুলিকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে, শুধু তাই নয়, শিক্ষাদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া থাকে, তারও মূল্যায়ন করে। যেসব সামাজিক প্রবণতা মতবাদ ও আদর্শ শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করে, তারও মূল্যায়ন শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব করে থাকে শিক্ষা কি করে সমাজকে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারও পথ দেখিয়ে দেওয়াও হচ্ছে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের কাজ। বিদ্যালয় সমাজের মধ্যে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে মতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এবং বিদ্যালয় ও বাইরের সমাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধের ওপরেও শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব আলোকপাত করে থাকে। অতএব শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব হচ্ছে কতকগুলি মৌলিক ধারণা যথা,—কৃষ্টি, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিত্ব এবং বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় বহির্ভূত বলীয় প্রতিক্রিয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ। ক্রমশঃ

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭৩)

...সবে তিনি যাননি, ...কিন্তু তোমাদের মানসিকতা সে কথা যে ধরতে পারে না সেইখানে তোমাদের নিষ্ফলতা...।...এখানে জিনিষ প্রচুর আছে—কিন্তু তোমাদের শৃঙ্খলা বোধের অভাবে তার খুব স্বল্প ব্যবহার হয় না।... তোমরা বেড়া বাঁধ—আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেন? আমার দরকার কি? আমি আজ আছি কাল নেই... তবু তোমাদের কর্মের, তোমাদের কষ্টের সাক্ষী থাকি;... তোমাদের সব কিছুর সঙ্গে যে আমি তোমাদের সঙ্গী, বন্ধু—এইটে যাতে তোমরা বুঝতে পার। কিন্তু যেহেতু আমি তোমাদের বন্ধু—অতএব তোমরা সব দিকেই আমার সমান—এমন ভুল যুক্তিতে যেন তোমাদের পেয়ে না বসে—তোমাদের থেকে সব দিকে বড় হয়েও বন্ধু হওয়া যায়—এইটে আজকের দিনে বুঝতে হবে—ভালবাসায় শ্রীভগবানও আমাদের বন্ধু হতে পারেন। তাই বলে কি তিনি আমাদের সমান, না আমরা তাঁর সমান?... নিতাগোপাল, তুমি চিনির পাহাড়, আমি পিঁপড়া—এক কণা নিলেই আমার চলে—কিন্তু সে বোধ যদি আমার না থাকে—আমি যদি মাত্রা ছাড়িয়ে চাইতে যাই?.. সংযত হও, সংযত না হলে বস্তুর মূল্য দিতে পারবে না চাল তেল নুন—প্রচুর—। এখানে ওটা পড়ে আছে, ওখানে সেটা...এতে বস্তুর মূল্য দেওয়া হয় না। ...সংযত না হলে, শৃঙ্খলাপূর্ণ না হলে আজ যে কৃপা পাচ্ছ সে কৃপা থাকবে না একদিন দেখবে সব শুকিয়ে গেছে ..সে দুর্ভাগ্য তোমাদের না হোক...। এমন সোনার মানুষ নিত্যগোপাল—এখানে এসেও যদি নিজেরা আগের মতই থেকে যাও তাহলে আসার সার্থকতা কি?... তিনি এসেছেন একথাটা যদি সামান্যও উপলব্ধি করতে পার, যদি বিশ্বাস কর তিনি অপূর্ব কিছু এনেছেন—তোমাকে সেই অপূর্বত্ব দিয়ে জীবনকে গড়তে হবে—তাহলে প্রকৃতি বদলাবে নিশ্চয়। বিশ্বাস কর তিনি এসেছেন—তোমাদের জীবনে তাঁকে আনতে যাও।

...তাঁর তত্ত্বাবধায়ী জীবন চালাতে হবে...। এক জনের দোষ প্রত্যেকের—অপরের দোষ দেখিয়ে নিজে নিষ্কলুষ হতে যেয়ো না।...রাধুকে তার দোষের কথা বললে সে অমনি বলবে, পতিব্রতপাই, ভাদুও করেছে—এ মনোবৃত্তি যেয়ো না। নিজের দোষ স্বীকার করতে শেখ, অন্যের দোষের জন্য যে তুমিও দায়ী এটা বুঝতে শেখ। গান্ধীজী সব সময় নিজের দোষ স্বীকার করে গেছেন—তাই তাতে তো তিনি ছোট হয়ে যান নি। তাতে ছোট তাদেরই হয়—এই বুঝি আমার দোষ দেখলে।... সকলের দায়িত্ব সমান—কোন ভুলের জন্য কারো একলা দায়িত্ব নয়—সকলের দায়িত্ব রয়েছে...। নিত্যগোপাল এসেছেন—নিত্যগোপাল এসেছেন ...।

৯, ১, ৫৭...গত শনিবার যতিলাল হিটলারের নকল থেকে যে পাঠ হয়েছিল, তাতে একটা কথা ফুটে উঠেছে যে, সেদিন আন্দোলনের দিনে একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল আমাকে প্রকাশ্য বাধা দিয়েছে। ঘটনাগুলি আমি ভুলেই গিয়েছিলাম—মানুষের সঙ্গে প্রীতিটাই মিলনটাই আমার শেষ কথা কিনা তাই অপ্রীতির কথাটা মনে থাকে না।... মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সেই প্রাণের প্লাবনে বাংলা দেশ—বিশেষ করে যতিলাল—আমাকে নেতৃত্বে বরণ করল।... প্রাণ-প্লাবনে ভাটা আসে যদি বুদ্ধি দিয়ে ধরে রাখা না যায়। আমার সুবিধা ছিল ঐ প্রাণ-প্লাবনকে বুদ্ধি দিয়েও পেয়েছিলাম। তাই আন্দোলনে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলাম।... ঐ নিত্যগোপালকেও আমি প্রাণে ও বুদ্ধিতে দুই ভাবেই পেয়েছিলাম...জীবনে প্রতি মুহূর্তের জন্য ঐ দুখানি ছিল সামনে।... সি আর দাসের স্বরাজ পার্টির মত ছিল কাউন্সিলে প্রবেশ—বুদ্ধিমানের দল তাঁকে সমর্থন করে...আমি চাপে পড়লাম...আমি প্রাণে প্রাণে দুয়ারে দুয়ারে আন্দোলনে বিশ্বাসী। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ছাড়তে হল।...স্বরাজদলের সঙ্ঘ গড়ে তুলেও তাকে সঙ্গে রাখতে চাইলাম তাকে সেক্রেটারী করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করতে রাজী হলেও তাঁর সঙ্গেও থাকা গেল না। বেরিয়ে পড়েছিলাম সেখান থেকেও :... বুদ্ধিমানদের সঙ্গে সেদিন পেরে ওঠা গেল না ...তবু তারা আমায় গ্রাস করতে পারল না। পাপে বর্ষ হল—ঐ ক্লেদপূর্ণ রাজনীতিতে থেকে গেলে আজ আর এখানে এসে বেদান্তের গজল করতে পারতাম না। আমার বাগ্মীতা, আমার প্রতিভা, আমার যোগ্যতা মানুষ যেন সহ্য করতে পারত না—তবু সব দুর্যোগের মধ্যে দিয়েও ঠাকুর আমায় রক্ষা করে এনেছেন।... তোমরা আজ খাটছ...আমি একদিন থাকব না...সেদিন যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে।...বুদ্ধির স্থান সংসারে হয়—কিন্তু আমার প্রাণের স্থান এখানে হবে কেমন করে?.....যে প্রাণ বুদ্ধিবাদ্য যুক্ত নয়, সে প্রাণ কোনদিন নেতৃত্ব করতে পারবে না!...কিন্তু যে প্রাণ নিত্যগোপালের প্রসাদে পেয়েছি, তাতেও একটা বুদ্ধি আছে, যা বুদ্ধিমানের বুদ্ধি নয়—ওটা আসে শরণাগতি থেকে। মহানির্বাণ মঠে জনসাধারণের ঢোকা সহজ হবে না, তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রেখে গেছেন... কিন্তু নিত্যগোপালের তত্ত্বাবধায়ী জীবন যাপন না করলে জনসাধারণের হাতে গিয়েই পড়তে হবে...।...নরনারায়ণ আশ্রমও অবশ্য সেরকম public নয় যেখানে জোরেই কাজ হয় ...গায়ের জোরে এখানে থাকতে পারবে না...। অতি বুদ্ধিমান লোক শয়তান হয়...তারা রাত ১২টায় ভোট নেয়...ও সব শয়তানের ধৈর্য তিতিক্ষা খুব...ভাল মানুষ যারা তারা অত গোলমাল সহ্য করতে পারে না ...। বুদ্ধিমানদের যেসব ভাল যোগ্যতা আছে সেগুলি আয়ত্ত করতে চেষ্টা কর।... ভাবুকতায় কোনদিন কোন প্রতিষ্ঠান চলবে না... নিত্যগোপাল পাদপদ্ম মাথায় ঠেকিয়ে চলেছি...বুদ্ধি দিয়ে তাকে বুঝেছি, প্রাণ দিয়ে তাকে বুঝেছি...। নিশীথ মুখুজ্জের কাল বলেছিলাম রাধাকৃষ্ণের বিরুদ্ধের যে-কোন অভিযোগ আমি বেকসুর খালাস করে আনতে পারি।... বুদ্ধি দিয়ে প্রজ্ঞা দিয়ে বোঝ, প্রাণ দিয়ে ভালবাস... যোগ্য হও।...প্রাণের বিপদ অনেক ...যেহেতু মেয়েরা প্রজ্ঞার সাধনা করে নাই, সেজন্য চির কাল দাসী হয়ে রইল...। নিত্যগোপাল সর্বতোভাবে তোমাদের

প্রজ্ঞাবান ও প্রাণবান করুন...আমার প্রাণের সঙ্গে প্রজ্ঞা ছিল বলে আমি এতদূর আসতে পেরেছি আমাকে বিচার কর, বিশ্বাস কর ·· নয়নারায়ণ আশ্রম চিরজীবী হউক

১২, ১, ৫৭—ওঁ···· পুরুষোত্তম-জীবনের এক অর্দ্ধেক আত্মা, আর এক অর্দ্ধেক সর্বভূত। আত্মাকে কেন্দ্র ধরা হয়েছে, সর্বভূত তার পরিধি। আবার সর্বভূত কেন্দ্র, আত্মা তার পরিধি। এই দুটোকে মিলিয়ে দুইদিকে সমান জোর দিয়ে সামগ্রিক জীবন যাপন করতে হবে···। মনের সাধ্য নাই দুই দিক রক্ষা আত্মাকে কেন্দ্র করে যারা তারা ভাবুক হয়.... আর এক দল সর্বভূতকে কেন্দ্র করে আত্মা সম্বন্ধে উদাসীন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ দুইটিকেই সমভাবে বিচরণ করেছেন...। আত্মার কেন্দ্র জ্ঞান-প্রধান বা ভক্তি-প্রধান, সর্বভূতকেন্দ্র কর্ম-প্রধান। কর্মের বিপদ সে আত্মাকে অস্বীকার করে বা উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে চলতে চায়···কিন্তু সংসার সংসারকে রক্ষা করতে পারে না যদি আত্মা ঠিক না থাকে···। এতথা আজ এজন্য আলোচনা করছি যে নয়নারায়ণ দুটোকে সমান মূল্য দিতে চায় ··· কোন একটাকে নেওয়া মানুষের জীবনে সহজ নয় তাই যে কর্মের টানে মানুষ কেন্দ্র ভোলে,···মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, কোন একটা দিক মানুষকে পেয়ে বসে—এটাও সত্য কথা...। সেইদিক থেকে খুব সাবধান হতে হবে। আশ্রমে তোমাদের এ বিষয়ে খুব সচেতন থাকতে হবে—আশ্রমে যা হয়েছে এবং আরও যা হবে—এসব লাইব্রেরী করতে হবে, প্রেস করতে হবে ···—তাতে তোমরা যেন আত্মহারা না হও—খুব সাবধান—কর্ম বাড়াতে খুব সাবধান। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ভক্তি ও প্রেম যদি বাড়াতে না পার তবে কর্ম বিপদে ফেলবেই।...আমি আত্মহারা হই নি বলে বেঁচে আছি···। রাজনীতি নিয়ে, সংসার নিয়ে, তোমাদের নিয়েও মেতে যেতে পারতাম যদি না আমার কেন্দ্র ঠিক থাকত।··· ভারতীয় ঋষিরা জানতেন যে কর্মের টান—অবিমৃশ্যকারিতার টান—কত প্রবল। তাই তাঁরা কর্মমাত্রকেই বন্ধনের কারণ বলে সাধকের পক্ষে কর্মকে গোড়াতেই ত্যাগ করতে বলেছেন। আত্মহারা হতে নেই, মাততে নেই, উন্মত্ত হতে নেই...কাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না...। মানুষ শেষপর্যন্ত ভগবানকেই যদি দেয়···পুত্রকন্যার সঙ্গে সম্পর্ক তো খানিকটা প্রয়োজনগত—তাদের বাদ দেওয়া যায় না—কিন্তু ভগবানকে যে দিনান্তেও একবার স্মরণ তার না দেওয়া তো তিনি আমাদের গলা টেপে ধরেন না···তিনি স্বপ্রকাশ—তিনি অনন্ত করুণাময়—কিন্তু প্রকৃতিকে অস্বীকার করলে সে গলা টিপে ধরে...। বাদ দাও দেখি ভাতকে একদিন···বাদ দাও বাতাসকে—পারবে থাকতে? কিন্তু ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করলে আমার দৈনন্দিন জীবনে কোনো অসুবিধা করতে হয় না এমন হতে পারে—তবু খুব ভালভাবে মনে রেখো নয়নারায়ণ আশ্রমে যারা এসেছ তাঁরা নিত্যগোপালের জন্য বাঁচবে—নিজেদের প্রয়োজনে বাঁচতে যেয়ো না।...মনে কর কেন্দ্রকে ভুলে যাও নি—সব ঠিক আছে.. কিন্তু ঠিক ভুলে গেছ তাঁকে, মূল্য তাঁর কমে গেছে।···আশ্রমে যারা থাকবে তাদের প্রতি এই আমার একমাত্র কথা—ঠাকুরকে ভুলো না, উজ্জ্বলভারতকে ভুলো না।...স্বামীকে সাজাবার জন্যই পুত্রকন্যা দরকার—সেবে স্বামীই ঘুরে চলে যাবে—পুত্রকন্যা বড় হয়ে ওঠে ...নিত্যগোপালকে ভুলোনা, উজ্জ্বলভারতকে ভুলো না—তাঁদের মূল্য যেন এতটুকুও কমে না যায়···। দশ হাজার টাকা পেলে তোমরা এসবই ভুলে যাবে... আমি নেই না···টাকাকে আমি ভয় করি.. যার টাকার মধ্যির সেই টাকা তার গুণ গাইবে···। দারিদ্র্যের সাধনার মধ্য দিয়ে নিত্যগোপালের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-সমন্বয়ের পথে চলো·· নিজের শক্তি দিয়ে সফল কর...। প্রাণের পথে টাকা আসে বিশ্বাস কর—সেই টাকা নেওয়া যায়···একজনের দশ হাজার টাকা চাই না—দশহাজার জনের দশ হাজার টাকা চাই।···বাইরে যখন গোলমাল হচ্ছে তখন খুঁজবে নিজের অন্তরে কোথাও ত্রুটি ঘটেছে কিনা—কড় উঠল কেন? খুব সাবধানে বিবেচনা করে দেখতে হবে...।···

১৩, ১, ৫৭ ··নিত্যগোপাল একটা নূতন বিশ্ব তৈরী করতে এসেছেন একটা দার্শনিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। অবশ্য এ সৃষ্টির পরিকল্পনা পাঁচ হাজার বৎসর আগে শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে এতগুলি রাজ্য-বিপ্লব ও এতগুলি ধর্ম-বিপ্লব হয়ে গেল ...আচরণের দিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রাণ-দর্শন অনেক মহাপুরুষের জীবনে এই এত বছরের ইতিহাসে পাওয়া যাবে—কিন্তু যে দার্শনিক কাঠামোটা এই প্রাণ-দর্শনকে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করাতে দরকার—তা কারুরই কয়েক হাজার বছরের মধ্যে ছিল না প্রচলিত স্থিতিশীল দার্শনিক কাঠামোকে কেউই বদলে দিয়ে যান নি...এই বৎসর পরে বর্তমান সময়ে নিত্যগোপাল সেই কাজটী করলেন...। জাতিভেদ তুলবার চেষ্টা মহাপ্রভুও করেছিলেন কিন্তু ঐ দার্শনিক কাঠামো না বদলাবার জন্য ব্রাহ্মণ বৈরাগী আর নব বৈরাগীতে পার্থক্য এসে যায়—বৈরাগী হয়েও যোগানাপিতত্রাহ্মণ হওয়ার বিচার বোধ দিতে পারে না।···তাঁরা অতীতের দর্শনের ওপরেই ভাগবত-ধর্ম প্রচার করেছেন। তা তো সত্যিকারের পরিবর্তনকে আনতে পারবে না ···এখানে যারা এসেছে তারা এই গোড়ার কথাটা বুঝবে—এতদিনের দার্শনিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে বর্তমান যুগ-চেতনাকে নিত্যগোপাল যে রূপ দিয়েছেন তাকে প্রশাসন করতে হলে। নিত্যগোপাল যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে চাইলেই আমাদের এখানে থাকার অর্থ হবে ··· সঙ্ঘ আমি সহজে গড়ি নাই···।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

দোলপূর্ণিমা ঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব—বিশ্বের রসসত্তা যে divine হয়, ভাগবতী হয়—উহা যে শুধু বন্ধনের হেতু হইয়া মানুষকে কেবল গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করে না, তাহারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় উত্তম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সেই কত কত বৎসর আগে। তাঁহার সমস্ত জীবনটীর সমস্ত দিনগুলিতেই এই রস-সত্তার ভাগবতীকরণের দৃষ্টান্ত, তবু এই একটী দিন কিছু বিশেষত্ব অর্জন করিয়া বসিয়া আছে এবং আমরা এ দিনটী পালন করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ইহার অর্থ বুঝি কি? দোল একটি সার্বজনীন অনুষ্ঠান—সব মানুষ সব মানুষকে ভালবাসিবে, একে অপরের কল্যাণ কামনা করিবে ইহাই দোল উৎসব। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে যে কোন প্রাকৃতিক বাধা থাকিতে পারে না, অথচ তাহা ধ্বংসাত্মক উচ্ছৃঙ্খলতারও জনক না হইয়া পারে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন তাহারই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমীর চিন্তা-ধারায় পচনধর্মী রসসত্তা ক্ষেত্রের চিরস্থায়ী ছাপ যখন করিয়া কেবলমাত্র ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি সত্তার ব্যবহারিক সত্তো টিকিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন রসসত্তার পচনধর্ম তাহার স্বভাব, কিন্তু পচনধর্মী বলিয়াই সে অসত্যই বা হইবে কেন, অপ্রয়োজনীয়ই বা হইবে কেন? তাহার বিশিষ্টতা লইয়াও তাহার চলার একটী ছন্দ-বিজ্ঞান আছে—তাহার বিগলীত অপচনধর্মী সত্তার সঙ্গে মিলিয়া বিশ্বে সে চিরন্তন। তাহার চলার ছন্দ-বিজ্ঞান বলে রসসত্তার পচনধর্ম তখনই ধ্বংস আনয়ন করে না যখন সে তাহার স্বরূপে স্থিত হইয়া বিশ্বরূপ জীবনে সুখদা হয়—দোল লীলা এই বিশ্বরূপ জীবনের একটী উৎসব-মুখর রূপ, সকলের সঙ্গে আনন্দিত হওয়ার একটী অবসর মুহূর্ত। দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের উত্তম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মত একজন সর্বাধীন বিপ্লবীর বিপ্লবধর্মের খোঁজ আমরা রাখিলাম না!

দীর্ঘ কয়েক হাজার বৎসরের ব্যবধানেও যখন

শ্রীকৃষ্ণের বিপ্লব-ধর্ম মানুষের সভ্যতার ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছিল না, তখন তাহাকে তৎকালীন আবেষ্টনে অনেকখানি রূপ দিতে এই দোলপূর্ণিমার দিনেই বর্তমান ইতিহাসের ধ্বংসোন্মুখ মধ্যে আবির্ভূত হইলেন রসরাজ মহাভাবময় শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর। সমস্ত মানুষকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিবার প্রাণের পথেও যে ব্রাহ্মী স্থিতি ওতপ্রোত এবং সেই পথেই যে জীবনের রসসত্তাও ক্লেদমুক্ত, সেদিনকার তাঁহার গৌরাঙ্গ-সুন্দর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রেম-স্বরূপতা আবার সেই বিপ্লব—সামাজিক কলঙ্ক দূরীকরণে প্রেমের সহজ রাস্তায় তাঁহার অবাধ বিচরণ। শ্রীকৃষ্ণের নব কলেবর সেই গৌরসুন্দরকে ফাল্গুনীপূর্ণিমার এই দিনটীতে স্মরণ করি, প্রণত হই। কিন্তু যে ভাবে বাংলাদেশ তাঁহার বহুগভীর বিপ্লব আর অনুপম বিশ্বজনীন প্রেম ভুলিয়া তাঁহাকে চিরাচরিতভাবে ঘর-দালান পুতুল ঠাকুরে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা সে ভাবে তাঁহার পূত চরিত্র স্মরণ করিব না। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ক্লেদপঙ্কিল দৈনন্দিন জীবনের সর্ব স্তরকে যে ইনি পরিশুদ্ধ করিতে পারেন তাহারই দৃঢ় ও স্পষ্ট আশ্বাস লইয়া আমরা তাঁহাকে সমাজ-জীবনে মানুষের কাছে উপস্থিত করিতে চাই। ইহা বোধহয় অনেকাংশে সত্য যে বাংলাদেশের এক ব্যবসায়ী মহল এই বিপ্লবী ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা করিয়া থাকেন—অথচ এই ব্যবসায়ী মহলই দেশের দুর্নীতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এই দেশের এইটাই সকলের অপেক্ষা বেশী দুশ্চিন্তার কারণ যে ইহারা তিলক কাটিয়া চুরী করে, গলায় তুলসীর মালা দিয়া পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। অথচ মহাপ্রভুর পূজা করিতে হইলে কি রকম হওয়া উচিত? মহাপুরুষদের পূজার অধিকার জন্মগত জাতিকুলশীলদ্বারা স্থিরীকৃত হওয়া যেমন অপরাধ, তেমনি পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া যাহারা নিজেদের বড় করে, অপরকে ঠকাইয়া যাহারা নিজেদের উদর স্ফীত করে, অপরকে অপমান করিয়া যাহারা নিজেদের সম্মান রক্ষিত হইল মনে করে, তাহাদের পূজার অধিকার থাকাই অপরাধ। শ্রীগৌর-সুন্দর এ সকল পূজা গ্রহণ করেন না বলাই বাহুল্য। তিনি বিপ্লবী চরিত্রবান হৃদয়বানের পূজা চান। পাপীকে তিনি ভালবাসেন—কিন্তু পাপ আমি করিয়া যাইতেই থাকিব, আর তিনি আমায় ভালবাসিতেই থাকিবেন তাহা হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ জন্মক্ষণে আজ প্রার্থনা করি, আমরা যেন চরিত্রবান হই, আমরা যেন হৃদয়বান হই, আমরা যেন বীর্যের সঙ্গে মানুষকে ভালবাসিতে পারি, ভগবানকেও ভালবাসিতে পারি। তিনি যে তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহার দার্শনিক দুরূহতা এখানে না তুলিয়া বলি—তিনি যেমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তেমনি জগাইমাধাইকে কোল দিয়া তাহাদের প্রকৃতি বদল করিয়া সমাজ শুদ্ধ করিয়া ছিলেন। তাই তাঁহাকে ভালবাসিতে চাহিলে আমাদিগকে কৃষ্ণকে পাইবার জন্যও কাঁদিতে হইবে—আবার কৃষ্ণকে পাইতে হইলে যে রকম প্রকৃতি হওয়া ও করা দরকার—সেই রকম শুদ্ধ প্রকৃতির লোক হইয়া সামাজিক আবহাওয়া পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। গৌরসুন্দর সামাজিক পরিস্থিতি আনিয়া সেদিন বাংলা দেশের ইতিহাস বদলাইয়া দিয়াছিলেন।

বুদ্ধপূর্ণিমা—বৈশাখী পূর্ণিমাকে ঘিরা বহু করিয়া ভগবান বুদ্ধ ভারতবর্ষের যে সময়টাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, আজিকার আবেষ্টন সে সময়টীকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিবে। গতিহীনতা সমস্ত জাতিকে এমন গভীরভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে জীবনে সহজ সুস্থাবস্থা বলিয়া কিছু ছিল না। আর আজ? বুদ্ধদেব ভারতবর্ষকে গতিধর্মাশ্রয় করিতে পারেন নাই, বরং তিনিই শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তবে একটা যে স্পর্শ অলক্ষিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার দর্শনের মধ্যে, তাহা চিন্তাবিদ্‌দের চিন্তার খোরাক যোগাইত। তাহার পর দীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ ঐ গতি-ধর্মকে আজ গোলামী মনোবৃত্তিতে বাস্তব জীবনের বাস্তায় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ফলে, সর্বশেষে প্রাচ্যেরও বহির্ভারতীয় প্রকারে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া আজ বা গত অন্ততঃ

চলিশ বৎসর এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন আবার ঠিক ঐ কথাই বিশেষভাবে বলিতে হইতেছে—স্থিতিহীনতা আজ সমস্ত জাতিকে

গতীরভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে জীবনে সহজ সুস্থাবস্থা বলিয়া আজ কিছু নাই। সেদিন এরকমভাবে ছিল না, আজ আর এরকমভাবে নাই। সেদিন এবং পরের দীর্ঘ দিন সমস্ত পরিবারের স্থিতিধর্মী ব্রত ও মত মিথ্যা-বাক্য অর্থাৎ যাহাকিছু গতিধর্মাত্মক তাই-ই মিথ্যা, তাই-ই বন্ধনের কারণ এই মতবাদে সমস্ত জাতিকে বাস্তবানুমুখী, কর্মকুণ্ঠ, নিবৃত্তিবাদী, সৃষ্টিক্ষমতাহীন করিয়া কতকগুলি পলায়নপর পরিণত করিয়াছিল—আজ যখন চাপে পড়িয়া আমরা গতিধর্মী হইয়াছি তখনও আমরা কিন্তু প্রকৃতি বদলাইতে পারি নাই, বাহিরে কোটপ্যাণ্ট পরিলেও আমরা তেমনই কর্মকুণ্ঠ, তেমনই বাস্তব-বিমুখী নিবৃত্তিবাদী, সৃষ্টিক্ষমতাহীন রহিয়া গিয়াছি। গতিধর্মের গুণ আমরা কল্যাণপ্রদভাবে আয়ত্ত করিতে পারি নাই। কেননা আমরা অন্তরে অন্তরে এখনও পুরোপুরি স্থিতিধর্মে আস্থাবান। আজ প্রয়োজন ভগবান বুদ্ধদেবের গতিধর্মের সঙ্গে ভগবান শংকরাচার্যের স্থিতিধর্মের সমন্বয় করিয়া একটী সামগ্রিক জীবনধর্মের। জীবন-ধর্মনের ইতিহাস হইতে এতদিনে এ শিক্ষাটুকু আমাদের পাওয়া উচিত যে জীবন একান্ত স্থিতিধর্মীও নয়, একান্ত গতিধর্মীও নয়—স্থিতিহীন গতি জড়ত্বধর্মতা, গতিহীন স্থিতি জৈব। সেজন্য শংকর-বুদ্ধ সমন্বয় আজ প্রয়োজন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-প্রণত জীবন ও দর্শন অনুসরণ করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার গ্রন্থসমূহের প্রবহমান ভাষে এই শংকর-বুদ্ধ সমন্বয়ের দার্শনিক কাঠামো দিয়া গৌরদর্শনের আলোক বিজ্ঞানবাদ ও শংকরবেদান্তের সাম্যতাবাদ কি করিয়া পুরুষোত্তম-বস্তুতে সমন্বিত হইল তাহা ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন। পুরুষোত্তম-বস্তুর জীবনবাদ হেয় সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন একান্ত একক কণাই স্বীকার করে না। সে যে অচঞ্চলের অমৃত বরিষণের মধ্যে চঞ্চলতার নিত্য নূতন আস্বাদন করে, সমগ্র চ্যুত জীবন-ধারার মধ্যে স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংমূল্যবান বর্তমান ও ক্ষণ স্বীকার করে। দৃষ্টির হিসাবের মধ্যে একে আনিতে গেলে আগে থেকেই সে সাততা অনেকটা অনেক সময় ধরা পড়িবে না বটে কিন্তু জীবন জীবনের—যেখানে বুদ্ধ ও ছিন্ন সম্পর্কের কাঠিন্য পালিয়ে গিয়েছে, মানুষের নিজের 'অহংতা'র পূর্ণ নিরসনের পথে অতীত ও বর্তমানের, ক্ষণ ও ক্ষণাতীতের বিচিত্র সামঞ্জস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। ক্ষণ ও সাততা যে পরস্পর-বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় না তার কারণ জীবনের মধ্যে এমন একটি সহজ শক্তি আছে যে প্রতিটী ক্ষণের স্বয়ংপূর্ণত্ব ও স্বয়ংমূল্য বজায় রেখেও ঐ স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ংমূল্যবান অনন্ত ক্ষণসমূহের অতীত যাইবার সামর্থ্য রাখে। সে শক্তি ক্ষণেরও বাহিরে, ক্ষণসমূহের ও বাহিরে, ক্ষণাতীতেরও বাহিরে—তাই গোঁজামিল দেওয়ার দরকার হয় না। আজ পরস্পরবিরুদ্ধ এই দুই চিন্তাধারার মিলিত জীবনবাদ মানুষের সামনে উপস্থিত করাই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—তাহাতে ভগবান বুদ্ধও বাঁচিয়া থাকিবেন, ভগবান শংকরও। আর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষও কর্মক্ষমতা, সৃষ্টিক্ষমতা লাভ করিয়া মানুষ হিসাবে সম্মানিত জীবন যাপন করিবে।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন করার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি

রামসূত্র (অবধূত গীতা)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ১।৩
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত) ৮৲
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ৬৲
ঈশোপনিষৎ ২৲
কেনোপনিষৎ ২৲
কঠোপনিষৎ ৩৲
প্রশ্নোপনিষৎ ১।০
ঐতরেয়োপনিষৎ ১৸০
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতালহরী
১২। উজ্জ্বলকাব্যেত (পুস্তিকা)
১৩ মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩৲
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)

21 MAY 1968

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৪। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

সূচীপত্র : চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৪-৭৫, ১৯৬৮

ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
শিক্ষাব্রতী সমাজতন্ত্রের (পুনরাবৃত্তি)
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত
জীবনদেবতা শ্রীনিতাগোপাল
শ্রীবেণু মিত্র
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৬৪) ৫৮
সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বাবৃত্তি) ৬৬
শ্রীশ্রীনিতাগোপাল
প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৭০)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
১৯। সাময়িকী : দোলপূর্ণিমা,বুদ্ধপূর্ণিমা

নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৫, ১৯৬৮ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র একবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুইয়ের সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

কর্তৃক

১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকা কালীন লিখিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

অবধূত-ভাষ্য

মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে জড় ও চেতনের যে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার সহিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক জীবন-চেতনার দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে, তাহা বর্তমান সমাজ-পরিশোধনে বিপ্লবী দর্শন। যে-কেহ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কথিত এই বিপ্লবী চিন্তাধারার অনুরাগী, তাঁহাকেই এই গীতা-ছাপানোর কাজে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দান করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে।

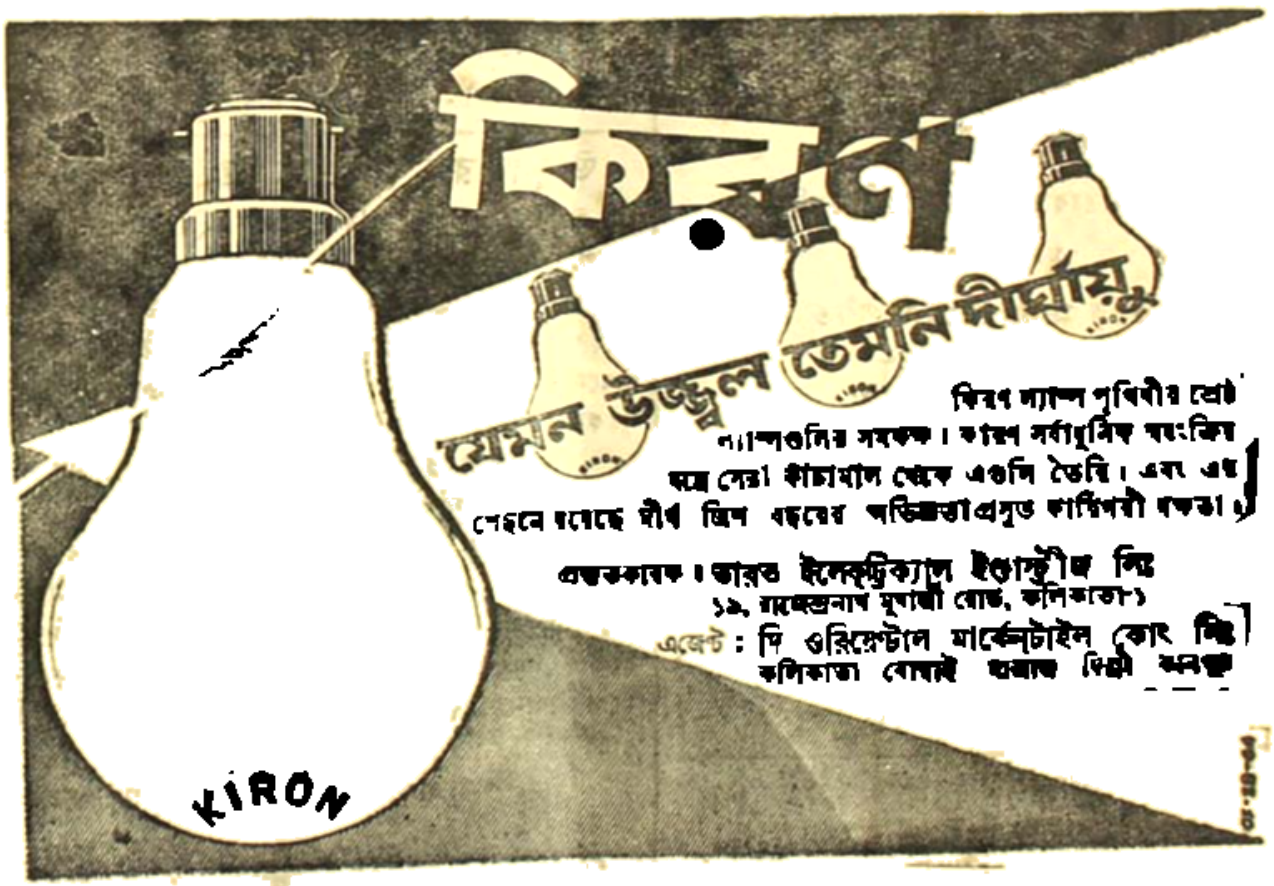

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

আত্মকথা

বা

সত্যের প্রয়োগ

মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর

সচিত্র নূতন বাংলা সংস্করণ

মূল গুজরাটী হইতে অনূদিত

অনুবাদ : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

মূল্য : ১২·০০

*

কয়েকখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

গান্ধী-রচনা-সংকলন

মূল্য ৫·০০

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

মূল্য : ৫·০০

মোহনমালা

একখানি নিত্যব্যবহার্য গান্ধীবাণী-চয়নিকা

মূল্য : ৩·৫০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিজড়িত জীবনী

মূল্য : ৫·৫০ ও ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গান্ধীজীর অর্থ নৈতিক দর্শন

মূল্য : ৫·৫০

সম্পূর্ণ পুস্তকতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রকাশন বিভাগ,

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),

১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৫, ১৯৬৮

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৭৪) ৭৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
২। কথাকলি (কবিতা) ৮১
শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার
৩। কিন্থুকিয়স ও প্লিনির পত্রাবলী ৮২
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাস
৪। শিক্ষাব্রতী সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্র (পুনরাবৃত্তি) ৮৭
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত
৫। সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি) ৯০
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
৬। মনোমাঝি প্রণতি (কবিতা) ৯৪
শ্রীভারতী
৭। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৬৭) ৯৫
৮। নারদ (কবিতা) ১০৫
শ্রীসুধারঞ্জন কাব্যতীর্থ, ভাষ্যরত্ন
৯। কঠোপনিষৎ (কবিতা) ১০৬
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
১০। সাময়িকী : রবীন্দ্র বার্ষিকী ও সমাজ জীবন ১০৭

উজ্জ্বলভারত (মাসিক পত্র, ২১শ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৪৯ প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬″×৮″।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বদ্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে জীবনের একটি সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্যাধ্যক্ষ—উজ্জ্বলভারত, নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন : ৫৭-২৫৪০

মিঃ ২৪ পরগণা গ্রাম: বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর

বরষার পথে ভরসা

একমাত্র বাটা জুতা নির্বাচনে মনোযোগ দিন, যাতে ওয়াটারপ্রুফ জুতো
বর্ষার খেলা পথে নিশ্চিন্তে বিচরণ করা। উপরে বরষার সাথিদের আদর,
ভেতরেই কিন্তু আসল সুরক্ষা। প্রতিটির আছে
সুস্থ। ভিতরে সাঁতা কাপড়ের লাইনিং, পা ঘর্মাক্ত হয়
বেশিক্ষণ আরাম। ভালো জুতা ফোম-এর সাশ্রয়ে আরাম
কখনো—বাস বা ট্রামের ভিড়ে চলন্ত ঘরে বেরবের টানি জুতা ফোমের—
এমন কোনোই নকশা যা পায়ে লাগে হুড়কায় না। আর, ফোমের জুতোই উপযুক্ত
বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো। আজ কিনুন, কাল লাগুক, সস্তা কবে কোনো
একমাত্র নয় ভিতরে কাপড়ের কাজের ৯ মাস বদল নিয়মে নতুন
বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো ঠাণ্ডায়, ভেজায়, ঝিমধরা

ওয়াটারপ্রুফ ৭.১১
২৪ ঘণ্টা

ওয়াটারপ্রুফ ৮.১৯
২৪ ঘণ্টা জলে পরা

ওয়াটারপ্রুফ ৯.৫০
২৪ : ৫৪ ঘণ্টা পর্যন্ত

বিলাসবহুল ৯.৫০
২৪ : ঘণ্টা

Bata

ওয়াটারপ্রুফ-টো ওয়াটারপ্রুফ ৯.৫০
২৪ : ঘণ্টার ভিজে জলে পরা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

বাংলার ঋষি	
বাংলার বিদুষী	
বাংলার মনীষী	
জীবন গড়া	
রাজর্ষি রামমোহন	
আচার্য জগদীশ	
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	
রবীন্দ্রনাথ	

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

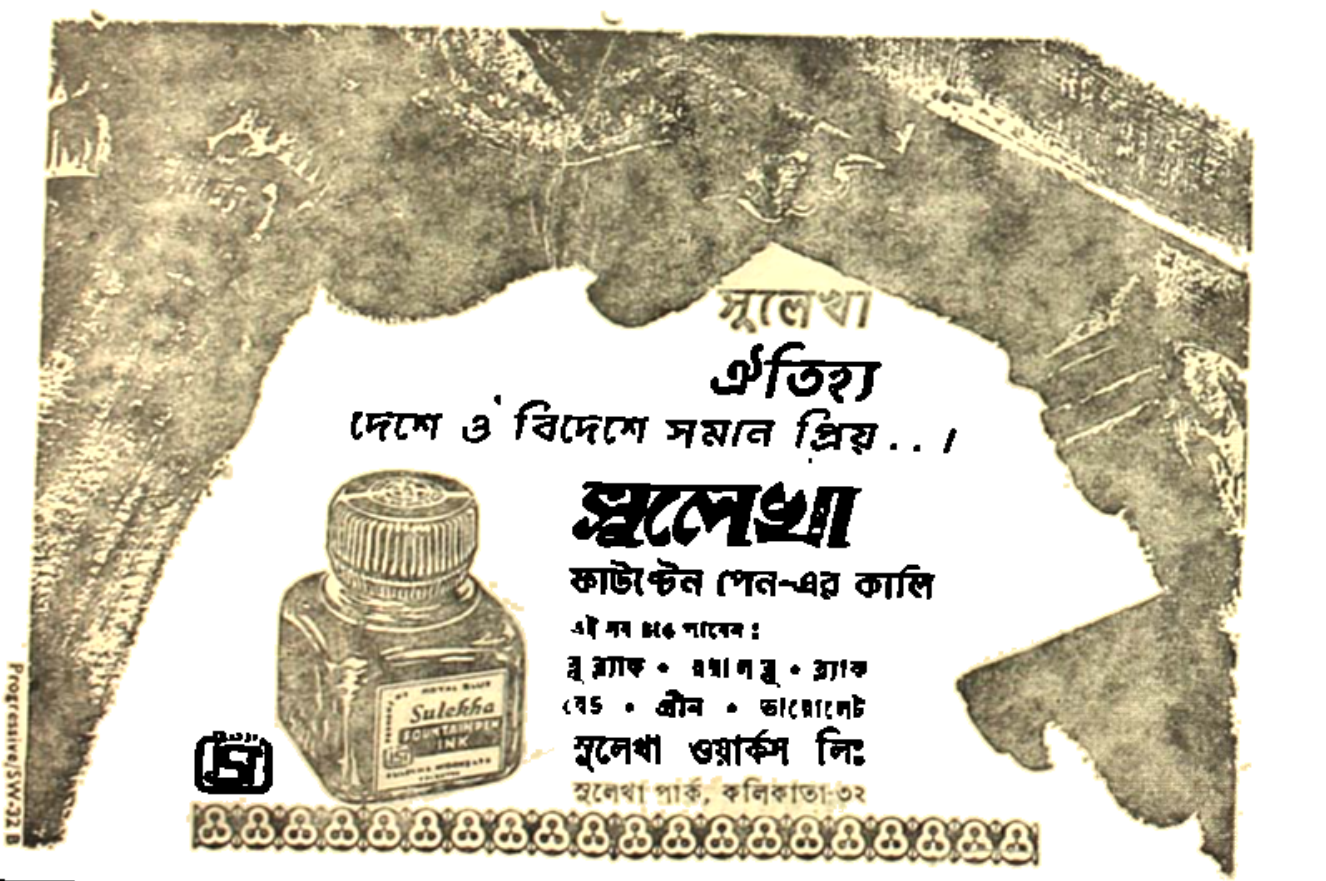

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৮ একবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭৪)

আজ (দুঃখিই বলব) করেছি একটা আশ্রম, কিন্তু ঠিকভাবে যদি না চলে ভেঙে যায় যেন...। নিত্যগোপালের সামগ্রিক জীবন-চেতনা যদি কেউ গ্রহণ করতে না পারে—তবে এ আশ্রমে যেন কেউ না থাকে···। আমার চিন্তাধারা রইল—বইগুলি রইল—নিত্যগোপাল রইলেন···। ধন-জন-পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য এই প্রাণের আন্দোলনে নাই।··· আমি আজও দাঁড়িয়ে আছি···। আমার জীবনকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করো··· সকাল সন্ধ্যায় এ জিজ্ঞাসা করা তোমাদের প্রয়োজন, 'কতখানি আমি তোমার ইচ্ছাকে রূপ দিতে পেরেছি'! জীবন একটা যজ্ঞ, মৃত্যু তার শেষ যজ্ঞ···জন্মও একটা যজ্ঞ—জীবনের সমস্ত কিছুই যজ্ঞ···। কৃষ্ণ বলেছেন অর্জুনকে—যজ্ঞের জন্য যে কর্ম না করে তাকে কর্ম বেঁধে ফেলে। সেবা করতে হবে তাঁকে—আমার কাজটুকু করলেই শুধু তাঁর সেবা হয় না। আমার করাটা এমন হল কিনা যাতে তাঁর সেবা হল সেইটুকুই লক্ষ্য রাখতে হবে।···তাঁর সেবা করতে চাইলে তাঁর সবটুকু কাজের দায়ও আমার থাকবে—কেবল আমার কাজের অংশটুকু করে রাখলেই তাতে তাঁর সেবা হবে না।···যান্ত্রিক মানুষ দিয়ে সঙ্ঘ হয় না···জীবন্ত মানুষ হতে হবে।...জীবন্ত দেহ-যন্ত্রে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই দেহকে সেবা করে···।···তোমরা যদি আমার—নিত্যগোপালেরই বলি—হতে চাও নিত্য-গোপাল-কেন্দ্রিক জীবন কর—যাঁর জীবনের দিকে তাকিয়ে পথচলা ঠিক হয়···। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সঙ্ঘ হয় না। মানুষের মধ্যে দুটো আমি আছে—একটী আমি তাকে ব্যাপকতর জীবনের মধ্যে ডাকে, অপরকে আপন করতে শেখায়, অপরকে মর্যাদা দিতে শেখায়···আবার তার মধ্যেই এমন একটী বিচ্ছিন্ন ছোট-আমি আছে যা পারস্পরিক সহযোগিতা বোঝে না, যা অপরকে মর্যাদা দিতে পারে না, যা নিজের বুদ্ধি-বোধকে, নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখে, যা অপর সকলের থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখে। এই বিচ্ছিন্ন আমি ঘুচলে সেবা হয়,···নিজের দেহ মনে করলেই যেমনধারা খেলে নিত্যগোপালের সেবা হয় সে রকমটী আর পাওয়া যায় না···। কপিল মা দেবহূতিকে বলেছিলেন দেহকে যারা কষ্ট দেয় তারা আমাকেই কষ্ট দেয়।···মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়, দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু —যেমন সমর্পণ করতে হবে—সব নিজের করে রেখে তাঁর সেবা হয় না—বিশ্বের সেবা হয় না···। কতটুকু আমার আমি রয়েছে—আর কতখানি নিত্যগোপালে তা দিতে পেরেছি—এ কথাটা ভাবতে শেখ···। পাশ্চাত্যের অহং-প্রধান কর্ম তাদের নয়—ভারত কর্ম দিয়ে সেবা করবে···। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি নিয়ে চলা কামুকতা—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বোধ থাকলে সেবা হবে।···দেহের যত

ওরা, দেহকে সাজান চলে যদি তাতে কুলদেবতা হয়—নিজের সুখের জন্য দেহকে সাজান চলে না···। যারা অর্থ আত্মনিবেদন···। প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করতে শেখো—সমস্ত দিনের কাজ দিয়ে তোমাকে খুশী করেছি তো? তুমি খুশী হয়েছ তো?···আমার কথার মধ্যে আমিত্ব আছে, না তোমার সেবা হয়েছে···? কর্মের মধ্যে অহংকার থাকলে সেটা যজ্ঞ হয় না, তাতে সেবা হয় না—তার দ্বারা শুধু ক্ষণিকের তৃপ্তি হয়। অসুর অর্থ অহংকার···Fame is the last infirmity of noble minds—যশঃ-আকাঙ্ক্ষা মহৎ প্রাণের থেকে যেতে পারে—সেজন্য খুব সাবধান হতে হয় তোমার আমির স্থানে তাঁর আমিকে বসাও···নিত্যগোপাল তোমাদের দিকে চেয়ে আছেন···তোমাদের দিয়ে তিনি উজ্জ্বল ভারত গড়তে চান—উজ্জ্বলভারত—বৃহৎ ভারত+ অসিত ভারত—মহান ভারত রচনার চেয়েও এ দুরূহ···।

১৪, ১, ৫৭—নিত্যগোপাল যে কথাটি বার বার বলতে চেয়েছেন—I am a cosmopolitan—আমি বিশ্ব নাগরিক—এটা আমাদের জীবনের মন্ত্র। যিনি বিশ্বনাগরিক তাঁর প্রেমের অন্ত নেই—তাঁর অহেতুকী কৃপা···। বিশ্বমানবের কাছে এই কথাই এই আশ্রম থেকে বলার যে আমি বিশ্ব নাগরিক। ব্যক্তিগত জীবন যাপন করার জন্য আশ্রম-নয়—বিশ্বমানবের সঙ্গে তার মেলামেশার জন্যই আশ্রমে আসা···তাঁকে ভালবাসতে গেলে আমাদেরও হইতে হবে I am a cosmopolitan···। অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম না হয়ে অসীম তাঁকে ভালবাসবে কেমন করে?···বিশ্ব-নাগরিক হতে হলে সব ধর্মকে নিজ ধর্ম, সব জাতিকে নিজ জাতি, সব সম্প্রদায়কে নিজ সম্প্রদায় বলে মনে করতে হবে···তখন ছোট আমি থাকে না—ছোট আমি থাকলে সকলকে ভালবাসা যায় না। তাঁর মত করে শিখতে হবে—তাঁর মত সকলকে—ছোট বড় সকলকে—মর্যাদা দিতে শিখতে হবে। নিত্যগোপাল, তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিশ্বনাগরিক···, অহং ব্রহ্মাস্মি+আমি বিশ্বনাগরিক=পুরুষোত্তম-আমি···আমার স্বতন্ত্র কোন প্রয়োজন নেই—বিশ্বকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছিলাম···। ব্রজমোহন স্কুলে মাষ্টারী করি যখন তখন 'বিশ্বকল্যাণ সভা' বলে একটী সমিতি করেছিলাম—সেই তখন থেকেই শুধু নিজের কল্যাণের কথা ভাবি নাই—সব মানুষকে শুভ চেয়েছি। বিশ্বটাকে ভাল লাগত। নিত্যগোপাল, তোমার স্পর্শ পাওয়ার পর থেকে আরও ভাল লাগতে থাকে—সেই ভাল-লাগার দার্শনিক সমর্থনও পেয়ে যাই···কাগজের উপরে একটী ছবি দেখেছিলাম—একটা খুব শক্তিশালী লোক একটা পৃথিবীকে মাথা দিয়ে ঠেলছে—খুব ভাল লেগেছিল—আজও আমার এ ছবি ভাল লাগে···। আমার মনে হয় একটা ঠেলা দিয়ে যদি পৃথিবীটাকে একটু এগিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে প্রাণে শান্তি পেতাম! নিত্যগোপাল, তুমি আমার সঙ্গে থেকো। নিত্যগোপাল, দিন গেল—শরীর যে ক্রমে দুর্বল হতে চলল, তুমি কোথায়—তোমার ভবের প্রতিষ্ঠা কোথায়?—মহাভারত রচয়িতাই উজ্জ্বলভারত রচয়িতা···বিশ্বকল্যাণ-মূর্তি, তোমায় নমস্কার···একলা কি করে কাজ হবে—বিরাট মানুষের দরকার···কে আসবে?···ক্ষুদ্র বুদ্ধি ক্ষুদ্র সেবা সকলের ভুলিয়ে দাও···নিজের ভাগ্যের সঙ্গে বিশ্বের ভাগ্য মেলাতে হবে···। যখন যা করেছি, বিশ্বকল্যাণ-বুদ্ধিতে করেছি···নিত্যগোপাল আমার নাথ, নিত্যগোপাল জগন্নাথ···।

১৭, ১, ৫৭ গতকাল কলকাতার মহাজনের সভায় নেহরু বলছিলেন বিশ্বটা আজ খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে—২৪ ঘন্টায় সমস্ত পৃথিবী ঘোরা যায়···। বিশ্বের প্রত্যেক দেশ আজ প্রত্যেক দেশের প্রতিবেশী;··· ভাস্কোডাগামার আমেরিকা আবিষ্কারের সময়ে পৃথিবীটা কি ছিল, আর আজ পৃথিবী কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজ এক দেশের ঘটনা বা অবস্থা আর এক দেশের উপর প্রতিক্রিয়া আনছে কত রকম ভাবে—আদর্শের দিক দিয়ে—জীবনযাত্রার দিক দিয়ে, আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে—এক দেশের মাল আর এক দেশে বিক্রী করতেই হবে। আবার ভাল দিক দিয়েও—এক দেশের ওষুধে আর সব দেশ উপকৃত হচ্ছে—বিজ্ঞানের উন্নতি যে

দেশেই হোক তা সকলের হচ্ছে··· নিতাগোপাল ১০০ বছর আগে এই কথাটাই তাঁর I am a cosmopolitan কথার মধ্য দিয়ে বলে গেছেন—নিতাগোপালকে ধরলে আমরা এ তত্ত্ব পাব ···স্বরূপকে ভুলে বিশ্বরূপকে পাওয়া যায় না, বিশ্বরূপকে ভুললেও স্বরূপকে পাওয়া যায় না—মায়াবাদ এদেশে আসতে পারল স্বরূপের উপর জোর পড়ায়।...এই বিশ্বনাগরিকতার তত্ত্ব—এই স্বরূপ-বিশ্বরূপের সামঞ্জস্যের তত্ত্ব যত আসবে তত মানুষের হৃদয় ফুটবে—তত মানুষ নির্বোধ হয়ে পড়বে। হৃদয়েরও অবশ্য একটা বুদ্ধি আছে—সেটা হৃদয়হীন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি থেকে আলাদা জিনিষ···। অনেকবার বলেছি আজও বলি—এই হৃদয় নিয়েই সারা জীবন চলেছি... বুদ্ধিমানের বুদ্ধি দিয়ে চলি নাই।...এ পথে যদি থাকতে চাও এই হৃদয়ের সাধনা কর—বুদ্ধির কৌশল এখানে চালাতে যেয়ো না।···শত শত পরিবারে এই হৃদয় দিয়ে তাদের মত করে মিশেছি—কিন্তু কোথাও কখনই নিজের স্থিতিকে, নিজের কেন্দ্রকে হারাই নি···ঘুনরিবারে যেমন, প্রতিষ্ঠানেও তেমনি—প্রবর্তক সঙ্ঘে গেছি—তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করেছি, বৃন্দাবনে যখন গেছি তখন বৃন্দাবনবাসীই হয়ে থেকেছি···। এই যে সকলের মত হওয়া অথচ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা এটা মানুষের অহং—ছোট-আমি—থাকলে হয় না··· নিজেকে যে একটা বড়-আমির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছে সেই বড় আমি তার আমি হয়ে গেছে।... বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে আমি খুব বোকা...কিন্তু তিনি আমায় কোলে করে রেখেছেন···। কত ঘটনা আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য ঘটছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কত ঘটনা হচ্ছে আমাকে বিপদ-মুক্ত করবার জন্য। কোন আবরণ, কোন দেওয়াল আমার চারদিকে আমি দেই নি—জাতিকুলের আবরণ, পুরুষ-কৌলীন্যের আবরণ, পাণ্ডিত্যের আবরণ, মিথ্যা অহংকারের আবরণ···। মা, তুমি তো আমায় উলঙ্গ করে রেখেছ—সন্তান যেমন নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে ঘুমায়, আমি তেমনি করে ঘুমাব—আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু মা তে দেখায়ে বুঝাবে... তোমার অবতরণে বিশ্বমঞ্চ গঠিত হোক···, তুমি উজ্জয়ন্তারতের সৃষ্টি-কর্ত্রী...। নয়নারায়ণ আশ্রম ছোট কিছু নিয়ে করবার হয়নি।...সেই শুরু প্রথমে বিশ্ব-কল্যাণ সত্তা করেছিলাম—বিশ্ব-কল্যাণ ছাড়া নিজেকে নিয়ে তো কোনদিন ভাবি নি—সকলের সুখদুঃখের সাথে নিজের সুখদুঃখ মেশাতে চেয়েছি চিরদিন।··· মা দুর্গা,...আমার ব্রহ্ম-গতি, পুরুষোত্তম-গতি প্রদান কর···। ধরার ধূলি ব্রহ্ম-ধূলি হোক, ধরার মানুষ ব্রহ্ম-মানুষ হোক সমগ্র বিশ্ব সমন্বয় ক'রে বিশ্ব-নাগরিকতার মন্ত্রে, এক-বিশ্ব মন্ত্রের তালে শ্রীনিতাগোপাল-চরণে আশ্রয় পাক্ ..।

১২, ১, ৫৭—ওঁ নমো...ওঁ যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন Resist not evil—পাপকে বাধা দিও না—পাপের সঙ্গে লড়াই করতে যেয়ো না...গান্ধীজী non-resistance policy-তে চলতেন···। বাধা দিলে শত্রুর শক্তি বাড়ে। যতই বাধা দিবে, ততই সে বলবান হবে। তাহলে বাঁচবে কি করে এই তো প্রশ্ন?—ভাগবত বললেন—নিজে বড় হও। তোমার নিজের বড় হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। বড় হবে জীবন দিয়ে—গলার জোরে বা টাকার জোরে বড় হওয়া দিয়ে শত্রুর শক্তিকে বাধা দিতে পারবে না—জীবনের মধ্য দিয়ে বড় হও। বাইরের প্রাবন না আসতে পারে, কিন্তু মাটির নীচের জলের সঙ্গে যোগ রাখতে তো কেউ বাধা দিতে পারবে না, সে যোগ তো আছেই··· আমার বুকের মধ্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভক্তিতে ক্ষমায় সহনশক্তিতে অপরকে মর্যাদাদানে বড় হও।···আর একটী কথা—আজ যাকে পাচ্ছিনা, তাকে চির দিন পাব না—এ মনে নিলে তো সে চিরদিন বাধা দেবে। পুরুষোত্তম-সাধনায় তাকে একদিন পেতে হবে—এই মন নিয়ে সেই মত ব্যবহার নিয়ে চলতে হবে।...চিরদিনের জন্য দুয়ার বন্ধ পুরুষোত্তম করেন না—প্রকৃতির পরিবর্তন হলে সেদিন দেখবে দুয়ার খোলাই আছে, ছিল।...আর কাকে আমার গোপন কথা বলব? আজ যে মিত্র, কাল সে শত্রু হতে পারে···।

ভাগবত ভাই বললেন, নিজে বড় হও—তোমার অন্তরে অফুরন্ত ভাণ্ডার—সেই ভাণ্ডারকে উন্মোচিত কর।... যে কোন আবেষ্টনে পুরুষোত্তম আসেন। কালকৌলীন্য স্থানকৌলীন্য পুরুষোত্তম মানেন না।... এই স্থান যত খারাপই হোক, তার মধ্যেও আমাদের চলতে হবে—নরনারায়ণ আশ্রমের এই তো কথা।... নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তা ফুটিয়ে তোল।... ঝরনাটি হতে পারে, নদী শুকোতে পারে, কিন্তু মাটির নীচের জল কিছুতেই শুকায় না—নিজের অন্তঃসলিলা ফল্গু থেকে জল নিতে পারছ না বলেই তোমরা এগোতে পারছ না।...আবেষ্টন সেদিন ঘরিশালে কত কুৎসিৎ ছিল—ঘরিশাল পত্রিকা নিয়মিত ভাবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করত।...অহিংস অসহযোগের পথে চলেছি—অহিংস অর্থ তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, অসহযোগ মানে আমার অস্তিত্ব মানতে হবে।...এক ঝগড়াটে মেয়েলোকের গল্প আছে...। একতরফা আমি চলেছি—পাল্টাপাল্টি করিনি... একতরফা চলো—তিনি তো আছেন...বাইরের আনুকূল্য নাই-বা থাকল। আমার সম্বন্ধে ঘরিশালের চক্রবর্তিরাজ বলেছিলেন, 'যারে আল্লা টানে তারে ঠ্যাং টানা কবি কি'। ঘরিশাল পত্রিকা আমায় কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নাই।...নিজে respectable distance-এ (সম্মানজনক তফাতে) থাকতে হবে, নিজের dignity—মর্যাদা—বজায় রাখতে হবে...; তাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঘৃণা বা বিদ্বেষ বা বিরক্তি না প্রকাশ পায়...। এই স্থানে মানুষ থাকতে পারে না বলে, কিন্তু পুরুষোত্তম সব স্থানেই থাকতে পারেন, আনন্দ নিয়ে, গড়বার প্রচেষ্টা নিয়ে থাকতে পারেন—সব ঠাঁই মোর ঘর আছে...। অন্তের ভালবাসা আমরা আদায় করব—জোর করে নয়—নিজের যোগ্যতা দিয়ে—প্রাণের বিরাট ঔদার্য দিয়ে।...একলা চলবে নরনারায়ণ আশ্রম...। এখানে আমাদের এখন পরীক্ষা হচ্ছে এ পরীক্ষায় নিশ্চয় জয়ী হতে হবে—নিত্যগোপাল অযুক্ত হবেনই।... একটা ঘটনা পাঁচজনে পাঁচ রকম করে দেখে...যার যতটুকু দৃষ্টি সে ততটুকু দেখে—ষোল আনা দেখতে পাওয়ার চোখ বা প্রাণ তোমাদের আছে কি?...ঘটনাকে তোমরা নিজে বিচার করতে যেয়ো না—আমার কাছে জিজ্ঞেস করো...।

২৪, ১, ৫১—ওঁ নমো...ওঁ নরনারায়ণ আশ্রম প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একটা সমগ্র দৃষ্টির কথা বলে এসেছে—কিন্তু জীবন্তের লক্ষণই এই যে সে সমগ্র দৃষ্টি চায় না—কোন কিছুর ষোল আনা দেখতে পায় না—দেখতে শিখতেও চায় না। বীজ থেকে অঙ্কুর—তারপরে চারাগাছ...—গাছের শুড়ি শাখা ফুল ফল—এই সবখানিকে দেখতে পেলে মানুষের তত্ত্বজ্ঞান হয়—অথচ মানুষ সবখানি দেখতে পায় না—দেখতে চায়ও না।... ভ্রূণ-শিশু-বালক-কুমার-কিশোর-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্য-মৃত্যু-সবখানি দেখতে পারলে কোনো অবস্থায় মানুষ আটকে থাকে না। কোন মানুষ কেবল শিশু থাকতে চায়—সেটা সুস্থ অবস্থা নয়...। কপালে কি আছে বলে কোন লাভ নেই—এ সব ছেদো কথা—কি আছে তা এখনই দেখতে পাওয়া যায়।...জানুয়ারী মাসে ডিসেম্বর মাস না দেখতে পেলে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে যে পরীক্ষা দিতে হবে সে কথা জানুয়ারী মাসেই মনে রেখে সেইমত পড়াশুনা না করলে কপালে অনেক কিছুই থাকবে—এটা বুঝতে কষ্ট হয় কেন?...বয়স বাড়ছে, চক্ষু বাড়ছে না। Process as a whole—আশ্রমের সামগ্রিকতা—খাদ্য-পত্র-লেখা-বিজ্ঞাপন-ঘরের কাজ-বাইরের কাজ—সব মিলিয়ে আশ্রমের সামগ্রিকতা রেখে কাজ করতে হবে।...খালা সার্থক করলে সার্থক কুমার অবস্থা আসতে পারে. কৌমার্য সার্থক করলে সার্থক কিশোর অবস্থা আসবে...। প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি অবস্থা সার্থক করে চলার মধ্যেই সমগ্র জীবনের সত্যিকারের সার্থকতা।... তিনটার সময় খেলে প্রকৃতি ছাড়বে না—শিশু রস নিঃসৃত হবেই।...সামগ্রিক দৃষ্টি না থাকাটা অপর প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্যে অনিয়ম চলে না—অনিয়মে সূর্য ওঠে না, অনিয়মে চন্দ্র ওঠে না...। অনিয়ম করে চলো না—একটা ছুটো বেজে যায়—স্নান হয় না...।

অহংকারের মজাই এই—অংশ নিয়ে মাতামাতি হড়াহড়ি করে।...সব দিকে চক্ষু না রাখতে পারলে কাজ হয় না।...কোম্পানী তৈরী করার সময় লিমিটেড-ডিপার্টমেন্টের কথাও ঠিক করে রাখতে হবে...' অপ্রয়োজনের বেহুবাহু...শিশুর দল এখন না পড়লে ফলভোগ করতেই হবে...। বাল্য যৌবন জরা—যখন যেটা আসে সেটাকে সার্থক কর—মাতামাতি করো না—সবেরই প্রয়োজন আছে।.. সামগ্রিক দৃষ্টি আনতে চেষ্টা কর।...তিনি সর্বশক্তিমান—তিনি অহৈতুকী কৃপা করেন...। দিন যায়...দিনের পর দিন জীবন এগোচ্ছে কিনা, আত্মন এগোচ্ছে কিনা তা তো ভেবে দেখবে...। প্রতি দিন যদি কিছু না এগোও—চিন্তায় ঘটনায় কর্মে—তা হলে চলবে কি করে?...তাঁকে যেন বেদনা না দেই—এই রকম করে ভেবো।..তাঁর কাছে এসে যেন বঞ্চিত না হয়ে যাও...। কোথাও আটকে পড়ো না...Reality lies ahead...।

৩০, ১, ৫৭—ও...। শ্রীনিত্যগোপাল আমার জগন্নাথ—তিনি জগন্নাথ—এই তাঁর একমাত্র পরিচয়...। তিনি জগন্নাথ বলেই তিনি বিশ্বনাগরিক...জগন্নাথ বলেই সর্ব ধর্ম সর্ব তত্ত্বের সমন্বয় করতে এসেছেন—তিনি বিশেষ কোন ধর্ম সম্প্রদায় বা তত্ত্বের নাথ নন—সর্ব ভাবের সর্ব ধর্মের সামঞ্জস্য তিনি করতে পেরেছেন। আমরা এমন জগন্নাথের আশ্রিত—আমাদের সেই ভাবেই চলতে হবে—এটা জগন্নাথ ক্ষেত্র সেটা মনে রেখে চলতে হবে। একটা নিয়ম আছে জগন্নাথে গেলে সাগরের ঢেউ নিতে হয়। অহংকার নিয়ে ঢেউ নেওয়া যায় না—মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়—ঢেউ উপর দিয়ে আসে, উপর দিয়ে যায়। যারা জগন্নাথের ...এই জগৎকে যদি ভালবাসতে হয় তাহলে তাদের ঢেউ নিতে হবে—ব্যক্তিগত জীবন যাপন করলে ঢেউ কম আসে—অসীমের মধ্যে দাঁড়ালে অনেক ঢেউ আসবেই। ঢেউ আমাকে নিতে হচ্ছে বটে! জগন্নাথের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তাই এত ঢেউ আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে নদীর ঢেউ থামে, সাগরের ঢেউ কখনও থামে না জগতের সেবা করলে সাগরের ঢেউ খেতে হবে দুই সাগর—মহাপ্রভু আর সমুদ্র। মহাপ্রভু প্রেমের সাগর চণ্ডালের সাথে একত্র খেতে হবে—কিন্তু দুর্ভাগ্য এ দেশের জগন্নাথের জমিদারী আর বাড়ল না। ওখান থেকে একটু এদিকে ওদিকে গেলেই ব্রাহ্মণ-কৌলীন্য ঠিক জেগে ওঠে কলার ভেলার মত সাগরের শবযাগস্থ হলে ঢেউ সহ্য করতে হবে পেতে হয় না—ওটা নামা প্রেমের তুফানে এ যে বিষম ঘূর্ণপাক কিন্তু অন্তরের শান্তি আনন্দ আর একাত্মতা তো নষ্ট হয় না। অহংকারের ওটা নামা অন্তরকম। তাঁর চরণ বুকে নিয়েছি—তারই জন্য মানুষকে বুকে নিয়েছি, বুকে থেকেই সে আঘাত করেছে। জগন্নাথকে নিয়েছি যখন এ আঘাত আমায় সইতেই হবে।

ক্রমশঃ

কথা-কলি

॥ শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার ॥

আঁধার ডাকিয়া কহে
আলো, ওরে আলো
জগতের সবলোক
বাসে তোরে ভালো।

আলো কেঁদে কহে, কালো,
বুঝিবেনা তাই
ভালো হতে গিয়ে কভো
নিজেরে জ্বালাই।

ভিসুভিয়স ও প্লিনির পত্রাবলী

॥ শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী দাস ॥

প্রথম পত্র

ইতালীর ভিসুভিয়স বিশ্বে সব চেয়ে পরিচিত আগ্নেয়গিরি। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে পৃথিবীতে প্লিস্টোসিন যুগে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে শেষ হিম যুগের তুষার গলিতে সুরু হওয়ার সময়ে নেপলস্ উপসাগরে ইহার জন্ম হয়। ইহা প্রথমে দ্বীপরূপে জলের উপর মাথা তোলে তারপর আগ্নেয় উদ্গম পূর্ণ হইয়া ইতালীর সহিত যুক্ত হইয়া যায়।

৬৩ খৃঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারীর আগে ইহার অগ্ন্যুৎপাত ও ভূকম্পনের কোন বিবরণ নাই, সেইজন্য মানুষের কাছে ইহার প্রকৃত রূপ অজানা ছিল। মানুষ তাই নিশ্চিন্তে ইহার পাদদেশে ও সন্নিকটে বড় সমৃদ্ধ সহর গড়িয়া তুলিয়াছিল। বিখ্যাত পম্পিয়াই ও হারকুলেনিয়ম সহর খননের পর তাহার সাবেকী রূপ দেখিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাই। এই সময় ষ্টেবি (Stabie) ও আরও কয়েকটি সহরও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। পম্পিয়াই ও হারকুলেনিয়ম সহর সম্পূর্ণ ভস্মস্তর ও কর্দমে ঢাকিয়া যায় ও বহু জনাকীর্ণ সহর দুইটি মানুষের বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যায়।

মন্তব্যজাতি ৬৩ খৃঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রচণ্ড ভূকম্পনের ফলে প্রথম ভিসুভিয়সের পরিচয় পায়। তারপর দীর্ঘ ১৬ বছর ধরিয়া মাঝে মাঝে ভূকম্পন চলিতে থাকে আর ৭৯ খৃঃ অব্দের ২৪ শে অগষ্টের ভয়াবহ রাত্রে তাহার প্রলয়ঙ্করী রূপ প্রকাশ পায়। এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সময় ভিসুভিয়াসের ছ্যাটালো শৃঙ্গ (মাথার) দিকের প্রায় অর্দ্ধেক উড়িয়া যায় ও নূতন শৃঙ্গ সৃষ্টি হয় যাহা আজ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। পুরানো শৃঙ্গের কিয়দংশ এখনও আছে তাহা সোম্মা (Somma) শৃঙ্গ নামে খ্যাত।

তদানীন্তন কালে রোমের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক ছিলেন কেয়াস্ কর্ণেলিয়াস ট্যাসিটাস্ (Caius Cornelius Tacitus)। তিনি ছিলেন ছোট প্লিনির বিশেষ বন্ধু। ছোট প্লিনির মাতুল ছিলেন তৎকালীন রোমের একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে প্রাণ হারান। তাঁহার মৃত্যুর সম্বন্ধে জানিবার জন্য ট্যাসিটাস্ ছয় বছর পরে ছোট প্লিনিকে তাঁহার মাতুলের মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করিয়া সেই রাত্রের কাহিনী তাঁহাকে জানাইবার অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে প্লিনি তাঁহাকে যে বিখ্যাত পত্র দেন তাহাতে সেই প্রলয়ঙ্করী রাত্রের অতি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম পত্রটি এখন আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এখানে পত্রের ভাবানুবাদ দেওয়া হইল।

যে ভয়াবহ বিপর্য্যয়ের মধ্যে আমার মাতুলের মৃত্যু হইয়াছে তাহার যথাযথ বর্ণনা আপনার চিরকালের বিখ্যাত লেখনীর মাধ্যমে উত্তর পুরুষদের নিকট চিরজীবী করিয়া রাখার ইচ্ছার যুক্তি অনস্বীকার্য। যদিও এই দুর্ঘটনা তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে বহু সুন্দর জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে, জনাকীর্ণ নগরকে শেষ করিয়াছে, তথাপি মনে হয়, ইহা তাঁহাকে মানুষের স্মৃতিতে অক্ষয় স্থান দিয়াছে। তাঁহার অনেক সৃষ্টি চিরজীবী, তাহা হইলেও তাঁহার নাম আপনার রচনার মধ্যে অমর হইয়া থাকিবে। সেইজন্য ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত আমি আপনার ইচ্ছা পূরণে প্রয়াসী হইলাম ; আর তাহা ছাড়া আপনি নির্দেশ না দিলেও এই কর্ত্তব্য আমি সমাপন করিতাম।

তিনি এই সময় মিসেনামে (Misenum) তাঁহার অধীনস্থ নৌবহরের সঙ্গে ছিলেন। আমার মা ২৪ শে

আগস্টের অপরাহ্ণ বেলা ১ টার সময় একটি অসাধারণ আয়তন ও চেহারার মেঘের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সেই সবে রৌদ্রে ঘুরিয়া আসিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নানের পর কিছু খাইয়া পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহিরে একটি উঁচু জমিতে সেই অসাধারণ দৃশ্য ভালভাবে দেখিবার জন্য গেলেন। একটি মেঘ—পাইনবৃক্ষের সঙ্গে ছাড়া তাহার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব—সুদীর্ঘ পাইন কাণ্ডের মত পাহাড় হইতে অতি উর্দ্ধে তীব্রবেগে উঠিতেছে আর তাহার অগ্রভাগটি যেন প্রবল বাতাসে উর্দ্ধোত্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বা নিজের ঘন ভারে নিষ্পেষিত হইয়া শাখা প্রশাখায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। তবে সেটি এত দূরে রহিয়াছে যে কোন্ পাহাড় থেকে উঠিতেছে তাহা বলিতে পারা যাইতেছে না। মেঘটি মাটি ও ভস্মপূর্ণ হইয়া কখনও উজ্জ্বল আবার কখনও গাঢ় ও দাগচিহ্নিত মনে হইতেছিল। আমার মাতুলের মত পণ্ডিত ও জ্ঞানান্বেষু মানুষের পক্ষেও দৃশ্যটি এতই অভিনব মনে হইয়াছিল যে তাহা তাঁহার ভালভাবে দেখিবার যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

তিনি একটি দ্রুতগতি জাহাজ প্রস্তুত রাখার হুকুম দিলেন ও আমার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহার সহিত যাইবার অনুমতি দিলেন। আমি আমার কাজে লিপ্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম ও তিনিও সেই আমাকে কিছু লিখিবার জন্য বলিলেন। তিনি ঘরের বাহিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসুসের (Basus) স্ত্রী রেক্টিনার (Rectina) নিকট থেকে তাঁহাকে এই বিপদে সাহায্য করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া পত্র আসে কারণ রেক্টিনার ভবনটি মিসুভিয়সের পাদদেশে অবস্থিত ও সমুদ্র পথে ছাড়া সেখান থেকে পরিত্রাণের দ্বিতীয় পথ নাই। তিনিও তাঁহার দর্শনমূলক মনোভঙ্গী ত্যাগ করিয়া ঐদার মহান প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শুধু রেক্টিনার জন্য নয় পরন্তু সেই সুন্দর সৈকত ভূমি অধ্যুষিত ঘন সন্নিবিষ্ট নগরীগুলির সাহায্যার্থে সাগরে জাহাজ ভাসাইতে বলিয়া তাহাতে উঠিলেন। তারপর যেখান থেকে সবাই সভয়ে পলায়নে উন্মুখ সেই বিপদ ক্ষেত্রের দিকে ভয়াবহ দৃশ্যের প্রতিটি অবস্থা ধীরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত নিরীক্ষণ ও বর্ণনা করিবার মত মনোবল লইয়া তিনি সেদিকে দ্রুত জাহাজ চালাইলেন।

তিনি ক্রমশঃ আগ্নেয়গিরির এত কাছে চলিয়া গেলেন যে বহু অঙ্গারস্তূপ গাঢ়ত্বের ও তাপময় হইয়া কাল পাথরের অনন্ত টুকরার সঙ্গে তাঁহার জাহাজগুলির উপর পড়িতে লাগিল। আর সমুদ্রও হঠাৎ দূরে অপসারণের ফলে জাহাজ আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনায় ও পাহাড় হইতে গড় হইয়া আসা পাথরের টুকরায় বেলাভূমি অবরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার বিপদ বাড়িয়া গেল। তখন তিনি কিরিনেন কিনা বিবেচনার জন্য কর্ণের অপেক্ষা করিলেন। জাহাজের পরিচালক তখন তাঁহাকে বলিলেন—ভাগ্য একমাত্র বীরকে বরণ করে তাই আসুন আমরা পম্পোনিয়ানাসের কাছে জাহাজ নিয়া যাই।

পম্পোনিয়ানাস সে সময়ে স্টেবিতে (Stabiae) ছিলেন —স্টেবি উপসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল ও সমুদ্রের কিছু খাম-খেয়ালী পরিবর্ত্তনের ফলে উহা বেলাভূমির সহিত মিলিয়া যায়। পম্পোনিয়ানাস যদিও তখন সাক্ষাৎ বিপদের মধ্যে পড়েন নাই তাহা হইলেও আসন্ন বিপদের অত্যন্ত কাছে থাকার দরুণ জাহাজে মালপত্র পাঠাইয়া দেন ও কিকিৎ মাত্র বিপদবৃদ্ধি ঘটিলে তীরের দিকে সোজা প্রবাহিত বাতাস বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাগর বুকে পাড়ি দিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই বাতাসের ফলেই কিন্তু পম্পোনিয়ানাসের কাছে মাতুলের যাওয়া সহজ সাধ্য হয়। তিনি তাঁহাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখেন আর খুব মমতার সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন ও সাহস রাখিতে অনুপ্রাণিত করেন তিনি তাঁহাকে শান্ত রাখিবার জন্য বাহ্যতঃ নিরুদ্বেগের সঙ্গে স্নানের ব্যবস্থা করিতে বলেন ও স্নানের পর তাঁহাদের সহিত পরম উৎফুল্লতার সহিত নৈশভোজনে যোগ দেন।

ইতিমধ্যে মিসুভিয়সের কয়েকটি স্থান হইতে বিস্তীর্ণ অগ্নিশিখা দীপ্ত হইয়া উঠে যাহার ঔজ্জ্বল্য রাত্রির তমসায় জন্য আরও দীপ্তিময়ী ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। মাতুল তাঁহার বন্ধুর ভীতি মোচনের জন্য পরিত্যক্ত গ্রামগুলি অগ্নিসাৎ হওয়ার জন্য অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন। এরপর তিনি নিরুদ্বেগে নিদ্রা যান ও কিকিৎ সুপ্তভাব জন্য

তাঁহার গভীর ও সমস্বর নাসিকাগর্জন বাহিরে অবস্থিত পরিচারকেরা শুনিতে পায়। তাঁহার কক্ষে যাইবার অল্পক্ষণ ইতিমধ্যে তপ্ত ও প্রস্তরে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ও আরও কিছুক্ষণ দেরী করিলে তাঁহার বাহিরে আসা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তাই তাঁহাকে জাগানো হয় ও তিনি উঠিয়া পম্পোনিয়ানাস ও অন্য সঙ্গীদের কাছে যান। তাঁহারা এতদূর ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে পলায়নের কথা ভাবিতে পারেন নাই। মুহুর্মুহুঃ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত কম্পিত গৃহের উপর নির্ভর করা শ্রেয়, না উন্মুক্ত প্রান্তরে যাওয়া হইলেও অত্যধিক তাপে বিচূর্ণ প্রস্তর ও ভস্মরাশির প্রাণসংহারী প্রবলধারার মধ্যে পলাইয়া যাওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেন ও তাঁহারা শেষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সবাই তখন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন কিন্তু মাতুল মহাশয় ধীরতার সহিত গভীর বিবেচনার পর উহা গ্রহণ করেন। তারপর তাঁহারা চতুর্দিকের প্রস্তর বৃষ্টির মধ্যে একমাত্র রক্ষাকবচরূপে মাথার উপর কোজনের সময় ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড দিয়া বালিশ বাঁধিয়া প্রান্তরে বাহির হন।

তখন অন্তত সন্ধ্যাকাল, তবু তখানে মধ্যরাত্রি থেকেও গভীর তমসা বিরাজ করিতেছিল যাহা কিছু মশাল ও অন্য আলোয় আলোকিত হইয়াছিল। তাঁহারা নির্বিঘ্নে সমুদ্রপথে যাইতে পারিবেন ভাবিয়া তখায় গেলেন কিন্তু দেখিলেন সমুদ্রও অশান্ত ও ভয়ঙ্কর। আমার মাতুল সেখানে তাঁহার জন্য প্রসারিত পালের কাপড়ের উপর শয়ন করিয়া দুইবার ঠাণ্ডা জল চাহিয়া খাইলেন। তৎক্ষণাৎ অগ্রবর্তী তীব্র গন্ধকের ধোঁয়ার সহিত অগ্নিশিখা আসিয়া সবাইকে বিতাড়িত করিল ও তাঁহাকে উঠিতে বাধ্য করিল। তিনি তাঁহার দুইটি ভৃত্যের সাহায্যে উঠিলেন ও মনে হয় সর্ব্বদা প্রবাহশীল কফপূর্ণ কণ্ঠনালীতে গাঢ় ক্ষতিকর ধোঁয়ার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে চলিয়া পড়েন। বেদনাময় ঘটনাটির তিনদিন পরে আবহাওয়া কিছু পরিষ্কার হইলে তাঁহার দেহটি পাওয়া যায় সম্পূর্ণ অবিকৃত ও পোষাক পরিহিত নিদ্রিত মানুষের মত অবস্থায়। তখন আমি ও আমার মা সব সময় মিসেনামে ছিলাম··· ···আর ঘটনার অব্যবহিত পরে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাই বিশ্বস্তভাবে আপনার ইতিহাসের জন্য জানাইলাম। বিদায়।

দ্বিতীয় পত্র

আগেকার প্রবন্ধে প্লিনির প্রথম পত্রের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম পত্রটি পাবার পর ইতিহাসবেত্তা ট্যাসিটাসের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় ও তিনি প্লিনিকে মিসেনামে সে সময় তাঁহার (প্লিনির) ও তাঁহার মায়ের অবস্থা কি হইয়াছিল জানাইয়া পত্র লেখার জন্য অনুরোধ করেন। প্লিনি সে সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়া ট্যাসিটাসকে তাঁহার দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন। তিনি লেখেন, আপনার অনুরোধে আমার মাতুলের মৃত্যুর পর মিসেনামে কি ভয়াবহ বিপদ ও ভীতির মধ্যে আমাদের কাটাইতে হইয়াছে তাহা আমি নিজেই আপনার জন্য লিখিতে আগ্রহান্বিত। কবি ভার্জিলের ভাষায় "যদিও আমার বিহ্বল আত্মা শিহরিয়া আসিতে চায় তবু আমার জিহ্বা তাহা বর্ণনা করিবে"।

আমার মাতুল বাড়ী থেকে চলিয়া যাইবার পর আমি স্নানের আগে পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ সময় পাঠে নিযুক্ত রহিলাম। এরপর নৈশভোজন শেষ করিয়া শয্যা নিলাম কিন্তু অস্বস্তির মধ্যে সামান্য মাত্র নিদ্রা গেলাম। বহুদিন আমরা ভূকম্পন লক্ষ্য করিয়াছি কিন্তু তাহাতে ভয় পাবার মত কিছু পাই নাই কারণ ক্যাম্পানিয়াতে (Campania) এটি একটি সাধারণ ঘটনা। সেদিন রাত্রে কিন্তু অবস্থাটা এতই ভয়াবহ মনে হইল যে শুধু কম্পন নয়, যেন আমাদের আশে পাশে সব কিছু উল্টাইয়া যাইবে। আমার মা ছুটিয়া আসিয়া দেখেন যে তাঁহাকে তুলিবার জন্য আমি উঠিতেছি। আমরা সমুদ্র ও ভবনটির মাঝখানে প্রশস্ত মুক্ত অঙ্গনে আসিয়া বসিলাম। তখন আমার বয়স আঠারো, তাই এই বিপদের মুখে লিভির বই লইয়া যেন অবসর কাটানোর জন্য পাতা উল্টানো ও উদ্ধৃতি গ্রহণ—আমার পক্ষে লাগল কি বোকামীর কাজ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

আমার মাতুলের সঙ্গে আগত স্পেন দেশীয় এক বন্ধু ঠিক এই সময় আমাদের কাছে আসিলেন আর মায়ের পাশে আমাকে বই হাতে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমার মাকে তাঁহার শান্ত ভাবের জন্য ও আমাকে বুদ্ধিহীন নিশ্চিন্ততার জন্য তিরস্কার করিলেন। তথাপি আমি বই পড়িতে লাগিলাম। যদিও সকাল হইয়াছে তবু আলো অত্যন্ত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট ছিল আর আমাদের চারিপাশের বাড়ীগুলি টলিতেছে। তাই উন্মুক্ত অঙ্গনে থাকিলেও জায়গাটি অপ্রশস্ত ও সীমাবদ্ধ। অসম্ভব বিপদের ঝুঁকি লইয়া থাকা উচিত নয় বলিয়া আমরা শেষে শহর ত্যাগের সঙ্কল্প নিলাম।

আমরা বাহির হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক-পীড়িত লোকের ঘন ভীড় আমাদের অনুসরণ করিয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিল (কারণ মন যখন আসন্ন ভয়ে বিপর্যস্ত হইয়া যায় তখন নিজের বুদ্ধির থেকে অন্যের বুদ্ধি অনেক বেশী বলিয়া মনে হয়)। বাড়ী থেকে নিরাপদ দূরত্বে আসিয়া আমরা একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভয়াবহ দৃশ্যের সামনে স্থাণু হইয়া গেলাম। আমাদের আশেপাশে ধাবিত রথগুলি সমতল রাস্তা সত্ত্বেও এত তীব্র ভাবে আগে পশ্চাতে দুলিতে লাগিল যে বড় বড় পাথরের ঠেকা দিয়াও তাহাদের স্থির রাখা গেল না। মাটির বিক্ষুব্ধতার জন্য মনে হইল সমুদ্রও যেন তীর হইতে গড়াইয়া সরিয়া যাইতেছে—অন্ততঃ তাহার তীরভূমি অনেকটা প্রসারিত হইয়া গিয়াছে ও কতকগুলি সমুদ্রের প্রাণীকে তীরে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল।

অন্যদিকে এক মসীকৃষ্ণ ভয়াল মেঘ দ্রুত আঁকাবাঁকা শিখায় ভাসিয়া পড়িতেছিল ও তাহার পিছনে ঘূর্ণিত ও বিরাট তড়িৎ শিখার বিস্তার দেখা যাইতেছিল। এই অবস্থায় স্পেনীয় বন্ধুটি গভীর আবেগ ও জিদের সঙ্গে মাকে আর আমাকে বলিলেন, যদি আপনার ভাই আর তোমার মাতুল নিরাপদে থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদের নিরাপত্তা কামনা করিতেছেন; আর তিনি যদি গভীর হন তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয় ইচ্ছা ছিল যে আপনারা জীবিত থাকুন, সে ক্ষেত্রে চলিয়া যাইতে এক মুহূর্তও দেরী করিতেছেন কেন? আমরা বলিলাম তাঁহার (মাতুলের) নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইয়া নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাবিতে পারি না। এরপর বন্ধুটি আমাদের ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বিপন্ন এলাকা হইতে চলিয়া গেলেন।

মেঘটি নীচে নামিয়া আসিয়া সমুদ্র ঢাকিয়া ফেলিতে লাগিল। ইহা ইতিমধ্যে কাপ্রি (Capri) ও মিসেনাম (Misenum) অন্তরীপ ঘিরিয়া ও ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। এবার আমার মা আমাকে পলাইয়া যাইবার জন্য মিনতি করিতে লাগিলেন, ভেদ করিতে লাগিলেন, এমন কি হুকুম করিতে লাগিলেন। আমার মত যুবার পক্ষে পলায়ন করা অত্যন্ত সহজ ছিল। কিন্তু বয়স ও স্থূলতার জন্য সেরূপ প্রচেষ্টা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও সেই একমাত্র কারণে আমার বিপদের হেতু হন নাই জানিলে সান্ত্বনার সঙ্গে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মা জানাইলেন। আমি কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া আমার সহিত যাইতে বাধ্য করিলাম। তিনি আমার পলায়নের পথে বাধা হওয়ার জন্য নিজেকে অনেক দোষারোপ করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সেই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে পরিমাণে প্রচুর না হইলেও আমাদের উপর ভস্মরাশি আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমি পিছনে চাহিয়া দেখিলাম যে একটি ঘনকৃষ্ণ কুহেলিকা যেন আমাদের অনুসরণ করিতেছে ও মেঘের মত সারা দেশের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে।

রাস্তার বাহিরে পাছে গভীর অন্ধকারে অনুসরণকারী জনতার চাপে আমরা মারা পড়ি তাই আমি বলিলাম আমাদের দৃষ্টি যতক্ষণ চলিতেছে তাহার মধ্যে চল আমরা উঁচু রাস্তার দিকে যাই।

আমরা সেখানে বসিতে না বসিতে আঁধার আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল—সে আঁধার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত নহে, নহে তাহা চন্দ্রহীন রজনীর মত, উহা সম্পূর্ণ বদ্ধ আলোক-বিহীন ঘরের মত। শোনা যাইতেছে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ

আর্তনাদ, শিশুকণ্ঠের ভীত আর্তনাদ ও পুরুষ কণ্ঠের প্রচণ্ড চীৎকার—কেউ ডাকিতেছে তাহার সন্তানকে, কেউ তাহাদের পিতামাতাকে, কেউ বা তাহাদের স্বামীকে আর পরস্পর পরস্পরের গলা চিনিবার চেষ্টা করিতেছে। কেউ তাহার ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিতেছে, কেউ বা তাহার পরিবারের ভাগ্যকে, কেউ বাজন ভীতিতে মৃত্যু কামনা করিতেছে, কেউ বা ভগবানের দিকে হাত তুলিয়া অভিযোগ করিতেছে আর বেশীর ভাগ লোকের ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে—এখন ভগবান কোথাও নাই এবং শেষ অনন্ত রাত্রি যাহার কথা তাহারা শুনিয়াছে তাহাই পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু আবার অন্তের কাল্পনিক বা ইচ্ছাকৃত রচিত ভীতিতে আরও ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আমার মনে হইতেছে কিছু লোক প্রচার করিতেছিল যে মিসেনামের একটা অংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিছু লোক বলিতেছিল সেখানে আগুন ধরিয়া গিয়াছে—সর্বৈব মিথ্যা—কিন্তু তাহাও বিশ্বাস করিবার লোকের অভাব ছিল না।

এরপর অন্ধকার কিছুটা আলোকিত হইয়া উঠিল, ইহাকে আমরা দিনের প্রকাশ অপেক্ষা বহির্গামী অগ্নিশিখার আলোক (তাহাই সত্য) বলিয়া ধরিয়া নিলাম। অগ্নি আমাদের থেকে কিছু দূরে পড়িল ও ফের আমরা গভীর আঁধারে ডুবিয়া গেলাম ও আমাদের উপর প্রবল ভস্মরাশি পড়িতে লাগিল। আমরা প্রায়ই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই ভস্ম ঝাড়িয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম, না হইলে তাহার ভারে আমরা চূর্ণ হইয়া গাদার মধ্যে পুঁতিয়া যাইতাম। এই ভয়াল দৃশ্যের মধ্যে থাকিয়াও আমার একটিও দীর্ঘ নিঃশ্বাস না পড়ায় বা ভীতির প্রকাশ না হওয়ায় জন্য আমি গর্ববোধ করিতে পারিতাম যদি গোটা মনুষ্যজাতির সঙ্গে আমিও একই ডুবোজলে জড়াইয়া গিয়াছি ও জগৎটার সাথে ধ্বংসের পথে চলিয়াছি এই বেদনাদায়ক ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া মহৎ কোন সান্ত্বনা আমার না থাকিত। শেষকালে সেই ভয়াবহ আঁধার মেঘ ধোঁয়ার মত ধীরে ধীরে কাটিল ও প্রকৃত দিনের দেখা পাওয়া গেল—এমন কি গ্রহণের সময়ের মত মৃতবৎ বীভৎসকান্তি সূর্যেরও দর্শন মিলিল। আর প্রতিটি বস্তু আমাদের (যেন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন) চোখের সামনে দেখা দিল, সব জিনিসই বরফের মত গাঢ় ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়া যেন বদলাইয়া গিয়াছে।

আমরা মিসেনামে ফিরিয়া গেলাম, যতটা সম্ভব ভোজন করিলাম, আর আশা আমরা (তার মধ্যে অধিক আশঙ্কা)র সহিত রাত্রি কাটাইলাম। কারণ ভূকম্পন তখনও চলিতেছে। অনেক প্রাণোন্মাদ লোক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ও ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া নিজেদের ও বন্ধুদের দুর্দশা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। যাই হোক আমার ও আমার মায়ের বিপদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ও আরও বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মাতুলের খবর না পাওয়া পর্যন্ত সে স্থান ত্যাগের ইচ্ছা রহিল না.....বিদায়।

"পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে বিশ্বের প্রতি স্তরে, প্রতি মতবাদে, ধর্মক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে রাসমণ্ডল-রচনার যে নিগূঢ় রহস্য গুপ্ত রহিয়াছে, পুরুষোত্তম তাহাই রাস-ক্রীড়ার ভিতর দিয়া বিশ্বের সামনে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বিশ্বরচনার ইহাই আশ্চর্য কৌশল যে, বিশ্বের স্পন্দনগুলি প্রত্যেকেই স্বয়ংপূর্ণ, এবং তাহারা এতই বিলক্ষণ যে উহাদের মধ্যে কোন যোগসূত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যোগসূত্র খুঁজিয়া না পাওয়ার কারণও হইতেছে এই যে, দুইটী স্পন্দনের ফাঁকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন বিরাট বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর। অথচ যোগেশ্বর এমন 'বিলক্ষণ' স্পন্দনগুলিকেও কণ্ঠে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া সংহত, সংবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। ইহাই রাসবিহারীর রাসমণ্ডলরচনা ও রাসবিহারের কৌশল। দুইটী দেহ সম্পূর্ণই বিলক্ষণ, অথচ দুয়ের ফাঁকে দাঁড়ানো বিশ্বরূপধারী তাহারা গৃহীতকণ্ঠ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্র

শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

মানুষ শুধু ঔৎসুক্যের বশেই নিজের পরিবেশকে জানতে চায়নি, পরিবেশের যে সমস্ত শক্তি তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সেগুলিকে জয় করবার জন্যই পরিবেশকে সে ভালভাবে জানতে চেয়েছে। এই জানার ফলে সে তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজ প্রয়োজনে তাকে প্রয়োগ করেছে। সে নিজের মধ্যে এবং অপরের মধ্যে যে শক্তি নিয়ে আভ্যন্তরীণ আলোড়ন করছে তারও সে হদিস রেখেছে। উদ্দেশ্য একই, উদ্দেশ্য হচ্ছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যক্তি বংশানুক্রম সম্বন্ধে জেনেছে, বিভিন্ন মানুষের বুদ্ধি পরিমাপ করেছে, তাদের উপার্জন-ক্ষমতার হিসেবও রেখেছে। মানুষ তার প্রাথমিক আবেগসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে, যুক্তি ও বিচারসহ কাজ করতে শিখেছে, মতামতগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করতে শিখেছে। কিন্তু জীবনে এগুলিই শেষ কথা নয়। যে সমাজের মধ্যে ব্যক্তি বাস করছে, সেই সমাজকে ব্যক্তি জানবে। সে কি পদ্ধতিতে মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা শিখবে, তা না হ'লে সে প্রকৃতি হতে যে শক্তি লাভ করছে, সেই শক্তিই একদিন তাকে এবং সমাজকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেবে। উদাহরণ স্বরূপ আণবিক শক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যদি মানবিক সংগঠন শক্তি আণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে, তাহলে তা সমগ্র মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে। তাছাড়া বহির্শক্তি মানুষের জীবনের উপর প্রভাব ক্রিয়া করে থাকে। মানুষ সামাজিক পরিবেশের অবদান। তার খাদ্য, পোষাক, আচার, আচরণ পছন্দ, অপছন্দ, ভাষা, অন্যের প্রতি মনোভাব, বস্তুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, সবকিছুই তার সমাজের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। ব্যক্তি ও সমগ্র দৃশ্য জগতের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া চলছে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া বিমুখী। ব্যক্তি সমাজকে প্রভাবান্বিত করছে এবং পক্ষান্তরে ব্যক্তিও সমাজদ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে।

ব্যক্তির বিকাশ এই পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করছে। পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করবার প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের বিষয় বস্তু।

জীববিদ্যা এবং মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্র ব্যক্তির বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষাকে যদি প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ হতে হয়, তাহলে তাকে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পৌঁছাতে হবে। শিক্ষাকে সমগ্র সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে হবে। সমাজ-তত্ত্ববিদগণ সমগ্র সমাজকে জানতে গিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করে থাকেন। তাঁরা দেশের কৃষ্টিগত ধারা লক্ষ্য করে দেখেন, সামাজিক সংগঠনকে বিশ্লেষণ করেন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতিকে আবিষ্কার করেন। ব্যক্তি ও দলের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মৌলিক প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং তার মধ্যে থেকে প্রকৃত সত্তীব সামাজিক ব্যক্তি বের হয়ে আসে।

পূর্বেই বলা হয়েছে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করবার প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু। তাহলে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বে মানুষ এবং সামাজিক সংগঠন উভয়েই উভয়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব অত্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞান। এ অত্যন্ত হালে বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে; তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থাৎ বিষয়বস্তু, কর্মপদ্ধতি, বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা ইত্যাদিতে সমাজতত্ত্বগত নীতিগুলি

প্রয়োগ করে থাকে।

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্র যদি বিচার করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে যে ঐ বিষয়টির মধ্যে রয়েছে শিক্ষার সাথে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির সম্বন্ধ, বিশেষ করে কৃষ্টির।

তার মধ্যে দেখা যায় কি ভাবে কৃষ্টি বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে, যুগ পরম্পরায় হাত বদল হয়ে নেমে আসছে গৃহ, বিদ্যালয়, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, এবং বিভিন্ন দলের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের সাহায্যে আমরা জানতে পারি কি করে সমাজীকরণ সম্ভব হয়, কি করে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া যথা—প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, সহযোগিতা, পরার্থপরতা এবং অন্যান্য ঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই সমাজীকরণ হ'য়ে থাকে। তাছাড়া, এই বিষয়টির সঙ্গে সংবাদপত্র বেতার ও চলচ্চিত্রের গভীর যোগাযোগ রয়েছে কারণ ঐগুলি হচ্ছে সমাজের মুখপাত্র এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মুখ্য অঙ্গ। তাছাড়া বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ কি ভাবে স্থাপিত হতে পারে, তাতে সমাজতত্ত্বই আমাদের দিশারী হিসাবে কাজ করে। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়বস্তু হচ্ছে শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপায়স্বরূপ, শিক্ষার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব, পাঠ্যক্রম, বিদ্যালয় সংগঠন, শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা দলের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন মানুষের ও দলের মধ্যে সম্পর্ক। এই গুলোই হচ্ছে শিক্ষাশ্রয় সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু।

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক

আমরা সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক কি তা লক্ষ্য করে দেখেছি। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব সমাজতত্ত্বেরই একটি অংশ। সমাজতত্ত্ব বিভিন্নমুখী আচার আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যথা সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সামাজিক সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বপ্রকারের কৃষ্টি বিষয়ক বিষয়। কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বে সমাজগত চিন্তাধারা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় মাত্র। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ববিদ্ শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন এবং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করাকেই শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য বলে মনে করে থাকেন। তিনি সমাজতত্ত্বেরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদি তত্ত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন।

শিক্ষাশ্রয়ী মনস্তত্ত্বের (Educational psychology) ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের নীতিসমূহ অভিজ্ঞতা লাভ বা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কি করে সবচেয়ে ভালভাবে হতে পারে, কিংবা কি ভাবে শিক্ষালাভ করা হয় সে দিকেই হচ্ছে শিক্ষাশ্রয়ী মনস্তত্ত্বের কাজ। কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব (Educational sociology) সামাজিক কার্যকারণ কি ভাবে শিক্ষালাভে সহায়তা করে তা নিয়েই নিবদ্ধ। শিক্ষা-প্রক্রিয়ার সামাজিক অবস্থাসমূহ শিক্ষার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। দুই ক্ষেত্রেই শিশুর আচার আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি সূচনা করে, কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী মনস্তত্ত্বে মনস্তত্ত্বই হচ্ছে মূল কারণ, পক্ষান্তরে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বে শিশুর নিয়ন্ত্রণ নিরূপক ভিত্তি হচ্ছে সমাজ।

নৃতত্ত্বের (Anthropology) দুটি ভাগ, একটি হচ্ছে কৃষ্টিবিষয়ক নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology) এবং অপরটি হচ্ছে সমাজবিষয়ক নৃতত্ত্ব (Social Anthropology)। নৃতত্ত্বের এই দু'টি ধারাই সামাজিক সংগঠন বিষয় সম্পর্কিত এবং সমাজতত্ত্বের সাথে তার মিলও রয়েছে, কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের সাথে নৃতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য রয়েছে।

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের সীমাবদ্ধ রূপ (limitations)

সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার উপর সমাজতত্ত্বের প্রভাবকে মোটেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সামাজিক উপাদান সমূহের গুরুত্ব খুবই বেশী, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ

নেই। সমাজতত্ত্বের উন্নতির ফলেই আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব কতখানি তা আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি। মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে বংশানুক্রমের বাইরেও যে আরও কিছু থাকতে পারে তা আমরা বুঝতে পেরেছি শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব থেকেই। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বই শিশুকে শিক্ষার সাথে জড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব আমাদের খুব বেশী দূরে নিয়ে যেতে পারছে না, কারণ শিক্ষা-দর্শনের দিক থেকে এর বিশেষ কিছু অবদান নেই। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের মতে শিক্ষার উপর সমাজের একটি প্রবল প্রভাব রয়েছে এবং শিক্ষার লক্ষ্য পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম —সমস্ত শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়াই—সমাজদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং সেই শিক্ষাই সমাজকে দিতে হবে। কিন্তু কি জাতীয় সমাজ সেটা? সেই সমাজের উদ্দেশ্য কি? সেই সমাজের চরম মূল্যবোধই বা কি? সমাজতত্ত্ববিদেরা জীবন ধারণের মূখ্য ইস্যু সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না।

সমাজতত্ত্বের উপর যদি অহৈতুক গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে সামাজিক আচার আচরণ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে সব কিছু প্রগতির মূল কথা। বস্তুতঃ পক্ষে সমাজতাত্ত্বিক বা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান হচ্ছে বাহ্যিক, বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক এই জ্ঞানের সাহায্যে ব্যক্তিকে ও দলকে ভাল করে বুঝতে পারা যায় না। যথার্থভাবে ও পূর্ণভাবে জানতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তিকে জানা, কারণ ব্যক্তিই জীবন থেকে অনুভূতি দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। "Education is concerned with men as living, feeling and potentially individual people and not merely as members of society"। অবশ্য ব্যক্তি যে ভাবে তার অনুভূতি প্রকাশ করে, যে ভাবে চিন্তা করে তা অন্যান্য ব্যক্তির কার্যক্রম ও আচার আচরণ দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু তা হলেও সেই ব্যক্তির চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ রূপেই তার নিজস্ব এবং তা স্বতঃস্ফূর্ত বটে। "No doubt the ways in which any individual comes to feel, to express himself, to will, and to act are largely governed by the ways in which other people in his society and in particular special groups of people within it, have taught him to feel, to express himself, to determine and to do. But the feelings and the actions are nevertheless his own and genuinely spontaneous—springing from within him—however much their pattern may be seen if we look at it internally, simply to reproduce that of the surrounding society"। যদি সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে ব্যক্তি সমাজের একটি কর্মীমাত্র, তার নিজস্ব কোন সত্তাই থাকবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে সমাজতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা বিষয়ের মধ্যে নয়, ঐ বিষয়টি বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যক্তিক করতে হলে যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তার মধ্যে।

"যেখানে প্রতি অংশটী (part) নিরংশ (partless, complete-in itself), প্রতি ধর্ম সর্বধর্ম, প্রতি সম্প্রদায় সর্বসম্প্রদায়, প্রতি পরিবার সর্বপরিবার, প্রতি ইন্দ্রিয় সর্বেন্দ্রিয়, প্রতি বর্ণ সর্ববর্ণ, প্রতি আশ্রম সর্বাশ্রম, প্রতি মন্ত্র সর্ব মন্ত্র, জাগ্রৎ স্বপ্নাদি প্রতি অবস্থাই সর্বাবস্থা অথচ প্রত্যেক অংশগুলিই আবার যুগপৎ অদ্বিত তিনিই গৌরগোপাল, নিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপালই 'তত্ত্বতঃ' বাস্তবিকভাবে সকল নিরংশ অংশকে, নির্ধর্ম সর্বধর্মকে, অসাম্প্রদায়িক সর্বসম্প্রদায়কে, অপারিবারিক সর্ব পরিবারকে, অজাতি সর্বজাতিকে, অবর্ণ সর্ববর্ণকে, অত্যাশ্রমী সর্বাশ্রমকে, নির্গুণ সর্বগুণকে, অমন্ত্র সর্বমন্ত্রকে, অনাশ্রিত সর্বাশ্রয়কে, অনবস্থা সর্বাবস্থাকে একই রাসমঞ্চে মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া প্রত্যেককে প্রত্যেকের নিকট দাঁড় করাইয়া নিত্য নব নব এক মহারাসবিধানের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

—শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় লইয়াই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততত্ত্বই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এব-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত "

সেই জন্যই বলি, কর্ম না করিয়া কর্ম করি এবং আপনাকে কর্তা-বোধ হইতেই পারে না। আর আমি-আত্মা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় চন্দ্র-প্রতিবিম্বের ন্যায় সলিল-আলোড়নেও আলোড়িত হই না। নিজে কর্ম না করিয়াও কর্ম করিতেছি বোধ করি না। চন্দ্র-প্রতিবিম্বের যদি বোধ থাকিত, তাহা হইলে সে কি সলিলের চলনাদি, নিজের চলনাদি বোধ করিত? ঐ রক্ত বস্ত্রের আভা আমার দেহে দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া আমার দেহই রক্ত বস্ত্র বোধ করিতেছি? তদ্রূপ আমি কিছু না করিয়া কিছু করি, কখনই বোধ করিতে পারি না। আমার দেহে আঘাত লাগিলে দেহ কষ্ট-বোধ করে না, তাহা ত অনেক সময় বুঝিয়াছি। দেহে আঘাত লাগিলে আমারই যন্ত্রণা বোধ হয়। ক্ষুধা-বশত আমিই কাতর হই, সুখ-দুঃখ আমিই বোধ করি, তাহা ত আমি জানি। নানাপ্রকার কথা আমিই কহি, তাহাও ত আমি জানি; তবে আমি-আত্মা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা কি প্রকারে?

একবিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ষাবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"রাগেচ্ছা সুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধের নাত্মনঃ ॥"

দর্শন এবং উপলব্ধির দ্বারা যাহা নিশ্চয় করা যায়, তাহা কেবল তর্কদ্বারা খণ্ডন করিলে কি উপকার হইতে পারে? আমি ইচ্ছা করি, তাহা আমি উপলব্ধির দ্বারা জানি। রাগ এবং সুখ-দুঃখাদিও আমি বোধ করি, তাহাও আমি জানি। অদ্বৈতমতের কোন কোন শ্লোকানুসারে আমি দেহ নই, আমার দেহ; অথচ সেই দেহের দ্বারা আমি কত প্রকার কর্মই করিয়া থাকি। সেই জন্য ঠিক বলিতে হইবে সে সমস্ত কর্ম আমি করি না, সে সমস্ত দেহই করে? অদ্বৈত মতানুসারে বুদ্ধি আমি নই, তবে যে প্রকারে দেহ আমার, সেই প্রকারে বুদ্ধিও আমার বলা যাইতে পারে। আমার দেহাবলম্বনে আমি যেমন নানাপ্রকার কর্ম করি, তদ্রূপ আমার বুদ্ধি অবলম্বনেই বা আমি নানাপ্রকার কর্ম করিতে সক্ষম হইব না কেন? আমার বুদ্ধি অবলম্বনে আমি ইচ্ছা করিতে পারি, রাগ করিতে পারি এবং সুখ দুঃখাদি বোধও করিতে পারি। সেজন্য ঐ সমস্ত করিবার অথবা

বোধ করিবার কর্ত্তা কি বুদ্ধি বলিতে হইবে? আমি যাহা সম্ভোগ করি, তাহা অন্য কেহ সম্ভোগ করে তখনই বলা যায় না। আমি সুখ দুঃখ ভোগ করি, তবে অন্য কেহ এই দুই আমার পরিবর্ত্তে ভোগ করে কি প্রকারে বলি? আমি আছি বোধ থাকিলে মন-সংক্রান্ত বুদ্ধি প্রভৃতির কোনটীই অব্যক্ত অথবা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে না। সুষুপ্তি কালে বুদ্ধির নাশও হয় না কিন্তু সেকালে বুদ্ধি থাকে না-ও বলিতে পার না। সুষুপ্তিকালে আমি আছি-বোধ আমার নিজেরই থাকে না। সেই জন্য কি বলিতে হইবে, তখন আমি নষ্ট হই অথবা তখন আমি থাকি না? সুষুপ্তিকালে আমি যেমন আমিত্বের ব্যক্ত-বোধ করি না, তদ্রূপ আমার বুদ্ধি প্রভৃতিতেও ব্যক্ত বোধ করি না। সেইজন্য সে অবস্থায় আমার বুদ্ধি প্রভৃতির নাশ হয় কি বলিতে পারি? না ঐ প্রকার বলা উচিত? আমাতে সুষুপ্তির প্রভাব যখন থাকে না, তখন আমি আছি বোধ যেমন করি, তদ্রূপ আমার দেহ বুদ্ধি প্রভৃতিও আছে বোধ করি। এই জাগ্রতাবস্থাতেও তোমার মধ্যে অব্যক্তভাবে রাগ রহিয়াছে। এক্ষণে তোমাতে যে রাগ রহিয়াছে, তাহা তুমি অনুভূতির দ্বারা জানিতেছ না; অথচ প্রয়োজনানুসারে সেই রাগ তোমা হইতে প্রকাশ হয় বলিয়া, সে রাগের প্রকাশ যখন তোমাতে থাকে না, তখনও সে রাগ নষ্ট হয় না স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির কোন অবস্থায় তোমাতে অব্যক্ত এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকিলে তুমি বলিতে পার না সে অবস্থায় তোমার বুদ্ধির নাশ হয়, অথবা তাহা থাকে না। পরে যখন তাহা তোমাতেই প্রকাশ হয়, তখন অংশই অব্যক্তভাবে এবং নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়ভাবে তাহা তোমাতেই থাকে; প্রয়োজনানুসারে তাহার প্রকাশ হয়।

ষাবিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,

"প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্মলতাত্মনঃ॥"

উক্ত শ্লোকাংশদ্বয়ে স্পষ্ট জানা যায়, অর্কের যেমন স্বভাব আছে, তোয়ের যেমন স্বভাব আছে, অগ্নির যেমন স্বভাব আছে, তদ্রূপ আত্মারও স্বভাব আছে। উক্ত শ্লোকাংশদ্বয়ে জানা যায়, আত্মার স্বভাব এক প্রকার নহে। উক্ত শ্লোকাংশদ্বয়ে তাঁহার সৎ-স্বভাব, চিৎ-স্বভাব, আনন্দ-স্বভাব, নিত্য-স্বভাব, এবং তাঁহার সেই স্বভাবে নির্ম্মলতা আছে বলিয়া নির্ম্মল-স্বভাব। স্বভাব যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। কারণ স্বভাবই গুণ-কর্ম্মের পরিচায়ক। আর গুণ-কর্ম্মের প্রভেদানুসারে সকলের স্বভাবও এক প্রকার নহে, তাহা স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই অর্থ প্রভৃতির বিভিন্নতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যেরই উক্ত ত্রয়োবিংশ শ্লোকাংশদ্বয়ে আত্মার স্বভাব আছে বলিয়া আত্মাও সগুণ-সক্রিয় বলিতে হয়। অর্ক প্রকাশক, তাঁহাতে প্রকাশতা আছে বলিয়া; প্রকাশকতা যাহা, তাহাই প্রকাশক নহে—সুতরাং অর্ক অদ্বৈত নহে। তোয় শীতল, তাহাতে শীতলতা বা শৈত্য আছে বলিয়া; শীতলতা বা শৈত্য যাহা, তাহাই শীতল নহে;—সুতরাং তোয় অদ্বৈত নহে। অগ্নি উষ্ণ, তাহাতে উষ্ণতা আছে বলিয়া; উষ্ণতা যাহা, তাহাই উষ্ণ নহে,—সুতরাং অগ্নি অদ্বৈত নহে। আত্মা সৎসম্পন্ন, তাঁহাতে সৎ আছেন বলিয়া; সৎ যাহা, তাহাই সৎ-সম্পন্ন নহে—সুতরাং সৎ-সম্পন্ন আত্মা অদ্বৈত নহেন। আত্মা চিৎ-সম্পন্ন, তাঁহাতে চিৎ আছেন বলিয়া; চিৎ যাহা তাহাই চিৎ-সম্পন্ন নহে—সুতরাং চিৎ-সম্পন্ন আত্মা অদ্বৈত নহেন। আত্মা আনন্দ-সম্পন্ন, তাঁহাতে আনন্দ আছেন বলিয়া; আনন্দ যাহা তাহাই আনন্দ-সম্পন্ন নহে—সুতরাং আনন্দ-সম্পন্ন আত্মা অদ্বৈত নহেন। আত্মা নিত্য-সম্পন্ন, তাঁহাতে নিত্য আছেন বলিয়া; নিত্য যাহা তাহাই নিত্য-সম্পন্ন নহেন; সুতরাং নিত্য-সম্পন্ন আত্মা অদ্বৈত নহেন। আত্মা নির্ম্মল, তাঁহাতে নির্ম্মলতা আছে বলিয়া; নির্ম্মলতা যাহা, তাহাই নির্ম্মল নহে—সুতরাং নির্ম্মল আত্মাও অদ্বৈত নহে। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অনেক গ্রন্থেই আত্মা সচ্চিদানন্দ ও আত্মা নিত্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আত্মবোধের উক্ত ত্রয়োবিংশ

শ্লোকানুসারে, আত্মা সচ্চিদানন্দ কিম্বা আত্মা নিত্য বলা যায় না। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মার স্বভাব সচ্চিদানন্দ নিত্য ও নির্মলতা। স্বভাব এবং যাঁহার স্বভাব উভয়ে অভেদ নহে; সেইজন্য আত্মা এবং তাঁহার স্বভাব সচ্চিদানন্দ, নিত্য ও নির্মলতা অভেদ নহে

ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্বিংশ শ্লোকানুসারে আত্মারও অংশ আছে। ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'আত্মনঃ সচ্চিদংশক্ত'। যাহার অংশ আছে বা যাহাকে অংশ করা যাইতে পারে, তাহাকে অবশ্যই অখণ্ড বলা যায় না। অথচ অদ্বৈতমতের অনেক গ্রন্থেই আত্মাকে অখণ্ড বলা হইয়াছে। আর আত্মার সচ্চিদংশ স্বীকার করিলে, আত্মার অন্যান্য অংশ আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সৎ এবং চিৎ এক বস্তু নহে। সৎ অর্থে সত্য বা নিত্য। চিৎ অর্থে সম্বিত, বোধ বা জ্ঞান। সুতরাং সৎ এবং চিৎ এক বস্তু নহে। যদি বল, একই আত্মার সৎ এক প্রকার বিকাশ এবং চিৎ তাঁহারই অন্য প্রকার বিকাশ, তাহাও বলিতে পার না। কারণ অনাত্মা-প্রকৃতির ন্যায় আত্মার বহুপ্রকারতা আছে স্বীকৃত হইলে, আত্মারও পরিবর্তন আছে, আত্মারও বিকার আছে স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে আত্মাকেও আত্মা না বলিয়া অনাত্মাই বলিতে হয়। কিন্তু সত্য শ্রুতি ও অদ্বৈতমতের গ্রন্থে, আত্মাকে অনাত্মার সঙ্গে অভেদ বা অনাত্মা আত্মার একটি নাম, বলা হয় নাই। ঐ সকল গ্রন্থানুসারে অনাত্মা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র।

চতুর্বিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মনঃ সচ্চিদংশস্তু বুদ্ধের্বৃত্তিত্রিতিত্বয়ং।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে ॥"

কিন্তু ঐ প্রকার স্বীকার করিলে, জ্ঞানকেও অনিত্য, অসত্য বা প্রাকৃত স্বীকার করিতে হয়। কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মার সচ্চিদংশ এবং বুদ্ধিবৃত্তি সংযোগ দ্বারা অবিবেক বশতঃ আমি জানি, এই বোধ বা ধারণা মুক্তিত হয় স্বীকৃত হইলে, অবশ্যই জ্ঞানের নিত্যতা বা সত্যতা স্বীকার করা যায় না। কারণ উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে, অবিবেকবশতঃ আমি জানি এই বোধ প্রবর্ত্তিত হয়। অবিবেকদ্বারা যাহা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা অবশ্যই নিত্য এবং সত্য নহে। কারণ অবিবেকও অসত্য অনিত্য—অজ্ঞান বা অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ। অদ্বৈত-মতানুসারে কথিত চিত্ত ও চিত্ত-বৃত্তি বা চিত্ত-বৃত্তি নিচয়ও অজ্ঞান বা অনাত্মার বিকাশ। সৎ এবং চিৎ এক হইলে, সৎ এবং চিৎ বিভিন্ন দুই শব্দই বা কেন আছে? এবং উভয়ের অর্থগত বিভিন্নতাই বা কেন আছে? সুতরাং ঐ উভয়ই আত্মা নহে। সুতরাং ঐ উভয়ই নিত্য-সত্য নহে। সুতরাং এই দুইও প্রকৃতি অথবা অনাত্মারই অংশ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অবিবেকবশতঃ চিত্ত-বৃত্তির সহিত ঐ দুইয়ের অংশ যোগ দ্বারা যে আমি জানি বোধ করি, সেই বোধ কখনই নিত্য-সত্য নহে। তাহা কখনই ব্রহ্মাত্মা নহে।

পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকানুসারে 'আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি' স্বীকার করিলে আত্মাকে অবিকৃত বলিতে হয়। আত্মা অবিকৃত স্বীকার করিলে, তাঁহার নিজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছেও স্বীকার করা যায় না। কারণ আত্মা ও আত্মজ্ঞান অভেদ নহে, তাহা এই সিদ্ধান্ত দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য, আত্মারও আত্মজ্ঞান হয়, তাহা তাঁহার অনেক স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন। আত্মা ও আত্মজ্ঞান অভেদ স্বীকার করিলেও, আত্মা ও আত্মজ্ঞান উভয়কেই প্রাকৃত বলিতে হয়। কারণ প্রসিদ্ধ শ্রুতিমতে, বেদান্ত দর্শনমতে এবং শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্লোকানুসারেই আত্মার কোন প্রকার বিকাশ নাই। ঐ সকল মতে আত্মার বহু-প্রকারতা নাই। ঐ সকল

মতে আত্মার কেবল একপ্রকারতা। ঐ সকল মতে আত্মার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনই নাই। আত্মা এক প্রকার এবং আত্মজ্ঞান অন্য প্রকার। সুতরাং উভয়ই এক প্রকার নহে বলিয়া, অদ্বৈতমতানুসারে ঐ উভয়কে অভেদ ও এক বলা যায়না। তাহা বলিলে, আত্মা এবং আত্মজ্ঞানকে প্রাকৃত বলিতে হয়। কারণ প্রকৃতির বিকার আছে বলিয়া, তাহার বহু-প্রকারতা এবং এক পরিবর্ত্তনও আছে। এক প্রকৃতিকে বহু প্রকার দর্শনও করা যায়।

ষড়বিংশ সিদ্ধান্ত

বোধ যাহার নাই, তাহাকেই জড় বলা যাইতে পারে। জড় যাহা, তাহা আত্মা নহে। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁর আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকে—'বুদ্ধের্বোধো ন আত্মেতি' বলায় তাঁহার মতেও বুদ্ধি জড় স্বীকার করিতে হয়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহার বোধ নাই, তাহাই জড় এবং তাহাই অনাত্মা। সুতরাং সেইজন্য শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই বুদ্ধিকে অনাত্মা জড় বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য 'আত্মনোবিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন আত্মেতি' বলায়, আত্মা এবং বুদ্ধি অভেদ বুঝিবার কোন কারণই নাই। শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মাই বুদ্ধি নহে বলিয়া, বুদ্ধি অনাত্মা অনাত্মা যাহা, তাহাই প্রকৃতি ও তাহাই অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ভবানীকেও অনাত্মা বলিতে হয়, কারণ তিনি বুদ্ধিকেই ভবানী বলিয়াছেন। তাঁহার যতি পঞ্চক নামক গ্রন্থে আছে, 'বুদ্ধির্ভবানী'। আবার তিনি সেই অনাত্মা-বুদ্ধি ভবানীর স্তবও করিয়াছেন। তাঁহার সেই স্তবটির নাম—ভবান্যষ্টক। সেই স্তব পাঠ করিলে, তাহাতেও শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদ স্বীকার দৃষ্ট হয়।

সপ্তবিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোক পাঠ করিলে, আত্মা এবং জীব অভেদ বুঝিবার কোন কারণ নাই। অথচ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী মালার একবিংশ শ্লোকে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈবনাপরঃ' বলায় জীব এবং ব্রহ্ম অভেদই বুঝিতে হয়। অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থে ঐ শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীমদ্ভগবৎ গোবিন্দপাদাচার্য্য-পরিব্রাজক-পরমহংসস্বামীও জীবেশ্বরের অভেদত্ব বা ঐক্যও স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত শ্রীমদ্ভগবৎ-গোবিন্দপাদাচার্য্য পরিব্রাজক-পরমহংসস্বামী তাঁহার অদ্বৈতানুভূতিতে বলিয়াছেন,—

"জীবেশ্বরাদিভাবেন ভেদং পশ্যন্তি মূঢ়ধীঃ।
নির্ভেদানবিশেষেঽস্মিন্ কথং ভেদো ভবেদ্ধ্রুবং॥"

অষ্টবিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকের শেষ চরণানুসারে, জীব এবং আত্মা অভেদ বুঝিবার কোন কারণই নাই। ঐ পঞ্চবিংশ শ্লোকানুসারে আত্মা কিংবা বুদ্ধি, জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা নহেন। ঐ শ্লোকানুসারে জীবই জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা। ঐ শ্লোকানুসারে জীবই আত্মা, অথবা আত্মাই জীব যদি বুঝিবার কোন কারণ না থাকে, তাহা হইলে জীবকেও সৎ, সত্য বা নিত্যও বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে সেই জীবের জ্ঞানকেই বা কি প্রকারে সৎ, সত্য বা নিত্য বলা যায়? তাহা হইলে সেই জীবের জ্ঞানকে সৎ, সত্য বা নিত্য বলা যায় না। আর যে জ্ঞানদ্বারা আত্মা এবং বুদ্ধিই সমস্ত বোধ হয়, সে জ্ঞানকে কখনই সৎ বলা যায় না। কারণ আত্ম-জ্ঞানদ্বারা বহু বোধ হয় না। আত্মা কেবল এক অদ্বৈততাই বোধ হয়। আত্মার আত্মজ্ঞান হইলে, সেই আত্মার মোহ হইতে পারে না। যে জ্ঞানের সহিত মোহের সংস্রব আছে, সে জ্ঞান কখনই নির্ম্মল আত্মজ্ঞান নহে। তাহা নিশ্চয়ই অনাত্মজ্ঞান। সেই জ্ঞানকে এক প্রকার অজ্ঞানও বলা যায়, সেই জন্যই—

ক্রমশঃ

মশামাছি-প্রশস্তি

॥ শ্রীভারতী ॥

তত্ত্ব কথা মাথায় থাকুক
আপাতত মশার কামড়ে মারা যাচ্ছি।
সন্ধ্যে থেকেই রক্ত চোষার দল
কিলবিল করে ঘিরে ধরে;
স্থির হয়ে বসবে বা পড়বে কিছু
এমন দায়িত্ব কারোর নেই।
অধিকন্তু রক্ত চোষাদের রাজত্বেই যাদের বাস
রক্ত দিতে তাদের আপত্তি করাটা একটুও ভালো কথা নয়।
তবুও বলতেই হবে আমরা এ দেশীয়রা অবশ্যই
ধৈর্যে এবং স্থৈর্যে অতিশয় শাশ্বত এবং
আদি ও অকৃত্রিম; নইলে সেই
কবে কোন্ শতাব্দীতে কে যেন বলেছিলেন
"রেতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কলকেতায় আছি।"
তার আর একটুও নড় চড় হয় না গা!
ঈশ্বর গুপ্ত গেলেন, গেলেন বঙ্কিম মধুসূদন
রবীন্দ্রনাথকে সরানো অবশ্য কঠিন।
তবুও এটা নাকি রবীন্দ্রোত্তর যুগ—
এখন তার যুগ? যারই হোক
এ যুগেও মশা মাছি তাদের ঘোষিত প্রতাপ নিয়ে
আমাদের জ্বালিয়েই চলেছেন।
অতএব গলা ছেড়ে আমাদের নিশ্চয়ই
মশা মাছিদের প্রশস্তি গাইতেই হবে।
এ হেন অবস্থায় চতুর্দিকে কান পাতো
শুনতে পাবে কি অসভ্য চক্কা নিনাদ,
আমরা নাকি উন্নতির সপ্তম স্বর্গে উঠে গেছি।
কিন্তু আমাদের পাপচক্ষে কি যে ঠুলি পরে আছি
সে উন্নতির কিছুই ছাই অক্ষিগোচরে আসছে না।
চোখ বুজলে খালি মশার কামড়
এমন কি দিনেও রেহাই নেই, আর
চোখ চাইলেই দেখছি খালি খালি পথের ধুলো।
বোধ হচ্ছে গোটা দেশটাকেই পাবু রোগে ধরেছে।
যতক্ষণ না দেবতারা স্বয়ং দৃষ্টির এই বিভ্রম ঘোচাচ্ছেন
ততক্ষণ আমরা কেবলই দেখছি
জল নিকাশের ড্রেন নেই
ঝিক্ ঝিক্ করছে পোকাপড়া স্থির জলরাশি।
জঞ্জাল ফেলবার কোনো ব্যবস্থা নেই;
অলকট্ তো আছেই—
রাস্তাঘাট সমেত চারধার বিশ্রী রকমের অপরিচ্ছন্ন।
চক্রবৃদ্ধি হারে মশা মাছির বংশ
এখানে বাড়বে না তো বাড়বে কোথায়?
মানুষের বংশবৃদ্ধি কমাতে আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি
কিন্তু হায়রে? এনারা?
এনাদের রক্ষাকর্তারূপে অবশ্যই আছেন কর্পোরেশন
মিউনিসিপ্যালিটি নামক কি কি যেন গাল-ভরা সব
প্রতিষ্ঠান।
দীর্ঘজীবী হোন তার কর্তাব্যক্তিরা
এবং সুদীর্ঘ জীবী হোক তাদের আত্মীয় এবং প্রিয়জন পুষ্ট
এই মহদাশয় মশা এবং মাছিরা আর আমরা
অভাগোরা তাদের সম্মানার্থে কেবলই
এদের কামড় খেতে থাকব আর জয় ধ্বনি দেব,—
কিন্তু হায়!
জন্মভূমির মুখে কালি লেপতে আর একটুও ইচ্ছে করছে না।
তবুও না বলে উপায় নেই—
"সময় হোলো সময় হোলো
যে যার আপন বোঝা তোলো"
দেরী করবার আর একটুও সময় নেই॥

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৬৬)

ঠাকুর, তোমার বিশ্ব আমার হউক, আমার ছোট বিশ্ব তোমার হউক, তোমার এই বিরাট দেহ আমার হউক। সর্বভূতে অবস্থিত ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শান্তি-ক্ষান্তি-কান্তি আদি সব আমার হউক। আমি বিরাট হইব। আমার সকল তোমার হউক, 'আমি' তুমি হই। তোমার আমার ব্যবধান মুছিয়া যাউক। তোমার আমার অদ্বৈত মিলনের ভিতর দিয়া এই বিশ্ব নূতন রূপে গড়িয়া উঠুক। নূতন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গড়িয়া উঠুক—তুমি আমি এক অদ্বৈত হইয়া সারা দেশময় তোমার বিভব ছড়াইয়া দিব। তুমি সকল ঔদার্যের মূর্তিমান ঘন। তোমার চরণ-তলে সকলের সব অহমিকা চূর্ণিত। তুমি প্রেমমূর্তি, মৈত্রীর ঘন বিগ্রহ।...পত্রিকা এত দেরী হইয়া গেল—কি আর করিব ইহাদের লইয়া?...অম্বিকা বাবুনী আজ বিদায় হইয়া গেল। আর একজন নূতন মানুষ আসিবে কাল হইতে। আবেষ্টনের সঙ্গে সারা জীবন ধাক্কাধাক্কি চলিল। আমিও ছাড়ি না, সেও ছাড়ে না। রেণু সকাল ৭॥ টায় প্রতাপ গুহরায়ের ওখানেও যায়। সে ৬ই জুন শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবে।...আমাদের আর বাড়ানো দরকার। কেউ তো নাই সাহায্য করিবার। যে যাহা দিত, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। সারা জীবন অনিশ্চয়তা লইয়া চলিয়াছি! ঠেকি নাই। কিন্তু তাহাতে কাজ তো হয় না। ঠাকুরের এত বড় কাজ, মন খুলিলে তাঁহার কথা সাথ মিটাইয়া শুনাইতে পারিতাম। পারিলাম কৈ? ব্যর্থ আমার জীবন!

২৭শে মে

ঠাকুর, 'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ'—নিরাশ্রয় বলিতে সত্য সত্য যাহা বুঝায় তাহাই আমি। ধনাশ্রয় আমার নাই, জনাশ্রয় আমার নাই, দেহাশ্রয়ও টুটিয়া গিয়াছে। একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়। সকল আশ্রয় আমাকে ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় করিয়া দিয়াছে। তোমাকে বুকে লইয়া তোমাময় হইয়া—যেমন লৌহ-পিণ্ড অগ্নি সংস্পর্শে হয়—সমাজের ভিতর প্রবেশিব, সমাজকে তোমার ছাঁচে গড়িয়া তুলিব সকল দেহে প্রাণে মনে। বল দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও। কি ভাবে যে আমার দিন যায়, তাহা কি তুমি দেখিতেছ না সখা আমার, বন্ধু আমার, স্বামী আমার! তুমি আমার আছ—এই কথা ভাবিয়াই আমি আজিও দাঁড়াইয়া আছি। নহিলে আমি কবে এলাইয়া পড়িতাম। তোমা-আশ্রয়েই তো দাঁড়াইয়া আছি। প্রায় ৯॥ টায় পর সূর্যকুমার সেন আসে। শতবার্ষিকীর ৬ টাকা ও উদ্বোধনের ৪ টাকা দেয়। আমার আম খাইবার জন্য ২ টাকা দেয়। বহিশালের অনেক কথা হয়। ১০টার পর যায়...রেণু ৬টার পর বাহির হইয়া যুগান্তর ও অমৃতবাজারে যায়। সেখানে আনন্দীজীবন, দক্ষিণা-রঞ্জন, কালীপদ বিশ্বাস, বসুবাবু প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। দক্ষিণাবাবুকে 'ঘরে-বাইরে' ও 'শেষ প্রশ্ন' দেওয়া হয়। আনন্দীজীবনকে শেষপ্রশ্ন দেওয়া হয়। বসুমতীতে যায়, গত রবিবারের সভার বিবরণ দিয়া আসে। আনন্দবাজারে যাওয়া হয় নাই। আমি ৬টার কিছু পূর্বে মঠের জন্য রওয়ানা হই। রেণু ফেরে প্রায় ৮টায়। আজ মঠে executive-এর সভা ছিল।...বৈকালে মঠের মাখনবাবুর শিষ্য হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসেন। জপতপে কেন শান্তি আসে না—প্রশ্ন করেন। 'বিদ্যা-তপঃপ্রাণনিরোধ' শ্লোক, 'চেতোদর্পণ...' শ্লোক ও 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি' শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া কিছু আলোচনা

হয়। আজ হইতে নূতন যাদুরী শান্তি কর্মে নিযুক্ত হইল।

২৮শে মে

ঠাকুর, তুমি-আমি সমপ্রয়োজন, নর-নারায়ণ সমপ্রয়োজন। এতদিন নারায়ণের প্রয়োজনে ছিল নর। কিন্তু তাহাতে ব্যাখ্যা হয় না। তাই আজ নরকে নারায়ণের অন্যরূপে, অদ্বৈতরূপে দেখিলে, সমপ্রয়োজন বলিয়া বুঝিলে দুইয়ের ব্যাখ্যা দুই হয়। তোমার সঙ্গে একীভূত হইয়া একই প্রয়োজনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া চলিব। এই অদ্বৈত রসাস্বাদন করিবার সৌভাগ্য আমার হউক। তোমার আমার বিচ্ছিন্নতা মুছিয়া যাউক। সকালে প্রথমে হারাণ মুখোপাধ্যায়, পরে কবির ছোড়দির বিনোদ চ্যাটার্জী আসেন। আমার জীবন তাঁহারই প্রয়োজন, আমার মুক্তি তাঁহারই হাতে, আমি শুধু তাঁহার সেবা করিব। আমার ভাবনা তাঁহার, তাঁহার ভাবনা আমার—ইহাই ভক্তিবাদের গূঢ় তাৎপর্য। গীতা সম্বন্ধে আলোচনা হয় বিনোদবাবুর সঙ্গে।···৪॥টায় সত্যেন শাস্ত্রী আসে।··· 'নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ' হইতে রেণুকে নিতে আসে।··· রেণু প্রধান অতিথি।···সভার রিপোর্টারগণ রেণুর বক্তৃতার অংশ লিখিয়া লইয়া গিয়াছে।···আমি ৯টায় ফিরি। সত্যেই - এর শিশু - মেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষা দেয় সন্ধ্যার অন্ধকারে। নীলরতনবাবু স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। কি অবিবেচনা ও দুঃসাহস! পত্রিকা আজও দিল না। সোমবার দিবে বলিয়া গেল। পানিহাটী যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হয়।...

২৯শে মে

ঠাকুর, আমি দেহধর্ম প্রাণধর্ম মনোধর্ম—সব ধর্ম সব অধর্ম—ছাড়িয়া তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি আমাকে স্বীকার কর, অস্বীকার কর। আমার জীবনে তোমার প্রয়োজন যত হউক, কার্যাত্মক রূপ পরিগ্রহ করুক, আমার বিচ্ছিন্ন সত্তা তুমি মুছিয়া ফেল, তুমি আমি সত্তার চৈতন্যে আনন্দে 'এক' হই। আমাকে দেখিয়া লোকে তোমাকে দেখুক, আমায় স্পর্শ করিয়া তোমাকে স্পর্শ করুক, আমাকে ভালবাসিয়া তোমায় ভালবাসুক—এমনই একটী অপূর্বকভাব তোমায় আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি বিশ্বের বুক চিরিয়া আত্মপ্রকাশ কর। ওগো বিশ্বমানবধন আমার!··· সন্ধ্যায় গৌরীশঙ্কর ও নবশঙ্কর ভ্রাতাদ্বয় আসে। রেণুর সঙ্গে অনেক কথা হয়—উজ্জয়িনীতে আশ্রমের কথা···, পাদ্রিতোর ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার কথা হয়। গৌরীশঙ্কর গ্রাহক হইবে ও বলিয়া দিবে। মাখনবাবু আসেন। মঠের কথা যখন ভাবি তখন বুক কাঁপিয়া উঠে, কাঁদিয়া উঠে। ইহার ভবিষ্যৎ কোথায়? একমাত্র ঠাকুর আছেন। তিনি যেমন নরোত্তম, আমরা তেমনই নরাধম। মিলিয়াছে ভাল। আমাদের কাছে রাখিয়া গিয়াছেন তিনি তাঁহার জীবন ও দর্শনের দায়িত্ব, তাঁহার মঠের ভার! অথচ ইহারা একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক। যে যাহার ব্যক্তির জন্য উন্মাদ। 'কলিকাতার মহানির্বাণ মঠ কে চায়?···কালো ঠাকুরের কথা বলিতেছিল।···ঠাকুরের প্রসাদ—বড়ি-ভোল, অম্ল, সুক্ত, আম পায়েস সেবানন্দ আনিয়া দেয়—সুশীলা রাখিয়াছিল।···

৩০শে মে

ঠাকুর, ১৯১৯ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী ব্রজমোহন স্কুলের চাকুরী ছাড়ার পর অর্থোপার্জনের কোনও পন্থা গ্রহণ না করার ফলে এবং বিশ্বের মাঝখানে দাঁড়াইবার ফলে চতুর্দিক হইতে যত চাপের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছি তাহাতে নিষ্পেষিত হইতে পারিতাম যদি না তুমি সঙ্গে থাকিতে। জীবনে কাহাকেও শোষণ করি নাই, কাহারও দ্বারা শোষিতও হই নাই। এ কি কম কথা! তুমি ছিলে সঙ্গে। মাথা আমি নীচু করি নাই। তোমার আদর্শ ত্যাগ আমি করি নাই। যাহারা তোমার নাম লইয়া মিলিয়াছিল, তাহারা আজ নাই। আমি আছি, আমি আছি—ইহাই আমার আনন্দ। আমি তোমার সঙ্গে থাকিব—এই ভাবনায় আমি শান্তিতে থাকি। তুমি আমি, আমি তুমি।··· রেণু ৩টায় বাহির হইয়া মনোরঞ্জন বসু···আনন্দবাজার···

হরিপদ মহলানবীশ···ডাঃ মুখার্জী·· গোলাম মহম্মদ রোড... হইয়া আসে। আভার সঙ্গে দেখা হয়।...রমাপতি-বাবুদের সঙ্গে ঠাকুরের (?) ফাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান সম্বন্ধে লেখা চিঠি ও অন্যান্য চিঠি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ওখানের সব কিছু ঠাকুর ঠিক করিবেন, ইহাই বিশ্বাস। আজিকার মুগান্তরে গত জনসভার (বুদ্ধদেব সম্বন্ধীয়) বিবরণ বাহির হয়। ঠাকুর ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছেন। আমাকে যে নিমিত্তমাত্র করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য।··· ৩১শে মে

আমার সারা জীবনের ধ্যানের ধন রাধারাণী, তোমাকে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে পুরিয়া চলিয়াছি। কেউ দেখে না, কেউ শোনে না। কী যে তুমি আমার জীবনে, তোমার সঙ্গে আমার যোগ যে কোথায়, কত গভীরতম, তাহা কে বুঝিবে? তোমাকে পাইবার তো চারিদিকের আবেষ্টন অনুকূল হইল না। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সমন্বয় বিধানের জন্য কি যুদ্ধই না সমস্ত জীবন করিয়াছি। আমি অপ্রতীকার, অপত্র। তোমার স্নেহ-প্রলেপ প্রতি মুহূর্তে সঞ্জীবিত করিতেছে আমার ক্ষতবিক্ষত এই দেহপ্রাণমনকে। তোমার করুণাধারাই আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা। সেই করুণার মাঝে অবগাহন করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি, পথ চলিতেছি। তোমার জয় হউক।...মিনু তোমার ঝিকিরগাছা গিয়াছে। সে বড় অব্যবস্থিতচিত্ত। কাণ্ডারীহীন তরীর মত তাহার অবস্থা। কথাবার্তা মেজাজ ভাল নয়। আমি তো এমন কিছু করিব না যাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ সঙ্কটাপন্ন হয়। তাহাকে তো গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। স্বপ্নার ভার আমার পক্ষে কোন দিক দিয়াই নেওয়া সঙ্গত নয়। স্থান নাই, অর্থ নাই। সারা জীবনের জন্য এত বড় দায়িত্ব আমি উহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার দুঃসাহস কেন করিব? আর মিনুও তো শক্ত মানুষ নয়। সে আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে আমি উহাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া অনেক কিছু করিতে পারিতাম। আজ আর মঠে যাই না।···

১লা জুন

ঠাকুর, তুমি 'দরিয়ার না'—উত্তাল তরঙ্গায়িত এই সংসার-সমুদ্রের তুমি তরণী, বিশ্ব-সমস্যার একমাত্র সমাধান। তোমার শ্রীচরণ হইতে প্রাণধারা নিঃসৃত হইয়াছে। এই প্রাণ-ধারা অবধূতী, নৈর্ঋতী, নৈর্ঋতী, সর্বসংস্কার-বর্জিতা। এই প্রাণ-ধারা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এত ঝড়-ঝাপটার মাঝে। সংসার বা সন্ন্যাস কিছুর সুযোগ আমি পাই না। সবই আমার কাছ হইতে মুখ ফিরাইয়াছে। ধর্ম-অধর্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি কোনও দলে যোগ দিতে পারি নাই। তোমার ভাষায় 'আমার সব দল লইয়া এক অখণ্ড দল'। ধার্মিকের দল, অধার্মিকের দল, সংসারীর দল, সন্ন্যাসীর দল, রাজনীতিজ্ঞের দল—আমি সর্ব দলের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছি। আমি কোন দলের নই বলিয়াই আমি সর্ব দলীয়। কে আমাকে নিবে? আমি প্রাণ-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। তোমার চরণই আমার একমাত্র গতি। ১১টার পর [রেণু···গোলাম মহম্মদ রোড...পোস্টাফিস...প্রেস ও মধুর বাসা হইয়া ফেরে ৫॥ টায়।...মধু কাঠ দিতে চাহিয়াছিল সেলফ্ প্রস্তুত করিবার জন্য। তাহার বাড়তি কাঠ আছে। সে কাঠ মোটা, তাহাতে আলমারী হয় না সম্ভব।··· আজ তারিণীবাবুর আসার কথা। রমাপতি বাবুর সঙ্গে...দেখা। প্রকাশানন্দের সঙ্গে কথা। কেহ শতবার্ষিকীর কাজ করিবে না। কাজ যখন হইবে, তখন ভিড় করিবার লোক আছে, 'নাম' কিনিবার লোক আছে। এখন কেহ আসিবে না।...সন্ধ্যায় পরিমল মৈত্র ও তাহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। তাহারা দুজনেই গ্রাহকের টাকা দিয়া গিয়াছে।...

২রা জুন

রাধারাণী আমার, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বুকে অরূপ-অরস-অগন্ধ-অস্পর্শ-অশব্দকে জমাইয়া তুলিবার, গড়িয়া তুলিবার পরাশক্তি তুমি যোগমায়া। 'যোগ-মায়ামুপাশ্রিত' তোমাময় হইয়াই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা নায়ক। তুমি আমার জীবনে আসিয়াছ, আমি তোমাকে চাহি নাই, খুঁজি নাই, ডাকি নাই।

আসিয়াছ তোমার প্রেরণায়। কিন্তু আমার আবেষ্টন, আমার প্রকৃতি তো গড়িয়া উঠিল না পুরুষোত্তম-দর্শন ও পুরুষোত্তম-জীবন প্রচারের অনুকূলে? আমাকে যে দিনরাত বিরুদ্ধ প্রকৃতির মধ্য দিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতে হইতেছে। আর যেন পারি না। কেন আসিলে তুমি যাথার্থই তুমিই জান। আসিয়াছ যে ইহা তো অস্বীকার করিব না। আজও আমার বুকে রহিয়াছ ইহাও বুঝিতেছি। তুমি আছ, তাই আমি সুস্থ থাকিয়া চলিতেছি। ৮টার পর মনোরঞ্জন গুপ্ত আসে, ৪ টাকা উদ্বোধনের দেয়। পাকিস্তান সম্পর্কে কথাবার্তা হয়।...সন্ধ্যার পর রমাপতিবাবু, নীলরতনবাবু, তারিণীবাবু, হরিস্মরণানন্দ ও আমার মধ্যে খুব heated discussion হয়। বিষয়—হিসাব transfer করা, শতবার্ষিকীর account, শ্রীকৃষ্ণানন্দের ব্যাপার। এখানের বুদ্ধি কাহারও ভাল নয়। আমি তো হাঁপাইয়া উঠি। লোক নাই, টাকা নাই। অসীম সাহসের উপর কাজ করিতে হয়। ইহার মধ্যে যদি বাধা আসে, তবে কি করিয়া আমার মত মানুষের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয়?...আলোচনার পর এখানে আসিতে প্রায় ১০টা হয়। হাওড়া হইতে কে একজন শিক্ষক আসিয়া ছিলেন মঠে বসুমতী হইতে সেই কাটিং লইয়া যাহার মধ্যে 'বুদ্ধদেব ও শ্রীনিতাই-গোপাল' সম্বন্ধীয় বক্তৃতার বিবরণ বাহির হইয়াছিল। একটী মানুষও যে আগ্রহ লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ।

৩রা জুন

ঠাকুর, আমি তো আর তোমার জন লইয়া আসাইতে পারিতেছি না। এমন যোগ্যতা দেও যাহাতে তোমার সেবা করিতে পারি। তোমার কথা ছিল, সেই কথার বর্তমান যুগের মানুষের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যোগা-যোগ তো গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। এই সঙ্কট হইতে আমাকে মুক্তি দাও। আমি তো আর কিছু চাই নাই। সারা জীবন তোমার দর্শন লইয়া চলিয়াছি। কলিকাতাকে নাড়াচাড়া দিবার মত একটী শক্তি বুকের ভিতর টের পাই। কিন্তু তাহাকে কার্যে রূপদান করিতে পারিতেছি কই? একান্ত অসহায় আমি। তোমার চরণ-প্রান্তে সারা দুনিয়াকে টানিয়া আনিয়া ফেলিবার মত বল দেও, বুদ্ধি দেও, যোগ্যতা দেও। তোমার জয় হউক। ৬।৭ টায় মঠ হইতে তারিণীবাবু আসে। তাহার সঙ্গে মঠের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি মঠ সম্বন্ধে যাবতীয় fact লিখিয়া দিবেন, ইহার পর চিন্তা করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করা যাইবে।...কেমন করিয়া ইহাদিগকে (অন্যান্য মঠগুলিকে) কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং একটী সামগ্রিক জিনিষ গড়িয়া তোলা যায়, তাহাই সমস্যা। এখানের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতার জন্য বাহিরে কাজ আরম্ভ করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।...২০ শে জুন পানিহাটি সভা করার কথা উঠিয়াছে। কবিবার তো কেহ নাই। কাঁকুড়গাছি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জিতেন ঘোষ সন্ধ্যায় আসিয়াছিল।...

৪ঠা জুন

ঠাকুর, আমার আবেষ্টনের সহিত আমি কবে তোমার ভাবে তোমাকে ছাঁচে গড়িয়া উঠিব? আমি কি সত্যই এক কাল্পনিক আদর্শের প্রতি ছুটিতেছি? আমার ভিতর এই আদর্শ তো ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি তো ইহাকে আমার বুদ্ধি দিয়া ঠিক করি নাই। সারা জীবন ইহা লইয়া ঠেলাঠেলি করিলাম। লক্ষ লক্ষ লোক আমার কথা শুনিল। কেহ তো ইহার জন্য পাগল হইল না? আমাকে পাগল করাই কি তোমার কাজ? তোমার জীবনে কৃত্রিমতা নাই। আমিও তো কৃত্রিমতা চাই না। সহজ জীবন তোমার। এমন আধুনিকতম তুমি। তুমি অপূর্ব। সর্ববিধ মুক্তির খোঁজ তোমার চরণপ্রান্তে পাইয়াছি। আমার জীবনে তুমি সহজ হও। সব কৃত্রিমতা হইতে আমাকে মুক্তি দাও ১০টার পর মনোরঞ্জন গুপ্ত আসে।...রমাপতি ও নীলরতন বাবুর সঙ্গে আগামী ৫ বৎসর অন্ততঃ ঠাকুরের মতবাদ বাঙ্গালা দেশে ছড়াইবার জন্য কার্যসূচী গ্রহণ করা উচিত বলিলাম। এজন্য পূর্বে এখানে ঠাকুরের

লেখা (মুদ্রিত অমুদ্রিত) গুছাইয়া ফেলা উচিত। একদিন বাহিরের লোকের দৃষ্টি পড়িবে। সে দিন খুব দূরে নয়। এজন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। বাহিরের লোকের কাছে ঠাকুরকে, তাঁহার জীবন ও দর্শন, তাঁহার লেখা দেখানো ছাড়া আর কি দেখানো যাইবে? এই বৎসরই 'শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ' স্থাপন করা উচিত। ৮।। টার পর ট্রামে চলিয়া আসি,...।

৫ই জুন

ঠাকুর, সারা জীবন তুমি সঙ্গে সঙ্গে ছিলে বলিয়া আমি এত দুর্যোগ ঠেলিয়া এই বিশ্বপথ বহিয়া চলিয়াছি, এই শোষণের ক্ষেত্রে কাহাকেও শোষণ করি নাই, কাহারওদ্বারা শোষিতও হই নাই। এই দিক দিয়া আমি নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত। কাহারও মর্মপীড়াদায়ক কথা বলি নাই, কোন ব্যবহারও করি নাই, যাহার ফলে আমাদের ব্যবধান বাড়িতে পারিত। চিরকাল পারস্পরিক আলোচনার পথ ধরিয়া চলিয়াছি। এজন্য আমাকে বেগ পাইতে হইয়াছে প্রচুর। আমি একতরফাই নির্ধারিত হইয়াছি, অভিযুক্ত হইয়াছি। আমি আমার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছি, মানুষ আমাকে অনবরত আঘাত করিয়াছে। তুমি আছ আমার, তাই আমি আছি ও থাকিব। মূর্খ আমাকে দিয়া তুমি কত কথা বলাইতেছ—ধন্য তুমি। সকালে হারাণ মুখোপাধ্যায় আসেন, 'শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে' এক কপি নেন। তিনি 'সত্য', 'শৌচ', 'সন্তোষ' সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন কিন্তু সমস্ত আবেষ্টন সৃষ্টি না করিলে ব্যক্তিগতভাবে যে সত্য শৌচ কিছুই পালন করা যায় না, তাহা আলোচনা করি। বিষাদ যোগী অর্জুনের সত্য শুচি ও সন্তোষ, আর 'নষ্ট-মোহ' অর্জুনের সত্য শুচি সন্তোষ কি এক হয়? অর্জুন কিভাবে সন্তোষ চাহিয়াছিলেন, ভগবান বলিলেন রাজ্য ভোগ করিয়া সন্তোষ। কোন্ সন্তোষ নিব? এই এই সব প্রশ্ন বর্তমানের পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা উচিত।...৬ টার পর প্রতাপ গুহরায় আসেন।...প্রতাপ-বাবু নিত্যগোপাল যে বর্তমান যুগ-প্রকৃতির মহান ছবি, তাঁহাকে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দেওয়া মঠবাসীর কর্তব্য—ইহা বলেন। সওয়াশত আমার লোক হইবে।...

৬ই জুন

ঠাকুর, তোমা হইতে বিশ্বে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম বিস্মৃরিত (transmuted) হইতেছে, আমি তাহা গ্রহণ করিব (receiver)। তুমি হইবে transmuter, আমি receiver। কিন্তু receiver যদি চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ অবলম্বন না করে, 'তদ্গতেন অন্তরাত্মনা' যুক্ত না থাকে—তবে কেমন করিয়া সে তাহা গ্রহণ করিবে? আমি তোমার যোগে (unification) যোগী হইব, আমার আমি মুছিয়া যাইবে, নিভিয়া যাইবে। তুমি স্বপ্রকাশ, আমি অপ্রকাশ। আমার জীবনে তুমি প্রকাশিত হও, আমি তোমার 'স্ব' হইব। তোমার সাক্ষাৎ প্রকাশকে আমি বহন করিয়া ভুবিয়ায় বেড়াইব। তোমার মৈত্রীর বাণী গ্রামে গ্রামে ছড়াইবার মত শক্তি দেও, সুযোগ দেও। আমাকে যে কী একটা শক্তি অহর্নিশ তাড়না করে! নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল! সকালে আগামী মাসের জন্য 'অড়াজড়সমন্বয়' প্রবন্ধ আজ শেষ করি।...আগামী রবিবার গীতাভবনে ৺হেমন্ত বসুর স্মৃতি তর্পণ। আমাকে সভাপতি হইতে হইবে। বিষয় সঙ্গে অনেক কথা—আসক্তি ও প্রেম এক কথা নয়। যাহার প্রতি মানুষ আসক্ত হয়, মানুষ তাহার অকল্যাণই করে আসক্তিবশতঃ তাহাকে টানাটানি করিয়া। মানুষ কাহারও হইবে না। আসক্ত হইয়া শুধু নিজেকে ও তাহাকে বিপন্ন করে, সহজ পথ হইতে বিচ্যুত করে। অতিমাত্রায় কোথাও আটকাইয়া না গিয়া মানুষ যদি সামনের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাতেই কল্যাণ হয়। কাটিং-এর মাস্টার সপ্তাহে ১ দিন আসিবে, ১০ টাকা দেওয়া হইবে (পূর্বে ২ দিনে ২০ টাকা ছিল)—এই কথা স্থির হইল ইহা বলিয়া দেওয়া হইল।

৭ই জুন

ঠাকুর, তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি ছাড়া কে আমার হইয়া নিত্যকাল থাকিবে? আর আমিই বা কাহার হইয়া থাকিব? কে আমাকে রাখিবে আবরিয়া, আগুলিয়া তোমার মত? সংসারের নির্বুদ্ধিতা, ক্ষুদ্রতা,

শোষণশূন্য হইতে আমাকে তুমি রক্ষা করিয়া আনিয়াছ। সংসার-দাবানলে আমি পুড়িয়া যাইতে পারিতাম। আমি তোমাকে বুকে লইয়া তোমার পথে একাকী চলিয়াছি। সঙ্গীহীন জীবনের সঙ্গী তুমি, বন্ধুহীন জীবনের বন্ধু তুমি। আমি কাহারও হইব না। কে আমার জন্য বসিয়া আছে ও থাকিবে তুমি ছাড়া? আর কাহার সেইরূপ যোগ্যতাই বা আছে? তাই সার বুঝিয়াছি তুমিই আমার সখা সাথী বন্ধু শরণ সুহৃৎ স্বামী। রেণু ৯ টায় পুরে বাহির হইয়া ডাঃ মুখার্জী-র দোকান হইতে ইনজেকশান লইয়া সেফডিসোজিট ও বিন্দুস্থানের চেক লইয়া ১২ টায় ফেরে। আমার পেটটা আজও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। আজ প্রেসে আষাঢ় মাসের জন্য কপি দেওয়া হয়। সাঘাতিক বৃষ্টি হয়। ৪ টায় পর টিপটিপ করিয়া বৃষ্টির মধ্যে মঠে যাই। ট্রাম হইতে নামিতেই বেশ বৃষ্টি হয়। ভিজিয়া গিয়াছি মনে করিয়া রেণু কাপড় লইয়া মঠে যায়। মঠের বর্তমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, তাহার ভবিষ্যৎ সংস্কার, পানিহাটিতে যাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে নীলরতনবাবু, তারিণীবাবু, সুশীলার সঙ্গে আলোচনা হয়। পানিহাটিতে ৭০।৭৫ টাকা তো লাগিবেই। আজ তারিণীবাবু যাইবে, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করিয়া আসিবে। এখানে পোষ্টার ছাপাইতে হইবে, মাইকও নিতে হইবে। প্রায় ৯ টায় পৌঁছি, তখনও টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্ধ্যার পর ধীরেন ডাক্তার আসিয়া ছিল।... শনিবারের চিঠিতে 'শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে' সম্বন্ধে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় একটু বাহির হইয়াছে। কিছুই বোঝে নাই, কিংবা লেখে নাই। 'Recognition কি সহজে মিলিবে? এজন্য অনেক খাটিতে হইবে। সাধনা চাই।

৮ ই জুন

নিত্যগোপাল, তুমি বিশ্বের পরম প্রয়োজন। তোমার দর্শন ও জীবনেই বর্তমান বিশ্ব গড়িয়া উঠিতে পারে। গড়িয়া উঠিতে হইলে পুরুষের যে যোগ্যতা চাই তাহা তোমার আছে, আবার গড়াইয়া তুলিবার জন্য প্রকৃতির যে ক্ষমতা প্রয়োজন তাহাও তোমার আছে। তুমি যে একাধারে পরম পুরুষ ও পরা প্রকৃতি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ, অদ্বিতীয়া প্রকৃতি। তোমার তুলনা নাই। তুমি আসিলে, কেউ চিনিল না। লুকাইয়া আসিলে, আড়াল দিয়াই চলিয়া গেলে। কেউ ধরিয়া রাখিল না। তুমি যাইতে পারিলে। তুমি চলিয়া গেলে অপরিচিত জনসাধারণের কাছে, যাহার এত সম্পদ আছে। এত সম্পদ পাইয়াও তেমন কিছুই করিতে পারিতেছি না। এস, আবার এস, অনাদৃত নিত্যগোপাল আমার। সকালে জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে 'নব্য বিজ্ঞান ও দর্শন' প্রবন্ধ পড়ি। বেশ ভাল লাগিল। আরও পড়িব। স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। রেণু ১২৷ টায় পর বাহির হয়।...হরিদাসীর পুত্রেরা উচ্ছৃঙ্খল। তাহাদের হাতে হরিদাসী মার খাইতেছে। আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া তাহারা হাবুডুবু খাইতেছে। পথ কাটিয়া বাহির হইবার মত সাহস ও মনোবৃত্তি কাহারও নাই। আবেষ্টনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় অনেক সময় আবেষ্টনের মধ্যে থাকে না। তখন আবেষ্টনের উর্ধ্বে উঠিতে হয়, বিপ্লবের পথে ছুটিতে হয়। ওখানে কেবল পারস্পরিক অভিযোগ।— তাহাদের বাঁচিতে দিবে না। সে বাঁচিয়া মরিবে, সেও ভাল। মাতৃত্ব মেয়েদের কি বন্ধনই না সৃষ্টি করে। পণ্ডিচেরীর শ্রীমা তাই মাতৃত্বের উর্ধ্বে উঠিবার কথা বলিয়াছিলেন।...

৯ই জুন

ঠাকুর, তুমি বিশ্বের মাঝে ভাসিয়াছিলে, আমিও বাহিরিয়া আসিয়াছি। আমার 'আমি' ও 'আমার' সকল আজ তুমি। তোমাকে পাইলেই আমি আমাকে ও বিশ্বকে পাই। তোমাকে হারাইলে আমাকে ও বিশ্বকে হারাই। আমার স্থান তোমার ঐ রাতুল চরণ। সেখানেই আমি পড়িয়া থাকিব। কে আমার পাগল প্রাণকে স্থান দিবে? আমি চাই সর্বসংস্কার-মুক্তি। আমার কথা কেহ বোঝে না, আমি কি করিব? আকাশের কথা কে বুঝিবে? মনের কথা, বুদ্ধির কথা মানুষ বোঝে। কথার কথা লোক বোঝে, আসল কথা বলিলেই তাহা হয় কই। সহজ ছাড়িয়া মানুষ অসহজ বুঝিতে অভ্যস্ত। তাই সহজ মেয়ের সহজ কথা বুঝিতে মানুষ হিমসিম

যাইতেছে। আমার কথা মানুষের বোঝার মত করিয়া দেও। ৮ টার পর সুর্য সেন আসে। সে কাল বরিশাল যাইতেছে। তাহার সঙ্গে সুরেশের জন্য একখানি 'সমন্বয়বৃত্তি নিতাগোপাল' ও অভিভাষণ দিয়া দেই। সুর্য দাম দিয়া নেয়·····

১০ই জুন

ঠাকুর, আমার জন্য কে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে সমগ্র ছাড়া, তুমি ছাড়া? যে যার মত চলিয়া যাইবে। কেহ আমার পথ পানে চাহিয়া থাকিবে না। তাহাদের থাকিবার সময় নাই, তাহারা যে দাঁড়াইতে পারে না। তুমিই শুধু 'স্থির আঁখি জাগিছ সতত শয়নে স্বপনে'। তোমাকে লইয়াই তম অন্যান্তর থাকিব। তুমি আছ অনাদি অনন্তে, আমিও আছি তোমারই সঙ্গে সঙ্গে। তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি আমি, আমি তুমি। তোমার জন্যই বা বসিয়া আছে কে পুরুষোত্তমানন্দ ছাড়া? তোমার দর্শন ও জীবনই আমার ধ্যান জ্ঞান। বিশ্বের বুকে তত্ত্ব-মূর্তি তোমার প্রতিষ্ঠা আমার সারা জীবনের কাম্য। তোমার জয় হউক। ৮ টার পর তারিণীবাবু আসেন। পানিহাটির জন্য লোহার ও চিঠির খসড়া করা হয়। যে তত্ত্বলোক মহেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে আমার ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ কাপি কিনিয়াছেন, তিনি শনিবারের চিঠিতে দেখিয়া 'শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে'র খোঁজ লইতে আসিয়া ছিলেন তারিণীবাবু থাকিতে থাকিতেই। তিনি একটী যুবক। ...রেণু ১টার পূর্বে বাহির হইয়া সুলেখা···বড়বাজার হইতে একটি তাপার গ্লাস কিনিয়া আনে। কেবে ৩ টার পর। ···রেণু মধুর বাসায় গিয়াছিল। সে তাহার পত্রিকার চাঁদা, গত বার্ষিকীর ১০৲ টাকা দিয়াছে। সুধাংশু দুপুরের পূর্বে আসিয়াছিল।

১১ই জুন

ঠাকুর, এই বিরাট সংসারে তুমি একেবারে হারাইয়া গেলে? কেউ তোমাকে তেমন করিয়া জানে না যেমন করিয়া জানিলে তোমাকে তোমার সত্য স্বরূপে জানা হইত। যাহারা তোমাকে জানে বলিয়া মনে করিতেছে, তাহারা কি তোমার cosmopolitan রূপ জানে? কত দিন তোমার আদর পাই নাই, আদরের ডাক শুনি নাই। আমার বড় সই, ঠাকুর। একা চলিয়াছি—'বাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দুটার কারার কাছে'? জানি শুধু 'তুমি আমার, আমি তোমার'। কে আছে আমার বল? থাকিলেও তুমি, না থাকিলেও তুমি। তুমিই আমার সব—ধন জন গর্ব। জাগো জগন্নাথ—চলুক তোমার রথ সকল অপ্রেম দলিত করিয়া 'এক-বিশ্ব' রচনার উদ্দেশে।···জগন্নাথ যা কিছু আমি করা পাঠায়···। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সকালে আসিয়া 'শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে' দিনিয়া নিয়া যায়। ৪টার পর মঠে যাই। সন্ধ্যার পর রমাপতিবাবু, নীলরতনবাবু, আশুবাবু তারিণীবাবু, সুধাংশু, প্রদ্যুম্ন ও কালো সহ ঠাকুরের কথা আলোচনা করি। জড়াজড় সমন্বয় ব্যাখ্যা করি। উঁহারা সকলেই ঠাকুরের প্রসঙ্গ করেন। নিতাইবাবুর সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক, নিতাইবাবুর অবস্থা বলি। এখানে পৌঁছি প্রায় রাত্র ১০টায়।···

১২ই জুন

ঠাকুর, পরম প্রেম-যোগের আগুনে তুমি আমি গলিয়া গিয়া একতনু হইব, একপ্রাণ, একমন, একাত্ম হইব। বিয়োগের জ্বালা মুছিয়া যাইবে, যোগানন্দে মত্ত হইব। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। এই গলিয়া গিয়া এক হইয়া যাওয়া তত্ত্বর স্পর্শে ধরার ধূলি হইবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হইবে ব্রহ্ম-মানুষ। তবে বিশ্বমানব তোমার আবির্ভাবে পাগল হইবে তাহা দেখিবার জন্য যে আমার নয়ন-চকোর পাগল হইয়া উঠিল। আমার দশা কি তুমি বুঝিতেছ না? প্রকাশিত হও আবার আমার জীবনে। আমার সকল তুমি, সকল তুমি, সকলই তো তুমি। আমার সাধনা তুমি, আমার সিদ্ধি তুমি, আমার মুক্তি তুমি। আমার জীবনের পরস্পর বিরুদ্ধতার মধ্যে তুমিই বিরাজিত।···৪টায় মহেন্দ্রের সঙ্গে গীতাভবনে যাই ৺যোগেন্দ্রকুমার বসুর শ্রাদ্ধসভায়। ৫টায় সভার কাজ আরম্ভ হয়। আমি সভাপতি হই। 'বড়ই দেখেছে প্রাণে' সঙ্গীত হয়। পরে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ হয়। তৎপর বিভেদ তত্ত্ব, কল্যাণ

চক্রবর্তী, হেমন্ত বসুর পুত্র নলিনী, প্রমথ দে (চিকাগোর দে-র পুত্র), অপর একটী হেমন্ত বসুর ছাত্র হলার পর আমি বলি। "হেমন্তবাবুর মাতৃভক্তিই তাঁহাকে সমস্ত সৎগুণের অধিকারী করিয়াছে। মায়ের মুখের বাণী, 'কাটাবন জুলবন হোক' যে হেমন্তবাবুর জীবনে সার্থক হইয়াছিল, তাহা বলি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মানুষকে মৃত্যু-রহস্য জানিতে হয়—নচিকেতা, গীতায় অর্জুন। 'মৃত্যুঃ যত্র পরীয়ম্'। 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'ও 'আত্মানং চাত্মশোচামি' শ্লোকদ্বয় ও আইনষ্টাইনের 4th dimension এ যে past present future পরস্পরকে সৃষ্টি করে এবং পরমাণুতত্ত্বের পক্ষে সৎই যে eternal present হইতে পারে তাহার উল্লেখ করি। Organic whole-এর মধ্যে মৃত্যু-বিচ্ছেদ বলিয়া কিছু নাই। 'সোঽহম্' শ্লোক এবং 'নিত্য স্বর্গ' ও 'আনন্দলোক' মন্ত্র পরস্পরবিরুদ্ধ।...ষষ্ঠে যোগেন সরকারের সঙ্গে দেখা। সে বলিল, 'আপনার ব্যক্তিত্বকে ভোলা যায় না'

১৩ই জুন

ঠাকুর, আমার আবেষ্টন একেবারেই আমার আয়ত্তের বাহিরে, আমার হাতছাড়া; কেমন করিয়া কাজ করিব? অথচ তুমি আসিয়াছ মায়া-ক্ষেত্রকে ব্রহ্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে। আমি আমার বুকের ভিতর এই গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা কেন বোধ করি? ইহা কি শুধুই আমার খেয়াল, অবাস্তব? চতুর্দিকে যে সব facts পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহার একটা বলিষ্ঠ সমাধান দিতে বা পাইতে হইলে ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? তাহা তো বুঝি না। আমাকে এমন করিয়া একা ফেলিয়া নিঃস্ব অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে কি কাজ আমাদ্বারা হইতে পারিবে? আমার বল দেও, জনজন দেও যাহাদ্বারা তোমার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। রেণু ডাঃ মুখার্জীর কাছ হইতে ইনজেকশান লইয়া গেলে... আশুবাবু, এস সরকার, এস, বি সরকার আমি ৮॥ টার পর ফিরি। ৯॥টার পরে তারিণীবাবু পানিহাটী হইতে ফিরিয়া এখানে আসেন...। পোষ্টারগুলি সকলের পছন্দ হইয়াছে। ঠাকুরের নাম এই প্রথম পোষ্টারে উঠিল। যোগেন সরকার সেদিন বলেন যে, ঠাকুরের লেখা এত স্পষ্ট যে তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কিছু বোঝাই যায় না। তিনি সত্যই বিশ্বদর্শন, বিশ্বময় বিপ্লবের বার্তা লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানের ইহারা গুরুগিরি লইয়া থাকিতে চায়।

১৭ই জুন

ঠাকুর, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, বিশ্বজনীন সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধের দর্শন লইয়া তুমি আসিয়াছ—তুমি নিম্ন বৃত্তিকে উচ্চ বৃত্তির শোষণ হইতে রক্ষা করিয়াছ। নির্বিচার মত দ্বন্দ্বের বন্ধন বলিয়াছ, পুরুষের শোষণ হইতে নারীকে রক্ষা করিয়াছে—তাই তুমি পুরুষ-শিষ্য করিলেও মেয়েদের মধ্যেই থাকিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণের হাত হইতে নীচকে রক্ষা করিয়াছ, কোলে তুলিয়া লইয়াছ। তোমার দর্শন বুকে লইয়া সারা জীবন ছুটিলাম। সাড়া তুলিতে পারিলাম কই? সবই তো গতানুগতিক পথে চলিতেছে। মেয়েদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য কোন মেয়ে কি তেমন করিয়া উন্মাদিনী হইয়া ছুটিয়া আসিল? সংস্কারক কেউ কেউ আছে বটে, বিপ্লবী কই? পুরুষ-নিরপেক্ষ নারীর মর্যাদা স্বীকৃত না হইলে নারীর শত সংস্কারেও সমাজের কিছু মঙ্গল হইবে না। তুমি এস, আমার বিপ্লবী ঠাকুর। দিনের কি ব্যবস্থা হইল তাহা জানিবার জন্য সকালে মঠে যাই। ১১টার পর বর্দ্ধমানের নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাহার এক ছাত্র ও এক পুত্র আসে, ১১টায় যায়। ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়—অনেক কথা। ইহারা বুঝিতে চায় না বলিয়া বলে যে, ওসব বুঝি না। Broglie-র antagonism ও complementary, James Jeans-এর লেখা প্রভৃতি বলি। শঙ্কর-বুদ্ধের সমন্বয় নিত্যগোপাল ছাড়া কে করিবে?...

১৪ই জুন

ঠাকুর, তুমি ব্রজ-গোপাল নিত্যগোপাল রূপে পানিহাটিতে অবতরণ করিয়াছিলে। তোমার শ্রীচরণ বুকে লইয়া শ্রীচরণরজঃ গায়ে মাখিয়া পানিহাটি আজিও

তোমার কৃষ্ণলীলার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তোমার যাহাকিছু সব আমার প্রিয়, স্বামিন্। তোমার দেহ, তোমার প্রাণমন, তোমার জন্মস্থান, তোমার নামরূপ-লীলা, তোমার স্বজন, তোমার বিশ্ব সবই আমার, সবই আমার প্রিয়। তোমার যা-কিছু সব আমার। তোমার পানিহাটিতে আগামী রবিবার গড়াগড়ি দিয়া ধন্য হইবার সুযোগ দিও। তোমার ছেলে তোমার নাম রূপ লীলা কীর্তন করিবার অধিকার দিও। এই তো প্রথম কলিকাতার বাহিরে যাত্রা। সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িবার প্রথম ধাপ। বিজয়-যাত্রা সফল হউক। আজ ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণ দিবস। কেওড়াতলায় সভা হয়...জিজ্ঞেস 'সাজলায় ধর্মগুরু' পুস্তক দিয়া যায়। ঠাকুরের সম্বন্ধে কথামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছে....। এই জাতীয় লেখা সংগ্রহ করা উচিত, ভবিষ্যতে ইহার জবাব দিবার জন্য। ঠাকুরের সম্বন্ধে যে সব উক্তি পরমহংসদেবের নামে বলি, তাহার প্রমাণ কোথায়? উহা তো তাঁহাদের কোন বইয়ে নাই। উহাদের বইয়ের সাথে পৌর্বাপর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে এবং ঠাকুরের দর্শন এ যুগের সমস্যার সমাধান কেমন করিয়া তাঁহার জীবনধারা সম্ভব, তাহা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এজন্য পুস্তক সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মঠে দীর্ঘদিন পরে ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা। তাহার বিধবা বেশ। একমাত্র পুত্র ট্রাম দুর্ঘটনায় মরিয়াছে। কত ঘটনায় তাহার সঙ্গে জড়িত, আমি তাহাকে আজও আমার জীবনের মধ্য হইতে ছাড়ি নাই। অনেক ঘটনা যে। প্রতিভা বসুর আনিতে যায়, তাহার সঙ্গেই ইন্দুমতীর ঠাকুরের মন্দিরে দেখা। সে নিয়া আসে।

১৬ই জুন

পুরুষোত্তম, তুমি শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকৃতির স্বাংমর্যাদা' দিতে গিয়া প্রকৃতির সকল দাবী মানিয়া লইলে নিজ ব্রহ্মস্বরূপ অটুট রাখিয়া—'আত্মনি অবরুদ্ধ সৌরতঃ'; কিন্তু তাহাতে তোমাকে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে শুচিতাবাদী, প্রজ্ঞাবাদী মানুষ যখনই। সেই তুমিই বর্তমান যুগে যখন প্রকৃতির মর্যাদা দানিতে মেয়েদের স্থান দিয়া গেলে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া (অবশ্য তাঁহার শিক্ষণের ব্যাখ্যানুযায়ী) তোমার শিষ্য পর্যন্ত তোমাকে কলঙ্কিত করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আমি তো দেখিতেছি তুমি নিষ্কলঙ্ক। তুমি প্রকৃতির সকল বিকৃত পরিণাম গায়ে মাখিয়া নির্বিকারত্বের দর্শন ও জীবন আস্বাদন করিলে। সব কাম-জয়ে ভীত, পলাতক। তুমিই শুধু নির্ভীক: তাই অবধূত। তাই তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 'একমত' ছিলে না কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে। তোমার জয় হউক। বেণু সারাদিন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন লেখে। সুধাংশু ৫১ সের চাউল নিয়া আসে, প্রসাদ পায়। ৫১ টাকা পর মঠে যাই। মঠে দেবীপ্রসাদ মিত্র নামে একটী বি, কম পাশ ছেলের সঙ্গে দেখা। সে আমার খোঁজেই গিয়াছিল। গীতাভবনে আমার 'যদা সংহরতে' শ্লোক ও 'রাগদ্বেষ-বিমুক্তৈঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যা যেদিন হয় সেইদিন সে উপস্থিত ছিল। সে অনেক কিছু ধরিয়া রাখিয়াছে দেখিলাম—'নয়নোৎপলাচিত ওষ্ঠ' প্রভৃতি। অনেক আলাপ হইল। সে গীতার ব্যাখ্যা চায়। এখানে একদিন আসিবে। আরও একটী যুবক ছিল। তারিণীবাবু মঠে এক চিঠি দিয়াছে। পানিহাটির সভার উদ্যোগ চলিতেছে। আমি মঠ হইতে ৮০ টাকা দিছি। বীরেন ডাক্তার তাহার পর আসে। প্রভাস সরকার ও অবনী সরকার উজ্জয়িনী-ভারতের ৬ মাসের টাকা বাবদ ৪৲ টাকা m. o. করিয়া পাঠাইয়াছে। আর গ্রাহক থাকিবে না জানাইয়াছে—'Dear Sir, we donot wish to subscribe' ইত্যাদি কুপনে লিখিয়া। বেদনা বোধ করিয়াছি। অপমান করিবার জন্যই উহারা এইরূপ করিয়াছে। যাক্, অনেক অপমান জীবনে পাইয়াছি। উহাদের গুরু আমাকে কতখানি ভালবাসিত তাহা উহারা জানিলে এই ব্যবহার আমার সঙ্গে উহারা করিত না। উহারা পুত্রস্থানীয়। উহাদের আর কি বলিব? ঐ কুপনখানি মঠে চিদানন্দ, সুধাংশু, নীলরতন ও ধর্মপতিবাবুকে দেখাই। পানিহাটি সভার বিজ্ঞাপন ছাপাইবার জন্য প্রেসগুলির নিকট ৫ খানা চিঠি সোই করা হয়। ১৭ই জুন

ঠাকুর, তুমি অনিন্দ্যসুন্দর, আমার অকলঙ্ক পূর্ণ শশী। তুমি চির নিশ্চিন্ত, নিত্য অনিন্দিত। সকল নিন্দা সকল কলঙ্ক গায়ে মাখিয়াই তুমি অনিন্দ্য অকলঙ্ক। প্রকৃতির সকল বিকার গায়ে লেপন করিয়া তুমি নির্বিকার, নির্লেপ। —প্রকৃতি করে ভীত, আর তুমি প্রকৃতির সকল ভার স্বীকার করিয়া, সকল অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নির্ভীক, বীরেশ্বর। তোমার মত বীর কে দ্বিতীয় আছেন? সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের শ্রীকৃষ্ণই তুমি হইয়া আসিয়াছ। তোমার বীরত্ব ও তাঁহার বীরত্ব একই, 'ব্রহ্মাবিষ্ণু' প্রকৃতির পায়ায় পড়িয়া 'ধাবি খাইতে' পারেন, নিত্যগোপাল ধাবি খান নাই। পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া ব্রহ্ম কাঁদিতে পারেন, কিন্তু নিত্যগোপাল এমনই এক ব্রহ্ম যিনি পঞ্চভূতের ফাঁদকে লীলা সহায়ক বলিয়া আস্বাদন করিয়া ব্রহ্মঘনবপুরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। একের লাগিয়া এক যখন কাঁদে, তখনই এই বিশ্বসৃষ্টি। একটে পাইবার জন্য এক ব্যাকুল, এক আপনাকে হারাইয়া আপনাকে পাইবার জন্য উন্মাদ—এই এক-রহস্য সমস্বর প্রচার করিয়া নিত্যগোপাল বন্ধু।...৪টার পর মঠে যাই, ফিরি প্রায় ১০টায়। মঠের কার্যকরী সমিতির সভা হয়।...কৃষ্ণগোপাল সকালে আসিয়াছিল। তাহাকে পানিহাটি যাইতে বলি। সে যাইতে পারে বলিল। এখানে ৬টার মধ্যে আসিবে।

১৮ই জুন

নিত্যগোপাল, জনমেজয়-নন্দন গৌরীদুলাল স্বামী আমার, তুমি আমাকে অঙ্গীকার কর, তোমার অঙ্গ করিয়া লও, আমাকে স্বীকার কর, তোমার স্ব করিয়া লও। তুমি আমি এক অদ্বৈত হইব প্রেমে। বিচ্ছেদের জ্বালা, বিভেদের জ্বালা দূর হউক। আমাকে অপৃথক-দর্শন দেও যাহাতে বুঝিতে পারি তুমি আমি অপৃথক, এক অদ্বৈত। তুমি সকল বস্তুর মধ্যে প্রেম-মৈত্রী স্থাপন করিতে পানিহাটে আবির্ভূত হইয়াছ—জড়-অজড়ে মৈত্রী, নিত্য-অনিত্যে মৈত্রী, চৈতন্যে-অচৈতন্যে মৈত্রী, পশুরে-বুদ্ধে মৈত্রী, শঙ্করে-চার্বাকে মৈত্রী। তোমার মৈত্রী পরস্পর বিরুদ্ধ তত্ত্বের মাঝে, পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তুর মাঝে, বৃত্তির মাঝে। মৈত্রীর চরম ও পরম রূপ তোমাতে উদ্ভাসিত। তোমার জন্য জন্মযুক্ত বিশ্ব-জীবনে। বিচ্ছিন্ন বিশ্ব এক-বিশ্বে গড়িয়া উঠুক।...যমুনা আসে একটার পর।...সুধাংশু আসে।

১৯শে জুন

আজ ২০শে জুন পানিহাটিতে শ্রীনিত্যগোপাল-জন্ম-শতবার্ষিকীর উৎসব ও সভা-অনুষ্ঠান।

আমার ব্রজ-গোপাল নিত্যগোপাল, গৌরী-দুলাল, জনমেজয়-নন্দন, তোমার আবির্ভাবে পূত পানিহাটিতে আজ সভা ও উৎসব। পানিহাটীর প্রতি ধূলিকণা তোমার শ্রীচরণ-পরশে ব্রজরজ, আমি বারবার আমার সকল সত্তা দিয়া পানিহাটীর প্রতি ধূলিকণা বৃক্ষতরুলতা পশুপক্ষী ও নরনারীকে প্রণাম করি। পানিহাটির এই যাত্রা মহানির্বাণ মঠের পর প্রথম যাত্রা। তোমার জীবন ও দর্শন দিয়া বিশ্ব-বিজয় অভিযান পানিহাটি হইতে সুরু হউক। আমার বুকে বল দেও। তোমাকে জীবনে মাখিয়া লইয়া তোমার সঙ্গে এক হইয়া এই বিজয়-অভিযানে যাত্রা করিলাম। তোমার জয় হউক, স্বামী আমার। ৫।৫টার উপর ও নীচে ঘর তালাবন্ধ করিয়া আমি উদ্বাহিণী বৃদ্ধ প্রতিভা যমুনা সুধাংশু রেনু গোপা বাসে ভাদুরাজারের মোড়ে যাই। কিছু পরে বিমল সেখানে যায়। রমাপতিবাবু ও তাঁহার স্ত্রী, নীলরতনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী পৌঁছেন প্রায় পৌনে আটটায়। মাইকওয়ালারাও পৌঁছায়। মাইকওয়ালারা ছাড়া আর সব এক বাসে উঠি। পানিহাটি নামি, হাঁটিয়া যাই। ঠাকুরের 'হাতেখড়ি'র স্থানে প্রণাম করি। মঠ হইতে হরিস্বরূপানন্দ, মাখনবাবু, শ্যামানন্দ, কারুণানন্দ, নিত্য-শ্যামানন্দ, দেবানন্দ, চৈতন্য, অভয়ানন্দ, আশুবাবু, অমূল্যবাবু, অগস্ত্য, কালো, মণি ডাক্তার, সুরেশ দেব, শঙ্করী-হরি-কৃষ্ণসখী, রাধাঘাটের লীলা, রাণী-বউদি, সুরেন দেব, সুরেশ দাস, কিরণ, নিত্য দেবানন্দ গিয়াছিল। সকলেই গঙ্গাস্নান করি। ২।৩টায় প্রসাদ পাই—খিচুড়ি, আলু-পটোলের তরকারী, চাটনি ও বুঁদে প্রসাদ পাই। মেয়েরা রান্নাঘরে, আমরা সবাই দুর্গা

যাসের উপর। বেশ লাগিল। ৪॥টার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভাপতি অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্র। প্রারম্ভিক সঙ্গীতের পর মণি ডাক্তার বেশ বলে। নিত্যগোপাল অপরিচিত, অথচ সাদা বিশ্বে পরিচিত হইবার যোগ্যতা তাঁহার আছে। বিবেকানন্দের মত কেউ থাকিলে এতদিন তাঁহাকে মানুষ চিনিত। পরে যতীন মজুমদার বলে, জড়কে ছাড়া যায় না, অজড়কেও নয়। চাই জড়-অজড়ের সমন্বয়। আগে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের কথা বুঝিতাম না, এখন যেন বুঝিতেছি যে উহার মধ্যে একটী আলোর সন্ধান আছে। কোন্নগরের যতীনবাবু বলেন, তাহার পর আমি বলি। তাঁহাকে পাইয়াও আমরা পাই নাই। অযোগ্য আমরা। একটা দার্শনিক বাদমণ্ডল রচিত হইতেছে যেখানে চক্রেশ্বর নিত্যগোপালকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের সব পরস্পর বিবদমান দার্শনিক হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইবেন। গীতার কথা বলি—জড়ের মাঝে বেদান্ত দিতে নিত্য-গোপাল আসিয়াছিলেন। আজ চোখে খুব জল পড়িয়াছিল। সারাদিনই একটা বিহ্বলতা অনুভব করি। সভাপতি অভিভাষণ পাঠ করেন ···প্রায় ৯টায় পৌঁছি।

২০শে জুন

ক্রমশঃ

শ্রীনারদ

শ্রীজগদরঞ্জন কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন

কভু গন্ধর্ব উপবর্হণ, দাসীপুত্র, স্বয়ং ব্রহ্মসুত—
কভু আশ্রম রাজ সভাতল পাদস্পর্শে হয়েছে পূত।
বৈকুণ্ঠ, কৈলাস ধাম, মথুরা, দ্বারকা অন্তঃপুরে—
দেব, গন্ধর্ব, অসুর আবাস ভ্রমিয়াছ ঋষি নিত্য ঘুরে।
ভক্তি ধর্মে দীক্ষা লইয়া জনক পশুযোনীর ঠাঁই
অমরা হইতে ভাগবত ধারা ঢেলেছ নিয়ত এই ধরায়।
দেবপ্রদত্ত পবিত্র বীণা তুলিয়া আপন সুর করে—
হরিগুণগান শুনায়েছ কত দেব-মানবের প্রতিটি ঘরে।
যেথা সমস্যা যেথা সংঘাত যেথেছ সেথায় উল্কা গতি;
মোহন মন্ত্র দানি শ্রুতিমূলে ধর্মে সবায় এনেছ মতি।

বহির্বতের যজ্ঞভূমিতে বহে যবে পশুরক্ত ধার—
তুমি দেবর্ষি দাঁড়ায়ে সেথায় দেনেছ ভক্তি তত্ত্ব সার।
অরণ্যগর্ভে কভু বা বসেছ কিশোর ধ্রুবের সন্নিধানে;
কবি পরীক্ষা শ্রীহরিভক্ত গড়েছ মন্ত্র দীক্ষা দানে।
দেহ প্রহ্লাদে, ধর্মপুত্রে, ভক্তিযোগের নিগূঢ় বাণী
দেব দানবের দ্বন্দ্ব ঘুচিতে বাড়ায়েছ তব অভয় পাণি।

হিংসামত্ত মেদিনী আজিকে; সংঘাত সদা স্বার্থ লয়ে—
কোথায় ভক্তি? জাগে আসক্তি—মানব মুগ্ধ মুগ্রামোহে।
বীণা-নিক্কণে নন্দিত কর নিখিল ধরণি মোদের প্রাণ—
এস দেবর্ষি! ভাগবত স্রোতে কলিহত জীবে করাও স্নান।

"পুরুষোত্তম-বিশ্ব পচা গলা এই জগতের বাহিরে নয়; সেই বিশ্ব এই বিশ্বেরই পুরুষোত্তম-অগ্নিতে হজম-হওয়া পুরুষোত্তম-রূপ। পুরুষতন্ত্র স্তরকে পুরুষোত্তম স্তরের কাছে সমর্পণ করিলেই এই স্তরের সব বন্ধন খুলিয়া যায়, এই স্তরের সব কিছু মুক্তির অগ্নিতে জারিত হইয়া এই স্তরেরই বুক চিরিয়া (বৃথায়) ভাগবত রূপে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়, যেমন হংসীমাতার বুকের তাপ পাইয়া ডিম হইতে ছানা বাহির হয়।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

কঠোপনিষৎ

ভাবানুবাদ

॥ শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

বায়ু যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০

একই বায়ু পৃথিবীতে প্রাণরূপে নন্দিত বহতা
প্রাণে প্রাণে : সুখ দুঃখ স্বপ্ন ভয় আলো উজ্জ্বলতা
নিয়ে তারা বৈচিত্র্যের বিচিত্র ছন্দের
এক একটি সুর যেন, বিশ্বের বিশাল ঐকতানে।
একই বায়ু প্রাণরূপে রয়ে গেছে প্রতি জীবনের
অন্তরালে, তবু কত রূপের পৃথিবী !
প্রতিটি জীবন তবু কত ভিন্নরূপে যে এখানে
প্রতিভাত ! পরিবর্তনের স্রোতে—এই বস্তুপুঞ্জের ভিতরে
কত রূপ হয়ে উঠছে—অথচ একই প্রাণ উজ্জ্বল বিস্তারী
হয়ে আছে চারিদিকে, একই বায়ু প্রত্যেক শরীরে
প্রাণরূপে বহমান—অথচ বিচিত্র তারা প্রহরে প্রহরে
বিচিত্র শরীর নিয়ে। তেমনই অদ্বিতীয় সর্বভূতের
অন্তরাত্মা—একক অথচ তবু বিভিন্ন দেহের
রূপ নিয়ে রূপান্বিত হয়ে উঠছে তারই রূপ ধরে।
আত্মা সর্বান্তরবর্তী—যদিও এ তরঙ্গিত বিশ্বজীবনের
বিচিত্রের নিত্য ছন্দে দেও তালো প্রহরে প্রহরে
অপরূপ হয়ে উঠছে—বহুর বিচিত্র রূপের
অতীতরূপে। অথচ তদতিরিক্ত অবিকৃত আত্মস্বরূপে
বর্তমান : একই 'অস্তি' বিশ্বাতীত হয়েও এখানে
বিশ্বব্যাপী হয়ে আছে : রূপে ও অরূপে
সমন্বিত একই আনন্দের
অবিরাম মূর্ছনা—বিশ্বময় মহাপ্রণবের।
ফুল ফুটছে, ঝরে পড়ছে নিরন্তর এ রূপের উদ্যানে ॥

২।৩।১০

সাময়িকী

রবীন্দ্র-বার্ষিকী ও সমাজ-জীবন—রবীন্দ্র-বার্ষিকীতে রবীন্দ্র-সাহিত্য আমরা আবৃত্তি করি, আচরণ করি না। সে সাহিত্য লইয়া আমরা যাহা করি তাহা হইল সাহিত্যের বিলাস—সাহিত্যের অনুশীলনও নয়, অনুধাবনও নয়। জাতীয় চরিত্রের এই দুর্দিনে সব কিছু লইয়াই আমরা যাহা করি, তাহা বিলাসই মাত্র। রাজনীতির যে তত্ত্বই আমরা লই না কেন, তাহাও আমাদের বিলাসই—কেননা যে কোন তত্ত্ব দিয়াই যদি কল্যাণ-বুদ্ধিতে, দেশ-সেবা বুদ্ধিতে কাজ করিতাম, তাহা হইলে দেশের চেহারা তথা আমাদের চেহারা অন্য রকম হইত। সমাজ-সেবা ক্ষেত্রেও তাই, চাকুরী প্রভৃতি অন্য যে কোন কাজের কর্মকে আমরা কর্ম হিসাবে, সেবা হিসাবে দেখি না—সে সব কিছু লইয়াই চলে আমাদের বিলাস। আর রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে তো কথাই নাই। ব্যষ্টি বা সমষ্টি সব রকম ভাবেই আমরা সাহিত্য লইয়া ভাবুকতা করি, আমোদ আহ্লাদ করি, পয়সা সময় খরচ করি—কিন্তু সাহিত্য আমাদের কোন প্রেরণা জোগায় না, মহৎ জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে না, জাতীয় চরিত্র সংগঠনে পথ প্রদর্শন করে না। সাহিত্য কি শুধু অবসর সময় কাটাইবার জন্য? যন্ত্রের উন্নতির ফলস্বরূপ ছাপার অক্ষরে কত কবিতাকাহিনী গল্প উপন্যাস আকারে কত কিছুই প্রতিদিন বাজারে বাহির হইতেছে—সে সবের একমাত্র প্রয়োজন হয়তো স্থূল রুচির সন্তোষ বিধান ও অবসর বিনোদন ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যেরও কি আমাদের জীবনে এই-ই স্থান ও মান? জীবনের নূতন মূল্যায়নে, নানা ধ্বংস ও ধ্বংস সংস্কারের অচলায়তন ভাঙিয়া নূতন জীবন-চেতনার রওনা হওয়ার কাজে যে রবীন্দ্র-পরবর্তী-সাহিত্য কি গভীর ও ব্যাপক ভাবে সক্ষম ছিল আমরা কি তাহা তুলিয়া ধরিয়া জাতির চরিত্র-সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলাম? রবীন্দ্র-সাহিত্য কি বলিয়াছে?—জীবনে ও জগতে 'আমি আনন্দিত'—অত্যন্ত সংক্ষেপে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইহাই বক্তব্য। আমরা কি আনন্দিত? আমরা কি জগতে ও জীবনে নানাভাবে যে বিষয় পীড়িত এই কথাটাই সর্বদা নানা ভাষায় নানা ভাবে প্রকাশ করি না? এবং জীবনে সেই রকম আচরণও করি না? সামঞ্জস্যের সুষমা ছাড়া কিছুই জীবনকে আনন্দিত করিতে পারে না—সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই সামঞ্জস্যের কথা। কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের, প্রেমের সঙ্গে ভক্তির—প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সামঞ্জস্যময় প্রেম-দৃষ্টিতেই শুধু জগতে ও জীবনে আনন্দ আস্বাদন সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের একটা স্বাভাবিক চেতনা ছিল। এই চেতনা যদি সমাজ-জীবনে প্রবেশ করান যাইত, তাহা হইলে আমাদের সমাজের চেহারা অন্যরকম হইত। রবীন্দ্র-সাহিত্য আনন্দের সাধনা করিয়াছে, কিন্তু কোথাও কি ক্লেদপূর্ণ হিংসাবিদ্বেষজড়িত আত্মসর্বস্ব জীবন-চেতনাকে মহিমান্বিত করিয়াছে? আমরা কি রবীন্দ্র-সাহিত্যের পংক্তিতে পংক্তিতে আত্মসর্বস্ব ভোগবাদকে দেখি? কিংবা জগৎ-বিযুক্ত নেতিবাদকেই দেখি? রবীন্দ্রনাথ কেবল তো সাহিত্য রচনাও করেন নাই, বিশ্বকল্যাণ-ঘন একটা সামাজিক সুস্থতা আনিবার চেষ্টাতেই তো তাঁহার আনন্দ-সাধনাকে তিনি কর্মের মধ্যেও রূপ দিতে চাহিয়া পুষ্টি করিয়াছেন জ্ঞান ও আনন্দ-সাধনাপীঠ শান্তি-নিকেতনের পাশাপাশি শ্রীনিকেতন—যেখানে শিল্প কৃষি গবাদি পশুপালন প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানুষের বাস্তব জীবন গৌরবান্বিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। রবীন্দ্রনাথকে আমাদিগকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হইবে। তাঁহার সাহিত্য চোয়াইয়া যে জীবন-দর্শন ফুটিয়া উঠিল তাহাতে জীবনের নূতন মূল্যায়ন আছে—সেই জীবন-দর্শন দিয়া আমাদের সমাজ-জীবনও গঠন করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ যদি সমাজ-জীবনকে উত্তোলন করিতে, সুস্থ করিতে—পাশ্চাত্য

সভ্যতার বাস্তব-সর্বস্ব বহির্মুখীনতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্মুখীন ধ্যানসমাধে জীবন-চেতনার সুষ্ঠু সংমিশ্রণ দিয়া—সুস্থ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া বিলাস চলিতে পারে, তাহাতে সমাজ-জীবনে কোন কাজ হয় না। আমাদের দেশে যাঁহারা মহৎ প্রাণ, তাঁহাদের এক এক জনকে লইয়া আমরা এক এক রকমের বিলাস করিয়া থাকি—কাহাদেরও লইয়া আধ্যাত্মিক বিলাস—কাহাকেও লইয়া নাচ গান আবৃত্তির বিলাস কিন্তু কাহাকেও জীবনের প্রয়োজনে লাগাই না। আমাদের বাস্তব জীবনের সেই ত্যাকুয়াম পূরণ করিতে তাই বহির্ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের ডাক পড়ে। কিন্তু ঘৃণা ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—আছে আছে—ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষীয় মহাত্মাদিগের কাছেই পাওয়া যাইবে সাহিত্যের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে সে সমাধান দিয়া গিয়াছেন। আমরা লইতে শিখি নাই। তাই বহিন্দ্রের মত রূপসের মত আমি—মহতের স্পর্শে মহান হইতে পারি নাই—মানুষ হইতে পারি নাই। আজ তাঁহার জন্ম বার্ষিকী দিনে প্রার্থনা করি—রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া আবৃত্তি করিয়া আমরা যেন জীবনকে অধিকতর সুস্থ করিতে পারি—সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেন আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি।

"কামবলে বলীয়ান হইয়া যোগতপবলোদ্ধত শুম্ভ-নিশুম্ভ একদিন ত্রৈলোক্য ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিলেন।...সকলের সব যজ্ঞভাগ, সকলের সব আত্মনিবেদনের ফল বিশ্ব ও ঈশ্বরের সেবায় না লাগাইয়া 'আত্মকারণাৎ' প্রাণতর্পণার্থ কাড়িয়া লইলেন।...হরণের পথে, শোষণের পথে সংঘ-গঠন খুব সহজ।...শক্তির জোরে বহির্জগতে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, শক্তির ক্ষেত্র যতদূর জয় করিতে পারে শুম্ভ তাহা করিয়াছে। অহংপ্রধান, প্রাণতর্পণ-প্রধান সভ্যতার চরম আদর্শ শুম্ভ-নিশুম্ভ। শুম্ভ মূর্তিমান বুদ্ধিমান-কর্মী 'আমি'। এই শক্তির প্রতিবলরূপে দাঁড়াইতে না পারিলে কেবল আলোর জোরে, কেবল অধ্যাত্মের জোরে দেবতারা যে টিকিতে পারিবেন না, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন, তাই তাঁহারা ভক্তিদেবীর শরণ লইলেন।...'শক্তি'র আমি-র প্রতিবল 'ভক্তি'র আমি।...পোষণাত্মক অনাবিল অত্যন্ত-শুদ্ধি তাঁহার কপালে জুটিল না, হৃদয়ে অনন্ত দেবতার অবতরণ না হইলে তো লক্ষ বৎসরেও অত্যন্ত শুদ্ধি লাভ হইবে না। জপে অসুরত্ব কাটে না, মহাদার্শনিক, মহাযোগী, মহাব্রতী, মহান তীর্থসেবী, মহাবৈজ্ঞানিক, প্রাণায়াম সাধক, মহাতপস্বী, মহাবিদ্বান, মহাকবিও শুম্ভ হইতে পারে যদি অনন্তদেব হৃদিস্থ না হন, হৃদয় বিকশিত না হয়।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসংঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন করার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। স্নেহহীন আত্মা যেমন অবান্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। ছুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

19 JUL 1988

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ১৷৷৩
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৮৲
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৮৲

২। উপোপনিষৎ ২৲
৩। কেনোপনিষৎ ২৲
৪। কঠোপনিষৎ ৩৲
৫। প্রশ্নোপনিষৎ ১৷৷০
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ ১৸০
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতাস্বরূপী
১২। উজ্জ্বলকারত (পুস্তিকা)
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৸৲
(মুক্তা-কীর্তনমুনি কর্তৃক প্রকাশিত)

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মুদ্রিত হইতেছে)
৪। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির জন্মকথা
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিল্প নিত্যগোপাল ও শিল্প সুধার কথা
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল ৷৷৶০
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩৲
৪। রবীন্দ্র-হৃদয় ৫৲
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৩৲

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয় আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৫, ১৯৬৮ :—শ্রীরেণু মিত্র একবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগ্‌দর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণী বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুইয়ের সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

আত্মকথা

বা

সত্যের প্রয়োগ

মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর

সচিত্র নূতন বাংলা সংস্করণ

মূল গুজরাটী হইতে অনূদিত

অনুবাদ : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

মূল্য : ১২·০০

*

কয়েকখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

গান্ধী-রচনা-সংকলন

মূল্য ৫·০০

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

মূল্য : ৩·০০

মোহনমালা

একখানি নিত্যব্যবহার্য গান্ধীবাণী-চয়নিকা

মূল্য : ৩·৫০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিজড়িত জীবনী

মূল্য : ৫·৫০ ও ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন

মূল্য : ৫·৫০

সম্পূর্ণ পুস্তকতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রকাশন বিভাগ,
গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র : শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৫, ১৯৬৮

প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৭৫) ১০৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
২। শ্রীগৌরাঙ্গ ও সাম্যবাদ ১১৩
শ্রীকবিদাস সাহা
৩। অমর নাট্যকার ইবসেন ১১৪
শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার
৪। ফেটিবাদ ১১৮
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৫। সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি) ১২০
শ্রীশ্রীনিতাগোপাল
৬। পুস্তক পরিচয় : রক্তকমল, জানীন ও ফেরজা ১২৬
৭। রাধারাণী (কবিতা) ১২৭
শ্রীনিতাগোপাল
৮। শ্রীকৃষ্ণ-অবতরণ-জন্মাষ্টমী-শ্রীরাধাষ্টমী ১২৮
শ্রীরেণু মিত্র
৯। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৬৭) ১২৯
১০। সাময়িকী : বিশ্ব-পরিস্থিতি ও মার্কসবাদ ১৪

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

কর্তৃক

১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে

জেলে থাকা কালীন লিখিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

অবধূত-ভাষ্য

মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে জড় ও চেতনের যে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণাসহিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক জীবন-চেতনার দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে, তাহা বর্তমান সমাজ-পরিশোধনে বিপ্লবী দর্শন। যে-কেহ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কথিত এই বিপ্লবী চিন্তাধারার অনুরাগী, তাঁহাকেই এই গীতা-ছাপানোর কাজে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দান করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে।

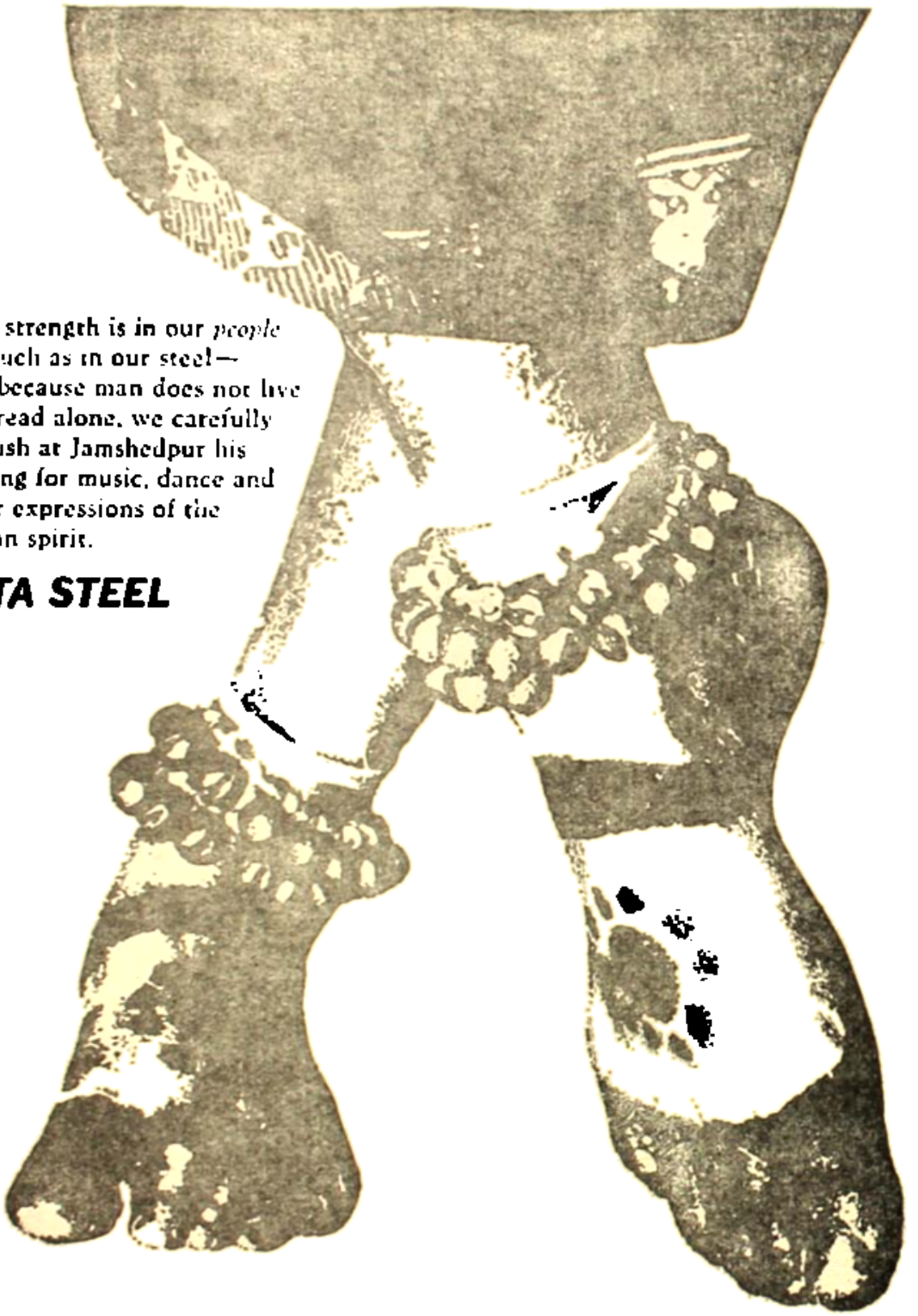

Our strength is in our *people* as much as in our steel—and because man does not live by bread alone, we carefully nourish at Jamshedpur his craving for music, dance and other expressions of the human spirit.

TATA STEEL

ছোটোদের জুতো দেখেশুনে কিনবেন
নতুবা পায়ের গঠনে
আজীবন খুঁত থেকে যেতে পারে

বাটা লিলিপুট ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি।
কোমল আর নমনীয় চামড়ায় এমন কৌশলে এর প্রতিটি জুতো পায়ের গড়নের
সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। সবচেয়ে আরামে খেলার ফাঁকে ও চলতে
ফিরতে পা ব্যথা পেতে পারে এমন কোনোকিছুর ওপর সযত্নে চোখ রাখা
করে। এমনকি এর মজবুত এই জুতোর তলা চলাফেরায়
পা-টলমলানোর সহায়ক। আর ভেবেচিন্তে এর ডিজাইন, যা পায়ের পক্ষে ক্ষতিকর না।
বিজ্ঞানের নিয়মেই এগুলো, উপরন্তু আর নিশ্চিন্তে ছোটোদের
আরও জুতো কেনা লিলিপুটে। বাজারে যতই নতুন স্টাইল
এখন বাটার দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আজই নিয়ে আসুন আপনার
ছোট্ট বাবুটির বাটা লিলিপুট দেখুন কেমন
খুশিতে ভরে ওঠে ছোটোদের মন।

Bata
লিলিপুট
ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি

পশ্চিমবংগ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

পশ্চিমবংগ

পত্রিকা পড়ুন

এই সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় জেলার কোথায় কি সব উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তার বিবরণ যেমন থাকে, তেমনি থাকে পশ্চিমবংগের বিভিন্ন জেলার খবরাখবর, নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ, সংবাদচিত্র ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা :

ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা বার্ষিক : তিন টাকা

★

পশ্চিমবংগ সরকারের অন্যান্য

সাময়িক পত্রিকা

ওয়েস্ট বেংগল

(ইংরেজী সাপ্তাহিক)

প্রতি সংখ্যা : বারো পয়সা ★ ষাণ্মাসিক : তিন টাকা ★ বার্ষিক : ছয় টাকা

পশ্চিম বংগাল

(নেপালী সাপ্তাহিক)

প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা ★ ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা ★ বার্ষিক : তিন টাকা

মাযবেরী বংগাল

(উর্দু পাক্ষিক)

প্রতি সং বার পয়সা ★ ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা ★ বার্ষিক : তিন টাকা

(ভি পি তে কোনো পত্রিকা পাঠানো হয় না)

অগ্রিম চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হবার জন্য

নিচের ঠিকানায় লিখুন

তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা

পশ্চিমবংগ সরকার

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

ডব্লিউ. বি. (আই অ্যাণ্ড পি. আর) অ্যাড (খ) ১৩৮৪২ /৬৮

UNIVERSITY

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৮

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭৫)

সমস্ত আঘাতের মধ্যে সেই বাণী স্মরণ করে চলব—'স্মরং, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি'...। তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ—শ্রীনিত্যগোপালের এতবড় জীবন ও তত্ত্বের কাছে শরণাগত হও···। জগতের মধ্যে দাঁড়ালে আত্মীয় নিয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘরকন্নাবাড়ি চলে না···নিজের খেয়াল পরিত্যাগ করতে হবে···। লোক বেদ ও স্ব—তিন ক্ষেত্রের কোন সংস্কার নিয়েই বৃন্দাবন যাওয়া যায় না···। আঘাত—অনেক আঘাত···। নিত্যগোপাল, আঘাত সইবার মত আমাকে শক্ত কর।··· জগৎ ছেড়ে যেতে তো পারব না···ঘোষণা করেছি মুখে দেখায় যে জগৎ সত্য, ব্রহ্মেরই মত সত্য—তাই জগৎ ছাড়তে পারব না—আঘাত সইতে হবে···। বিদ্যাসাগর মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে পেয়ে মানুষ-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন—নিত্যগোপাল, আমাকে সে মৃত্যু থেকে বাঁচাও—মানুষের প্রতি যেন বিদ্বিষ্ট হয়ে না উঠি।··· আমার আমি তুমি নেও···। মানুষকে আপন করে নিয়েও যে আসক্তি বিদ্বেষে জর্জরিত না হয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায়—এ কথাটা মানুষের কাছে নূতন বলে আমার প্রাণভরা ভালবাসাকে কেউ বুঝল না—এ পথে তাই কেউ আসল না..যাদের আপন করতে গিয়েছি, যাদের সঙ্গে এক হতে চেয়েছি—সেখান থেকেই আঘাত পেয়েছি। লীলাতরঙ্গে আমি অবগাহন করব···জগন্নাথ শ্রীজগন্নাথ. জগন্নাথই আমার নাথ জীবনের শেষ কালে যেন জগৎকে মিথ্যা বলতে না হয়—মানুষের ব্যবহারে ত্যক্ত হয়ে জীবন শেষে যেন দুঃখবাদী হয়ে না পড়ি···। ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য এই দিব্য জ্ঞান প্রদান কর নিত্যগোপাল...।

২, ২, ৫৭ ওঁ নমো ভগবতে···ওঁ। সেদিন একটী বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীরা মানুষের দেহের রোগ সারিয়ে মানুষের সেবা করছে, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি দিয়ে দেশে বিদেশে মানুষের অনেক সেবা করছে। শ্রীনিত্যগোপাল এসেছেন মানুষের মনের রোগ সারাতে—বিভিন্ন চিন্তাধারার সংঘর্ষে ক্লান্ত মানুষের মনের দৈন্য মেটাতে—নূতন মূল্যে জীবন ও জগৎকে দেখাতে তিনি এসেছেন···এক একটী পরিবারকে আদর্শ বা ঋষির পরিবারে তৈরী করে দিয়ে জগৎটাকে বাসযোগ্য করে তুলতে তিনি এসেছেন।···আমার মত বিপ্লবীর পক্ষে আশ্রম করা সম্ভব নয় বলে অনেক দিন ভাবি নি··· গানের ছন্দের মত পারিবারিক জীবন চালনাতেও একটী ছন্দ আছে—সেই ছন্দ শিখে নিলে জীবনে নিরানন্দ কোথায়? মনে করে ছিলাম মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরের আদর্শ রেখে যেতে পারব···কিন্তু পারলাম কই? তবু ভগবদিচ্ছায় নরনারায়ণ আশ্রম করেছি···কতটা কি হবে জানি না।...আমার বিপ্লবের অন্তই শেষ আসে

না।...আমি সংসার-বিরহী, আমি সন্ন্যাস-বিরহী—প্রচলিত কোন ধরা-বাঁধা মূলত করা জীবন-চেতনা নিয়ে আমি চলছি না—তাই আমার কেউ নেই।...অর্থ আমাদের নেই বুড়ো রামনাথ ভট্টাচার্য পাতার ঝোল খেয়ে কাটিয়েছেন...আজ এখানে এক তোলা হলেও দুধ আসে। ...যেদিন চাকুরী ছেড়ে এ পথে বওয়ানা হয়েছিলাম সেদিন ছোট বালক থাকলেও দুধ ছিল না।... মেয়েরা বা ছেলেরা আশ্রমের কাজ করবে না—লেখাপড়া করবে—তা হবে না—যার যা কাজ নিয়ে যাও।...গা ঢেলে দিয়ে চলা চলবে না আমি কত প্রকৃতি বদল করেছি—বুঝো ছিলাম—একটা মেয়েলী লজ্জার কাছে মাথে মিশতে পারতাম না...শ্রীনিত্যগোপাল-প্রসাদে আজ অপরিচিত মানুষের সাথে একান্ত আপনের মত করে মিশছি...। আমার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রকৃতি বদল কর...পড়ব না বলে গা ছেড়ে দিলে কি পড়া যায়?...বিছানা তুলতেই পড়া বন্ধ...হলে চলে না।... ভগবান যখন দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তা কাজে লাগাতে হবে...। মানুষের অসীম ক্ষমতা...যার যে ক্ষমতা এখন আছে তা বাড়ান যায়... এ ভাবে থাকা আমার চলে না...। খাওয়া যায় শুধু তার জন্য—এখন সেদিন নেই যে জামাই এলে গ্রামশুদ্ধ নেমন্তন্ন। ..চলার পথ যদি না শেখ টিকতে পারবে না...সংসার ধ্বংস হয় চলার পথ না জানায়...। শুরু করেছি যখন শিশুর জীবনের সব খবর রাখব—সব দিকে—ধর্মে অর্থে কামে মোক্ষে—সব জায়গায় আমি গুরু।..নিত্যগৌরবানন্দ তা নয়—তারা খোঁজ রাখে না শিশু তার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভাবে চলে—কী তার জীবনের সমস্যা কী তার সমাধান।...আমি গা ছেড়ে দিয়ে শুলে ধনঞ্জয় লাগবে আমাকে তুলতে...মরা মানুষের ভার বেশী...। এ ভাবে চললে ভবিষ্যতে ডুবতে হবে...তোমাদের খেয়ালমত আশ্রম চলবে না...। শুদ্ধসত্ত্ববোধ না থাকলে সময় পাওয়াই যাবে না...। আমাকে কি এই বয়সে এত উদ্বিগ্ন করা উচিত?...জওহরলাল নাকি ভারত চক্কর দিচ্ছে...বলছে আরাম হারাম হ্যায়...। নেওয়া সহজ...হজম করতে পারবে কিনা—সেই বুঝে নেবে; পরিমাণ বুঝে সংসার থেকে নেবে যেটুকু আমার ভুতো ভুতো করছে—যতদিন না কিনে পারি..., পায়খানা পায়খানা করে কানের পোক খসিয়েছে... যতদিন শক্তি দেহী করি—। নিত্যগোপালের সেই কথা স্মরণ কর—জাগো জাগো, এ সংসার অতি ভীষণ স্থান—জাগো মানে সচেতন থাকো।...আমাকে শক্তি দেওয়া, খুশী করাই সেবা—কাজ করা সেবা নয়।... দিন করে কি হল তার হিসাব কর...প্রত্যেককে নিজেই কাজ কর—কিন্তু শুধু কাজে তো হবে না—সেবা করতে পার কি না দেখ...। সেবা-বুদ্ধিতে কাজ কর—নিজের অহংকার নিয়ে নয়। আশীর্বাদ করার ক্ষমতা যদি ভগবান দিক থেকেও থাকে—আশীর্বাদ করি...। মেহ ভাঙতে পারে...মন প্রাণ তো না ভাঙলেও পারত।... কলির সব মানুষেরই দেহ ভাঙা...মন ও প্রাণ যদি সাধনা-সিক্ত থাকত তাহলে ভাঙত না ...মনপ্রাণ ভগবানে দিলে ভাঙা দেহ নিয়েই অনেক কাজ করা যেত...। তোমাদের দিন বেশ যায়—অথচ আমার দিন বেশ যায় না...খাইতে লোয়াস্তি নাই, নিদ নাই চোখে...—আমার অবস্থাই তো এই...তা তোমরা দেখতে পাও না? নর তোমরা, নারায়ণ নিত্যগোপাল—তোমাদের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা নিত্যগোপালকে নাও।...

৪, ২, ৭৭, সরস্বতী পূজা

শ্রীনিত্যগোপাল আমার বিদ্যাপতি—যুগে যুগে ভারতের কাছে বিদ্যার এক এক রূপ ধরা পড়েছে। যুগে যুগে শিক্ষা সভ্যতার সঙ্গে বিদ্যার রূপ বদলেছে...। নিত্যগোপাল বর্তমান যুগের বিদ্যা নিয়ে এসেছেন—তাই তিনি বিদ্যাপতি...। বর্তমান যুগের বিদ্যার উপাসনা নরনারায়ণ আশ্রম করিতেছে—ভারতের এক কোণে বসে নিরালা নিভৃতে জনজনহীন অবস্থায় যে বিদ্যার সাধনা নরনারায়ণ আশ্রম করিতেছে—গীতা ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের যে রূপ পেয়েছি—তা মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবনের সমস্যার সমাধান দিতে যে সক্ষম তা একদিন প্রমাণিত হবে...এই রূপকে আমরা ধারণ করব।...শুভ্র

হং সাত্ত্বিকতার রং—সুন্দরের মত, তুষারের মত সাদা রং সরস্বতীর—তিনি বীণা বাজন করেই চলেছেন··· ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব প্রভৃতি দেবতাদের দ্বারা তিনি সর্বদা বন্দিতা হচ্ছেন—সেই মা সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন—নিঃশেষজাড্যাপহরিতা···। জাড্য—জড়তা। বিদ্যাময়ী মায়ের প্রসাদ লাভ করলে মানুষ সকল জড়তার বিরুদ্ধে গর্জন করে ওঠে। সরস্বতী শুধু intellect—বুদ্ধি—নন; তিনি বিদ্যাময়ী—তিনি মুমুক্ষুদায়িকা দেবী···। ব্রহ্মবিদ্যা···গায়ত্রী—নরনারায়ণ আশ্রম তোমার সেই রূপের চাঁদে সমস্ত সমাজকে গড়ে তুলবে বলে বেরিয়েছে···। শক্তি দাও··· আমার জীবনের সকল জড়তা অপহরণ কর—১৯৭৯-এ ব্রহ্মসূত্র রূপে তুমি এসেছ···এসেছ গীতা উপনিষৎ রূপে। আমার জীবনে এলে তুমি—অথচ আত্মা অনাত্মা-তত্ত্বের দূর করা রূপ বিদ্যা মানুষের কাছে আমি তুলে ধরতে পারলাম না! মা··· শ্রীরাধা, আমার সরস্বতী—রসের দেবী তুমি—যে রস পচে না···সরস্বতী অর্থ রসবতী। সরস্বতীর একদিকে রস, আর এক দিকে ভাব—তাই তো রসের বিকৃতিও তাঁতে নেই, ভাবের বিকৃতিও তাঁতে নেই··। কেন এলে তুমি আমার জীবনে, শুধু শুধু এলে? আমি তাকি নাই, খুঁজি নাই—আমার জীবনে বার্থই তুমি এলে? আমি সবের পূজা করব না—আমার বহুরে একদিনের পূজা নয়···। সারা জীবন এই বিদ্যার পূজা করেই পথে পথে কাঁদলাম···দিন তো শেষ হয়ে এল···হয়তো চলে যাব কিছু করতে পারার আগেই···তোমার তো কিছুই করে যেতে পারলাম না···। আজও তো, দেহ শক্তিহীন হলেও, আজও তো তোমাকে নিয়ে ছুটতে চাই···।

৫, ২, ৭৯। ঔ···ঔ। যে পরিকল্পনা নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রম এখানে এসেছিল, যার এ পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারা যায় নি—নিত্যগোপালের আশীর্বাদে তারই একটী বীজ—লাইব্রেরী বীজ—আজ পোতা হল। ছিল আশা অনেক, মুকুলও আশা···সরস্বতীর যে কৃপা উপলব্ধি করেছি তাই দিয়ে নূতন ভারত গড়ন করে যাব।···হবে কি না জানি না।···একটা প্রশ্নই শুধু সব সময়ে মনে হয়—তিনি এলেন···শঙ্কর প্রভৃতি মহামনীষীগণ যারা বেদান্তের ব্যাখ্যা লিখলেন—সেই বেদান্তের এক নূতন যুগোপযোগী ভাষ্য তিনি আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের কাছে উদ্ভাসিত করলেন—অথচ সে কথা মানুষের কাছে দিয়ে যেতে পারলাম না··· কেন? এই প্রশ্নের জবাব কি?···নরনারায়ণ আশ্রম সত্যিই ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ—যে ব্রহ্মবিদ্যা জড় (matter) এবং অজড় (spirit)-কে যথাস্থানে যথামানে স্বীকার করে, সম্মিলিত করে, তাদের ছন্দ প্রকাশন করে সত্যি সত্যিই বড়···। ভারতবর্ষের এই একটী মাত্র ক্ষুদ্র স্থান যেখান থেকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছে—যত ক্ষুদ্রাকারেই হোক—প্রচারিত হবে। আগ্রহ জীবন-যাপনের সুস্থ স্বাভাবিক এই ছন্দের তত্ত্ব একদিন বিশ্বকে নিতে হবে, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়. তবে দেখে যেতে পারলাম না···নরনারায়ণ আশ্রমে আসা সৌভাগ্যের কথা বই কি—যদি অবশ্য এই জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকে তবেই সে সৌভাগ্য-বোধ থাকতে পারে।···লাইব্রেরী স্থাপিত হল···বাড়বে।··· কিন্তু তোমাদের জীবন যদি এই রকম ভিন্ন ভিন্ন করে বয়—তাহলে কি হবে?···সব যেন শিথিল হয়ে গেছে আমার রক্তও যেন ঠাণ্ডা করে দিতে চায় এই আবেষ্টন। কে আমাকে উষ্ণ স্পর্শ দেবে? নিত্যগোপাল, তোমার উষ্ণ স্পর্শে এতদিন বেঁচে ছিলাম···। আজ আর আমি বেঁচে এর মধ্যে নেই···কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি একটা উন্মত্ততা দেখতাম—নিত্যগোপালের তত্ত্বগত জীবন-যাপন করবার জন্য যদি একটা পাগলামী দেখতাম—তাহলে শান্তি পেতাম। একটী পাগল নাচলে অন্য ছোট পাগলও তার সঙ্গে নাচে···আমাকে জ্বলবার জন্য যদি কেউ আহুতি দিত, তবে তো আমি জ্বলতে পারতাম। কাঠ নেই—তাই আগুন জ্বলছে না···। বহিশালে সেদিন মানুষকে যা করতে বলেছি, তাই তারা করেছে···আজ আর সে ক্ষমতা নেই—অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন আর নূতন জীবন-চেতনা দিয়ে সমস্ত জীবন ব্যাপনের আন্দোলন এক নয়—তাই কিছু করে যেতে পারলাম না।···নিত্যগোপাল, জ্বলবার মন্ত্র মিলি মোরে, তাইতে জ্বলি, কেবল জ্বলি জ্বলছি

জীবন তবে··· । নিতাগোপাল, আমি বেশ নাই—নিজের বুকের পাঁজর জালিয়ে আমি একলা চলব··· । নিতা-গোপাল—তোমারই প্রস্থাগার—তুমিই জান মানুষের সেবা করতে পারব কি না··· । প্রস্থান-ত্রয়ের অবধূত ভাষ্য রেখে গেলাম···হয়তো চাপা হবে...সমস্ত ভাষ্য হবে প্রস্থাগারে, অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে··· । এই এখানে পড়ে আছি—কেউ খোঁজও নেয় না।···ঠাকুর, তুমি অপাত্রে এলে? অপাত্র বলতেও তো সাহস হচ্ছে না—তুমি এসেছ যাতে তাকে অপাত্র বলি কি করে?...তুমিই লিখিয়েছ···এত বুদ্ধি তো আমার ছিল না...লিখতে লিখতে যখন থই পেতাম না...তখন তুমি আবার আলো জ্বালিয়েছ, আবার লিখিয়েছ···। আমাদের মানুষ কর—আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠার আগুন জ্বালিয়ে তোল—জড়তা কাটিয়ে কর্মে জ্ঞানে ভক্তিতে পরিপূর্ণ করে দাও

৬, ২, ৫৭।···সরল বিজ্ঞানের (গোপার বই) পাতা উল্টাতে উল্টাতে জড় আর জীবের পার্থক্য পড়লাম।··· জড়বস্তু বাইরে থেকে বাড়ে, আর জীব ভেতর থেকে বাড়ে। এক খণ্ড মিশ্রী যদি মিশ্রীর জলের মধ্যে রাখলে মিশ্রীখণ্ডটা বড় হয়। গাছ, মানুষ—এরা জীবধর্মী—এরা ভিতর থেকে বাড়ে—from within...। টাকার জোরে বড়, গলার জোরে বড়, মাটিতে বড়—এগুলি সব জড়-ধর্ম, বুদ্ধিতে রূপে বড়ত্বটাও জড়-ধর্ম। জীব-ধর্ম হচ্ছে তিতিক্ষা, উদারতা...। জড়-ধর্মীরা সব সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করে। জড়ের লক্ষণ জানলে জোড়া লাগে না, জীবন-ধর্মে জানলে জোড়া লাগে।...মানুষ সহজে পচে না।.. আজ মানুষ সাধারণতঃ জড়বাদী হয়ে গেছে··· । আমার সম্পদ ব্যাপকতা—আমি সর্ব মানুষকে কতখানি ভালবেসেছি তা কি মানুষকে বোঝাতে পারব? ...জীবন-রস ভিতর থেকে আহরণ করে বাড়তে হবে—শিবানী বিড়ালীর পেটে বাচ্চা ভিতর থেকে বাড়ছে...। আমার কাপড়ে টাকার মাটীতে...বড় হতে পারবে না—ওটা গোদার পায়ের মত—ভেতরটা ফাঁপা। ধনীর ধন গোদার পা।···ধন দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে—কোন কোলীন্য-বোধ দিয়েই বড় হওয়া যায় না। আত্মার সম্পদ বাড়াও—নিজেকে ব্যাপক কর···হজম করার ক্ষমতা জীবের ধর্ম।···গাছ বায়ু থেকে, জল থেকে সমুদ্র অংশ দিয়ে খাদ্য আহরণ করে ...মানুষ তার স্থান থেকেই খাদ্য আহরণ করতে পারে ...আমার একমাত্র কথা ভেতর থেকে বড় হও, জীবনে বড় হও, আত্মায় বড় হও।... ভেতর থেকে বড় হওয়ার জন্য শৃঙ্খলা দরকার...symetry', শৃঙ্খলা', ব্যাপকতা—এরই নাম প্রেম।···মানুষকে জীবনের মধ্যে পরিপাক করতে চেষ্টা কর। জড় জড়কে আকর্ষণ করে না—চৈতন্য জড়কে আকর্ষণ করে। বাইরের মাটি ও দেহের মাটি কি এক? এই দেহও তো মাটি—অথচ সে মাটির কত মূল্য? জড় মন বুদ্ধি অহংকার গোবিন্দে দিলে তা পরা প্রকৃতিতে গড়ে ওঠে··। নরনারায়ণ আশ্রমের এই কথা···। নিতাগোপাল বলেছেন আমায় ফিরি করো না—অর্থাৎ ভিতর থেকে বড় না হয়ে ওঁকে চালানো যাবে না।...জীবন দিয়ে বড় হও, তাহলেই ধরার ধূলি হতে পারে ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হতে পারে ব্রহ্ম-মানুষ...

৮, ২, ৫৭—শ্রীনিতাগোপাল এসেছেন একটা নতুন বিশ্ব রচনা করবার উপযোগী জীবন ও দর্শন নিয়ে। আমরা তাঁর শ্রীচরণতলে সমবেত হয়েছি··· । তাঁর কাছে আসা মানে যে mission নিয়ে তিনি এসেছেন তাকে পূরণ করা—তাঁর এ misson পূর্ণ তখনই হবে যখন আমরা সকল দেহ-মন-প্রাণ তাঁর কাছে সঁপে দিতে পারব।... mediacy চাই...অর্জুনকে না পেলে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত রচনার কল্পনা একেবারেই কল্পনা থেকে যেত'... রবীন্দ্রনাথের বলাকার সেই কবিতাটীতে যে অবস্থার উল্লেখ আছে সেটা মনে কর—'দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন ওরে দীন, ওরে উদাসীন! ঐ ক্রন্দনের কলরোল লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল বহ্নি বন্যা ভয়জের বেগ বিষশ্বাস কটিকার মেঘ···'—একটা প্রলয় এসে পড়েছে—সমস্ত বিশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে—প্রলয় পয়োধি জলে ডুবে যাবে বিশ্ব··· । দুঃখ এই—এ অবস্থা থেকে বাঁচবার পথের কথা তিনি রেখে গেলেন—কিন্তু সেটা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারলাম না।... ঠাকুর, তোমার চরিত্র-নৌকাখানা বেয়ে রেখে গেছ···এ ছাড়া এই প্রলয়-পয়োধি-জলে পাড়ি দেব কি করে? উদ্ধব ভাগবতের আদর্শে পৌঁছাব কেমন করে?...

ক্রমশঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ ও সাম্যবাদ

॥ শ্রীকৃষ্ণদাস সাহা ॥

সামাজিক অনাচার ও মানবতার নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বজ্রকঠোর ভূমিকা তাঁকে অবতার মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমাজকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে বর্ণবিভাগের ব্যবস্থা দিলেন তাকে অস্বীকার করেন নি শ্রীচৈতন্যদেব, বিরোধিতা করেছেন বর্ণভেদকে, অস্পৃশ্যতাকে—যে অস্পৃশ্যতাকে কেন্দ্র করে মানুষ চালিয়েছে মানুষের উপর নির্মম নির্যাতন, মানবতাকে করেছে অপমান, অপমানিত হয়েছেন ভগবান। এ সব দেখে উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছেন তিনি—'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহারই স্বরূপ'। ভগবানের সঙ্গে মানুষের তুলনা করে মানুষকে এতটা মহিমান্বিত করা সম্ভব হয়েছে মানবপ্রেমিক শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষেই। তিনি ঘোষণা করলেন মানুষে মানুষে কোন বিভেদ নেই—এ বিভেদ একশ্রেণী স্বার্থান্বেষী মানুষের সৃষ্টি। প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিভূ, সকল মানুষের হৃদয়ে করুণাময়ের অধিষ্ঠান। মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয়েছে যে ঘৃণা তা শুধু অপরাধই নয়, তা ক্ষমাহীন পাপ। মানব-ধর্মের অমর্যাদায় তাঁর কোমল হৃদয় একদিকে যেমন অপরিসীম বেদনায় ডুকরে কেঁদে উঠেছে, অপর দিকে অন্তরের সকল নির্যাস নিঃস্বরণে মানুষকে তাই বেসেছেন তিনি। এমন করে বুঝি আর কেউ কোনদিন মানুষকে ভাল বাসেনি, এমন করে কেউ কোনদিন বুকের মাঝে টেনে নেয়নি। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ ত্যাগের পর বাসু ঘোষ যথার্থই বলেছেন—'কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া, পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া'।

প্রবল বিরোধিতার মধ্যে দেশে বিপ্লবের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য—গৃহে গৃহে প্রচার করেছেন সাম্যের বাণী—সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিভেদপূর্ণ সমাজকে, আর তার জন্যে দু'টি কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন তিনি—একটি সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে সম্মিলিত ভজন, অপরটি মহোৎসবের মধ্য দিয়ে সম্মিলিত ভোজন।

ব্যক্তিগত মুক্তিচিন্তার চিন্তা যেমন স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত মুক্তির ইচ্ছাও তেমনি আত্মম্ভরিতা। সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণে সমস্তের কল্যাণে, সকলের মঙ্গলে জাতির মঙ্গলে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্মিলিত ভজনের উপর গুরুত্ব দিলেন সর্বাধিক—প্রচারিত হ'ল 'নগর সংকীর্তন'। এরূপ আরাধনায় শ্রীভগবানের যেমন উপাসনা হয়, এরূপ মিলনে তেমনি সাত্ত্বিক শক্তি আসে। নগর সংকীর্তন প্রথায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রা। এ এমনি এক পুণ্য মিলন যেখানে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে প্রভেদ নেই, ধনী-নির্ধনে ব্যবধান নেই। ব্রাহ্মণের পরশে চণ্ডাল উল্লসিত, চণ্ডালের পরশে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের ঘটে নব উদ্বোধন। ঈশ্বরের নামে ছড়িয়ে দেওয়া বাতাসের আজ লুটিয়ে পড়ে সকলে। চণ্ডালরূপী ঈশ্বরের পাদস্পর্শে যে প্রসাদের সৃষ্টি তা লুটে নিতে ব্রাহ্মণের কত না আনন্দ! আবার ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শে সজ্ঞাত প্রসাদ প্রাপ্তিতে চণ্ডাল আনন্দে আত্মহারা! এমন এক মহামিলনে ব্রাহ্মণ হারিয়ে ফেলে তার ব্রাহ্মণত্ব, ভুলে যায় তার ব্রাহ্মণত্বের অহংকার; চণ্ডালের চণ্ডালত্ব যায় ঘুচে—ঘুচে ফেলে তার আত্মাবমাননা। ধনীর অহংকার আর দরিদ্রের মর্মবেদনা বিলীন হয়ে যায় সুউচ্চে। সংকীর্তন মহাযজ্ঞের মহামিলনে সকলের পাদস্পর্শে প্রতিটি ধূলিকণা হয়ে ওঠে পরম পবিত্র, আর সেই পবিত্র ধূলিকণা অঙ্গের ভূষণ করে সকলে—পরম শ্রদ্ধাভরে মাথায় তুলে নেয় সে-সকল, স্বর্গ যেন নেমে আসে ধূলার ধরণীতে।

অস্পৃশ্যতামুক্ত সমাজ-গঠনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দ্বিতীয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ মহোৎসব প্রবর্তনে। মহোৎসব—

সাম্যবাদের এক নূতন রূপান্তর। সেখানে উচ্চ-নীচের বিচার নেই, ধনবান-নির্ধনের পার্থক্য নেই—সকলকে খেতে হয় এক পংক্তিতে বসে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের মহামিলনে স্বর্গীয় আনন্দ ধারার প্লাবনে মহোৎসবের ক্ষেত্র রূপান্তরিত হয় তীর্থক্ষেত্রে। তথাকথিত অস্পৃশ্য লোকের সাহচর্য দূরের কথা তাঁদের ছায়া মাড়ালে যখন হ'ত পাপ, সে পাপমুক্তি যখন হ'ত গঙ্গা স্নানে, ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এ সকল কর্মসূচী তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়—কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তস্তল মানবপ্রেম ও সাম্যবাদ তাঁকে দূরদর্শী ও মহাবিপ্লবী করে তুলেছিল।

জন্মগত বর্ণভেদও স্বীকার করেন নি শ্রীগৌরাঙ্গদেব। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী হয়েছিল—চতুর্বর্ণোঽপি বিজাগ্র্যাঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ। সে বাণীর প্রতিফলন হয়েছিল তাঁর ব্যবহারিক জীবনে। কৈবর্তের পোলোবেচা শ্রীধরের সঙ্গে তাঁর যে প্রীতির সম্পর্ক তার বুঝি তুলনা মিলে না! নিজ হাতে পথ পরিষ্কার করেছিলেন বলে রাজা প্রতাপরুদ্র না তাঁর কত প্রিয়। তাঁর সুকোমল হৃদয়খানা প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ তাঁধার শুধু হিন্দুই নয় অনেক মুসলমানেরও স্থান হয়েছিল সে-সুকোমল হৃদয়ে। তাঁর সাম্যবাদের পতাকাতলে মিলিত হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান সকলে। ঠাকুর হরিদাসকে শুধু মুখে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন নি তিনি, তাঁর প্রাণশূন্য দেহ নিয়ে নৃত্য করেছিলেন নিজের হাতেই দেহখানা সমাধিস্থ করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুবর্তক রঘুনাথদাসের জন্মস্থান আজও কীর্তিত হয় পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠশ্রেণী মুসলমানের মধ্যে। পোলকরতাল-সহ দেহতত্ত্ব সঙ্গীতের মত গৌরাঙ্গ-প্রীতিতেও মুখর হয়ে ওঠে তারা। এই মুসলমান সমাজকেও মানবতার মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা সে যুগে যে কিরূপ দুরূহ কাজ তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু সব কিছুই সম্ভব হয়েছিল সাম্যবাদী শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে—তাঁর চোখে যে সকল মানুষ সমান। তাঁর ধর্মের মূল ভিত্তি সাম্যবাদ।

"কামবলে বলীয়ান হইয়া যোগতপবলোদ্ধত শুম্ভ-নিশুম্ভ একদিন ত্রৈলোক্য ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিলেন।...সকলের সব যজ্ঞভাগ, সকলের সব আত্মনিবেদনের ফল বিশ্ব ও ঈশ্বরের সেবায় না লাগাইয়া 'আত্মকারণাৎ' প্রাণতর্পণার্থ কাড়িয়া লইলেন।...হরণের পথে, শোষণের পথে সংঘ-গঠন খুব সহজ।...শক্তির জোরে বহির্জগতে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, শক্তির ক্ষেত্র যতদূর জয় করিতে পারে শুম্ভ তাহা করিয়াছে। অহংপ্রধান, প্রাণতর্পণ-প্রধান সভ্যতার চরম আদর্শ শুম্ভ-নিশুম্ভ। শুম্ভ মূর্তিমান বুদ্ধিমান-কর্মী 'আমি'। এই শক্তির প্রতিবলরূপে দাঁড়াইতে না পারিলে কেবল আলোর জোরে, কেবল অধ্যাত্মের জোরে দেবতারা যে টিকিতে পারিবেন না, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন, তাই তাঁহারা ভক্তিদেবীর শরণ লইলেন।...'শক্তি'র আমি-র প্রতিবল 'ভক্তি'র আমি।...পোষণাত্মক অনাবিল অত্যন্ত-শুদ্ধি তাঁহাদের কপালে জুটিল না, হৃদয়ে অনন্ত দেবতার অবতরণ না হইলে তো লক্ষ বৎসরেও অত্যন্ত শুদ্ধি লাভ হইবে না। জপে অসুরত্ব কাটে না, মহাদার্শনিক, মহাযোগী, মহাব্রতী, মহান তীর্থসেবী, মহাবৈজ্ঞানিক, প্রাণায়াম সাধক, মহাতপস্বী, মহাবিদ্বান, মহাকবিও শুম্ভ হইতে পারে যদি অনন্তদেব হৃদিস্থ না হন, হৃদয় বিকশিত না হয়।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

অমর নাট্যকার ইবসেন

॥ শ্রীঅনিল কুমার সমাজদার ॥

হেনরিক জন ইবসেন [Heuric John Ibsen] ছিলেন ব্যবসায়ীর ছেলে, ২০শে মার্চ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। স্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সের সময় দারুণ সংকট দেখা দিলো জীবনে। তাঁর সব সময়ের চিন্তা ছিলো স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলেজ জীবনে উচ্চ শিক্ষিত হবেন, কাব্য চর্চায় পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করতে পারবেন—এই ছিলো তাঁর জীবনে একমাত্র চিন্তা।

পিতার ব্যবসা ছোট হ'লেও বুড়ি পাঁচশ বছর ধরে চলছিলো সংসার কিন্তু পর পর তিন বছরের লোকসানে প্রতিষ্ঠানটি তাঁর পিতার তুলে দিতে হলো, আর্থিক চিন্তায় তাঁর বাবার শরীর ভেঙে পড়লো, মানসিক আর শারীরিক অসুস্থতায় বেশী দিন বাঁচলেন না তিনি। এক বন্ধুর পরামর্শে এবং সুপারিশেই ইবসেন এক ওষুধের দোকানে সামান্য একটা চাকরী জোগাড় করেন।

মালিক ভদ্রলোকটি খুবই ভালো ছিলেন। কিশোর ইবসেনের পড়বার আগ্রহ দেখে তিনি প্রথমেই খুব প্রসন্ন ছিলেন। কম বয়সে পড়াশোনা বন্ধ হয়েছে জন্যে খুব ব্যথিত হলেন এবং যাতে লেখাপড়া বন্ধ না হয় তার জন্য লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন চাকুরী বজায় রেখে ওষুধের দোকানের মালিকের পরামর্শে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ভালো করে তৈরি হতে লাগলেন ইবসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেন। তারপর ডাক্তারী পড়া আরম্ভ করলেন। ডাক্তারী পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হলেন না। ডাক্তার হবার বাসনা মন থেকে ত্যাগ করলেন। মনে মনে এক মহান সৃষ্টির প্রবল বাসনা জাগলো।

কাব্য চর্চা ও সাহিত্যের নানা বিষয়ে পড়াশোনা আর বন্ধ হয়নি বরং অধিক উৎসাহের সঙ্গেই চলছিলো। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে না পড়ার ঘাটতি ইবসেন ভালো ক'রেই পুষিয়ে নিয়েছিলেন শিল্প সাধনার জীবনে বাস্তিত হবার জন্য বন্ধু পরিবৃত হলেন।

এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে একখানা সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা বের করলেন। আর্থিক সঙ্গতি, ছোট বড় নানা শ্রেণীর সাহিত্যিকগণের সঙ্গে সহযোগিতা, বিজ্ঞাপন দাতাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা এবং প্রচার তথা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি কোন বিষয়েই জ্ঞান তাঁর বা তাঁর বন্ধুর ছিল না। অভিজ্ঞতাহীনতার জন্যই পত্রিকা বের করে মহা সমস্যায় পড়লেন। টেনে হিঁচড়ে ন' মাস চললো পত্রিকা। কোন পত্রিকা চালাতে গেলে নিজের লেখার খুবই ক্ষতি হয়। পরবর্তী জীবনে প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েও আর পত্রিকা চালাবার ঝুঁকি নেননি। লেখক হিসাবে কিন্তু অনেক পত্রিকাই তাঁর লেখা পেয়েছে।

পত্রিকার কাজ ছেড়ে নতুন করে নিজের রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তারপর ঝোঁক চাপলো নাটকের দিকে। নাটকে প্রাচীন ও আধুনিক কোন বিষয়েই বাদ দিলেন না বিষয় বস্তু সংগ্রহ করতে। তিনি বিশেষ করে—ইস্‌কাইলাস, ইউপিরিদেস, সোফোক্লেস, অরিস্তোফানেস কালদেরন, শেক্সপীয়ার এবং মলিয়ের সমস্ত রচনা অনেকবার পড়লেন। বছরের পর বছর পার হলো অথচ একটা বইও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল না। বাইশ বছর বয়সে ইবসেনের প্রথম ছাপা বই 'ক্যাটিলিনা' নাটক প্রকাশিত হল। লুসিয়াস সেগিয়াস ক্যাটিলিনা রোমান রাজনীতির এক জটিল চরিত্র। নাটকটি পদ্যে রচিত। মঞ্চস্থ হবার পর প্রচুর সুখ্যাতি হলো নাটকটির সাহিত্য খ্যাতিতে, কিন্তু দর্শক নাটক হিসাবে ভালো ভাবে গ্রহণ করলেন না। কারণ দীর্ঘ একটানা বক্তৃতার সঙ্গে

সংবাদপত্র। নাটকটি মঞ্চে সফলতা না পাবার জন্য ইবসেন নাটক লেখার সঙ্গে সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করবার কলা-কৌশল শিখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

একটা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ পেলেন। ওষুধের দোকানটি ছাড়বার জন্য খুবই ব্যথিত হলেন। দু বছর পর একটা থিয়েটারে কাজ পেলেন। সহকারী পরিচালক রূপে প্রথমে, পরে পরিচালকরূপে প্রথমে বার্গেনের "ন্যাশনাল" থিয়েটারে, তারপর পেলেন ক্রিশ্চিয়ানার "ন্যাশন্যাল থিয়েটারে"। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ন বছর এর সঙ্গে ছুটো থিয়েটারের পরিচালক এবং সহকারী পরিচালকরূপে, মঞ্চ থেকে নাটকের সফলতা অর্জনের যাবতীয় খুঁটিনাটি পূর্ণভাবে অর্জন করলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ক্যাটেলিনা প্রকাশিত হয়, তারপর থেকে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে ক' খানা নাটক ইবসেন রচনা করেন তা প্রত্যেকটিই মঞ্চে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করলো অভাবিত ভাবে। সেল্টী ইনগার অব অলট্রাট, দি ওয়ারিয়র্স অব হেলগেলা'ণ্ড, দি রাইভাল কিংস—তিনখানা নাটকই উত্তর ইউরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাসের ছায়াসম্বলে রচিত। জার্মানীতে তাঁর দুখানা নাটকের অভিনয় হয়েছিলো।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি ডীপের মালিকানা ও সীমান্ত নিয়ে ডেনমার্কের সাথে জার্মানীর বিরোধ সৃষ্টি হলো। ক্ষুদ্র ডেনমার্ক নরওয়ের কাছে সাহায্য চাইলো। নরওয়ে এগুতে সাহসী হলো না। জাতীয় সরকারের দুর্বলতায় ক্ষুব্ধ হলেন ইবসেন। তীব্র প্রতিবাদ করলেন প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে। তারপর দেশত্যাগী হলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইবসেন দেশের বাইরে কাটান। আটাশ বছর জার্মানী, ইতালী, রোম, ড্রেসডেন ও মিউনিক ঘুরে বেড়ান। বিদেশে আর্থিক সংকটে পড়ায় সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে দেশের লোক সরকারের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করেন এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সরকার বাধ্য হয়ে ইবসেনের জন্য একটা মাসিক ভাতা বরাদ্দ করেন। সেটা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঘটেছিলো। এর পরে ইবসেন আরো চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা এতো বেশী তখন যে, কোন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না।

সমাজ-সমস্যামূলক বাস্তবধর্মী গদ্য নাটকের প্রথম নাটক দি পিলারস অব সোসাইটি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ব্রাণ্ড (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ), পীয়ার গিণ্ট (১৮৬৭) আর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এমপারার এণ্ড গ্যালিলিয়ান রচিত হয় ব্রাণ্ড নাটকটিতে কবি ইবসেনের কাব্য এবং নাট্যপ্রতিভার সুখ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

শ' এর ভাষায় পাদ্রী ব্রাণ্ড "is a villain by virtue of his determination to do nothing wrong"।

ব্রাণ্ডের চরিত্র ইবসেন যা এঁকেছেন তা রীতিমতো heroic। পাদ্রী ব্রাণ্ড সজ্ঞানে কোন প্রকার অন্যায় না করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; তাঁর দৃঢ়তাই একাধিক জনের মৃত্যুর কারণ হয়। যেমন পরিশ্রমী তেমনই দুঃসাহসী ও জেদী; কর্তব্য থেকে কেউ বিচলিত করতে পারে না, নিজেরও নেই মৃত্যু-ভয়।

একটি কৃষকের মেয়ে মৃত্যু-শয্যায়। ব্রাণ্ডকে উপস্থিত হতে হবেই কারণ তাঁর পৈতৃক অন্তর্ভুক্ত ঐ গ্রাম। ভীষণ দুর্যোগ আর গ্রামে যেতে হলে একটা নদী—তার জলও বরফ হয়ে গেছে ঠাণ্ডার জন্যে—পুরো না জমলেও ওপরের অংশ জমেছে—সফরণশীল তুষারখণ্ডগুলি—ছোটো বা নৌকো চালানো যায় না তার ওপর দিয়ে। কৃষকটি নিজেই বারণ করলো ব্রাণ্ডকে যেতে।

নিষ্করুণার মৃত্যুকালীন পাদ্রীদর্শন বা ভগবানের নাম শ্রবণের চেয়ে পাদ্রীর জীবন রক্ষা চিন্তায় কৃষক ব্যাকুল। ব্রাণ্ড কর্তব্য হতে মোটেই বিচলিত নন জীবনের অনিবার্য তুচ্ছতা ও সহস্র ত্রুটীর কথায় বক্রতা দিয়ে কৃষকটিকে সরিয়ে দুর্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন কর্তব্য কাজে।

অন্য ঘটনা—পর্বতসংকুল তীরভূমির মধ্যে ছুটে পড়া

[সমুদ্রের কালিকে বলা হয় ফিয়র্ড] ফিয়র্ডের ওপারে ব্রাণ্ডকে যেতেই হবে। খবর এসেছে খুন অবশ্য হয়েছে বেশ কয়েকটা লোক—তাদের মৃতদেহগুলি কবরখানের মাটি শোনাতেই হবে। কিন্তু যাওয়া যায় কিভাবে? কোন মাঝিই দুর্যোগে ফিয়র্ডের মধ্যে নৌকো চালাতে রাজী নয়—প্রচণ্ড ঝড়। ছেলেদের অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলো। তারা ব্রাণ্ডের মস্তিষ্কের সুস্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করলো। শেষে এক তরুণী ব্রাণ্ডের আদর্শবাদে শ্রদ্ধাবনত হয়ে নৌকো চালাতে রাজী হলো। রমণী হাল ধরলো প্রচণ্ড ঝড়ে ভরসা হলো ব্রাণ্ড। পরে ঐ আদর্শ নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলো ব্রাণ্ড।

একটি ছেলে হলো। দুজনেই সুখী। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মারা গেলো ছেলেটি। মৃত শিশু নিয়ে ব্রাণ্ডের স্ত্রী কাঁদছে তখন এক ভিখারী তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে এলো। ব্রাণ্ড তার স্ত্রীকে নির্দেশ দিলো মৃত সন্তানের জামাটা ঐ শিশুকে দিয়ে দিতে। অনেকগুলি জামা ছিলো, সবগুলো একের পর এক করে খুলে দিতে লাগলো ব্রাণ্ডের স্ত্রী। মাত্র একটি জামা গায়ে যখন রইলো ব্রাণ্ড বললো, না, তা হবে না, এটা আদর্শের প্রশ্ন। খোকার মৃতির জন্যও তা মাথা চলবে না। ভিখারীর সন্তান বাঁচানোই প্রথম দরকার। স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ মেনে নিলো। শোকের বন্যা উঠলো—তীব্রতা এত প্রবল হলো যে স্ত্রীর দেহও নিষ্প্রাণ হলো।

এমনি করে এক একটি ঘটনার দ্বারা ব্রাণ্ডের চরিত্র এঁকেছেন। নদী নিবিড় ছোট গির্জাটিতে লোকে লোকারণ্য। স্থান অল্প, তাই ব্রাণ্ড বললো, চলো আমরা ঈশ্বরের নিজস্ব স্থানে ঐ উঁচু পাহাড়টায় যাই—এই বলেই ধর্মোন্মাদ ব্রাণ্ড উঠতে লাগলো পাহাড়ে—বরফের স্তূপের মধ্যে হারিয়ে গেলো তার নশ্বর দেহ।

এসব ছাড়াও হেডেন হইডেন্ড্, এমারকেল, অলস্ হাউস্, গোইস্, এ্যান এনিমি অফ দি পিপল্, দি ওয়াইল্ড ডাক, রসমারস্ হলম, দি লেডী ফ্রম দি সী, হেড্ডাগ্যাবলার দি মাষ্টার বিল্ডার, লিট্‌ল্ ইয়লফ্—জন গাব্রিয়েল, বর্কম্যান, লাভেস্ কমেডি, দি লীগ অব ইয়ুথ।

গোষ্টস মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপের শিল্প ও সাহিত্য মহলে তোলপাড় সুরু হয়। কেউ স্পষ্ট করে লিখলো—এ নাটক নয় একটা খোলা নর্দমা। ইউরোপে তখন যৌনাবেগ একটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিলো (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে)। ইবসেন তাই বাস্তব সমস্যাকে চোখের সামনে তুলে সমাজকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সমাজের উপকারই করেছিলেন। তাই পরবর্তী নাটক হলো এ্যান এনিমি অব দি পিপল। জনগণের প্রকৃত শত্রু যারা তারা চটে উঠলো। ঢিল মৌচাকেই পড়েছিলো।

২৩শে মে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইবসেন সারা ইউরোপকে কাঁদিয়ে ধরাধাম থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন।

"পুরুষোত্তম-বিশ্ব পচা গলা এই জগতের বাহিরে নয়; সেই বিশ্ব এই বিশ্বেরই পুরুষোত্তম-অগ্নিতে হজম-হওয়া পুরুষোত্তম-রূপ। পুরুষতন্ত্র স্তরকে পুরুষোত্তম স্তরের কাছে সমর্পণ করিলেই এই স্তরের সব বন্ধন খুলিয়া যায়, এই স্তরের সব কিছু মুক্তির অগ্নিতে জারিত হইয়া এই স্তরেরই বুক চিরিয়া (বুঝায়) ভাগবত রূপে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়, যেমন হংসীমাতার বুকের তাপ পাইয়া ডিম হইতে ছানা বাহির হয়।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

স্ফোটবাদ

॥ শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম এ ; বি, টি ; ভি, এল্, ই ॥

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিল্প জিনিষটা হচ্ছে একটা অখণ্ড এবং অবিভাজ্য পদার্থ। এই কথাটার বক্তব্য হচ্ছে এই যে শিল্প জিনিষটার সঙ্গীব হাত পথে তার কোনও পরিচয়ই সার্থক নয়। সেটা যতক্ষণ না সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পূর্ণ পরিণতি লাভ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মূল্যায়ন হয় না। উপাদানের জোড়াতালি দিয়ে সেটা পর্বে পর্বে গড়ে ওঠে না, সেটা যতক্ষণ না পুরো-পুরি তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ তার যথার্থ পরিচয় আমরা পেতে পারি না।

সাহিত্যিক রচনা সম্বন্ধে এই কথাটা অনেকখানিই প্রযোজ্য। একটা অক্ষরের পর আর একটা অক্ষর সাজিয়ে যখন চলতে থাকি, তখন তার মাঝপথে কোন অর্থই থাকে না। কিন্তু যখনই সেটা একটা পুরো শব্দ তৈরী করলো, তখনি একটা অর্থ যেন হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো। গ্+অ+ব্+ট এই অক্ষরগুলি যখন সম্পূর্ণ সাজানো হয়ে গেলো, তখনই আমরা "গরু" শব্দটা পেলাম, যার একটা অর্থ আছে।

তেমনই যখন আমরা একটা পদের পর আর একটা পদ সাজিয়ে চলি, মাঝপথে তার কোনও অর্থই থাকে না ; কিন্তু যেমনি ঐসব পদের মিলনে একটা পূর্ণ বাক্য তৈরী হয়ে গেলো, তখনই তার একটা অর্থ যেন হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। "গরুকে মাঠ থেকে নিয়ে এসো" এই বাক্যটি যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বক্তার বক্তব্যটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না।

আরও একটু বড় জিনিষ দিয়ে এই তত্ত্বটা বোঝানো যেতে পারে। একটা সনেট (sonnet)-এ কবি কি বলতে চেয়েছেন, সেটা ঐ সনেটের শেষ পংক্তি পর্যন্ত পড়া না হলে ঠিক উপলব্ধি করতে পারা যায় না। একটা নাটক বা উপন্যাসেও তাই। তার শেষটুকু পর্যন্ত পড়বার পর হতেই তার যথার্থ মূল্যায়ন হয়। বিপরীত পক্ষে যে নাটকের প্রথম অঙ্কেই আমরা তার শেষ অঙ্কের কথাটা ধরে ফেলতে পারি, সে নাটকের সাস্‌পেন্স (suspense) নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তার মূল্যটা কমে যায়।

এ্যারিষ্টটল্ নাটকের সংহত গঠনের কথা বলেছিলেন যে নাটকে দৃঢ়-নিবদ্ধ সংহতি নেই, যার মধ্যে "পরে কি হবে ?" এই জাতীয় প্রশ্নের অবকাশ নেই, সাস্‌পেন্স (suspense) নেই, অর্থাৎ যে নাটকের গাথুনিটা আল্‌গা, সেই জাতীয় নাটককে এ্যারিষ্টটল্ নিকৃষ্টতম নাটক বলেছেন। তিনি বলেছেন, "Of all plots and actions the episodic are the worst." Poetics—Chap IX ; Aristotles theory of Poetry and fine Art—S. H. Butcher P. 37)

মহারাজ দিলীপের চরিত্র-বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস বলেছেন,

"তস্য সংবৃত-মন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব ॥"

(রঘুবংশ ১।২০)

অর্থাৎ তাঁর আকার ইঙ্গিতগুলি এমনই গোপন জিনিস ছিল যে, তাঁর আচরণ দেখে তাঁর মনের কথাটা বুঝতে পারা যেতো না। পূর্ব জন্মের প্রাক্তন সংস্কারকে যেমন উহার থেকে সোজাসুজি বুঝতে পারা যায় না, এই জন্মের কর্মফল থেকেই সেটা অনুমান করতে হয়, তেমনই মহারাজ দিলীপের কাজের পরিণতিটা দেখেই তাঁর কাজের পরিকল্পনাটা কি রকম ছিল, সেটা অনুমান করতে হতো।

রাজনীতি বাঁরা করেন, বাঁরা সমাজের স্থায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, তাঁদের "সংবৃত মন্ত্র" হতেই হয়। একজন বিচারক যখন বিচারকের আসনে বসে থাকেন, যখন

দুপক্ষের উকিলরা সাক্ষীদের নিয়ে জেরা করতে থাকেন, সেই সময় বিচারকের মুখে যদি এক পক্ষের প্রতি প্রীতি বা বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে, তাহলে তাঁর বিচারের রায়টা সকলকে তৃপ্তি দিতে পারে না। লোকে সেই রায়টাকে পক্ষপাত দুষ্ট (prejudiced) বলে সন্দেহ করতে পারেন। তাই একজন বিচারকের মত দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মহাকবি দিলীপের মতই "সংযত মন" হতেই হবে, "গূঢ়চারী ইঙ্গিত" হতেই হবে, তাঁর "রায়" টা "ফলাপ্লেষেণ্ড" হতেই হবে।

শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। শিল্পীর মাথায় সৃষ্টির গোড়ার দিকে একটা রূপ থাকে ঠিকই, একটা পরিকল্পনা থাকে ঠিকই, কিন্তু পাঠক বা দর্শকের কাছে সেটা দুর্নিরীক্ষ হওয়া দরকার, সেটা "অনুমেয়" হলে চলবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, কি ভাবে যে রূপটা শেষ হবে, শিল্পী নিজেই সেটা পুরোপুরি জানতে পারেন না। কারণ শিল্পীর জীবন-দেবতা বা শিল্প-লক্ষ্মী তাঁর সোনার তরী বেয়ে শিল্পীকে একটা "নিরুদ্দেশ যাত্রায়" নিয়ে চলেন। শিল্পী বার বার শিল্প-লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করেন,

"বল কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী" ?

শিল্প-লক্ষ্মী এই প্রশ্নের উত্তর দেন না, তাই শিল্পীকে যেন করে বলতে হয়

"তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না বলে"

(নিরুদ্দেশ যাত্রা ; সোনার তরী ; রবীন্দ্রনাথ)

এই জন্য অনেকে কাব্য শিল্প প্রভৃতির সৃষ্টিকে একটা inspiration-এর ফল হিসাবে গণ্য করেন। এই inspiration-টা যার তার উপর আসে না। যিনি উপযুক্ত অধিকারী, তাঁরই উপর বাণীর প্রসাদ নেমে আসে inspiration হিসাবে। তখন শিল্পী তাঁর তুলি বা কলম চালিয়ে যান বটে, তবে তিনি যেন বুঝ, আর যন্ত্রী কাজ করতে থাকেন তাঁকে ভর করে, তাঁরই হাত দিয়ে।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ-চৈতন্যের অপূর্ব বিশ্লেষণটি তুলনীয়। তিনি বলেছেন—The poetic expression depends to a great degree on the order of the individual word. The poet arranges the words in such an order that until the total complex of meaning is achieved, no premature leakage of meaning can occur and the poetic sense remains integrately unrevealed until on the completion of the verbal stream, the meaning 'explodes', to use the term of G. M. Hopkins. Rhyme and metre are important devices of this type - though they have other functions too—for they unconsciously tip off the reader to delay his integral reaction till the completion of their formal pattern and also warn him against re-acting to the poetic expression as if it was a series of propositional statements.

(Sanskrit Poetics ; on Sphota pp 66-69)

এইটেই হচ্ছে স্ফোটবাদের মৌলিক তত্ত্ব। এবং এর বক্তব্যটা হচ্ছে, যে-সমস্ত নাদ বা ধ্বনি (sound) দিয়ে একটা পদ তৈরী হয়, তার সমস্ত ধ্বনিগুলি শেষ হবার পর তবেই তার অর্থটা ফুটে ওঠে। তার আগে সেই অর্থটা বুঝতে পারা যায় না। পদের উপাদানীভূত শব্দ পরম্পরাটা শেষ হবার পরেই পদের অর্থটা যেন ফুটে ওঠে বা ফেটে ওঠে। এইটেই হচ্ছে স্ফোট। স্ফোট শব্দটাই এসেছে স্ফুট্, ধাতু থেকে, যার অর্থ হচ্ছে ফুটে ওঠা, ফেটে পড়া, burst করা, explode করা।

একটা শব্দের উপাদানীভূত নাদগুলি (sound) শেষ হবার পর সেই গুলির ভিতর থেকেই যে একটা অর্থ হঠাৎ আবির্ভূত হয়, এটা একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। এই বিস্ময়ের ব্যাপারটা ভারতীয় বৈয়াকরণরা প্রথমে আবিষ্কার করে ছিলেন এবং দার্শনিকরা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি এবং মাধ্বাচার্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরে ব্যাকরণের অতুল শাস্ত্র অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছিলেন, তাঁদের চোখেও এই তত্ত্বটা প্রকাশিত হয়। তখনই হয়েছে অলঙ্কার শাস্ত্রে "ধ্বনি বাদের" সূচনা, যেটা আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্তের হাতে পূর্ণতা পেয়েছিল পরবর্তী যুগে।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় ভক্তই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততত্ত্বই আবৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতাসারে ভগবান দত্তাত্রেয়নির্দ্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং শ্রুতীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

"আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাড্যিতি।
জীবঃ সর্ব্বগতং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা ভবেদ্ধি মুক্তিঃ।"

শ্লোকানুসারে জীবের যে জ্ঞান, তাহা আত্মজ্ঞান নহে। তাহাকে অনাত্মজ্ঞান বা আত্মা সম্বন্ধে তাহা অজ্ঞানই বলা উচিত।

একোনত্রিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ষড়বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"রজ্জুঃ সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানকেনির্ভয়ো ভবেৎ॥"

রজ্জুর ভ্রমবশত আপনাকে সর্প-বোধ হয় না। রজ্জুর সেইপ্রকার ভয় হইয়া তাহা তিরোহিত হয় না। যে অন্ধকারে প্রত্যেক সামগ্রী অস্পষ্ট দর্শন হয়, সেই অন্ধকারে অজ্ঞাত রজ্জু দর্শনে কোন কোন ব্যক্তির ভ্রমবশত সেই রজ্জুকে সর্প-বোধ হইতে পারে। কিন্তু অন্ধকারে ভ্রমবশত আপনাকে কি কাহারও আপনি সহসা বোধ হইতে পারে? তাহা কখনই হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্যের মতে ভ্রমবশত যাহার রজ্জুতে সর্প-বোধ হয়, সে ব্যক্তি যদি নিজে রজ্জু হইত, তাহা হইলে তাহার কখনই অন্ধকারে ভ্রমবশত আপনাকে সর্প-বোধ হইত না। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালার মতে সত্য ব্রহ্ম এবং জীব অভেদ। অদ্বৈতমতানুসারে সেই ব্রহ্মই আত্মা। সুতরাং ব্রহ্মাত্মা ও জীব অভেদ। তবে আত্মা-রজ্জুকে, জীব-সর্প বোধ বা দর্শন হইলে, সেই জীব-সর্পের ভয়ের কারণ কি আছে? কারণ সর্পের আপনাকে আপনার ভয় হয় না। আর যদি বলা হয়, আত্মা-রজ্জুর ভ্রমবশত আপনাকে সর্পবোধ হইয়া তাঁহার ভয় হয়, তাহাও বলা যায় না। কারণ আপনাকে সর্পবোধ হইলে, আপনি আপনার ভয়ের কারণই বা হইবেন কেন? প্রকৃতপক্ষে, কোন সর্পের কি আপনাকে সর্প-বোধ থাকায়, আপনার ভয়ের কারণ আপনি হয়? তবে আত্মা-রজ্জুর যদি ভ্রমবশতও সর্পবোধ হয়, তাহা হইলেও সেই আত্মারজ্জুর আপনাকে ভয় হইতে পারে না। কোন অত্যন্ত বলবান্ ভয়ঙ্কর জন্তু অন্য কত লোকেরই ভয়ের কারণ হয়। সেই বলবান্-ভয়ঙ্কর-জন্তু কি নিজে, নিজের ভয়ের কারণ হইয়া থাকে?

তাহা কখনই হয় না। তাহা হইলে আত্মাও আত্মার ভয়ের কারণে কোন কারণেই হইতে পারেন না। অথবা জীবও নিজে নিজের ভয়ের কারণ কোন মতেই হইতে পারে না। অদ্বৈত ব্রহ্মমতেই আত্মা নির্বিকার। সেইজন্য সেই আত্মার, নিজেকে জীব-বোধ হইয়াও নিজের ভয় হইতে পারে না। কারণ ভয়ও একপ্রকার বিকার। সেইজন্যই সেই ভয়ের সঙ্গে নির্বিকার আত্মার কোন সংস্রবই হইতে পারে না। আর সেই আত্মা অজর বা নির্ভয় স্বীকার করিলেও, সেই আত্মার কোন কারণে ভয়ের উদ্রেক হইতেই পারে না। আর আত্মার আপনাকে জীব বলিয়া যদি ভ্রম হইতে পারে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শ্রৌত উপনিষদাবলী ও বেদান্ত প্রভৃতি মতে সেই আত্মাকে যে নির্বিকার, নিরঞ্জন ও শুদ্ধ প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহাই বা কি প্রকারে অস্বীকার করিয়া ঐ সকল গ্রন্থের পক্ষীয়গণ কি প্রকারেই বা আত্মা জীবস্বরূপ বিকার প্রাপ্তে, আত্মা জীব হইয়া শোক-দুঃখ-লজ্জা-ঘৃণা-কাম-ক্রোধের বেগ প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হন্ স্বীকার করিতে পারেন? জীব ঐ সকল ভোগ বরে স্বীকার করিলেও সেই সকল ভোগ ব্রহ্মাত্মারও করা হইয়া থাকে' অবশ্যই শঙ্করাচার্য্যের পক্ষীয়গণের স্বীকার করা উচিত। কারণ পূর্ব্বেই শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, ব্রহ্ম, আত্মা এবং জীব অভেদ্। সুতরাং জীব বিকৃত হয় স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম বা আত্মাও বিকৃত হন্ স্বীকার করিতে হয়। অথচ শঙ্করাচার্য্যই স্বীয় আত্ম-বোধ গ্রন্থে বলিয়াছেন,—'আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তে।'

ত্রিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য আত্মবোধ গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত ষড়বিংশ শ্লোকে—'নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানকেদ্রির্ভবো ভবেৎ' বলায়, ভ্রান্তিক্রমে পরাত্মাই নিজেকে জীব-বোধ করেন ও করিতে পারেন, বুঝিতে হয়। তাহার কারণ প্রথমতঃ 'ব্রহ্মঃ সর্ব্বব্রহ্মাত্মনং জীবো জ্ঞাত্বা ভবং বন্ধেৎ' শ্লোকাংশ বিবেচনা পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া, পশ্চাৎ 'নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানকেদ্রির্ভবো ভবেৎ' শ্লোকাংশ পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অগ্রে পরাত্মার ভ্রমবশতঃ আপনাকে জীব-বোধ না হইয়া থাকিলে, তিনি কখনই জ্ঞানলাভের পরে বলিতে পারেন না, 'নাহং জীবঃ পরাত্মেতি'। উক্ত শ্লোকাংশ অনুসারে প্রতিপন্ন হয়, অগ্রে যিনি আপনাকে জীব-বোধ করিতেছিলেন, তিনিই পরে জ্ঞান প্রভাবে আপনাকে জীব-বোধ না করিয়া পরাত্মাই বোধ করিতে পারেন এবং বোধ করেন। তাহা হইলে পরাত্মার ভ্রান্তি হইতে পারে এবং তাঁহার সেই ভ্রান্তি জ্ঞান-প্রভাবে অপসারিত হইতে পারে, পূর্ব্ব বৃত্তান্তানুসারে নিশ্চয়ই বোধ হয়। তাহা হইলে পরাত্মার বিকার নাই ও স্বীকার করা যায় না, এবং তিনি বিকার-বিহীন হইয়া নির্বিকার হইতে পারেন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তবে তিনি কখনও সবিকার এবং কখনও নির্বিকার স্বীকার করিলে, তাঁহাকে নিত্য-নির্বিকার বলা হয় না। তাহা হইলে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়েরই প্রভাব তাঁহার উপর আছে স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে তিনি জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়েরই অধীন, স্পষ্টই স্বীকার করিতে হয়।

একত্রিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণি চ।
দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা তস্মৈতৈর্ন বিভাস্যতে।"

উক্ত শ্লোকানুসারে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ জড়। তাহারা আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, আপনারাও প্রকাশিত হইতে পারে না; আত্মাই তাহাদের প্রকাশ করেন। সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা উচিত নহে। যাহা প্রকাশ করে, তাহা কখনই নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে। দীপ ঘটাদিকে প্রকাশ করে, দীপ কি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়? প্রত্যক্ষ দেখি, দীপ সগুণ-সক্রিয়। সেইজন্য দীপকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। আত্মা যদি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিতে

সক্ষম হইতেন না। আত্মা স্বয়ং গুণ নহেন বলিয়া তাঁহাকে নির্গুণ বলা যাইতে পারে বটে।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টবিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপত্বতায়নঃ।
নহ্যপস্তাজ্যদীপেচ্ছা তথা ধাত্মা প্রকাশতে"।

এক দীপকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য দীপের প্রয়োজন হয় না সত্য, কিন্তু সেই এক দীপকে প্রকাশ করিবার জন্য কি তৈল সলিতা বা কার্পাস-বর্ত্তিকা, অগ্নি, অগ্নির আলোক, এবং সেই দীপ প্রকাশের আধারের প্রয়োজন হয় না? তবে কেবল এক দীপই, সেই এক দীপের প্রকাশক কি প্রকারে বলা যাইবে? একাত্মাকে প্রকাশের জন্য অন্য আত্মার প্রয়োজন হয় না বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই একাত্মার প্রকাশের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, বলা যাইতে পারে না। আর আত্মবোধ বা আত্মজ্ঞানই আত্মা, এবং সেই আত্মজ্ঞান-আত্মাদ্বারা আত্মাকে জানা যায় এবং তদ্দ্বারাই আত্মা প্রকাশিত হয়, ইহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ যাঁহাকে জানিতে হয়, তিনি এবং যাহাদ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়, তাহা পরস্পর অভেদ এক-বস্তু; তাহা অদ্বৈত-তত্ত্বমতে বুঝিবার কোন কারণই দেখি না। কারণ আত্মা এবং আত্মজ্ঞানের এক-প্রকারত্ব নাই, তাহা অতি সহজেই বোঝা যায়। যে সকল বস্তু দৃষ্টি-শক্তি প্রভাবে দর্শন করা যায়, সেই দৃষ্টি-শক্তি এবং তাহারা কি পরস্পর অভেদ? তাহা কখনই নহে, তাহা কোন্ বুদ্ধিমান না বোঝেন? তবে যাঁহাকে জানা যায়, তিনি এবং যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, সেই জ্ঞান পরস্পর অভেদই বা কি প্রকারে বলা যাইবে? অবিনশ্বর নিত্যাত্মাকে বোধ-রূপও বলা যায় না। কারণ বোধ অর্থেই জ্ঞান। শঙ্করাচার্য্যের মতেই জ্ঞান ও নিত্য নহে। তাঁহারই মতে জ্ঞান ও বিনষ্ট হয়।

অষ্টাত্রিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের একোনত্রিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"নিষিধ্য নিখিলোপাধীয়েতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্ধ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥

অদ্বৈতমতানুসারে আমি-আত্মা বা আমি-পরমাত্মা ভিন্ন অপর আত্মা বা পরমাত্মা না থাকিলে, এবং আমি-আত্মা বা আমি-পরমাত্মা বিনা ঐ অদ্বৈত মতানুসারেই নিত্য-নির্বিকার এবং নিত্য-নিরঞ্জন স্বীকৃত হইলে, অপর জীবাত্মা কোথায় পাওয়া যাইবে? সুতরাং জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য-বাচক মহাবাক্যের সাহায্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে অভেদ, ইহাই বা জানিতে হইবে কেন? তাহা হইলে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের প্রয়োজনই বা হইবে কেন? তাহা হইলে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' নামক মহাবাক্যেরই বা প্রয়োজন হইবে কেন? তাহা হইলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই যে মহাবাক্য, ইহারই বা প্রয়োজন হইবে কেন? তাহা হইলে এই আমি-নিরঞ্জন-আত্মার বা পরমাত্মার, জীবাত্মা বা জীব-সংজ্ঞাই বা হইবে কেন? তাহা হইলে এই নিরঞ্জন-নির্বিকার-আমি-আত্মাতে নিখিল-উপাধি-সমূহ সংক্রামিত হইয়া আমিই বা সবিকার এবং অজ্ঞানবিশিষ্ট জীবাত্মা বা জীব হইব কেন? আমার আবার 'নেতি নেতীতি' বাক্যদ্বারা আমি হইতে নিখিল-উপাধি সকল অপসারিত বা নিষেধ করত, জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য-বাচক কোনও মহাবাক্য দ্বারা আমি জীবাত্মাই-পরমাত্মা, ইহাই বা আমার বোধ করিবার প্রয়োজন হইবে কেন?

চতুস্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"অবিদ্ধকং শরীরাদিবৃক্ষং মূঢ়ধিয়ং পরং।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্ধাদ্ধং ব্রহ্মেতি নির্মলবুধঃ॥"

বৃক্ষ হইতে যাহা প্রকাশ হয়, তাহাও বৃক্ষ। অবিদ্যা হইতে যাহা প্রকাশিত, তাহাও অবিদ্যা। আত্মবোধের ত্রিংশ শ্লোকানুসারে অবিদ্যা হইতেই শরীরাদি বৃক্ষ।

সুতরাং অবিদ্যা এবং শরীরাদি অভেদ। শঙ্করাচার্যের আত্মানাত্মবিবেকানুসারে অবিদ্যা অনাদি সুতরাং সেমতে তাহা অবশ্যই নিত্য। তবে তাহা হইতে যে শরীরাদি হইয়াছে, তাহারা অবশ্যই নিত্য। শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষানুভূতিতে 'সর্বাত্মোক্তি' আছে। সুতরাং শরীরাদি দৃশ্যও তাঁহারই মতে আত্মা বলিতে হয়। সুতরাং তাঁহারই মতে শরীরাদি-দৃশ্যও অনিত্য নহে

পঞ্চত্রিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্যের আত্মবোধ গ্রন্থে বলা হইয়াছে —

"দেহাক্ষত্বাদয়ো জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিষ্ক্রিয়ত্বং ন চ ॥ ৩১
অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ
অপ্রাণোঽমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতি শাসনাৎ ॥"

উক্ত একত্রিংশ শ্লোকানুসারে দেহ ও আত্মা অভেদ নহে। কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষানুভূতির কোন কোন শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে দেহ এবং আত্মা অভেদ। অদ্বৈত মতানুসারে, জন্ম-জরা-কার্শ্য-লয় প্রভৃতি ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সকল অনাত্মা বা অবিদ্যার বিবিধ-বিকাশ। অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে—

"এবং দেহত্রয়াদন্য আত্মাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্বাত্মা সর্বরূপশ্চ সর্বাতীতোঽব্যয়ঃ ॥

উক্ত শ্লোকে আত্মা সর্বরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা অবিদ্যা-অনাত্মা এবং আত্মা অভেদও স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ সর্ব-রূপ অবিদ্যা-অনাত্মারই বিকাশ। জন্ম-জরা-কার্শ্য-লয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতিও সেই অনাত্মা-অবিদ্যার বিবিধ প্রকাশ। সুতরাং ঐগুলিও অনাত্মা-অবিদ্যা। অনাত্মা-অবিদ্যার বিকাশ সর্ব-রূপকে যদি অপরোক্ষানুভূতির চত্বারিংশ শ্লোকে আত্মা বলা অসঙ্গত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অনাত্মা-অবিদ্যার জন্ম-কার্শ্য-লয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বিকাশগুলিকেই বা আত্মার বিবিধ-প্রকাশ বলা অসঙ্গত হইবে কেন? অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে 'সর্বাত্মোক্তি' স্বীকার করিলে জন্ম-জরা-কার্শ্য-লয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতিও আত্মার বিবিধ বিকাশ বলা যাইতে পারে। উক্ত দুই শ্লোকানুসারে ইন্দ্রিয়গণকে, মনকে, প্রাণকে, [illegible] জন্ম প্রভৃতিকেও কথিত আত্মারই বিবিধ বিকাশ বলা যাইতে পারে। অতএব ঐ সকলের সহিত ত্রিবিধ দেহের জন্ম, জরা, কার্শ্য, লয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সকলের সহিত আমি-আত্মার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই বলা যায় না। কারণ আমি-আত্মাই ঐ সকল—পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আমি-অপর সহিত আমি-আত্মার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর অন্য কিছুর সহিতই হইতে পারে না। কোন শাস্ত্র এবং যুক্তিমতে দেহ ভোগী নহে। তুমি-আত্মা কি দেহকে কিছু ভোগ করিতে দেখিয়াছ? কখনই দেখ নাই। তুমি-আত্মা নিজেই ত্রিবিধ দেহাবলম্বনে সমস্ত ভোগ করিয়া থাক আমি-আত্মাও নিজেই সমস্ত ভোগ করিয়া থাকি। তবে কি প্রকারে বলিব, তুমি-আত্মা জন্ম প্রভৃতি ভোগ করনা? তুমি-আত্মা অথবা আমি-আত্মার জন্ম প্রভৃতি যে ভোগ হয়, সে সম্বন্ধে কোন পুস্তক, কোন রচনা কিংবা কোন উদাহরণদ্বারা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। তাহা তুমি আমি যখন বুঝি, তখন আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি আছে? তুমি-আত্মা ও আমি-আত্মাই জন্ম প্রভৃতি ভোগ করি প্রমাণ করা হইয়াছে বলিয়া, তুমি-আত্মার সহিত এবং আমি-আত্মার সহিত জন্ম প্রভৃতির সম্বন্ধ স্বীকারও করা যায়।

ষট্‌ত্রিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্যের আত্মবোধ গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—

"নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্মলঃ ॥ ৩৩
অহমাকাশবৎ সর্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদা সর্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্মলোঽচলঃ ॥ ৩৪
নিত্যা শুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দময়ম্যহং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ ॥ ৩৫

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।

হৃদয়াবিদ্যা বিক্ষেপান্ যোগানিব রসায়নং ॥ ৩৬"

আত্মার সহিত অহঙ্কারের সংস্রব বাস্তবিক, আত্মা 'আমি' বলিতে পারেন না। তিনি আমি-বোধও করিতে পারেন না। অহঙ্কার অনাত্মার অংশ বা অনাত্মার বিকাশ, তাহা এই সিদ্ধান্তদর্শনের প্রথম ভাগের অদ্বৈতমত এবং যুক্তি অনুসারে বিবৃত হইয়াছে। অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব থাকিতে সেই আত্মাকে আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকানুসারে নিরঞ্জন, নির্বিকার, নিত্য-মুক্ত এবং নিষ্কল; চতুস্ত্রিংশ শ্লোকানুসারে শুদ্ধ, নিঃসঙ্গ ও নির্মল এবং পঞ্চত্রিংশ শ্লোকানুসারে নিত্য-শুদ্ধ ও বিমুক্ত বলা যাইতে পারে না। কারণ অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মার অহঙ্কারই একপ্রকার অঞ্জন। সুতরাং সেই জন্য অহঙ্কার-বিশিষ্ট আত্মা নির্বিকার নহেন। অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব থাকিতে আত্মাকে 'কেবল' বলা যায় না; অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব থাকিতে, আত্মাকে মুক্ত বা নিত্য-মুক্ত বলাও যায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে যদি অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব না থাকিত তাহা হইলে সেই আত্মাকে 'কেবল' বলিতে পারিতাম। তাহা হইলে সেই আত্মাকে মুক্ত বা নিত্য-মুক্ত না বলিয়া 'অবদ্ধ-কেবল' বলিতে পারিতাম। কারণ আত্মা নিত্য-নিরঞ্জন এবং নির্বিকার স্বীকার করিলে তাঁহাকে মুক্ত কিংবা নিত্য-মুক্ত বলা যায় না। কারণ যে আত্মার কখন বন্ধনই হয় নাই, তাঁহার কখন মুক্তিরও প্রয়োজন হয় নাই; সুতরাং সেইজন্য সেই আত্মাকে মুক্ত অথবা নিত্য-মুক্ত বলাও অসঙ্গত হইত। আত্মার সহিত অন্য কিছুর অসংস্রবই আত্মার নির্মলতা। আত্মার সহিত অন্য কিছুর অসংস্রবই আত্মার শুদ্ধতা বা শুদ্ধি। আত্মার সহিত অন্য কিছুর অসংস্রবই আত্মার নিঃসঙ্গতা। অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মার অহঙ্কারই মালিন্য; সুতরাং সেই অহঙ্কার বিশিষ্ট আত্মাকে নির্মল না বলিয়া, স-মল বলাই সঙ্গত। অহঙ্কারও অশুদ্ধ অনাত্মার একপ্রকার বিকাশ,—সুতরাং সেই অহঙ্কারবিশিষ্ট আত্মাকে শুদ্ধ না বলিয়া অশুদ্ধ বলাই সঙ্গত। অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব থাকিতে আত্মাকে নিঃসঙ্গ বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য আপনাকে আমি-আত্মা বা অহমাত্মা যদি বোধ না করিতেন, তিনি তাঁহার কোন গ্রন্থে আপনাকে আমি আত্মা বা অহমাত্মা বলিয়া যদি পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে 'তিনি' শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন, আমিও শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতাম। তাহা হইলে তিনি-আত্মা নিত্য-শুদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেন, আমি-আত্মাও নিত্য-শুদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতাম শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের চতুস্ত্রিংশ ও পঞ্চবিংশ শ্লোকোক্ত আত্মার সহিত যদি অহঙ্কারের সংস্রব না থাকিত তাহা হইলে তাঁহাকে বিমুক্ত বলিলেও সঙ্গত হইত। অহঙ্কার রূপ বন্ধন থাকিতে আত্মাকে মুক্ত কিম্বা বিমুক্ত বলা যাইতে পারে না।

সপ্তত্রিংশ সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের চতুস্ত্রিংশ শ্লোকের প্রথম চরণে বলিয়াছেন,—

"অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।"

উক্ত চরণানুসারে দেখিতেছি, শঙ্করাচার্য্য 'সর্ব্ববহিরন্তঃ'ও স্বীকার করিতেন। দেখিতেছি, তিনি সর্বও মিথ্যা বলিতেছেন না। দেখিতেছি, তিনি সর্বের বহির্দেশ এবং মধ্যদেশও মিথ্যা বলিতেছেন না। উক্ত শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, আমি আকাশবৎ সর্বদা সর্ব-বস্তুতে সমভাবে থাকি। আমি সর্ব-বস্তুতে সমভাবে থাকি বলিয়াই যে-সকল বস্তুতে এবং যে-সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে থাকি সে সকলও আমি-আত্মার ন্যায় নিত্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

অষ্টত্রিংশ সিদ্ধান্ত

পূর্বোক্ত ষট্ত্রিংশ সিদ্ধান্তে পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থোক্ত পঞ্চত্রিংশ শ্লোকানুসারে আমি-পরব্রহ্ম-আত্মাকে 'নিত্যশুদ্ধ বিমুক্তৈকং', 'অখণ্ডানন্দং', 'অদ্বয়ং', 'সত্যং', 'জ্ঞানং' ও 'অনন্তং' বলিলে, আমি পরব্রহ্মাত্মার এক-প্রকারতা বুঝিবার কোন কারণই থাকে না। কারণ আমি-পরব্রহ্মাত্মাকে ঐগুলি বলায়

আমি-পরব্রহ্মাত্মার নানাপ্রকার উপাধি ও নাম আছেও স্বীকার করা হইতেছে। প্রসিদ্ধ অনেক অদ্বৈত-মতের প্রকারান্তরেই আমি-পরব্রহ্মাত্মা একই প্রকার। সে সকল মতে 'আমি'র বহু-প্রকারতা নাই। অদ্বৈতমতে অনাত্মা-অবিদ্যারই বহু-প্রকারতা। বহু-প্রকারতা যাহাতে আছে, অথবা বহু-প্রকারতার সঙ্গে যাহার সংস্রব, তাহা অসঙ্গ কেবলাত্মা নহে। আর আমি আত্মা নিত্য কেন, তাহাও ত বুঝিতে পারি না? কারণ আমি-আত্মা ছিলাম কি না, তাহাও আমার বোধ নাই। আমি আত্মা ইহ জীবন পরে থাকিব কিনা, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না;—তবে আমি-আত্মা যে নিত্য, ইহাই বা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা যায়? আমি-আত্মার কতই অসত্যতা,—সে সকল অদ্বৈতমতানুসারে আমি-আত্মার যে সকল দেহে বিকাশ, সেই সকল দেহেই বোঝা যায়। কত দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গে ঐ প্রকার আত্মার সম্বন্ধ, সেগুলি নিশ্চয় ঐ প্রকার আত্মার বিষয় বন্ধন। নানাপ্রকার রোগ-শোক-তাপ, নানাপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা-অবমাননা ও উৎপীড়ন প্রভৃতিও ঐ প্রকার আত্মার বিষয় বন্ধন। তবে আমি-আত্মা বিমুক্ত কি প্রকারে বলি? সর্ব সচল চেতনাবিশিষ্ট দেহে একই আমি-আত্মা আছি স্বীকৃত হইলে, তাহা আমি-আত্মার বোধ থাকা উচিত ছিল। প্রত্যেক দেহী-আত্মাই নিজের সঙ্গে অন্যান্য দেহস্থ আত্মা, অভেদ বোধ করেন না এবং অভেদ বোধ করিও না; সুতরাং কেবল একাত্মাই বা কি প্রকারে স্বীকৃত হইতে পারে? সুতরাং বহু-দেহে বহু আত্মাই স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য কেবল একাত্মাই স্বীকার করা যায় না। অতএব আমি-আত্মা 'এক' সেইজন্য বলিতে পারা যায় না। বহু-আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈত-মতানুসারে একাত্মা স্বীকৃত হইলেও বহু-দেহে সেই একাত্মারই বহুখণ্ড অনুভূত হইতেছে। কারণ সর্ব-দেহেই এক অখণ্ড-আত্মার বিদ্যমানতা আমি-আত্মা বোধ করি না, তুমি-আত্মা বোধ করে না, কিম্বা তিনি বা অন্য কোন আত্মাও বোধ করেন না। এই দেহে কেবল আমি-আত্মাই আছি, বোধ করি। ঐ দেহে কেবল তুমি-আত্মাই আছ বোধ করি। কিন্তু ঐ দেহে আমি-আত্মাই আছি, তাহা ত বোধ করি না? ঐ প্রকারে কোন দেহস্থ আত্মাই সর্ব-দেহস্থ আত্মার সঙ্গে আপনাকে অভেদ অভিন্ন অথবা এক বোধ করেন না; তাহা আমি-আত্মাকে দিয়াই বুঝিতেছি। তুমি-আত্মার পিতা যিনি, তিনিও অবশ্যই আত্মা। অথচ তুমি আত্মার সহিত তোমার পিতা-আত্মা যে অভেদ বা এক এবং অখণ্ড, তাহা ত বুঝিতে পার না? তুমি-আত্মার সহিত যদি তোমার পিতা-আত্মা অভেদ বা এক এবং অখণ্ড হইতেন, তাহা হইলে তুমি-আত্মার সুখ দুঃখে তোমার পিতা-আত্মার তোমারই ন্যায় সুখ-দুঃখ বোধ হইত। তাহা হইলে তুমি-আত্মার সুখ বোধ হইলে, তোমার পিতা-আত্মারও সুখ-বোধ হইত। সেই জন্যই বলি তোমার পিতা-আত্মা হইতে তুমি বিকাশিত হইয়াছ স্বীকার করিলেও তুমি ও তোমার পিতা-আত্মা পরস্পর অভেদ বা এক এবং অখণ্ড বলা যায় না। আমার সুখ এবং আমি অভেদ নই যে প্রকারে, সেই প্রকারে আমার আনন্দ এবং আমি অভেদ নহি। সকল সচেতন দেহেই আত্মা বিদ্যমান, অথচ সকল দেহের আত্মাই অখণ্ড নহে তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং আমি-আত্মাই 'অজর' বলিতে পার না। আমি-আত্মা সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত বলিলেও, আমি-আত্মার বি-প্রকারতা স্বীকার করা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে বহু-প্রকারতা যাহার আছে, তাহাই অনাত্মা। সুতরাং আমি-আত্মাকেও কি অনাত্মা বলিতে হইবে? আমি-আত্মাই জ্ঞান স্বীকার করিলে, আমি-আত্মা জ্ঞানীও স্বীকার করা যায় না; যেমন যাঁহার দ্রষ্টা এবং দৃশ্য অভেদ নহে তদ্রূপ যাঁহার জ্ঞান এবং যিনি জ্ঞানীও অভেদ বলা যাইতে পারে না। চক্ষুদ্বারা যাহা দর্শন করা হয়, তাহা ও চক্ষু কি অভেদ? তদ্রূপ যাহাকে জানিতে হয়, তাহা এবং জ্ঞান অভেদ বলিতে পারা যায় না। আমি-আত্মা অনন্তই বা কি প্রকারে বলা যায়? কারণ এই পরিমিত দেহ ব্যতীত অন্য কিছুতে আমি-আত্মা আছি বোধ করি না; সুতরাং আমি-আত্মা অনন্ত নহি।

ক্রমশঃ

পুস্তক-পরিচয়

রক্তকমল—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী—প্রকাশক প্রয়াগধাম, কলিকাতা-৯। শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারীর 'রক্তকমল' উপন্যাসখানি পড়েছি। ভালো লেগেছে। প্রথমেই প্রশংসা করব লেখকের ভাষার ব্যঞ্জনার। বেশ সংহত, পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, অথচ কাব্যের জ্যোতনাবর্জিত নয়। লেখকের আদর্শবাদী মনটিরও আভাসায় আবেদনার পরিচয় মেলে।

অমলা সেনের চরিত্র বেশ সুন্দর আঁকা হয়েছে, কমলের চরিত্রও। তবে কাহিনীর বিন্যাসে ও উপস্থাপনায় কিছু রোমান্টিক মনোভাবের আতিশয্য আছে। সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই ভালো। অমলা সেন বা সবিতা যে সমাজের মেয়ে সে সমাজের সঙ্গে কমলের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরের এক মেসবাসী যুবকের মেলামেশার সুযোগ অতিসহজ পরিমিত, প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। অথচ উপন্যাসে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখানো হয়েছে। বলতে পারা যায় কমলের দাদা গৌতমের সূত্রে তার সঙ্গে ওঁদের পরিচয়, কিন্তু এ রকম সম্ভাব্যতা উপন্যাসেই শুধু মনোহর রঙে চিত্রিত করা চলে, বাস্তব জীবনের সত্য তাকে বলা চলে না। কমলের স্বাধীন চিন্তার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিমান এবং তার প্রকাশ-মাধ্যম বক্তা নামক এক সুস্পষ্ট লক্ষ্যবিহীন ক্ষুদ্র পত্রিকাকে আশ্রয়—এও লেখকের আদর্শবাদী স্বপ্নালু মনের পরিচয় দেয়, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির চেতনার নয়। কোনো মানুষই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন চিন্তার পোষক নয়, কোনো না কোনো সূত্রে কোনো না কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বার্থ সূত্রে তার মন বাঁধা। কাজেই চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের অজুহাতে তার জনগণের আন্দোলন থেকে গা বাঁচিয়ে চলাটা কোনো কালের কথা নয়। কমল সেই ভুলই করেছে, ক'রে রোমান্টিক তা
মধ্যে হারিয়ে গেছে।

উপন্যাসটির আয়তন বড়ো সংক্ষিপ্ত, আরও বিস্তারের অবকাশ ছিল। পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়গুলি এতো হ্রস্ব যে কাহিনীর ধারাবাহিকতার বাঁধে বারেই ছেদ ঘটেছে। আর একটু লম্বানো কাহিনী হলে পড়ার তৃপ্তি আরও বাড়ত।

যাই হোক, এ' সব খুঁটিনাটির কথা। এতে উপন্যাসটির মৌলিক সুখপাঠ্যতা তথা উপাদেয়তার কোনো হানি হয় না। লেখক আরও বড়ো ক্যানভাসে বড়ো বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখুন, তাঁর সার্থক ঔপন্যাসিক হবার প্রতিশ্রুতি আছে।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

কানীন ও ক্ষেত্রজা—শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়—বাক-সাহিত্য, কলিকাতা-৯। বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ' লিখে ঔপন্যাসিক হিসেবে নিজেকে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'কানীন ও ক্ষেত্রজা' তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস এবং নিঃসন্দেহে আলোচনার যোগ্য।

কাহিনীর নায়ক বীরেন সেন স্ব মুখেই গল্পটি বর্ণনা করে গেছে। নায়িকা ইভা এক অসহায় তরুণী, অনেক দুঃখ ও অবহেলা সয়ে অবশেষে মহৎ-চরিত্র শিল্পী সুবিনয় রায় চৌধুরীর আশ্রয় পেয়েছে। শিল্পী সুবিনয় ইভাকে অনেক কিছু দিয়েছেন—গৃহ, আশ্রয়, ভালবাসা এমন কি জীবনের নিরাপত্তাও। পারেন নি দিতে শুধু একটি জিনিষ যার অভাবে নারী-জীবন বিশেষ করে ইভার মত নারী চির বুভুক্ষু। সন্তানের জনক হওয়ার মত ক্ষমতা

সুবিনয়ের মধ্যে ছিল না। তাই ইরার জীবনে তার প্রেমিক বীরেশের আবির্ভাবে।

কাহিনীটি স্বল্পপরে ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক। তাঁর ভাষার বুনুনিতে কাব্যের মোহনা মনকে ভরিয়ে দেয়। তাঁর সংলাপ স্বচ্ছন্দ; চরিত্র-চিত্রণ সুস্পষ্ট। শুধু উপসংহারে নায়কের তাত্ত্বিক আলোচনা কাহিনীর গতিকে কিছুটা ব্যাহত করেছে। উপন্যাসটির পরিধি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; প্রায় লিরিক কবিতার মত। তবু কবিতার মতই সংহত ও সুবদ্ধ একটি ভাবকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন পাঠকের সামনে। কথাকে শিল্পে পরিণত করতে পেরেছেন—রচনা-রীতির এই অসামান্যতার জন্য লেখক অভিনন্দন-যোগ্য।

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

রাধারাণী

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

শ্রীরাধারাণীর নামে আনন্দিত মন।
উল্লাসে পুরেছে প্রাণ, প্রেমে নিমগন।
শ্রীরাধারাণীর নামে রহি কতই আরামে
রাধারাণী আমোদিনী, কৃষ্ণপ্রেমে প্রমোদিনী,
রাধারাণীর কৃপাতে, পাব কৃষ্ণ-দরশন।
আদ্যাশক্তি রাধারাণী, কৃষ্ণমানসমোহিনী,
কৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্যামা, কৃষ্ণ বিনোদিনী।
কৃষ্ণভাবের ভাবিনী, কৃষ্ণপ্রাণস্বরূপিনী,
কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী সদা সর্বক্ষণ।
রাধারাণী মনোরমা, শ্রীরামরমণী রামা,
বেদবতী সীতা সতী, বেদব্রহ্মরূপিনী,
প্রেমময়ী পরাশক্তি, মহাভাবময়ী শক্তি,
দীন জনে পরাভক্তি, করেন প্রদান।
রাধারাণী গুণবতী, শাম্ভবী শিবানী সতী,
দয়াময়ী দুর্গাদেবী বেদেন্দ্রবন্দিনী।
হৈমবতী হেমাঙ্গিনী, হৃদিকমলবাসিনী,
স্বর্ণময়ী সুহাসিনী, সুন্দরী কেমন।
মায়াতীতা শান্তিরূপা সনাতনী শিবরূপা
আত্মাময়ী অপরূপা কৃষ্ণ আহ্লাদিনী
পরেশী কৃষ্ণপ্রেয়সী, কিবা পরম রূপসী
কৃষ্ণময়ী নিরুপমা কৃষ্ণের সমান।

শ্রীকৃষ্ণ-অবতরণ-জন্মাষ্টমী—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

বাইরে দুর্যোগপূর্ণ কঠিন রাত্রি—ভাদ্র মাসের অবিরাম বর্ষণের দুর্যোগ—দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বেরই প্রতিকৃতি—সাধকের অন্তর বাইরের দুর্যোগের কথাই নেই!—কিন্তু তারও মধ্যে আলো জ্বলে। কংসের কারাগারে সেদিন মানুষী সমাজের দুর্যোগ ও বাইরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুইয়েরই মধ্যে এক কালো শিশুর জন্মে এমনই আলো জ্বলেছিল—সাধকের অন্তরেও সে প্রদীপ জ্বলে উঠে তার বাইরেকেও প্রজ্বলিত করে তুলেছিল—অনন্ত প্রকৃতির ক্ষেত্রে হোক না কেন তা স্বল্পের জন্যই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—কত দীর্ঘ কাল ধরে এই নামটি ভারতবর্ষ জপ করে আসছে—জপ করতে কী যে ভাল লাগে—তবু আজও পর্যন্ত তাঁকে জানা ফুরিয়ে গেল না। এই অফুরান মানুষটীকে নিয়ে যত মানুষের কত রকমের মাথা ব্যথা। যিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্', সেই বিশ্বরূপ মানুষটীকে পাঁচ হাজার বৎসরাধিক কালেও চেনা গেল না। একদল কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে পাগল, আর একদল তাঁকে নিশ্চিহ্ন করতে সোচ্চার—কিন্তু জীবন-চেতনা সম্বন্ধে তিনি যা বলে গিয়েছিলেন আজও তা সমাজ-জীবনে রূপ নিল না। যাঁরা তাঁর নামে পাগল তাঁরাও সমগ্র ঐ মানুষটীর বিশ্বরূপ বাদ দিয়ে তাঁকে সীমিত করে ফেলেছে। যাঁরা আজ পর্যন্ত তাঁতে বিরূপ তাঁরাও তাঁর নাগাল পেলে না, তাঁর শেষ পরিচয়টাও দিতে পারলে না। তবে বর্তমান যুগটা কৃষ্ণ-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হওয়ার যুগ নিঃসন্দেহে। বস্তু-জগৎ একান্তভাবে আমার, কিংবা সে একেবারেই বাইরের, বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কটা একান্তভাবেই স্বকীয়, কিংবা সে একেবারেই মিথ্যা মায়া—অনাদি কাল থেকে প্রচলিত এই দুই রকম চিন্তাধারার তীব্র অথচ মধুর প্রতিবাদ—শ্রীকৃষ্ণ। বস্তু যেমন আমার, তেমনি সে তার নিজস্ব গৌরবে গৌরবান্বিত অর্থাৎ বস্তু আমারও নয়; বস্তুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটীও তাই একান্ত স্বকীয়ও নয়, একান্ত পরকীয়ও নয়। এই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনের সকল ঘটনায় এমন সুন্দর করে আস্বাদন করে এমন বিচিত্র মুক্তির পথ-রেখা রেখে গেছেন যে, যে-কোন একমুখীন মনোবৃত্তির কাছে তা অবোধ্য থেকেই যায়—কেননা তিনি যে সমগ্র। পরস্পর বিরুদ্ধধর্মকে অঙ্গীকৃত করেই তিনি সমগ্র। জীবন্ত জীবনটাই বিরুদ্ধ ধর্মকে ওতপ্রোত মিলিয়ে একটী সমগ্র বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ একটী জীবন্ত জীবন।

আজকের দিনে শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা কি ভাবে পেতে পারি? আজকের দিনের প্রথম কথা—মানুষের প্রথম পরিচয় মানুষ হিসেবে। সে ভারতীয়, না বাঙালী, না ইংরেজ, না রাশিয়ান—এটা কোন কথাই নয়। সে ব্রাহ্মণ, না কায়স্থ, না শূদ্র,—সে কুলীন, না অন্ত্যজ—এটাও কোন কথা নয়। সে পুরুষ, না নারী, সে শিক্ষিত, না অশিক্ষিত, সে ধনী, না দরিদ্র—এগুলিও অবান্তর। জন্ম দিয়েও তার কোন পরিচয় নয়; ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মালেই সে ব্রহ্মবিৎ নয়, শূদ্র হয়ে জন্মালেও সে মার্কামারা অপবিত্র নয়। সে মানুষ—এইটেই তার প্রথম পরিচয়। আজকের দিনের দাবীদার এই মানুষ হবার জন্য সৌধর্ববোধের অধিকারের কথা। এই অধিকারকে মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে নানা ভাবে হরণ করা হয়েছিল, করে আজও আছে। এবং তারই প্রতিবাদ দিকে দিকে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যত বিক্ষোভ যত দাপাদাপি—বিকৃতি তাতে যতই থাক—সব কিছুর গোড়ার কথা মানুষ হওয়ার অধিকার স্বীকৃতির প্রশ্ন।

শ্রীকৃষ্ণ সে স্বীকৃতি—সকল স্তরের সকল মানুষকে তার মর্যাদা, তার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি—প্রাণ খুলে মর্যাদীন ভাষায় দিয়ে গেছেন সেই দীর্ঘ কয়েক হাজার বৎসর আগেই। তাঁর জীবন অনুধাবন করতে জানলে দেখা যাবে তিনি আধুনিকতম মানুষ। অত্যাধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদেরা জীবনের নূতন মূল্যবোধের যত কথা বলেছেন—দেখতে জানলে দেখা যাবে শ্রীকৃষ্ণ তার প্রত্যেকটিই বলে গেছেন। মানুষকে কী অপরিসীম মর্যাদা তিনি দিয়েছিলেন ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়! ভাগবতের পাতায় পাতায় তাঁর এই মর্যাদা দানের বিবরণ ছড়িয়ে আছে। চাষাভূষা ঐ সব ব্রজবাসীকেরা—তাদের তিনি কি আপনই যে বোধ করেছেন তা কি আজকের দিনের কোন সাম্যবাদী ভাবতেও পারে? দরিদ্র অশিক্ষিত যে চাষাভূষাকে আমরা ছোটলোক বলে, নিতান্ত কৃপার পাত্র বলে জেনে এসেছি, সেইমত ব্যবহার করে এসেছি, বালক শ্রীকৃষ্ণই শুধু তাদের কাঁধে নেন নি, রাজা শ্রীকৃষ্ণও এমনই চাষাভূষা সুদামকে তার সেই ধূলি ধূসরিত পা সহ সিংহাসনে বসিয়েছিলেন—কোন ফুটনৈতিক মন নিয়ে নয়—পরম প্রেমে বিগলিত হয়ে। যে মেয়েদের একমাত্র সন্তানধারণ ক্ষমতা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা পরিস্ফুট হওয়ার কোন আবেষ্টন সভ্যতার মধ্যে ছিল না, দীর্ঘ যুগ যুগ ধরে যে মেয়েদের বুদ্ধিমান সমাজ এতটুকু মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য কোনদিন দিতে পারেনি, সমস্ত উচ্চতর জীবনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে যে-মেয়েদের মনে করে আসা হয়েছিল যুগযুগান্ত ধরে—শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাবতরণের আগেও, পরেও—সেই মেয়েদেরই বা শ্রীকৃষ্ণ কী অপরিসীম মর্যাদা দিয়ে গেলেন—ভাবলে বিস্ময় লাগে! আরও বিস্ময় লাগে এই জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ কী কথাটা মেয়েদের সম্বন্ধে কিংবা চাষাভূষা সম্বন্ধে বলেছিলেন বা আচরণ করেছিলেন সেটা ভারতবর্ষ—কি ভারতবর্ষের সনাতন শাস্ত্র কি ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজ—আজ পর্যন্ত বুঝতে পারল না। আজকের দিনে কালের ধাক্কায় যে অবস্থাটাকে (বাধ্যত?) মেনে নিয়ে চলতে হচ্ছে তার পিছনের কথাটি হচ্ছে এতদিনের বিপরীতের স্বীকৃতির দাবী। চাষা, শ্রমিক, নিম্নশ্রেণী, নারী—যাদের কোন স্বাতন্ত্র্য, কোন মর্যাদা স্বীকৃত হয় নি—তারাও স্বতন্ত্র, তারাও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী—এতদিনের বিপরীত এই কথাটি বলছে তথাকথিত কম্যুনিজম্—এবং এই কথাটি বলতে তারা যে-কোন পথের আশ্রয় নিচ্ছে। কেবল বিপরীতটুকু বলেছে বলেই বিকৃতির দৌরাত্ম্যে কালো সমাজের সামনে কেউ আজ পথ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু প্রাণধর্মী এই সব মানুষগুলির স্বাতন্ত্র্য দেওয়ার পথ শুধু বিপরীত (antithesis) অবস্থার স্বীকৃতিই নয়। শ্রীকৃষ্ণ অনেকটা এগিয়ে আরও অনেকটা বড় কথা বললেন। বললেন—যে-কোন ভাবে বিপরীতের, বিরুদ্ধের স্বীকৃতিই শেষ কথা নয়—বিপরীত যদি নিজেকে আবার সমগ্র সমাজ বলে বলে, তাহলে যে ভুল এতদিন ধনিক, কুলীন, নর ও আত্মাভিমানী করেছে, সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আজ শিখতে হবে, বুঝতে হবে যে প্রত্যেকেই—যুগ যুগান্তের সুযোগপ্রাপ্ত ধারা তারা কিংবা এতদিনের অবহেলিত অবমানিত লাঞ্ছিত যারা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অথবা দাঁড়াতে চাইছে—এরা প্রত্যেকেই সমগ্রের অংশ—তাই প্রত্যেকে স্বাধীন; প্রত্যেকে পরাধীন—এই স্বাধীন পরাধীন প্রতি অংশ মিলিয়ে একটি জীবন্ত সমাজ। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের স্বাধীনতা স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সে যে সমগ্রের মধ্যে স্থিত হয়ে পরাধীনও এই কথা বলে একটী শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কল্যাণকর জীবন্ত মনুষ্য সমাজের কল্পনা রেখে গেছেন।

অথচ এই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে কত পর হয়ে আছেন, কেবল আধ্যাত্মিক হয়ে কাঁসর ঘণ্টার পূজা পাচ্ছেন—জীবন দিয়ে ভারতবাসী তাঁকে পূজা করতে পারল না! কৃষ্ণ সামগ্রিক, তিনি ব্রহ্ম, আবার তিনিই রাখাল বালক হয়ে গোঠে মাঠে, তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ; আবার তিনিই পাখা কর্মে নিযুক্ত, পা-ধোয়ার কর্মে আনন্দিত, তিনি প্রেমে সকলের দ্বারা গৃহীতকণ্ঠ, আবার যুদ্ধে প্রণোদিত করতেও তাঁর দ্বিধা আসছে হয় না, কেননা

অত্যাচারীর অবসান ঘটিয়ে সামগ্রিক কল্যাণ তাঁর কাম্য। এমন একটি তত্ত্ব-জীবন যে মানুষের মধ্যে বিচরণ করেছিল, মুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন ঐকদেশিক দৃষ্টি-মানব তা অবধারণ অনুধাবন করতে অক্ষম। তাই তাঁর পূজা আজও হল না—এই পাঁচ হাজারের বয়োবৃদ্ধ ঐ কিশোর বালক আজও প্রহেলিকা—প্রহেলিকা তাঁর বৃন্দাবনের সহজ সরল প্রেম-জীবন, প্রহেলিকা পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধপূর্ব রাজনৈতিক জীবন। বর্তমান মনস্তত্ত্ব ও আধুনিকতম পদার্থবিজ্ঞান, বর্তমানের বস্তুনিষ্ঠ প্রভাবিত মনস্তত্ত্ব-সমাজবিজ্ঞান, ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের বুকে অবাকী অচেনা মানুষ শ্রীশ্রীনিতাগৌরাঙ্গদেবের সর্ব্ব সমন্বয়-বিজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে অনেকখানি প্রকাশ ও প্রস্থাপন করে গেছে—আমরা আমাদের সকল সত্তা দিয়ে তাঁর চরণে প্রণত হই। মানুষের সামগ্রিক রূপ ঐ মানুষটীর জন্ম হোক।

শ্রীরাধা—মানুষের সর্বাঙ্গীণ আবাহনের একটা মুক্ত চিত্র রেখে গেছেন উত্তম মানুষ শ্রীকৃষ্ণ, আর নারীত্ব কি ভাবে নারী হিসেবে এবং মানুষ হিসেবেও সার্থক হতে পারে তার চিত্র রেখে গেছেন শ্রীরাধা। প্রধান তত্ত্বের অবগুণ্ঠিত আবাকারে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের কাছে শ্রীরাধা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সর্ব্বত্রই মানুষের সভ্যতায় নারীর স্থান খুবই নীচে। অযোগ্যতা নারীর অনেক। তবু সে যে মানুষের সম্মান নিয়ে, মর্যাদা নিয়ে, স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে—সব শেষে নারীর মধ্যে যে ব্রহ্ম-শক্তি অবতরণ করতে পারে, নারীকে নিয়েও যে ব্রহ্ম-সাধনা হয় তারই বার্তা পৌঁছে দিয়ে ছিলেন শ্রীরাধা। নারীত্বের এই উজ্জ্বল রূপ আজও মানুষের কাছে উদ্ভাসিত হয় নি—তাই একদলের কাছে তিনি একেবারেই অপাংক্তেয়, আর এক দলের কাছে তিনি শুধু আধ্যাত্মিক।

শ্রীরাধা বিস্ময়ময়ী—নারীত্ব বা নারীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি শোষণমূলক অপমানকর এক তরফা নীতিবোধ মেনে নেন নি—স্ত্রীণ স্বামীর ঘর ফেলে বেরিয়ে পড়েছিলেন জীবনের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে, কিন্তু তাঁর বিস্ময় ছিল নূতন মূল্যবোধে প্রাপ্ত জীবনের গভীর ব্যাপক চেতনা দিয়ে সংগঠনাত্মক—তাই ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ভেঙে তিনি পুরুষোত্তমকে গ্রহণ করেছিলেন—কাপুরুষের হাতে নিজেকে দিয়ে নারী-জীবনকে ভোগের পণ্য দ্রব্যে পরিণত করেন নি—তাই তাঁর বাস্তব জীবন-যাপন দ্বারাই অধ্যাত্ম ব্রহ্ম-সাধনার শেষ স্তরে তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ প্রাপ্ত। নারীত্বের যে একটা মহিমাময়ী রূপ হয়—যা আতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়েও নিত্য পূর্ণতায় কল্যাণময়ী—তারই চিত্র রেখে গেছেন শ্রীরাধা সেই কয়েক হাজার বৎসর আগে। পরস্পর বিরোধী বহু গুণের আকর শ্রীরাধা সম্বন্ধে বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখেছে—তিনি বিনীতা, তিনি বিদগ্ধা, প্রচলিত পথের বাইরে গিয়েও তিনি গুর্ব্বোপিতা গুরুসেবা; কৃষ্ণের নিজের ভাষায় 'আমি বৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়, রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্মময়'! স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা নিয়ে যদি দাঁড়াতে হয় তাহলে নানা গুণ অর্জন করতেই হবে, ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র চলবার মোটামুটি যোগ্যতা রাখতেই হবে; প্রাণের স্নিগ্ধতা এবং বুদ্ধির দীপ্তি দুই-ই আয়ত্ত করতে হবে যদি নারীত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙ্গে মানুষ-নারী হতে হয়; শ্রীরাধা-জীবনের যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব তারও খোঁজ কমবেশী রাখতে হয়। ভোগ করবার চেতনা জীবনে মুখ্য হয়ে উঠলে কিংবা ঐকদেশিক গণ্ডীবুদ্ধি নিয়ে কখনও বৃহৎ জীবনের স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা লাভ করা যায় না।

নারীর নিজরূপ সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, '...বর্তমান ভারতের আবহাওয়া সকল দিক দিয়া নারীর ব্যক্তিত্বের শিক্ষা ও অধিকার দানের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে।...পুরুষেরা যদি পুরুষোত্তম হইতেন, শোষণের পথ ছাড়িয়া পোষণধর্মী হইতেন, নারীদের পক্ষ হইতে এ দাবী উঠিতই হইত না। কিন্তু যেখানে দর্শন, শাস্ত্র, সমাজ নারীর সহযোগে নারী-সমস্যার সমাধান করে নাই, নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিয়া শুধু পুরুষ-কৈন্দ্রিক সমাজই গড়িয়াছেন, সেখানে দুই একজন সৎ পুরুষ থাকিলেও সাধারণ পুরুষ কামেরী স্বার্থের গর্বে ও অহঙ্কারে নারীকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে। তাই আজ নারী-সমাজ ক্ষিপ্ত। নারীর অন্তরের মোহিনী কালী শক্তির উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যে সমাজকে বিপন্ন করিয়াই তুলিয়াছে।

কোথায় শিব, কোথায় পুরুষোত্তম যাহার বুকে দাঁড়াইয়া এই উদ্ধুঙ্খল শক্তি লজ্জায় জিভ কাটিবেন, শিবের বুকে শিবানীরূপে স্থিতিলাভ করিবেন? নারীর এই উদ্ধুঙ্খল নৃত্যের পরিচিতি দিক হইতেছে শিবের বুকে তাহার স্থির হইয়া দাঁড়ানো, সমাজ-কল্যাণে তাহার এই নৃত্যকে কাজে লাগানো, সার্থক রমণীত্বের সঙ্গে সার্থক জননীত্বের সমন্বয় বিধান করা। এ যুগের তরুণ এই রমণী-জননীর সমন্বয়ের বার্তাই পৌঁছয়াছেন.....পুরুষ বা নারী পলায়নপর (escapist) মনোবৃত্তি লইয়া কিছুতেই এককভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। আজ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে জীবন লাভ করিয়া কৃষ্ণ-ব্রহ্মচারী হইবার কৌশল শিখিতেই হইবে। নারী আজ সর্বক্ষেত্রে এমন কি মঠ মন্দিরেও পুরুষের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভারতবাসীরা জননী-উপাসনায় একান্তভাবে ভাবিত হইয়া আছি বলিয়াই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ এই রমণী-শক্তিকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেছি। তাই তাহাকে সামলাইতে পারিতেছি না।.....এই দুই দিকের আকর্ষণকে যে-নারী সমান মূল্য দিয়া সামলাইতে পারেন, তিনিই পরাশক্তির অংশ, সাক্ষাৎ দুর্গাস্বরূপিনী। একান্ত জননীও ব্যর্থ, একান্ত রমণীও ব্যর্থ; সার্থক নারী একাধারে জননী রমণী, রমণী জননী।...নারীর জননীত্বও যেমন তাহার স্ব-রূপ, রমণীত্বও তেমনি স্ব-রূপ—ইহার কোনও একটি না হইলে নারী আর অখণ্ড নারী থাকিবে না। স্বরূপচ্যুত নারী সমাজের পক্ষে এক মহা বিভীষিকা, তাহা সে রমণীই হউক বা জননীই হউক।

মদনকে মদন রাখিয়া অর্থাৎ তাহার উপর নিগ্রহ বা চাপ না দিয়া কিংবা কামোপভোগের প্রশ্রয় না দিয়া যিনি মদনকে মোহন করেন, তিনিই মদনমোহন। জীবের কাম একটা বিকার; ইহা জীবের সুস্থ অবস্থা নয়। জীবনে যখন সাম্যস্তরের (equilibrium) হানি ঘটে, তখন বিকৃত মনে কামের জন্ম হয়। জীবনে যখন মনের খেলা সুরু হয়, যখন জীবনে যৌগপদ্যজ্ঞানের (knowledge of simultaneity) অভাব হয়, যখন স্বরূপ ও বিশ্বরূপের—self life ও cosmic life-এর—যাহে সংঘর্ষ সুরু হয়, তখনই মনোজ কামের জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণতত্ত্বের দেবতা, তাই তিনি প্রাণ-বল্লভ। এই প্রাণের মধ্যেই রহিয়াছে মনের লয়, স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বয়। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ বলিয়াই মদনমোহন।...আজ নারীকে বিশ্বরূপা হইতে হইবে, স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বয় বিধান করিয়া, জননীত্ব ও রমণীত্বের সার্থক সমন্বয় করিয়া নারীকে পরাশক্তিরূপিনী হইতে হইবে। এই পরাশক্তিই শ্রীরাধা। সীতা যেখানে বার বার সতীত্ব-পরীক্ষায় তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইখানে—মনস্তত্ত্বের সেই স্তরেই শ্রীরাধা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন, শ্রীরাধা মদনমোহিনী; তাঁহাদের জীবনে কাম সুস্থ অবিকৃত, অমৃত। ব্রজের কাম অমৃতসংযুক্ত। ভারতীয় নারী-চরিত্রের শেষ চরিত্র শ্রীরাধা-চরিত্র। বর্তমান ভারতের নারীকুল চাহিতেছে এই শ্রীরাধারই পন্থা অনুসরণ করিতে; কিন্তু বিশ্বরূপ কই, পুরুষোত্তম কই যাহার অনুবর্তন করিলে তাহাদের এই ঘর-ছাড়া মনোবৃত্তি, উদ্দাম নৃত্য সুস্থ সমাজ সংগঠনে নিয়োজিত হইত? পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ইষ্ট থাকিলে তাহাদের এই ঘরছাড়া জীবন রমণীত্ব জননীত্বের সমন্বয় সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি ব্যাপারে সহায়তা করিত।.....রমণীত্বের পরাকাষ্ঠা জননীত্ব।...সার্থক রমণীত্বেরই সার্থক আস্বাদন জননীত্ব। রমণী-জীবনে যিনি সার্থক নন, জননী জীবনে তাঁহার ব্যর্থতা অনিবার্য।** নারীর ইতিহাসে প্রথমে রাধা চরিত্র, পরে সীতা চরিত্র। আমরা রাধাষ্টমী তিথিতে শ্রীরাধার আবির্ভাবকে সকল দেহ প্রাণ দিয়া বরণ করি।"

নারী-জীবন যৌবনত্ব কেমন করে হতে পারে তার স্পষ্ট রেখা উপরের লাইনগুলিতে পাওয়া যাবে। আজকের দিনে নারী-সমাজের সামনে তথা পুরুষেরও সামনে এই চিন্তাধারা উপস্থিত করতে পারলেই কেবলমাত্র প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থান ও মান বুঝে নিয়ে তারা সুস্থ হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-জীবনকে এই

বস্তুবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝে নিয়ে সমাজের সুস্থ হওয়ার পথের দিক্‌দর্শন রেখে গেছেন শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ। তাঁদের নবনারায়ণ আশ্রম তথা উদ্বোধন পত্রিকা এই চিন্তাধারা মানুষের কাছে উপস্থিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। ভাদ্র-অগ্রহায়ণের দুই সংখ্যাতে এই শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধার জীবন-তত্ত্ব আমরা আলোচনা করব।

ভারতবর্ষের সনাতন বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারা যেমন ঐক্যদেশীয়, তেমনই চারদিকে এই তাগুনের স্রোত বেয়ে যাচ্ছে, তেমনি এ তাগুন যদি ব্যক্তি ও সমাজকে দৈহিক মানসিক সুস্থতা ও কল্যাণ এনে না দেয় তাহলে এমন তাগুনও সেই ঐকদেশিকতা দোষেই দুষ্ট হয়ে পড়ে। তাগুন শব্দ বলে। দীর্ঘ প্রচলিত নীতি-বোধকে যদি ভাঙি তাহলে এমন কোন্ কল্যাণ আনতে পারলাম যাতে মুক্ত আকাশতলে সুস্থ মানুষ সমবেত হতে পারে, সে কথা অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। শোষণেরই রকমফের জীবন চালিয়ে কিংবা নিজেকে শোষকের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হতে দিয়ে—সনাতন চিন্তাধারাতেই মোটামুটি জীবন চালিয়ে—তারই অন্তর্গত নীতি-বোধকে ভাঙার অর্থ তো হয়ই না, কল্যাণ কিছু না এনে তা সমাজকে শুধু উচ্ছৃঙ্খলই করে। নারী যদি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন যাপন করতে চায়, তাহলে তার সামনে দৃষ্টান্ত ঐ শ্রীরাধা। প্রচলিত নিয়ম ভেঙে ছিলেন তিনি—সাদা চোখে সই করা স্বামীত্বকে মেনে নিয়ে তিনি জীবনকে বিড়ম্বিত করেন নি, কিন্তু তাঁদের মোহে পড়ে সংসারে নিজেকে ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হতে দেন নি—পুরুষোত্তমের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন পরম প্রেমে, পরম বৈরাগ্যে, নিজের অন্তরের ব্রহ্মত্বকে নিয়ে ব্রহ্ম-পুরুষোত্তমের মধ্যে লীন হয়েছিলেন।

"পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বের প্রতি স্তরে, প্রতি মতবাদে, ধর্মক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে রাসমণ্ডল-রচনার যে নিগূঢ় রহস্য গুপ্ত রহিয়াছে, পুরুষোত্তম তাহাই রাস-ক্রীড়ার ভিতর দিয়া বিশ্বের সামনে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বিশ্ব-রচনার ইহাই আশ্চর্য কৌশল যে, বিশ্বের স্পন্দনগুলি প্রত্যেকেই স্বয়ংপূর্ণ, এবং তাহারা এতই বিলক্ষণ যে উহাদের মধ্যে কোন যোগসূত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যোগসূত্র খুঁজিয়া না পাওয়ার কারণও হইতেছে এই যে, দুইটী স্পন্দনের ফাঁকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন বিরাট বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর। অথচ যোগেশ্বর এমন 'বিলক্ষণ' স্পন্দনগুলিকেও কণ্ঠে কণ্ঠে গ্রন্থন করিয়া সংহত, সংযত করিয়া রহিয়াছেন। ইহাই রাসবিহারীর রাসমণ্ডলরচনা ও রাসবিহারের কৌশল। দুইটী দেহ সম্পূর্ণই বিলক্ষণ, অথচ দুয়ের ফাঁকে দাঁড়ানো বিশ্বরূপধারী তাহারা গৃহীতকণ্ঠ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৬৭)

ঠাকুর, তোমার জন্মস্থলী পানিহাটির ব্রহ্ম-রজঃ স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য দিয়াছ, ধন্য হইয়াছি। তোমার সেই ব্রহ্ম-ঘন রস আস্বাদন করিবার, বিশ্বকে আস্বাদন করাইবার মত শক্তি আমাদের দাও। নইলে কলঙ্ক যে বড় আমাদের। তোমার মত এমন মানুষ পাইয়া আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না, ইহাই সকলে বলে। সত্যই তো। আমরা কত অপদার্থ! আমিও তো উহাদের মত নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিতাম। আমার পাগল করিলে, অথচ ধনজন আমার নাই। ঠাকুর আমার, স্বামী আমার, আমাকে তোমার মত বল দেও। এই যে বস্তু তুমি লইয়া আসিলে সেই বস্তুর পরিচিত হইবার শক্তিও তো সেই বস্তুর অন্তরে রহিয়াছে কেন তেমন করিয়া গর্জন করিতে পারিতেছি না! বুকের মধ্যে যে গর্জন করিবার মত একটা শক্তি টের পাই: ঠাকুর, সে যে আমায় বড়ই তাড়না করে। আমাকে বড় বড়াইবার মত শক্তি দেও যেমন একদিন রাজনীতিতে বড় বড়াইয়াছিলাম। তোমার জয় হউক। গত কলাকার সভাপতি 'ওঁ নমো ভগবতে নিতাগোপালায়' বলিয়া তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মাইক নিবার উপযোগিতা আছে, দূর হইতেও মানুষ শোনে, দূরের মানুষও টের পায়। এই সম্প্রদায়ে এমন কেউ নাই যাহাকে সকলে মান্য করে। বেলুর মঠে 'একনায়কত্ব' আর এখানে 'সর্বনায়কত্ব', এখানে সকলেই 'কেবল'। এত 'কেবল' যদি সেবাপরায়ণ না হয়, ভক্ত না হয়, তবে দলাদলি হইবে কি করিয়া, কাজই বা হইবে কি করিয়া? এই যে পানিহাটিতে এতগুলি মানুষ গেল, কোনও রকমের শৃঙ্খলা মাতামাতের কি ছিল? যে যাহার মত গিয়াছে ও আসিয়াছে। ঠাকুর, আমায় সেবা করিবার বড় লোভ ছিল। আমাকে তেমন করিয়া গড়িয়া তোল যাহাতে আমি সকলকে মানাইতে পারি, সংযত করিতে পারি, সকল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটা একতানতা স্থাপন করিতে পারি। আজ কোমরের নীচের অংশে খুব বেদনা। ঠাকুর আমাদের অবিদ্যা-আয়গা, টাকাকড়ি এবং বিদ্যা—তাঁহার তত্ত্ব সমন্বিত লেখা—রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি এই তত্ত্ব বিশ্বময় পৌঁছাইতে না পারি, we will be taken to task। আজই লোকে চৈকিৎস চায়। এমন বস্তু আছে অথচ আমরা নিষ্ক্রিয়। প্রায় ৯টায় ঘিবি ....

২১শে জুন

ঠাকুর, যে 'মাল' তুমি আমাদের কাছে রাখিয়া গিয়াছ, আমরা তাহার যোগ্য নই। অথচ যোগ্য না হইলে তাহার এয়ারিশ তো থাকিতে পারিব না, অন্যে তাহা কাড়িয়া লইবে। কি অপমান, কি লজ্জা আমাদের। আমাকে যোগ্য করিয়া তোল। তোমার ছাঁচে গড়িয়া তোল যেন আমার মুখ দেখিয়া তোমাকে সকলে চিনিতে পারে। তোমার একজন যোগ্য প্রতিনিধি না হইলে কাহার কথা বিশ্ব শুনিবে, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা শুনিবে?...আমার মাধ্যমে তোমার তত্ত্ব বিশ্বময় প্রচার কর। আমি মুছিয়া যাই, তুমি থাক আমার দেহমন প্রাণ ছড়াইয়া। তোমার প্রকাশ আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমিয়া উঠুক। তুমি ছাড়া কে এই তত্ত্ব বহিবে? আমাকে তোমার তুমি করিয়া লও। আমার স্থানে তুমি থাক। হরিদাসী কয়েকটী আম, একটী আনারস ও মিষ্টি পাঠাইয়া দেয়।...নীলুর নিকট ২০ টাকা মীমার

বিবাহ বাবদ আশীর্বাদী পাঠান হয় M. O যোগে। একটার পর মঠে যাই তারিণীবাবু পানিহাটী হইতে আসিয়াছে। পানিহাটী মঠে কাহাকে রাখা যায়? এক সন্ন্যাসী। কেহ এখান হইতে যাইতে চাহে না। এখানের মঠবাসীগণ এমন এক উন্মাদনার ভিতর দিয়া চলিতেছে যে মঠের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সাধারণ নীতিবোধ পর্যন্ত নাই। যে যাহা পায় তাহা নিতেও কেহ কুণ্ঠিত নয়। ঠাকুরের কোন প্রসঙ্গ নাই, ঠাকুরের গ্রন্থ কেহ পড়ে না। পড়িবার চেষ্টাও কেহ করে না। সাধন ভজনের বালাই নাই নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপন করে। বড় জোর লাগে তাহারা মঠের কি হইবে? না আছে জ্ঞানের পিপাসা, না ভক্তির আচরণ, না আছে কর্মের প্রেরণা। একেবারে জড় পিণ্ড, শুধু ভোগবাসনা বিলবিল করিতেছে। ঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর। সেবা বুদ্ধি কাহারও নাই। কোথায় ঠাকুর? যে যাহার ক্ষুদ্র প্রয়োজন লইয়া মশগুল। ৮।। টার পর ফিরি। কাহারও ঠাকুরের অন্নস্থানের উপর আসক্তি নাই। বর্ষাপের সেই বাবাজী যাহার সামনে রাধারাণী প্রকট হইয়া ছিলেন, তাঁহার কথা রমাপতিবাবু ও নীলরতনবাবুর কাছে করি।

২২শে জুন

ঠাকুর, তোমার 'পয় বৈরাগ্য' কে বুঝিবে? একটি পয়সা দেখিলে যেখানে হাত সুড়সুড় করে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের হাত বাঁকাইয়া যায়, যে মেয়েমানুষের টাঁনে পুরুষ ব্যক্তিবাস্ত, নাজেহাল, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এক শয্যায় নিজ স্ত্রীকে লইয়াও ভোগ করিলেন না—বৈরাগ্যের এই জাঁবাল দৃষ্টান্ত মানুষকে মুগ্ধ করে, স্তম্ভিত করে। ইহা মানুষ বোঝে। কিন্তু এখানেও যে কাঞ্চন-নীতি আছে, কামিনী-নীতি আছে এবং নীতি যেখানে আছে সে জীবন যে সহজ নয়, তাহা বুঝিবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি কয়জনের আছে? প্রচলিত বৈরাগ্যের পর তোমার বৈরাগ্য, যে বৈরাগ্য ভোগের মাঝে জমিয়া উঠে। কিন্তু তোমায় নাম করিয়া যাহারা বৈরাগী হইল, তাহারা যে ভোগের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিল। তোমার দৃষ্টান্ত তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। তাহাদের ট্যাঁকে টাকা আছে, কিন্তু সমাধি নাই? কোমরের কাপড় খসে না, কিন্তু ভাব মহাভাব নাই? ইহারা কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে ভীতিহীন, দুঃসাহসিক। সাধারণ নীতিবোধও নাই। ঠাকুর, আমাদের রক্ষা কর। বেলু ১-৫০-এ বাহির হইয়া মহেশ লাইব্রেরী, ভারতী বুক ষ্টল ...মঠে যাই।... না পাইয়া ঐ দশ স্থানে বই দিয়া রাইটার্স বিল্ডিংএ যাই, পরে যুগান্তর, আনন্দবাজার, বসুমতীতে পানিহাটি সভার রিপোর্ট দিয়া ফেরে ৮ টার পর।...সব মিলিয়া যখন মঠের মূল ভিত্তিকেই নষ্ট করিতেছে, তখন যাহারা ইহার সংস্কারকামী তাহাদের কি রকম চলা উচিত, সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয় তারিণীবাবুর সঙ্গে। বিরোধ আমি কাহারও সহিত করিতে বলি না। কিন্তু non-violent non co-operation করা চাই, যেমন অসহযোগের প্রতি বিন্দুমাত্র ত্রুটি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দৃঢ়তা থাকিবে, ত্রুটি করিবার সামর্থ্যও থাকা চাই।

২৩শে জুন

ঠাকুর, বিপদের কটিকা যদি স্বর্গ মর্ত্য ছিন্ন ভিন্ন করে, সখার মুখজ্যোতিঃ আমাকে পথ দেখাইয়া চলিবে। যাহারা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত এই সাগরের মাঝে তোমাকে বুকে করিয়াই আমি শঙ্কিত হৃদয়ে অচকল চরণ বিক্ষেপে নূতন সৃষ্টির পথ করিয়া চলিব। কেউ দেখিবে না, কেউ শুনিবে না—তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। তুমিই আমার ক্ষতবিক্ষত এই দেহ প্রাণ মনের পরম স্থান। তোমার পায়ের কাছে নিজকে ফেলিয়া রাখিলাম। ওগো বর্তমান যুগস্রষ্টা, এক-বিশ্ব-রচয়িতা, পুরাতনকে ভাঙিয়া নূতনকে গড়িয়া তুলিবার উপযোগী বীর্য আমাকে দেও, সুযোগ দেও। তোমাকে, তোমার বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার সৌভাগ্য আমার হউক—তোমার জয় হউক। বেলু ১১টার পর রিক্সায় জেনারেল প্রিন্টার্স-এর জন্য বই নিয়া ৩ নং বাসে সেখানে গিয়া বই দিয়া রাইটার্স বিল্ডিংস হইতে ৮৩ টাকার চেক নেয়, পরে ডাক্তার মুখার্জীর কাছে ইনজেকসন নেয়। ফেরে প্রায় ৫টায়। আমি ও প্রতিভা মঠের জন্য রওয়ানা হই।... ইন্দুমতীর মেয়ে কমলা আমার উপর অভিযোগ করিল। তাহার বাবা নাকি এখানে

নরনারায়ণ কেমিক্যালে কাজ করিতে আসিয়া মর্যাদা টাকা কিছুই পায় নাই। মনে ঠিক কিছু নাই। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, জীবনে জ্ঞাতসারে কাহারও মর্যাদা হানি করি নাই, আর কাহাকেও এক পয়সা হইতে বঞ্চিত করি নাই। বরং জীবন জয়া ঠকিয়াছিই। ঠকাইতে কাহাকেও পারি নাই। অভিযুক্ত হইবার কপাল, অভিযুক্ত হইয়াই গেলাম। ইন্দুমতী নিশ্চয়ই আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য অনেক করিয়াছে। শতবার্ষিকীর টিনের delivery লইবার চিঠি আসিয়াছে। মঠের মূল ভিত্তিই বানচাল হইয়াছে। পরস্পরের অতীত ত্রুটি কীর্তন করিয়া ইহারা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। কেহ নূতন করিয়া ভাবনা হইতে চায় না। 'অবিদ্যা অনাদি, কিন্তু বিনাশ্য'—ইহা স্মরণ করিলে আজ হইতেই অতীত-নিরপেক্ষ নূতন জীবন আরম্ভ করা যায়—ইহা অমূল্য চৌধুরী প্রভৃতিদের সামনে আজ সন্ধ্যার পর বলি। পেটটা ভাল যাইতেছে না।

২৪শে জুন

ঠাকুর, তুমি শুনাইয়া গিয়াছ, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। আমি সকল ধর্ম ও অধর্মের বন্ধন ত্যাগ করিয়া অবধূত হইয়া, নিরাবরণ হইয়া, নিরন্বর হইয়া তোমার শরণ নিব—ইহাই আমার সারা জীবনের সাধ। তুমি আমার বস্ত্র অপহরণ কর, ওগো বসনচোর। আমি সর্বতোভাবে তোমার হইব, নইলে তোমাকে প্রচার করিব কি করিয়া? তোমার 'স্ব' হইব, তবে না স্বপ্রকাশ তুমি আমার সকল 'স্ব' ব্যাপিয়া প্রকাশিত হইবে? আমার দেহ তোমার স্ব দেহ হউক, আমার প্রাণ তোমার স্ব প্রাণ হউক, আমার মন তোমার স্ব মন হউক, আমার বিজ্ঞান তোমার স্ব বিজ্ঞান হউক, আমার আনন্দ তোমার স্ব আনন্দ হউক। আমি তোমার আমি বনিয়া যাই।.. যতীনবাবু 'সমন্বয়-মূর্তি নিতাগোপাল' পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছেন এবং ১৩৫৮ সনের ভাদ্র মাসের 'উদ্ভাস ভারত' চাহিয়াছেন। নগেনবাবু বৈশাখ মাসের ধীরেনবাবুর 'শ্রীনিতাগোপাল ও সর্বপথের সমন্বয়' প্রবন্ধ পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, ধীরেন বাবুকে ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য আমার মাধ্যমে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমি এটার মঠের জন্য হওয়ানা হই। মঠে পৌঁছিতেই খুব বৃষ্টি নামে।...অমূল্য চৌধুরীর সঙ্গে কি গোলমাল হইবার জন্য তাহাকে মঠ ছাড়িতে হয়, তাহা নীলরতনবাবুর নিকট শুনি। মঠের পূর্বের ইতিহাস অবগত হই। সে তুলনায় এখন অনেক ভাল হইয়াছে। — গত শনিবার মঠে আসিয়াছিল। সে নাকি পাণিহাটী যাইবার জন্য আসিয়াছিল। তাহাকে নাকি কেহ বলে নাই বলিয়া পাণিহাটী যায় নাই। ইহার অর্থ কি? তাহাদিগের নামে চিঠি গিয়াছে। জনে জনে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে? আমি তো বারান্দায় বসিয়াছিলাম। সে কি আমার সঙ্গে একবার দেখাও করিল? তারিণী বাবুকে 'অসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা'—ইহা স্মরণ করিবার জন্য বলি। দাশরথিরা আজ বৈকালে মঠে আসেন।...

২৫শে জুন

নিতাগোপাল, জগন্নাথ, আমার প্রাণনাথ, আমার প্রাণ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ুক, আমি বিশ্বাত্মা হইয়া তোমাকে আমার হৃদয়ে ধারণ করিব। আমার সকল পরিচ্ছিন্নতা, সকল উপাধি, সকল সংস্কার, সব ক্ষুদ্রতা মুছিয়া যাউক, তোমার বিশ্বরূপ আমি-তে পড়িয়া উঠিব। বিপদের যবনিকা যদি স্বর্গবর্তা ছিন্ন ভিন্ন করে, আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব। কবে তুমি আসিবে আমার প্রাণ-পথ বহিয়া ওগো প্রাণেশ্বর। 'মুষোদি অস্মৎ জুহুরাণম্ এন'। সকল ছোট হওয়ার পাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর।...৪॥ টায় সভার কার্য আরম্ভ হয়। আগামী বৎসরের কার্যক্রম করার জন্য আমি কিছু বলিলে দাশরথিবাবু আমাকে অনেক অভিযোগ করেন—আমি প্রতিশ্রুতির বক্তৃতা দিবার সুযোগ দেই নাই, বেণু মিত্রের নামে বই ছাপাইয়াছি, পুরুষোত্তমানন্দের নামের সঙ্গে সঙ্গে (বঙ্কিমলালের শরৎ ঘোষ) লিখি, ব্রাহ্মণ-কৌলীন্যের বিরুদ্ধে প্রচার করি, এই আলোচনার জন্য তাঁহাকে দারহাট্টায় অনেক কথা শুনিতে হয়। ইহার পর চিদানন্দ, মুরলী ধর, বেণু সোম, পার্বতীবাবু, অমূল্য চৌধুরী সকলেই একসঙ্গে আক্রমণ করে। আমি নাকি বলিয়াছি যে, কমিটি বলিতে আমি, তারিণীবাবু ও চিদানন্দ—ইহাও দাশরথিবাবুর অভিযোগ। রসজিৎবাবুও বলেন যে ইহা পূর্ব-পরিকল্পিত

ষড়যন্ত্র। আমার resign দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই—ইহা বলিলাম। যাহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নাই, তাহা দ্বারা কাজ হয় না। আইন-ঘটিত খুঁটিনাটি লইয়া চলাও আমার পক্ষে অসম্ভব। যেখানে 'প্রাণ' বলিয়া কিছু ছিল না, সেখানে মরিয়া মরিয়া কাজ করিব কি করিয়া? ৮৮টায় বওয়ানা হইয়া আসি। যেখানে চিদানন্দের সঙ্গে এত বিরোধ সেখানে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়—ইহাও বলিয়াছি।

২৮শে জুন

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া তো আগাইতে পারিতেছি না। তোমার মঠের লোকেরা কি বাধাই না দিতেছে। আমাকে দিয়া তো উহাদের সকলেরই অসুবিধা হইতেছে আমি কি করিব? যে ভাবে উহারা আক্রমণ করিল, তাহাতে কি আমার কোনও কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভবপর? কাহাদের নিয়া কাজ করিব? উহারা তো তোমাকে চায় না। যে যাহার মতলব হাসিলের জন্য ঘাঁটিয়া আছে। দল পাকাইয়া এইরূপ হীন আক্রমণাত্মক অভিযোগের ভিতর কি কাজ করা যায়? আমার সরিয়া পড়া ছাড়া গতি কি? শ্রদ্ধা তো আর জোর করিয়া আদায় করা যায় না। আমার উপর শ্রদ্ধা তো নাই—আমার দোষেই হউক আর উহাদের দোষেই হউক। শ্রদ্ধা না থাকিলে কাজ হয় না। ঠাকুর, পারিলাম না, আমারা হইল না। বড় সাধ করিয়া তোমার সেবা করিতে গিয়াছিলাম। ক্ষমা করিও। উহাদের মানাইয়া কাজ করিবার মত যোগ্য যদি হয়, সেইদিন কাজ হইবে। আজ যেন কতকটা ছুটির আনন্দ ভোগ করিতেছিলাম। ঠাকুর, আমাকে ছুটি দেও, আমার মত এমন কম-জোর মানুষ দিয়া বর্তমান সংসারে কোন কাজ হইবার নয়। বেলা ২টায় তারিণীবাবু আসেন। কি করা উচিত আলোচনা হয়। রাগদ্বেষের কথা তুলিব না। কিন্তু চিদানন্দ ও তাহার সঙ্গীদের নিয়া কি কাজ করা যাইবে। কার্যকরী সমিতির সহিত এত পরামর্শ করিয়া কি এই নূতন ক্ষেত্রে কাজ করা যায়? শ্রীনিত্যগোপাল বাংলাদেশে একেবারেই নূতন। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে বড় রকমের activity সৃষ্টি বা বরদাস্ত করিতে পারে? অসম্ভব। কোনও constitutional activity দ্বারা বিপ্লব সৃষ্টি করা যায় না। অথচ বিপ্লব ছাড়া নিত্যগোপালকে প্রচার করা যাইবে না। বিপ্লবের force একটী মানুষের মধ্যেও নাই। এত কমিটী আমি বুঝি না। আমি রাজমার্গের লোক। বিধিমার্গ আমার কংগ্রেসের কাজেও ছিল না। সেখানেও দুষ্টদের জয় হইয়াছে, তাহারাও ডুবিয়াছে, আমাদেরও ডুবাইয়াছিল। এখানেও কি তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে? তুমি জান। বৈকালে ছাত্র নগেন মুখার্জী ও ছাত্র জিতেন গাঙ্গুলী ও তাহার এক বন্ধু আসে। জিতেন 'নিত্যগোপাল—দর্শনে ও জীবনে' নেয়। ঠাকুরের দর্শন আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের কিছু লেখা (ভড়াভড় সময়ের সহচারী) 'স্বাধীনতা ও হিন্দুধর্ম' পুস্তক হইতে পড়া হয়। আজ আর মঠে যাই না।

২৭শে জুন

ঠাকুর, তোমার শততম জন্মোৎসবের মাধ্যমে তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য কি করিয়াছি, কি না করিয়াছি তুমিই তাহার সাক্ষী। আমার এই ভাঙ্গা দেহ, অতিরিক্ত প্রাণ লইয়া যতদূর পারা উচিত, বোধহয় তাহারও বেশী করিয়াছি। কিন্তু শেষ রক্ষা তো হইল না। বাধা আসিল তোমার জনদের হাত হইতে গত শনিবারের সভায় কুরুসভায় দ্রৌপদীর মত আমি লাঞ্ছিত হইয়াছি। কি আমি করিতে পারি? আমি কি কাহারও প্রাপ্য সম্মান মর্যাদা কর্মক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়াছি? আমি কি কাহারও সুযোগ ছিনাইয়া লইয়াছি? কেউ তো যোগ্য হইবার জন্য ব্যাকুল নয়। সকলেই অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র। আমি হাঁপাইয়া উঠিয়াছি। আমাকে মুক্তি দেও এই আবেষ্টন হইতে। নহিলে এ আবেষ্টন ঘুচাইয়া দেও। এমন করিয়া লজ্জিত হইয়া কি কাজ করা যায়, না কাজ হয়?...বেশ, তুমি ঘুমাইয়া থাক। আমার যেটুকু আয়ু ও বল আছে, তাহা তোমার সেবায় নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছিলাম। আর বোধহয় দেবা নিবে না। ইহাদের লইয়াই তুমি থাক।... বাহির হইলে আর ঢোকা যায় না, আর আমারও করণীয়

কিছু থাকে না। তাই সকল অপমান বরণ করিয়াও কাজ করা যায় কি না, কাজ করা উচিত কি না—তাহাই আজ সারাদিন ভাবি। তাঁহার কাজ যদি হয়, তবে অপমান বরণ করিতে অপমান কি? কিন্তু তাহাতে কি কাজ হইবে? ইহারা কি কাজ করিতে দিবে? পরিত্যাগ না করিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্য করা ভাল মনে হয়। দেখা যাক, ঘটনার গতি কোন্ দিকে যায়। মহানির্বাণ মঠ তো আর কোনও public organisation নয় যে, যে যাহা খুসি তথায় করিতে পারিবে।

২৮শে জুন

ঠাকুর, রুদ্র তুমি। তুমি কি রুদ্র রূপে প্রকট হইলে তোমার মঠে? তোমার রুদ্ররূপ মঠের সকল মলিনতা পুড়িয়া ফেলুক, সকল দুর্বুদ্ধির অবসান ঘটাক, মঠ তোমার ছাঁচে গড়িয়া উঠুক। বড় সাধ ছিল তোমার দর্শন ও কীর্তন লইয়া নিরাপদ অভিযান করিব। তাহা তো হইল না। পথ কি নিষ্কণ্টক হইবে না? আমাকে পথ কাটিয়া বাহির হইবার মত শক্তি দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও সব কাজ কি পণ্ড হইবে? আর কি অগ্রসর হওয়া যাইবে না? এ কি রহস্য? যাহার কথার অভাব নাই, যিনি এত কথা লিখিয়া গেলেন, তাঁহার কথা মানুষের কাছে পৌঁছাইবার পথে এত বাধা! তুমি কি সত্যই কাঁথা বুড়ি দিয়া আমাকে থাকিবে? আমায় বুঝাইয়া দেও। তুমি তো বলিয়াছ—'শরৎ, তোমার যখন যাহা দরকার ভগবান অন্তর্যামীরূপে তাহা বুঝাইয়া দেন'। আমাকে বুঝাইয়া দেও—পথ কি, কি আমার বর্তমানে করণীয়? গোঁজামিল, জোড়াতালি দিয়া কি কাজ হয়? ঠাকুর, ঠাকুর, পথ দেখাও।...পাণিহাটী হইতে যতীন মজুমদার এক চিঠি দেয়। পাণিহাটি মঠে একজন ব্রহ্মচারীর থাকা ও ছোট একটি গ্রন্থাগার রাখার বিষয়ে। 'সমন্বয়মূর্তি নিত্যগোপাল' ও খানি পাঠাইতে লিখিয়াছে। বিক্রয় হইলে দাম দিবে। সেখানে মঠি মেয়ের ঝগড়ায় সে স্থানের আবহাওয়া মলিন। আমার পাণিহাটি গিয়া মাসেক খানেকের জন্য থাকার কথা মনে হইতেছিল। ইহাতে কলিকাতা মঠে না যাতায়াত করিয়াও শক্তসামর্থ্য লইয়া থাকা হয়। ইহা intensive work এইভাবে ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে থাকা দুই-ই হয়। শরীরের বর্তমান অবস্থার দিকে চাহিয়া মন এক একবার অগ্রসর হয় না। দেহের ছোটখাট প্রয়োজন যে অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। তবুও যাইব প্রয়োজন হইলে। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। দেখি, আরও আলোচনা করিয়া।...সব পত্রিকাগুলিতেই পাণিহাটীর সভার বিবরণ বাহির হইয়াছে। শান্তশীল দাশ এক পত্র দিয়াছে।

২৯শে জুন

আমার পথের সম্বল তুমি নিত্যগোপাল। আমার সমস্যাসঙ্কুল জীবনের সমাধান তুমি। নদী যখন সাগরে যুক্ত, বন্ধুবান্ধব যখন যুক্ত বন্ধুর সঙ্গে যুক্ত, তখন নদীর ও বন্ধু বান্ধুর নিজের সকল সমস্যার সমাধান। নদী-সাগরের পুণ্যতীর্থেই সকল সমস্যার উদ্ভব। তাই আমি তোমার সঙ্গে যুক্ত হইব। এই যুক্ততা যতখানি গভীর ও ব্যাপক হইতে পারে, ততখানি গভীরতা ও ব্যাপকতা লইয়াই আমি যুক্ত হইব। যুক্ততার যত অর্থ হইতে পারে, তত অর্থেই আমি তোমার সঙ্গে যুক্ত হইব। ইহাতেই আমার ও তোমার পরিপূর্ণ সার্থকতা। আমি পথ বাহিয়া চলিয়াছি, তুমিই আমার পথের সম্বল। আমার বুদ্ধি তুমি, সকলই তুমি ...প্রস্তুতা ঘাটার পর মঠে যায়। মঠে সেবানন্দ ও ডাক্তার সুধাংশুর সঙ্গে কথা হয়। সেবানন্দ বলিয়াছে যে, শনিবার যে ঘটনা ঘটিয়াছে, চিদানন্দ তাহার জন্য অনুতপ্ত। এতটা হইবে এবং হারাধনবাবু তাহা প্রকাশ্যে আলোচনা করিবেন, ইহা সে ভাবে নাই। সে ক্ষমা চাহিবে কাকা মহারাজের নিকট। চিদানন্দ সকালে আসিয়াছিল আগামী শনিবার সভার সভ্য হিসাবে আমার দস্তখত নিতে। দস্তখত দিয়া দিই। গত শনিবারের বিবরণীর ভাষা ঠিক হয় নাই, তাই উহা রাখিয়া দিয়াছি। মঠের গুরুভাইরা, রণজিৎবাবুরা আমার জন্য বেদনা বোধ করিতেছে। কাজটা যে গর্হিত হইয়াছে, তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়ে যায় কাহারে'। মঠের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিবার ইহা প্রথম ধাপও হইতে পারে। ঠাকুর, তুমি যে বলিয়াছিলে,

'শরৎ মনোহরপুকুরে আসিয়া থাকুক', ইহা কি তাহার পূর্বাভাস? জানিনা কি করিবে। আমি তো যাইবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যেরকম করিয়া গেলে যাওয়া হয়, সে রকম করিয়া না গেলে কি কাজ করিতে পারিব? তারিণীবাবু ৮টার পর আসেন। —এর ফলকে এখানে স্থায়ীভাবে কিছু করিতে দেওয়া হইবে না দেখে উহারা এমন শক্ত হইয়া বসিবে যে, উহাদের লইয়া সমস্যার পর সমস্যার উদ্ভব হইবে। ৯টার পর তারিণীবাবু যান। চিদানন্দ তারিণীবাবুর নিকটও কথা প্রার্থনার কথা বলিয়াছে। সুবর্ণনের সম্পাদক শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ তাহের সংখ্যায় ছাপাইবার জন্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

৩০শে জুন

ঠাকুর, আমার প্রকৃতি সামনে না-আগাইবার। পিছনে থাকিবার। বক্তৃতা দিতে গিয়া এখনও চোখ বুজিয়া থাকি। তুমি এই ঘরের কোণের মানুষটীকে রাস্তায় বাহির করিয়াছ, পথের মাঝখানে 'হাঁড় করাইয়া দিয়াছ। রাস্তায় আমার লাঞ্ছনার সীমা নাই। মানুষকে ভালবাসিতে চাহিয়াছি। মানুষ আঘাত করে নাই। তবুও বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। বুদ্ধি আমার তেমন নাই। ছিল একটু হৃদয়। তাহা মানুষকে বুঝাইতে পারি নাই। অভিসন্ধি আমার ছিল না, আজও নাই। অকপটে সর্বস্ব পণ করিয়া শুধু সেবাই করিয়াছি। বরিশালে সতীনবাবুরা লাঞ্ছনা করিয়াছে। মঠে এই সেদিন শনিবার লাঞ্ছনা করিল ধীরেশবাবু-চিদানন্দ প্রভৃতি। তোমার সেবা পরিপাটিরূপে করা ছাড়া আমার বুদ্ধির কোণায় আর কি ছিল ঠাকুর? আমি কি আমার সুখ-সুবিধার কথা ভাবিয়াছি? আমি কি কাহারও সুযোগ কাড়িয়া লইয়াছি? মানুষকে সুযোগ দিবার জন্যই তো মানুষের কাছে অপমানিত হইলাম। যাহা হয় তুমি কর, লাঞ্ছিতের বন্ধু। যে প্রকৃতির অন্তরে বাহিরে পথ রুদ্ধ, তিনিই শ্রীরাধা পথা প্রকৃতি। শ্রীরাধা-জীবনে রুদ্ধ শুধু লঙ্ঘন করিবার বস্তু নয়। রুদ্ধ-বস্তু সেখানে অন্তরে বাহিরে। সেই রাধারাণী আমার পরাণপুতলী। শ্রীরাধাই আমার শ্রীনিত্যগোপাল। ৭টার পর কিতীশ চক্রবর্তী আসে। তাহার সঙ্গে গত শনিবারের সভার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কিতীশ আমার কথার মর্যাদা দেয়। নীলু ১২ টাকা M. O. যোগে পাঠায়—৯ টাকা মীরার বিবাহ উপলক্ষে প্রণামী, ৩ টাকা মাসুর।...

১লা জুলাই

ঠাকুর, আমার, প্রাণনাথ আমার, তুমি আজ রথযাত্রার বাহির হইয়াছ বিশ্বের ক্ষেত্রকে পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য সাম্যমৈত্রীর মূর্ত বিগ্রহ তোমার জীবন। মানুষে মানুষে জাতির ভেদ, বর্ণ ভেদ, কুলের ভেদ ভাঙ্গিয়া এক ক্ষেত্রে তুমি দাঁড় করাইয়াছ। তোমার শ্রীচরণ-তলে অন্নের বিচার নাই। মানুষের অন্ন মানুষ গ্রহণ করিবে, কোলাকুলি করিবে, অন্নক্ষেত্রে এক মহান সাম্যভাব গড়িয়া তুলিবে। রথে এক অচল জগন্নাথ। আর পথে সচল জগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দররূপ। সেও তো তুমিই। ওগো অচল সচল জগন্নাথ, তুমিই আমার প্রাণরূপ। তোমার পরশে বিশ্ব ব্রহ্মানন্দে গড়িয়া উঠুক। ধরার জ্বালা জুড়াইয়া যাক তোমার রথযাত্রা সফল হউক ...চিদানন্দ আসে। আমি তাহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, তাহার ত্রুটিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করি নাই (কাহারও করি না), তাহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের, কত দিনের, আমার পুরুষ-শিষ্য সেদিন থাকিলে তাহারা মারামারি করিত, অথচ তাহারা গুরু-ভাইয়ের শিষ্য হইয়া চুপ করিয়া আমার অপমান চোখের উপর দেখিল! আমি খুব মর্মাহত হইয়াছি তাহার এই ব্যবহারের জন্য—ইত্যাদি বলি। চিদানন্দ ৮টার পর আসে মঠ হইতে। আমি কমিটীর মধ্যে না থাকিয়া বাহির হইতে যাহা পারি করি, ওখানে আমার মাত্র তিন জন—তারিণীবাবু, নীলরতনবাবু ও কিতীশবাবু (উহারা নাকি বলে ২॥ জন), আর সব অল্পাধিক পরিমাণে আমার বিপক্ষ। সমস্ত মঠ আমার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। বিজ্ঞানানন্দ আসিয়াছে, পরামর্শ হইবে ইত্যাদি।

সেবানন্দ আমাকে কালবাদে তাই ছুটিয়া আসিয়াছে আমাকে খবর দিতে। চিদানন্দ এখান হইতে গিয়া এখানের আলোচনা ওখানে করিয়াছে। ঠাকুর, তুমি স্বপ্নে বলিয়াছিলে, 'ধরং মনোহরপুকুরে এসে থাকুন'—এই কি মনোহরপুকুরে থাকার পথ? 'কর কি টেনে তুলব' বাণী সম্বল করিয়া চলিয়াছি। সেবা করিতে চাহিয়াছিলাম, পারিলাম না হয়তো। সকলের সব কৌলীন্যে আঘাত পড়িয়াছে, তাই গর্জন করিয়া উঠিতেছে। ঠকবা তোমার কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়ে যায় তাহারে!...

২৩শে জুলাই

ঠাকুর, তোমার আহ্বান মনে করিয়া মহানির্বাণ মঠে গিয়াছিলাম তোমার পত্রবাহিকীর সেবা করিবার জন্য। তুমি বিপ্লবমূর্তি। তোমার এই বিপ্লবকে ছড়াইয়া দিতে যাওয়ায় ইহারা মারমুখী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে, সব নোংরামি উথলিয়া উঠিয়াছে। আমার ধন নাই, জন নাই, একা অসহায়। কেমন করিয়া সেবা করিব? ইহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব? শুনিলাম সমস্ত মঠ (নবদ্বীপ, নলহাটী ও কালনা) নাকি একত্রিত হইয়াছে আমার বিরুদ্ধে। ইহা ঠেলিয়া কি আমি পারিব? সারা জীবন তুমি আগলাইয়াছ, আজও তোমার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তোমার কর্ম তোমার থাকুক; আমাকে ছুটি দেও। তোমার প্রতিষ্ঠা যাহাকে দিয়া হয় গড়িয়া তোল। আমি তো কোনও দিনই কিছুতেই জোর খাটাইয়া যাইতে চাহি নাই। ডাকিয়াছিল গিয়াছি। বহুবার দুইবার তোমার মঠে যাইতাম। তুমি জান। যাহা হয় করিও। ৭টার পর তারিণীবাবু আসেন, রসিদ বইগুলি ও টাকা লইয়া যান। কিছু পরে রেণুটামের মাসিক টিকিট কিনিয়া মঠে গিয়া চিদানন্দকে সব বুঝাইয়া দেয়। সম্পাদকের নামে এক চিঠি দিলাম—'নারায়ণেষু, অদ্যকার কার্যকরী সমিতির সভায় উপস্থিত হইতে না পারার জন্য বেদনা বোধ করিতেছি'। সন্ধ্যায় কিছু পূর্বে বিমলা আসে। তাহার ভিতর একটা উদ্বাস্তা ছিল যাহা গোবিন্দের সেবায় লাগিলে সার্থক হইত। বিমলা ৪ টাকা দিয়া যায়। সন্ধ্যার কিছু পরে ধীরেনবাবু আসেন। 'It is as true to say'—ইহার অর্থ তিনি জানিতে চাহেন। ব্যাখ্যা করি। নগেন প্রামাণিকের চিঠি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাই। বিদায় না লইতে তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহাকে একখানি 'নিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' দেই।...মঠের সভায় কি হইল তাহা জানিলাম না। কে আমাকে জানাইবে? কে আছে আমার?

৩রা জুলাই

রাধারাণী, তুমি অযাচিত করুণায় আমার জীবনে আসিয়াছিলে, কোনও দিন তোমায় বরণ পর্যন্ত আমার ছিল না। যাহা কিছু ভাবিতাম 'আমি রাধা, জীবমাত্রই রাধা'—এই রূপ ভাবিতাম। কিন্তু তুমি আমার সবল কিছু ছাপাইয়া আসিলে। তোমার এই আসার কিতর দিয়া আমার আয়েটেন তো কিছু বলাইল না। একটী নারী-সঙ্গ তো তোমার জীবনের স্পর্শ দিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না, যাহারা তোমার জীবন দুনিয়ার প্রকৃতির বুকে ছড়াইয়া দিতে পারে। শুধু কি আমার জন্যই আসিয়াছিলে? তুমি আর আমি, আমি আর তুমি পথ বলিয়া চলিয়াছি, একা আমি তোমার সেবা করিব কি করিয়া? নিত্যগোপাল আমার, তোমার যাহারা তাহারাই কি তোমার দর্শন ও জীবনের আহ্বানে ছুটিয়া আসিল? তাহারা গতানুগতিকের পথ ধরিয়া চলিয়া তোমার বিপ্লবাত্মক দর্শন ও জীবনকে প্রকাশিত হইবার পথে প্রবল বাধা তুলিতেছে। তুমি গুরুগিরি কর নাই। আর এখানে চলিতেছে বর্তমান যুগ যাহা চায় না তেমন গুরুগিরি। আমি একা অসহায় তোমার দর্শন ও জীবন লইয়া। তারিণীবাবু ৯টার পর আসেন। শনিবারের সভায় খগেনবাবু সভাপতি হন। নগেনবাবু, খগেনবাবু ও বেণু সোম auditor নিযুক্ত হন। সভায় চিদানন্দ বলিয়াছে যে, সে ৪ টাকা হাওলাত নিয়াছে। সভা-সমিতির বিবরণী লেখার পুস্তকে ২টী সভার বিবরণ লেখা হয় নাই, তাহা recorded হইয়াছে। তজ্জন্য ঐ দুই সভার কার্য্য অনুমোদন করা হইল না। মাখনবাবু আসে। তারিণীবাবু বলিলেন, আজ বৈকালে নাকি তাহারা closed door-এ কি কথা যায় তাহার আলোচনা

করিবেন।...উহারা শতবার্ষিকী কমিটী dissolve করার কথা ভাবিতেছেন। শতবার্ষিকী কমিটী না থাকিলে ট্রাস্টীদের সঙ্গে মিলিয়াই কি কাজ হইবে? কে করিবে, টাকা আসিবে কোথা হইতে? আর পারিলাম না বুঝি ঠাকুর। কি দুঃখ আমার! কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, ভাবিয়া ছিলাম তোমাকে বুকে লইয়া যমুনা পার হইব। মাঝ দরিয়ায় আসিয়া তোমাকে হারাইয়া ফেলিলাম! কি বেদনা! কি করিব, আমাকে পথ দেও। ভারিণীবাবুদের আবার কি দুঃখ? আমার বুক যে ভাঙ্গিয়া যাইবে ঠাকুর! তুমি ছাড়া তো আমার কিছু নাই। আজ মীরার বিবাহ হইবার কথা।

৬ই জুলাই

ঠাকুর, কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া নিজের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া শরীরের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তোমার সেবার জন্য খাটিয়াছি। আজ ইহারা লাঞ্ছনা সুরু করিয়াছে। তুমি যাহা হয় করিও। আমি তো ইহাদের মত যাহা খুশী করিতে বা বলিতে পারিব না। আমি সে দিক দিয়াও অসহায়। যে অনাচার এতদিন চলিয়াছে, তাহা আজ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, যে অপমান ট্রাস্টীগণ ইহাদের কাছে পাইয়াছে, অথবা অসহায়ভাবে সহ্য করিয়া গিয়াছে, আজ সেখানে বাধা পাইয়া ইহারা গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে। আমি কেমন করিয়া এই উচ্ছৃঙ্খলতার কাছে মাথা নোয়াইব? দ্বিধাবিভক্ত কমিটীর সঙ্গে আমার কাজ করাও সম্ভব নয়। মঠের মধ্যেও দলাদলি চলে? রাজনীতিতে বরং চলে। যেখানে শুচিতা পবিত্রতার জীবন যাপন করার কথা, সেখানে এত ভেদবুদ্ধি থাকিলে সে সংস্পর্শে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর, লাঞ্ছনা হইতে আমাকে বাঁচাও।...পাবনা হইতে ক্ষিতীশ বিশ্বাস আসেন। তাঁহার নির্বাচনী অভিযানের বিবরণ শুনিলাম। উদ্বাস্তুদের প্রচুর সাহায্য তিনি বক্তৃতার মধ্যে দিয়াছেন। কম্যুনিজম পরিত্যাগ করার কথা, বিনোবা ভাবের কথা, গিরিধারীর কথা বলেন। ক্ষিতীশবাবু বিশেষ বন্ধু, আমাকে বেশ ভালবাসেন। প্রতিষ্ঠা-দিবস মঠে যায়।...উহারা—নগেনবাবু, তারিণীবাবু, রমাপতিবাবু, নীলরতনবাবু, আশুবাবু, তুলসী, খগেনবাবু—স্থির করিয়াছেন কমিটী dissolve করিতে। আমার মতে তাহা সঙ্গত মনে হয় না। সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী sensation ট্রাস্টীদের বিরুদ্ধে ভিক্টেটার বলিয়া উত্থিত হইবে, যাহার সুযোগ ইহারা লইবে। আমি ত এই কমিটী লইয়া কাজ করিব না। এই dilemma-র মধ্যে সমাধান শুধু তিনি। পদত্যাগ আমি করিব ট্রাস্টীদের কাছে। চিদানন্দ এক চিঠি দিয়াছিল জনরঞ্জনবাবুর কাছে। আমরা পদত্যাগ করিলে কাজ কিছু হইবে না—লিখিয়াছেন। পানিহাটিতে যাইয়া থাকিতে খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু শরীরের দিকে চাহিয়া ভয় হয়।

৭ই জুলাই

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম বিশ্ব দরবারে—তোমার আসন রচনার জন্য। পথিপথে তোমাকে হারাইলাম, উহারা কাড়িয়া লইল। তোমার বিশ্বনাগরিক রূপ বা বেশ কেহ তো চায় না। যাহার 'সকল দল মিলাইয়া এক অখণ্ড দল' তাঁহাকে লইয়া আজ দলাদলি—গৃহী-সন্ন্যাসীতে দল, শিক্ষেশিক্ষে দল, শিক্ষে-প্রশিক্ষে দল। আমি কি এত দল লইয়া চলিতে পারি? ঠাকুর, কি হইবে? আবার কি কাঁথা বুকি দিয়া থাকিবে? আমার যে মৃত্যু-যন্ত্রণা হইবে। এই এক বৎসর খুব খাটিব ভাবিয়াছিলাম। আমার খাটুনী তুমি নিবে না? এই পর্য্যন্তই কি তোমার প্রচার এযাবের জন্য হইল? ইহাদের তো মাথা ব্যথা নাই তোমার জন্য। যে যাহার অভিসন্ধি নিয়া বিভোর। ঠাকুর, পথ দেও, পথ দেও। পূর্ব্বে সাধকবৃন্দ সহজ সরল বাধা-হীন আবেষ্টনের মাঝে সাধন করিতেন।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

বিশ্ব পরিস্থিতি ও মার্কসবাদ :—সাম্প্রতিক রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যের মতান্তরকে কেন্দ্র করে আজ সারা বিশ্বেই একটা আলোড়ন ও প্রশ্নের অবতারণা হ'য়েছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, মার্কসীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে ও সেই অনুসারে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বাধীনতা পাবে কি না। প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক এবং প্রশ্নটির মধ্য দিয়ে মার্কসীয় দর্শনের মূল ধরেই টান চড়ান হয়েছে। মার্কসীয় কাঠামোর মধ্যে যে একটা একত্বের রূপ-রেখা অঙ্কিত হয়েছিল তা আজ কম্যুনিষ্ট জগতে যতগুলি রাষ্ট্র ও দল আছে তাদের দেখে আর মনে করবার উপায় নেই। একত্বের পরিবর্ত্তে যেন ভেদ বিভেদই ক্রমশঃ উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

মহামতি কার্লমার্কস্ বিশ্বের সকল ছোটদের বঞ্চিতদের একটি ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার মত একটি সমাজ-ব্যবস্থার রূপরেখা দার্শনিক যুক্তিতর্ক সহায়ে জগতের সামনে উপস্থাপিত ক'রে বিশ্বের নমস্য। বিশ্ব এ জন্য তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইতিপূর্ব্বে এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার কথা কার্ল মার্কস ব্যতীত আর কেউই বলেন নি।

কম্যুনিজমের মূল কথা "ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান"। এই ভাব যারা জগতে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য, সকল বঞ্চনা ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজে সম মান, সকল সুযোগ সুবিধার সমবণ্টনের জন্য একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কসবাদ সংগ্রামরত। গত ৫০ বৎসরের অভিযানে মার্কসবাদে অনুপ্রাণিত বিশ্বের জনগণ এমন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হ'য়েছে যে শোষককুল আজ ভীত সন্ত্রস্ত। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা আজ শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় ব্যস্তসমস্ত পণ করছে। মার্কসবাদ সকল বঞ্চনা ও শোষণের অবসান ঘটাতে পারবে এই প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্বের ছোটদের দল বঞ্চিতের দল যখন সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক সেই সময়ে শোষকদের বিরুদ্ধে একটা সামগ্রিক সংগ্রামের মুখে কম্যুনিষ্ট মুখে এই বিভেদ-প্রবণতা মানুষকে চিন্তিত ক'রেছে যারা "একলা খাইব সুখ না পাইব—শ্রীনিতাগোপাল" এই ভাবের ভাবুক, তাদের প্রত্যেকের মনেই আজ এই প্রশ্ন, উদ্দেশ্য যেখানে এক সেখানে এই বিভেদ কেন? যাঁরা মার্কসীয় সমাজ ব্যবস্থায় রূপদান করছেন এই ত্রুটি তাঁদের, না আরও কোন গভীরতর কারণ আছে?

আমাদের বিবেচনায় এই ভাঙ্গনের মূলে রয়েছে বাদ দেওয়ার ভুল (error of omission)। 'জগৎটাকে কি চোখে দেখব' (angle of vision)—তার উপরই নির্ভর করছে জগতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া—"কৃষ্ণ যেমন, যে দেখে যেমন"—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—ইহাই বাস্তব বিজ্ঞান। মার্কসীয় দর্শনের গোড়ায় রয়েছে এই বাদ দেওয়ার ত্রুটি। মার্কসের ভাষায়—"My dialectic method is fundamentally not only different from the Hegelian, but is its direct opposite. To Hegel, the process of thinking, which under the name of 'Idea', he even transforms into an independent subject, is the demi-urge (creator) of the real world and this real world is only the external phenomenal form of the "Idea". With me, on the contrary, the "Ideal" is nothing else than the material reflected by

the human mind and translated into forms of thought."। বাস্তব জগতে এই "Idea" এবং "Matter" বিপরীতধর্মী হয়েও সমগ্রের দুইটি অংশ এবং এই অংশ দুইটি নিজেদের সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও, কখনও মুখ্য, কখনও গৌণ হয়ে সমগ্রের সেবায় রত। যেখানে সমগ্রের সেবাই লক্ষ্য (আত্মসেবা লক্ষ্য নয়) সেখানে যত বৈপরীত্যই থাক না কেন সঙ্ঘর্ষের অবকাশ থাকে না। জীবনের ক্ষেত্রে "Idea in terms of Matter" এবং "Matter in terms of Idea" যুগপৎ কথা বলে Matter এবং Idea সমগ্র জীবনের দুইটি দিক কোন বাদ, উভয়েরই মুখ্য এবং গৌণ হওয়ার যোগ্যতা আছে এবং উভয়ই সত্য। কোন একটিকেও মুখ্য হওয়ার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বাদ দিলে জীবন চলে না। কোন একটিকে শত যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে তার অধিকার থেকে বাদ দিতে চাইলেও যে বাদ দেওয়া যায় না এই সহজ সত্য কথাটি আজ বুঝবার এবং স্বীকার করবার দিন এসেছে। মায়াবাদী ভারতও এ ভুল করেছিল—ব্রহ্মকে মুখ্য ক'রতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ জগৎটাকেই মিথ্যা বলতে হয়েছিল—তাতে জগৎ সংসার আজও মিথ্যা হয়ে যায় নি। ফলে হয়েছে মায়াবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে মাটির মুখ্য, দেহের মূল্য দিতে ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল পরপদানত হয়ে নিজ ভিখারীতে পরিণত হয়েছিল। আজও ভারতবাসী তার ঐ বাদ দেওয়ার ভুল, বার বার যথামূল্য না দেওয়ার ভুল, শোধরাতে পারেনি। সে আজও এমন কোন দার্শনিক চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারে নি যাতে সে ব্রহ্মের মূল্য ও মাটির মূল্য সমভাবেই দিতে পারে। ফলস্বরূপ স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ ২০ বছর পরেও দেখছি ভারতবর্ষ কামমোহিত, বিভ্রান্ত।

বিপরীতপক্ষে মার্কসীয় দর্শনেও একই বাদ দেওয়ার ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। মার্কস্‌বাদ অজড়কে, "Idea"কে, আত্মচৈতন্যকে তার সহজ অধিকার, মুখ্য হওয়ার অধিকার, প্রথমিকা হওয়ার অধিকার না দেওয়ার ত্রুটির জন্য কম্যুনিষ্ট জগতেও প্রতিবাদ ধ্বনি উঠি হয়েছে। জড়কে primary করে গণ্য করার ফলে প্রয়োজন-মূল্য (use-value) প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু আত্মচৈতন্যের মূল্য, নিজ মূল্য (self-value) সেখানে থাকে অনাদৃত, অস্বীকৃত। আদর্শহীন প্রয়োজন-বোধ সেখানে বেলাগাম হতে বাধ্য। বিপরীত পক্ষে অজড়কে, আত্মচৈতন্যকে, Idealism-কে primary করে গণ্য করার ফলে নিজ-মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয় বটে কিন্তু প্রয়োজন-মূল্য অনাদৃত অস্বীকৃত হওয়ার ফলে জীবনই যায় শুকিয়ে। একান্ত ব্রহ্মের মূল্য, আদর্শের মূল্য দিতে গিয়ে, প্রয়োজনের দিককে যথাযোগ্য মূল্য না দিয়ে অন্তর্বিক্ষত হয়েছে ভারত আর আজ কম্যুনিষ্ট জগতেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চীন, যুগোস্লোভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এমন কি অসমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেও বিচ্ছিন্নতামূলীন প্রবণতা ও তাজন দেখা দিয়েছে। মার্কস্‌বাদের ব্যাখ্যা ও তার রূপায়নের পদ্ধতি নিয়ে এই যে মতান্তর ইহা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল লক্ষ্য হচ্ছে যার যার নিজস্ব ধারণার প্রাধান্য লাভের চেষ্টা অর্থাৎ নিজমূল্য আদায়ের চেষ্টা ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

ভারতীয় দর্শনে, পুরুষোত্তম-দর্শনে এমন স্তরের কথাও আছে, যে-স্তরে ঐ বিপরীতধর্মী জড় আর অজড় সকল শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র মানব সমাজের সেবায় পরস্পর পরস্পরের স্বাধীনসত্তাকে বজায় রেখে, পরস্পর পরস্পরকে প্রথম হওয়ার মর্য্যাদা দিয়ে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হতে পারে। সমগ্রের সেবাই যেখানে প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য থাকে সেখানে যত বিপরীতধর্মীয় সমাবেশই হোক না কেন, সঙ্ঘর্ষের কোন অবকাশ থাকে না। বাস্তব জীবন ও আধুনিক পদার্থ বিদ্যাও এই সাক্ষ্যই দেয়। জীবনের ক্ষেত্রে every cell lives for itself as well as for whole organism। এখানে স্বার্থ এবং পরার্থ স্বার্থপরার্থ থেকেই, contradictory হয়েও complimentary, অঙ্গাঙ্গিভাবে। এই-ই বাস্তব বিজ্ঞান, ভাগবতের ভাষায় যাতবেদস্।

মার্কস্‌বাদ যেখানে সকল ভোগ্যবস্তু ও সুযোগ

সুবিধা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নিকট কেন্দ্রীভূত (centralise) করার পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঐগুলি বিকেন্দ্রীভূত (decentralise) করার জন্য তদুপযোগী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চিত্র দান করলেন, সেখানে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে Dictatorship of the proletariate-এর নামে মুষ্টিমেয়র হাতেই আবার সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করলেন। এখানেই সাম্যবাদীকরণের পরিকল্পনা তার সহজ ও স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছে। মার্কসবাদ অবশ্য বলে থাকে কোন সময় এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকবে না—তখন stateless society হবে। কিন্তু ধন সম্পদের ন্যায় ক্ষমতা ও শক্তির এমন একটি মোহ আছে যে, যাদের হাতেই ক্ষমতা ন্যস্ত হউক কেন তাঁরা যদি উপযুক্ত পাত্র না হন, তাঁরা যদি ঐ অনাবৃত Idealismদ্বারা নিজেদের মধ্যে নিজেরা সংযত না হন, তবে condition reflex-এর নিয়মানুসারে তাঁদের ক্ষমতার মোহ ও তার অপব্যবহার কিছুতেই সংযত হবে না। সুতরাং কম্যুনিজমের stateless society-র কল্পনা স্বপ্নেই থেকে যাবে।

আজ বিশ্বপরিস্থিতি যেরূপ, তাতে পৃথিবী থেকে শোষণ বঞ্চনা দূর করতে হলে সকল শোষিতদের সঙ্ঘবদ্ধ না হলেও তো চলবে না। কম্যুনিষ্ট জগতের এই তাণ্ডব রোধ করতে না পারলে বিশ্বের শোষিতদের মুক্তির আশাও সুদূর পরাহত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চ্যাতিস্লাভাক রাশিয়া, চেক, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র যে আলোচনারত যাতে এই তাণ্ডব রোধ করা যায়, সেখানে হয়তো একটা সাময়িক pact গোঁজামিল দেওয়া যেতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তরিকতার চেতনাকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ধার্মনিক স্তরে, রাজনৈতিক স্তরে, অর্থনৈতিক স্তরে, সামাজিক স্তরে, সর্ব স্তরে স্বীকার না করা হচ্ছে, ততক্ষণ এই তাণ্ডব রোধের সম্ভাবনা নেই, সাময়িক ভাবে তাকে চাপা দেওয়া যেতে পারে মাত্র। আমাদের আজ এমন একটি ভাবাদর্শ ও তদনুযায়ী এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রয়োজন যেখানে Dictatorship ও Democracy একত্রে চলে—যেখানে Dictortorship সংযত হবে democracy-তে, democracy সংযত হবে dictatorship-তে। বর্তমানের democracy প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তীত কিছুই নয়, dictatorshipও ক্ষমতামদমত্ত। উভয়ের মিলিত রূপই শুধু সমাজসেবার উপযোগী হবে। সেখানে ধন ও শ্রম নিজ নিজ একান্ত স্বার্থের পরিবর্তে সমাজের সেবায় নিযুক্ত হয়ে সার্থক হবে। আজ পৃথিবীর সকল চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণ এ দিকে দৃষ্টি দান না করলে প্রকৃতি তার নিজ প্রয়োজনেই সাময়িক ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সমতা বিধান করবেন। প্রকৃতিতে শোষণ নেই, আছে শোষণ, আছে তর্জন—প্রকৃতির এই সহজ রূপটি সহজ ধর্মটি যিনি অস্বীকার করবেন তিনি ধনিকই হোন আর শ্রমিকই হোন, রাজাই হোন আর প্রজাই হোন, নারীই হোন আর পুরুষই হোন, প্রকৃতি ছাড়বে না। মানুষের সজ্ঞাতা সাময়িকভাবে শোষণধর্মী হওয়া ছাড়া উপায় নাই: Time is short but art is long। আমাদের মনে হচ্ছে O hour-এ পৌঁছে গেছি। যাঁরা আধুনিক চিন্তাধারার সমৃদ্ধ, যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁদের আমরা বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। মার্কসবাদ কোন্ পর্যন্ত সামঞ্জস্য-পূর্ণ, মার্কস্‌বাদের নিকট শোষণের প্রকৃতির গভীরতম প্রদেশের গভীরতম রহস্য ধরা পড়েনি, ধ্বংসাত্মক বিপ্লববাদ কেমন করে বাস্তবরূপ হয়, কোথায়ই বা তার অন্তরায় ও তার সমাধান এ বিষয়ে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ ১৩৪৩-৪৪ ও ১৩৪৮-৪৯ বঙ্গাব্দে পাঁচটি প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। উদ্ধারণভারতের পাঠকদের কাছে আগামী সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধটি পুনরায় উপস্থাপিত করব যাতে ঐ চিন্তাধারা এই সন্ধিক্ষণে আলোচিত হতে পারে।

শ্রীপার্বতী নাথ বিশ্বাস

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	
বাংলার বিদুষী	
বাংলার মনীষী	
জীবন গড়া	
রাজর্ষি রামমোহন	
আচার্য জগদীশ	
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	
রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

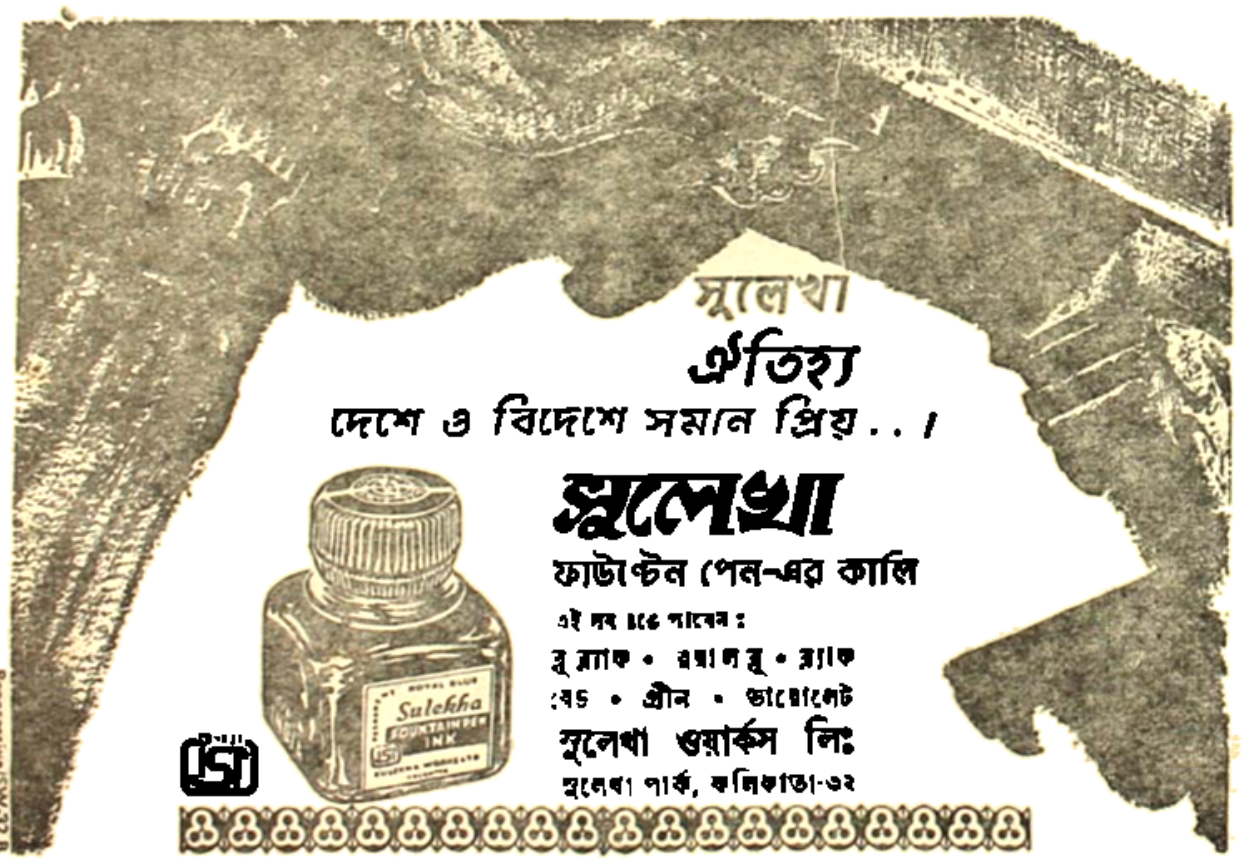

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রহ্ম। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্য, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। † † †"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধি উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

19 AUG 1968

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতাসমন্বয়
১২। উজ্জীবনতাপস (পুস্তিকা)
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি-সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মুদ্রিত হইতেছে)
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির রূপরেখা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত নিত্যগোপাল ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়দৃষ্টি শ্রীনিত্যগোপাল
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
৪। রবীন্দ্র-ছন্দ
৫। প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম: বাগইআটি পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

উদ্ভ্রান্ত ভারত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয় আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

শারদীয়া ১৩৭৫, ১৯৬৮ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র একবিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুইয়ের সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

অধিক ফসল ফলাতে হলে

ভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত জৈব ও রাসায়নিক সার সংমিশ্রণে

লক্ষ্মী মার্কা

সুষম দানা সার ব্যবহার করুন

★ অজয়—ধান, গম ও পাটের জন্য (এন ৯.৭, পি ৯.৭

★ জ্যোতি—ধান, আলু ও শাকসব্জীর জন্য (এন-৮, পি-৮, কে-৮)

★ মুকুট—(উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সার) ধান, আলু পাট ও শাকসব্জীর জন্য (এন-১২, পি-১৫, কে-১৫)

দি ফসফেট কোং লিঃ

রিসড়া, হুগলী

(ফোন : শ্রীরামপুর ৪৮৩/৪৮৪)

হেড অফিস : ১৪নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা-১

(ফোন : ২২-৬৮৬১-৭০, ২২-৯৪২০, ২১-৭১৮৮)

বিজ্ঞাপন—১

ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট

আগামী বছরের পুজোর খরচের জন্য ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

প্রতিমাসে টা. ৫ জমা দিলে আগামী পুজোয় সময় টা. ৬১.৫০ হবে। পাঁচ টাকার গুণিত অধিক পরিমাণ টাকাও জমা নেওয়া হয়।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ১, ঈশ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

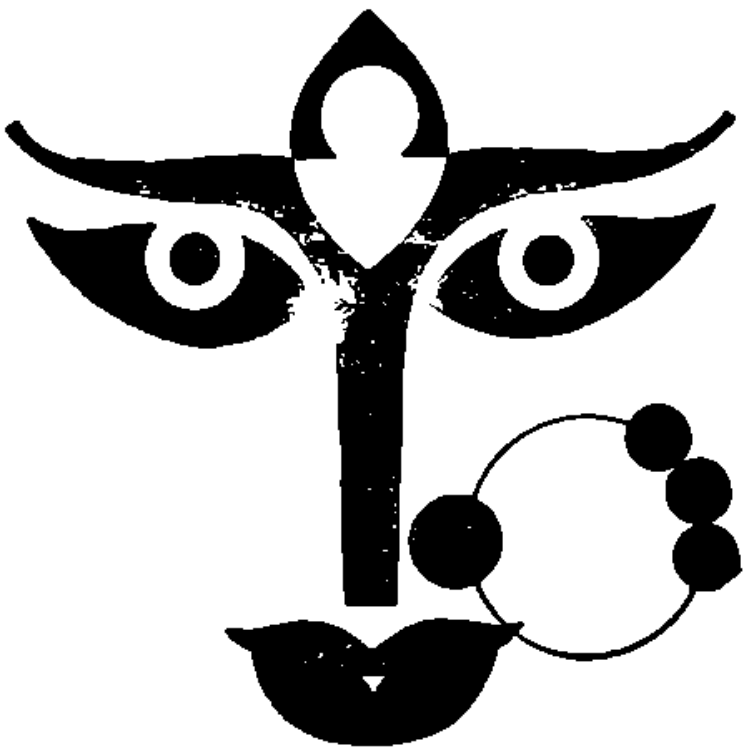

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন।

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সব সময়েই

সঞ্চয়ের অভ্যাস ভাল—

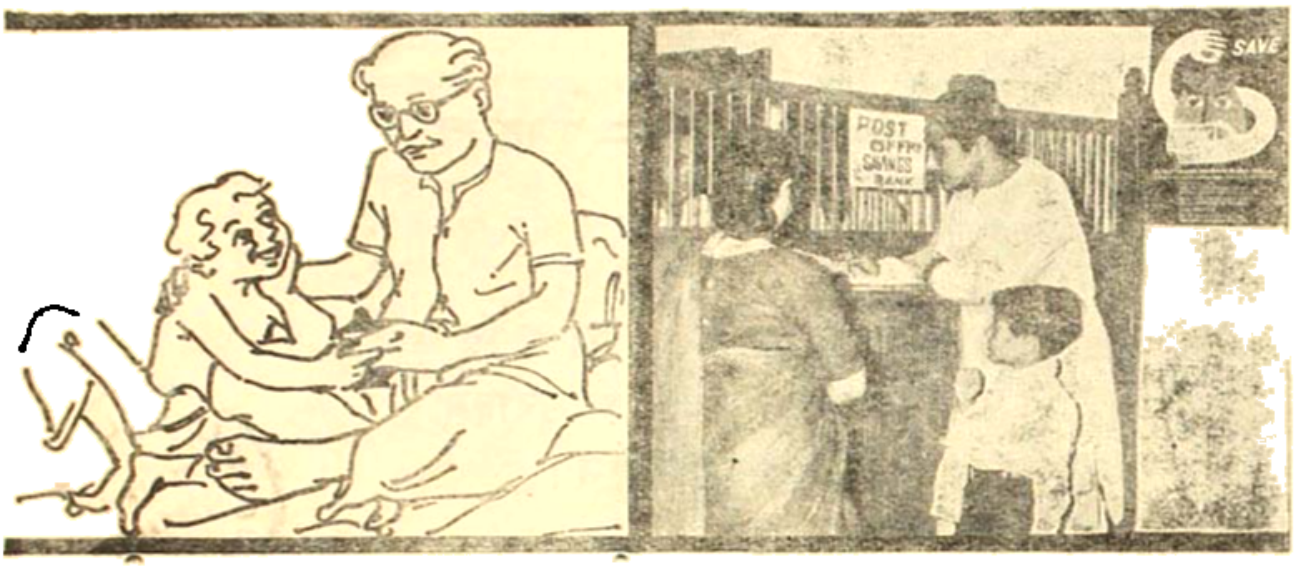

ডাকঘরেই টাকা জমা রাখা সবচেয়ে নিরাপদ

●

পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মতই সুবিধা রয়েছে। পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে জমানো টাকা থেকে প্রয়োজন মতো যে-কোনো পরিমাণ টাকা যতবার খুশি তোলা যায়, কোনো বাধা নিষেধ নেই। তাছাড়া পোস্ট অফিসের টাকায় সুদের উপর কোন আয়কর লাগে না।

এই মাসেই

পোস্ট-অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে

একটা পাসবই খুলুন

বন্ধ সঞ্চয় সংস্থা ● পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ছোটদের আজীবন খুশিপায়ে চলতে হবে—এই কথা মনে রেখে জুতো কিনবেন

ছোটরা বড়ো হবে পায়ের নিখুঁত গঠন বজায় রেখে—এই যদি আপনার কামনা—তা হলে এখন থেকেই তাদের জুতো কেনা বিষয়ে সাবধান হোন। অন্যথা, ছোট পায়ে বড়ো রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা। ছোটদের বাটার জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি, নকশায় আর নির্মাণে আরামে হাঁটার নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, খাপ খাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তলি যা অবাধে পা সঞ্চালনের সহায়ক। তাই সুষম গঠনে তাদের পা বাড়ে, যার ফল আজীবন খুশিপায়ে টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর আরামে পয়লা নম্বর—এমন জুতোই এখন মজুত বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের। এদের খুশিপায়েই শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।

টিপ ডার্লিং ৫·৯৫-৪·৭৫

Bata

বালক ৮·৫০

তলি ৮·৫০

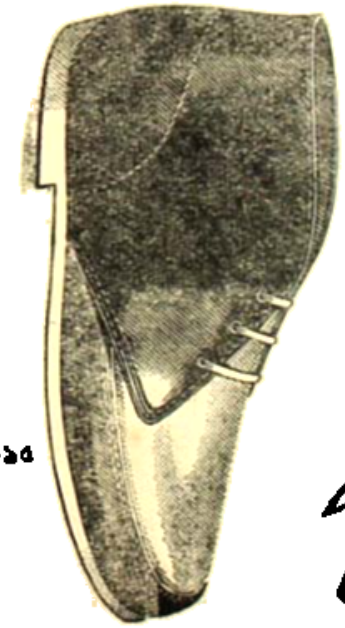

বুটি ৮·৯৫

৺পূজার অভিবাদন

আমাদের বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি

দি ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কলিকাতা

ASP/UCO-33/67

পূজার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

বেলেঘাটা ভ্যারাইটী ষ্টোর

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৩৮, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,

কলিকাতা-১০

শারদোৎসবে
আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৫·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·৫০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীমীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

মানুষের মত মানুষ	·৭৫
বঙ্কিমের গল্প	১·২৫
সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত (শিক্ষা-বিষয়ক বই)	·৭৫
শিক্ষা—শ্রীরমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত	৭·৫০
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	২·২৫
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি	১২·০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও শ্রীরমণী সেনগুপ্ত

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা	৯·২৫

শ্রীসুবোধ সেন গুপ্ত

শিক্ষা-বিজ্ঞান—শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী	৩·৫০
শিক্ষার ইতিহাস—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসু	৩·২৫

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	২·৫০
ভয়ঙ্কর আফ্রিকা ১ম, ২য়	৩·২৫
বেদুইনের দেশে	১·৭৫

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	১·২৫
নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন	১·২৫
সরল যোগ ব্যায়াম	১·২৫
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	১·৪০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	১·৪০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৩·০০

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর (মহারাজ)

জেলে ত্রিশ বৎসর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম	

শ্রীরমেশচন্দ্র সরকারের

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	৩·৫০

Student's Own Dictionary (of Words Phrases & Idioms) ··· 7·50

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মধ্যমাকৃতি অভিনব বাংলা অভিধান। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (বহুচিত্র শোভিত পূর্ণাঙ্গ জীবনী) ৩·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

(Formerly : Kesoram Cotton Mills Ltd.)

LARGEST COTTON MILL IN EASTERN INDIA

Manufacturer & Exporters of

QUALITY FABRICS & HOSIERY GOODS

Managing Agents

BIRLA BROTHERS PRIVATE LIMITED

Office
15, India Exchange Place
Calcutta-1

Mills at :
42 Garden Reach Road
Calcutt-24

কান্তা সুগন্ধি
আপনার মনোরঞ্জনের
মন্ত্র জানে

কান্তা সুগন্ধি মেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সন্ধকোটা ফুলের মত আপনি সৌরভ ছড়াবেন। আপনি পাশ দিয়ে গেলে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হবে ; আপনাকে সকলেই মুগ্ধনেত্রে দেখবে। হয়ত তেমন কারো কর্ণমূলে দিলে যেতে পারে—যার কাছে সেই মুহূর্তে হবে অক্ষয় আসন পাবেন শুধু শ্রীময়ী আপনি।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

CCKA 1968A

পাঠাগারের অপরিহার্য বই

মণি বাগচির

বাঘা যতীন—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে একদিন নরকাঙ্কালের হলদিঘাট সৃষ্টি করেছিলেন বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি বাঘা যতীন নামে পরিচিত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর সম্পর্কে এই নূতন জীবনীতে বহু নূতন তথ্য আছে আর আছে সেই বিপ্লবী মানবের বাস্তবনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু	মণি বাগচি	৪·০০
জননায়ক জওহরলাল	মণি বাগচি	৪·০০
সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী	মণি বাগচি	৩·০০
সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক	মণি বাগচি	৩·০০
লোকমাতা নিবেদিতা	মণি বাগচি	২·৫০
বাংলার বাঘ আশুতোষ	অরুণ বিশ্বাস	২·৫০
দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র	মণি বাগচি	৪·০০

শিক্ষা ভারতী

৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

★

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ

কলিকাতা ৪

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমায়
কাজে বেরোতে হয়—কিন্তু চুল আমার
এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই
আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চটচটে না, বালিশে বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুমধুর গন্ধ সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার চুল পরিপাটি থাকে।

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈলঃ—আজ তাতি চুলের জন্য

কেশ মেডিকেল হেয়ার কালচার লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, জয়পুর, কানপুর, হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, ইন্দোর

সি, সি, কোম্পানী

—কন্টিনেন্টাল কম্যার্শিয়াল কোং লিঃ—

৮।৯, ডালহৌসী স্কোয়ার,

কলিকাতা।

যাবতীয় অফিস-ষ্টেশনারী ও

ছাপাই-এর কাজ :

টাইপরাইটার—ফাউণ্টেন পেন

বিক্রয় ও মেরামত :

—ষ্টীল ফারনিচার—

গ্রাহকের সন্তোষ আমাদের লক্ষ্য

ফোন—২২-৬২৬৩

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল
ক'রে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাসে
নিয়মিত ব্যবহারেই
তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ

বেঙ্গলের নাম খোদা ষ্টাঁচবার জন্য
টিনিবার সময় ট্রেড মার্ক শ্রীরামচন্দ্র
ছুর্তি, শিলমোহর প্রমুখ বয়াপের উপর
RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারক
এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া
নইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস কেশ তৈল

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ · লক্ষ্মীবিলাস হাউস · কলিকাতা-৯

বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের
বিদুষী কন্যা শ্রীমতী চিত্রিতা দেবীর

উপনিষদ

। বহু প্রতীক্ষিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ।

লেখিকা 'ঈশোপনিষৎ', 'কেনোপনিষৎ', 'কঠোপনিষৎ' ও 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ'-এর চিরন্তন রহস্যময় বাণী সহজ, সরল ও সছন্দ অনুবাদে বর্তমান যুগের পাঠকের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। লাইনোটাইপে মুদ্রিত সুন্দর বহিরাবরণে শোভিত।

॥ মূল্য পাঁচ টাকা ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্

এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

SPACE DONATED

by

The Oriental Metal Industries Private Ltd.

Manufacturers of "DIPTI" Lantern, Enamel Ware,
& Khas Janata Kerosine Cooker.

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

আত্মকথা

বা

সত্যের প্রয়োগ

মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর

সচিত্র নূতন বাংলা সংস্করণ

মূল গুজরাটী হইতে অনূদিত

অনুবাদ : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

মূল্য : ১২·০০

*

কয়েকখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

গান্ধী-রচনা-সংকলন

মূল্য ৫·০০

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

মূল্য : ৪·০০

মোহনমালা

একখানি নিত্যব্যবহার্য গান্ধীবাণী-চয়নিকা

মূল্য : ৩·৫০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিজড়িত জীবনী

মূল্য : ৫·৫০ ও ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)

প্রকাশের অপেক্ষায়

অন্ত্যোদয়

রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট'-এর গান্ধীজী-কৃত

সারানুবাদের বঙ্গানুবাদ

সম্পূর্ণ পুস্তকতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রকাশন বিভাগ,
গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র : আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৭৫, ১৯৬৮

	শক্তি-স্তুতি (কবিতা)	১৪৫
	শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল	
২।	বিপ্লবময়ী	১৪৬
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	
৩।	দুর্গাপূজার কথা	১৫০
	শ্রীবেণু মিত্র	
৪।	দশপ্রহরিণী (কবিতা)	১৫৩
	শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন	
৫।	শোপেনহরের দুঃখবাদ	১৫৪
	শ্রীশৈলেনকুমার রায়	
৬।	সাহিত্যে আধুনিকতা	১৬০
	শ্রীদক্ষোবরকুমার অধিকারী	
	ভারতের মাটিতে মার্কসীয় দর্শন	১৬৩
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত	
৮।	মায়ামৃগয়া (কবিতা)	১৮৪
	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	
৯।	কার্ডিনাল নিউম্যানের ধর্মান্তর গ্রহণ	১৮৫
	জনাব মোজাউল করীম	
১০।	কথাকলি (কবিতা)	১৮৮
	শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার	
১১।	এলোপাথারি	১৮৯
	শ্রীমান	
১২।	আজ অশ্রদ্ধা সর্বত্তরে	১৯২
	শ্রীনলিনী কিশোর গুহ	
১৩।	একানব্বই বৎসর বয়স্কের দৈনন্দিন দিন-যাপন	১৯৫
	বন্ধুবর	
১৪।	মাতৃ-উদ্বোধন (কবিতা)	১৯৭
	শ্রীমোহিনীমোহন কাব্যপ্রাণ, কাব্যভাস্কর	
১৫।	সাময়িকী	১৯৮
	পার্থতীনাথ বিশ্বাস	

উজ্জ্বলভারত

আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৮ শারদীয়া সংখ্যা

শক্তি-স্তুতি

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

সারদা ভাষা শিবানী
প্রেমময়ী ব্রহ্ম সনাতনী
বিশ্বময়ী বিশ্বরূপা কর দীনহীনে কৃপা
আদ্যাশক্তি আনন্দদায়িনী
দিব্য জ্ঞান প্রদায়িনী ভক্ত চিত্তবিনোদিনী
মহেশ্বরী অচল নন্দিনী।
ভবভ্রান্তিনিবারিণী বিদ্যাগিরিনিবাসিনী
দয়াময়ী সুবীনতারিণী
গিরিজা গৌরী অমলা, বীরেশ্বরী সুবিমলা
শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী বাণী।
অনন্ত শক্তিধারিণী সর্বশক্তিস্বরূপিনী
সিদ্ধেশ্বরী সত্য সনাতনী
সরলা ভাষা শিবানী সুগঠনা বিদুষী
মঙ্গলা মঙ্গলকারিণী।
কালী ত্রিকালব্যাপিনী শিবে অনন্তরূপিনী
সুখময়ী শান্তিবিধায়িনী ॥
দীর্ঘ পিঙ্গলজটিনী নীল কমলধরণী
শঙ্কর শিব মোহাগিনী
ভাবনী ভবকল্যাণী বৈষ্ণবী মায়া মোহিনী
বিশ্বম্ভরী ভক্তবৎসলা

নরকপালমালিনী রুদ্রাণী ভবতারিণী
মহাকৌত্রী কৈতরী ভবানী
উমে অর্দ্ধেন্দুবালিনী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
জগদ্ধাত্রী ভূতাবহারিণী
ভক্তিরসতরঙ্গিণী মনময়ী আহ্লাদিনী
তেজোময়ী মহাতেজস্বিনী।
তুমি ধর্মমহাবিদ্যা আনন্দময়ী অনাদ্যা
আদ্যাশক্তি জগৎজননী ॥
সদা প্রাণের ভিতরে লুকায়ে রাখি তোমারে
আদরে হেরি সারে বারে।
স্নেহময়ী নিত্য কালী আছ হৃদে নিত্যকালী
নিত্য কালই হেরি মা তোমারে ॥

দুর্গা দনুজদলনী দুর্গতি-দুঃখহারিণী
বিপদভঞ্জনাশিনী, পতিতপাবনী।

*

দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী ভবানী ভবহারিণী
হরপ্রিয়া হরবিলাসিনী।

বিপ্লবময়ী

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

(১৩৩২ বঙ্গাব্দের পূর্বপর্যায় উদ্বোধন আরম্ভ হইতে)

কে তুমি গো দাঁড়িয়ে এই ভারত-শ্মশানে মহা অমানিশার মাঝে ভয়াবহা সকল নৈরাশ্য সকল অবসাদ পায়ে দ'লে বিনিদ্রনয়না বিপ্রবেশা নারী-মূর্তিতে? যেখানে তীব্র অন্ধকার মহান্ অস্তিত্বকে সুষুপ্তির মাঝে সুপ্ত করে দেবার জন্য আজ ঘন, ঘনতর ও ঘনতম; অবসন্নতার হিম সংজ্ঞা স্পন্দনকে দিয়ে মেরে ফেলবার জন্য যেখানে আজ সমুদ্যত; সকল হাসিখেলা, সকল খাওয়াপরা, সকল কলাবিদ্যা, সকল কৃষিশিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করবার জন্য যেখানে মরণের হাহাকার অহরহ গর্জন কচ্ছে; ভয়ে অধীর হয়ে যেখানে ভারতের ভূসকল, ভারতের বৃক্ষলতা, ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, ভারতের পশু ভারত মাঠ, ভারতের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়ে আত্মগোপনের প্রয়াসী, মিলনের সুর ভুলে গিয়ে যেখানে পরিবার সমাজ ও জাতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে শক্তি নিয়ে বীভৎস হড়াহড়ি মারামারি করছে, আজ সেই পরাধীন পদানত ভারতেই তোমার নৃত্যলীলার উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে! বেশ মানিয়েছে; নাচ নাচ গো দেবী, প্রাণভরে নাচ। এক দিকে অন্ধকারের বিভীষিকা, অন্য দিকে তোমার রসদিক আলোকরা রূপ; এক দিকে অবসন্নতার বিরাট নিষ্পেষণ, অন্য দিকে প্রাণমন-মাতানো চকল নৃত্য, এক দিকে জড়ৈশ্বর্য্য, অপর দিকে তোমার ঐ অভয়া বরাভয় প্রদায়িনী মূরতি; এক দিকে মরণের কালো ছায়া, অন্যদিকে অমৃত-মদিরা পান-নিরতা ভঙ্গিম তোমার ভ্রূভঙ্গি-যুগল; একদিকে বিচ্ছিন্নতার করুণ আর্ত্তনাদ, অন্য দিকে তোমার ঐ মৃদুস্মিতাননী শুভ্রখানি, এক দিকে শোষণের ভূত ভূতপ্রেতের রক্তশোষণকারী বিকট হাস্য, অন্য দিকে তোমার ঐ অধর-যুগলে ভুবন-মঙ্গল মৃদু মধুর হাসির ছটা। কি অপূর্ব রস-সামঞ্জস্যেই না ভারতের ভাগ্যাকাশে তোমার শ্রীমূর্তি আজ উদ্ভাসিত।

দেখি, তোমার কেশ আজ মুক্ত, মুক্ত কেশই তো মুক্তির চিহ্ন। তোমার ঐ মুক্তকেশী রূপের অনুকরণ করেই না রাজ্যহারা বীরাঙ্গনা দ্রৌপদী একদিন দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিলেন যে, রাজ্য ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আর কেশ-বন্ধন করবেন না? যে মুক্তকেশ সেদিন বর্ষা দেশে মুক্তিপথের পথিক তিক্ত উত্তমের জেল গমনের পথে আস্তরণরূপে বিছান হয়েছিল, সে কেশ কি তোমারই মুক্তকেশের আভাস নয়? দেখ যেন নিত্যমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারত-নারীর মুক্তকেশে কেউ বন্ধন যোজনা করতে না পারে: ভারত আলুলায়িত কেশ হয়েই এলোকেশী তোমার অবতরণ-ভূমি। আজ তুমি দিগম্বরী; কেউ তো মুক্তিবসন পরিয়ে তোমায় উলঙ্গিনী সাজ ঘোচালে না? তোমার ভক্ত-পুত্র রামপ্রসাদ এই তো সেদিন 'বসন পর মা, বসন পর' বলে কেঁদে কেঁদে বাংলার মাটি ভিজিয়ে রেখে গেল। কোন্ বসনে তোমার শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদিত হলে যে তোমার ঈপ্সিত বিপ্লবের অনুকূল হয়, তা তো এতদিন কেউ অনুধাবন করে নি। কলাবিদ্যা যখন মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয়, তা কি কখনও তোমার ক্ষুব্ধ দৃষ্টির হাত হতে রক্ষা পায়? তখন বিলাস-বসন বর্জনেই তোমার অপূর্ব আনন্দ, তোমার বিপ্লবময় চরণের আঘাতে তখন বিলাস-ব্যসনাসক্ত বিশ্ব থর থর করে কেঁপে ওঠে। একদিন ব্রজধামে তোমারই এই দিগম্বর নগ্ন সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য আস্বাদন করেছিলেন মদনমোহন স্বয়ং। বসন নিয়েই তো চিরকাল

এ জগতে ও জগতে যত টানাটানি। শ্যাম গোপীদের বসন হরণ করেন, তুমিই নিজেই দিগম্বরী, শিব নিজেই দিগম্বর। বিলাসী পরাধীন ক্লীব জাতিই বসন কেড়ে নেওয়াকে বড় ভয় করে, ভিতরে যে তার কত বীর্যহীনতা, বসন সৃষ্টির ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। তার যে অনেক গোপন করবার আছে। বিলাসী কলাবিদ্যার কি আস্বাদন করবে? তারা তো কলাবিদ্যাকে কলাবিদ্যার হিসাবে সম্মান করে না। বিলাস বর্জনেই বিলাসের বিশেষ দীপ্তি, নচেৎ বিলাস বিনাশেরই রূপান্তর মাত্র। তাই তো সৃষ্টির গোড়ায়, দেবি, তুমি বিলাস-সৃষ্টি বিনাশিনী, বসনবর্জিতা, রূপরঞ্জিনী, বিপ্লবময়ী, প্রেমঘন মূর্তি। তোমার সকল অঙ্গ বিপ্লব মাখান। প্রাকৃতিক বিপ্লবের বুকে পাষাণ চাপা দিতে যে প্রেমময় মহাবিপ্লবরূপে ভারতের অন্তরাত্মায় তুমি ফুটে উঠেছ, তাতেই ভারতের সব ঘর-মুখো হয়ে অচিরাৎ ঘরে ফিরে আসবে। ওগো ঠাকুরাণী, তুমি আজ নারী সেজেছ, নইলে বিপ্লবের বান ডাকে না! বিপ্লবের গুরু নারী। নারীই পরিবার, নারীই সমাজ, নারীই জাতি, নারী আবার সেখানেই শৃঙ্খলা। এই নারী-শক্তি যদি একবার কোন কারণে চঞ্চলা উন্মাদিনী হয়ে ক্ষেপে ওঠে, বিশ্ব তখন টলটলায়মান। পুরুষের কি সাধ্য যে সে একটা স্থায়ীত্ব বিপ্লবের সৃষ্টি করবে? পিতা মরে গেলে মা সন্তানকে রক্ষা করেন, মা মরলে বাবা অন্ধকার দেখেন, সন্তানের তখন আর দাঁড়াবার পথ থাকে না। স্ত্রী মরলে স্বামীর কাছ থেকে সংসারটা যেন সরে যায়, স্বামী মরলে সংসারে অসুবিধা হয়, বিপ্লব হয় না। পুরুষ আকাশ, ফাঁকি; নারী সেখানে পূর্ণতা, বাস্তব। 'আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্ণাতে'—উপনিষৎ। ব্রহ্মধামে তুমিই একদিন রাধারূপে সকল বন্ধন, সকল আর্যপথ (constitutional path) বর্জন করে বিপ্লবের পথে পাগলিনী সেজেছিলে! পরিবার সমাজ জাতি যখন ব্যভিচারে পচে যায়, তখন সেই ব্যভিচারের তীব্র প্রতিবাদ করবার মত বিপ্লবের সৃষ্টি কে করবে? পুরুষের বিপ্লব ঘোষণার মূল্য কতটুকু? তা সমাজের অন্তঃস্থলকে স্পর্শও করতে পারে না। নারী পরিবার ও সমাজের প্রাণমন ধরে আকর্ষণ করতে পারেন, তেমন তো পুরুষের দ্বারা কখনও সম্ভব হয় না। তাই সমাজকে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজের যথাস্থানে ফিরিয়ে আনবার জন্য চাই নারীতে শ্মশানবাসিনী, বিপ্লবময়ী, প্রাণময়ী কালীশক্তির প্রকাশ দশমহাবিদ্যার প্রথম স্তর কালী, দশম স্তর কমলা। কালী না হলে কমলা হয় না; ধ্বংসের ভিতর দিয়ে ছাড়া সৃষ্টি ব্যক্ত হয় না; কলাবিদ্যা কমলা মূর্তিতে ফুটে উঠে না। মুক্তকেশী না হলে সুকেশী হবার সাধ পূর্ণতা, পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। নারী একাধারে কালী ও কমলা। ওগো অগ্নিময়ী দেবী আমার, যদি তুমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে ঘরে বাইরে সর্বত্র নারীর ভিতর ছড়িয়ে আছ, একবার সেই নারী-শক্তিকে জিপ্ত করে তোল, সন্তান-স্নেহে উন্মাদিনী করে তোল, আমাদের সকল আরাম-প্রিয়তা, পুরাণো বাঁধা পথে চলবার সকল দারুণ নেশা,- নূতন পথ কেটে এগিয়ে চলবার পথে দারুণ বাঁধা এক হুঙ্কারে বিলীন হয়ে যাবে। নারী যখন হারান সন্তানকে কুড়িয়ে আনবার জন্য রাস্তায় বের হবে, তখন আমলাতন্ত্রের দাম্ভিক সংসার সব আপনা আপনি তাদের ঘরের মত ঝেড়ে চুরে পড়বে। সর্বত্র চলছে একটা শোষণের অসুরলীলা, যার বাহন শুষ্ক আইনের শৃঙ্খলা, বাইরের ফাঁপা মিলন এক ভাই অপর ভাইকে, পিতা নিজ পুত্রকে এবং পুত্রও পিতাকে, স্বামী তার স্ত্রীকে ও স্ত্রী তার স্বামীকে, জমিদার তার প্রজাকে এবং প্রজাও তার জমিদারকে শোষণ করতেই ব্যাকুল; স্নেহের একবিন্দুও কোথায়ও নেই। কেউ কাউকে নিজের রক্ত দিয়ে আর পুষ্ট করতে চায় না, অপরের রক্তে নিজ পুষ্টিই সকলের কামনা। এই মরুভূমির রাজ্যে কেমন করে থাকব? তুমি এমন একটা ওলটপালট এনে দাও যেন পরিবার সমাজ জাতি সব ভেঙ্গে আবার নূতন করে গড়ে ওঠে। একদিন এই ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের বিপ্লবই না যমের কবল থেকে সত্যবানকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল? বাঙ্গলার বেহুলাই না একদিন লৌকিক বাহ্য আচার পরিত্যাগ করে বিপ্লবময় সতীধর্ম এই বাঙ্গলার নদীতে নদীতে ভেলায় ঘুরে ঘুরে জলের সঙ্গে মিলিয়ে

রেখে গিয়েছেন? বাঙলার জলে মাখান সেই বিপ্লবকণা কি বাঙলার মেয়েদের রক্তে এক ফোঁটাও স্পর্শ করে নি? ভারতেরই সীতা রাবণ-গৃহে বন্দিনী হয়ে যে বিপ্লবের ঝড় বইয়েছিলেন, যাতে রাবণ গেল, তার সোনার লঙ্কা উড়ে গেল, সে বিপ্লবের একটা ঢেউও কি ভারতের মেয়েরা নিজের বুকে এই সন্তান হারাণোর যুগে অনুভব করছে না? কই সেই সীতা-সাবিত্রী-বেহুলার দলের মা'রের দল, তারা কি ছেলেদের ঠেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দোর বন্ধ করে আরাম উপভোগ করছেন? দেবী, তোমার কল্যাণিনী ঐ নারীশক্তি যে আজ বহির্মুখিনী, সংসার ছাড়া! তারা নিজের বিলাস ভোগের অন্তরায় বলে স্বামী চায় না, পুত্র চায় না; একবার দেশের দিকে, নিজের দিকে সেই ঘর-ছাড়া হবার মনোবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দাও; নইলে এদের তাণ্ডব নৃত্যে যে ভারত ডুববে! এদের বহির্মুখী নৃত্য ধরা আর ধারণ করতে বেশীদিন পারবে না। যদি ত্যাগে বৈরাগ্যে এসে এই নারীশক্তির চরণতলে পড়ে এদের বিলাসনৃত্যের বেগ কথঞ্চিৎ থামিয়ে না দেয়, শীঘ্রই পৃথিবীকে এক ব্যভিচারের তাণ্ডব নৃত্য ছেয়ে ফেলবে, তার পূর্বাভাস বেশ টের পাচ্ছি। ভারতের নারীও আজ স্থানচ্যুত, সে পুরুষের সঙ্গে ক্ষেত্রে সমতার দাবী করছে। নারীই যে পরিবার সমাজ বা জাতির অন্তরতম প্রদেশ, অন্তরেই যে তাদের মহিমা ও মাধুর্য! দেহের ক্ষেত্রে সে নিরাশ্রয়, প্রাণের ক্ষেত্রে সে-ই আবার পুরুষের আশ্রয়। পুরুষ দেহে বড়, প্রাণে খাট, নারী দেহে খাট, প্রাণে বড়। আজ নারী এই গভীর রহস্য ভুলে দেহকে সাজিয়ে গুজিয়ে, দেহকে নাড়িয়ে বড় হতে গিয়ে ডুবতে বসেছে। সে আজ স্বধর্মত্যাগিনী! নারী আজ নাচায় না, সে নিজে নেচেই আজ আর সময় পায় না। ভারতের যশোদা আর গোপালকে নিজের হাতে সাজায় না, তাইই যে সাজবার দিন এসেছে, গোপালের তাই উলঙ্গ দেহেই আনন্দ! নারী আর শোষণ করবার শক্তির পথে কন্যাদী হয়ে দাঁড়ায় না, সে-ই নিজে 'কাপড় আন', 'অলঙ্কার দেও', 'চাকুরী করে টাকা আন' বলে পুরুষকে শোষণই করছে, সে ত আর 'নচ ধনগবিতবান্ধবেষণম্'—এই মন্ত্র স্বামী-পুত্রের কানে দেয় না। যে নারী সরস্বতী সাজে একদিন নিজের বুকের দুধ দোয়াতে পুরে সন্তানকে লিখতে শেখাত, আজ সেই নারী যে পথে রক্ত দিয়ে কলম ডিপিয়ে মজা করে অপরের রক্ত শোষণ করা যায়, সেই পথে একবারও এসে পথ আগুলিয়ে দাঁড়াল না! নারী যে শোষণ-মূর্তি—এ কথা কি সে বিস্মৃত? ওগো আত্মবিস্মৃতা নারীশক্তি, একবার তাকিয়ে দেখ, তোমাদের আত্মবিস্মরণের ভিতর দিয়ে, বেহুলার ক্ষণিক নিদ্রার ভিতর দিয়ে কালনাগ লক্ষীন্দরকে, ভারতকে দংশন করে গেল। আজ নারীর দুধ শুকিয়েছে, সে আর বাঁচাতে জানে না, বাঁচাতে পারে না। যে নারী নিজের মস্তক ছিন্ন করে সেই রক্ত নিজে পান করে সমগ্র বিশ্বকে পান করাত, আজ সেই নারীই নরশোণিতপিপাসু স্বার্থান্ধ বৈদেশিক শক্তির শাসন সহযোগে শিক্ষিতা ও সজ্জিতা হতেও যায়। নারী ছাড়া কে আছে যে অসুরের সঙ্গে লড়াই করতে পারে? তাই চিরকালই নারী অসুরদলনী। সীতা মহীরাবণ বধের সময় 'কালী' সেজেছিলেন, তার চেয়ে বড় লক্ষীত্বের দাবী কি কোন নারী বর্তমান ভারতে করেন? নারী আজ সীতা হতে চায় বনে না গিয়ে, কাঁটার আঘাতে নিজ অলক্তরঞ্জিত চরণ ক্ষত না করে, কালীর মত বৈরাগ্যের সাজ গ্রহণ না করে। বিনা বৈরাগ্যে সৃষ্টি হয় না, তাই নারী আজ বৈরাগ্যও চায় না, সৃষ্টিও চায় না। নারীশক্তির এই অধঃপতন তুমি ছাড়া আর কে ঠেকাবে গো দেবি? পুরুষের অধঃপতন নারী রোধ করতে পারে, নারীর অধোগতি নারী ছাড়া আর কেউ রুধ করতে পারবে না। সকল নারীশক্তির উৎস তুমি, আজ তোমার সামনে আমরা অসুর-ভয়ে ভীত, পদদলিত, উপেক্ষিত, নিরন্ন, উলঙ্গ সন্তানের দল মায়ের উদ্বোধন আশায় ছুটে এসেছি। তুমি এমন প্রাণোন্মাদনা নারীর রক্তে এনে দেও যেন সে সব আবিলতা ধুয়ে ফেলে সমাজ জাতিকে অহিংসা সত্য ও প্রেমের বন্যায় আপ্লাবিত করে দিতে পারে। আজ তোমাকে সব নারীশক্তির মাঝে উন্মাদিনী মূর্তিতে প্রকট দেখতে চাই, নইলে যে রক্ত দিয়ে তুমি সন্তানকে

মোটামোটা করেছ, সেই সন্তান-রক্তেই ভারতের জালিয়ানওয়ালা চিরদিনই রঞ্জিত হবে। দেবি, তোমার রক্ত তোমার পেটাতে না লেগে দেশের মাটি রঞ্জিত করছে, এর চেয়ে বড় অপমান আর তোমার রক্তের সম্মান কি করবে? আমরা বেত্রাঘাতে আর তোমার রক্তের অপমান সহ্য করতে পারছি না। তাই অন্তরস্থ প্রার্থনা করছি তোমার নিজের রক্ত তুমি নিজে পান কর, তাতে আমাদের কোন দুঃখ নেই, কোন অপমান নেই, সন্তান-রক্তে তোমার রক্তপিপাসা প্রশমিত হোক, সন্তানের মরণ সার্থক হোক। আমরা আজ সার্থক মরণকে বরণ করছি।

তুমিই ভারতের মানদা মা; নইলে মানদণ্ড আমরা আর কার কাছে পাব? ভারতেরও যে মান আছে, তার মানেও যে বিশ্বের মানী হতে হবে, তাকে অপমান করতে গেলে যে বিশ্বই অপমানিত হবে—এ কথাটা জগতের মানদাত্রী জগন্মাতা ছাড়া আর কে বোঝাবে? মায়ের মানেই সংসারের মান; পুরুষের আবার মান-ইজ্জৎ কি? নারীর মানেই পরিবার সমাজ জাতি সম্মানিত। গৃহিণীই গৃহ, গৃহিণীর মানে গৃহের মান। 'মা' ধাতু হতে মাতা, 'মা' ধাতু হতেই মান। আমরা 'মা' ধাতুর প্রসাদ হারিয়ে মাতাও হারিয়েছি, মানও হারিয়েছি। যার যার প্রয়োজন মেপে ব্যবস্থা করতে পারেন বলেই জননী মাতাপদবাচ্যা। রামপ্রসাদ গান গেয়েছেন, 'মা হওয়া কি মুখের কথা, প্রসব করলেই হয় না মাতা'। প্রত্যেক সন্তানের বিশেষত্ব রক্ষা করে যিনি একসূত্রে সন্তানগুলিকে বাঁধতে পারেন, তিনিই মাতা; মাতা যেন অন্তপাত্রের L.C.M. (ল. সা. গু.)। আজ ভারতের ওজনে ভারতকে নিজের ওজন বুঝতে হবে—সে কেন এসেছে, কোথায় এসেছে এবং কোন্ প্রয়োজনে এসেছে। এই মহাপ্রশ্নের উদয় যখন তার মাথায় উঠেছে, তখন মহাবিদ্যা মায়ের কৃপা ব্যতীত কেমন করে তার মীমাংসা জানবে? 'কালীতারা মহাবিদ্যা।' ভারত নির্বিশেষ মহাবিদ্যার নির্বিশেষ লীলাক্ষেত্র, সারা বিশ্বের প্রতীক (Epitome of the World)। তাই মা, ভারতের অন্তর্নিহিত আত্মানন্দ আত্মরতি দিয়ে ভারতকে মাপস, ভারতকে চিনস, ভারতকে আস্বাদন করস; আর সেই ভারতকে কেন্দ্র করে বিশ্বের যে মানদণ্ড স্থির করবার একটা দুর্জয় লোভ ভারতের প্রাণে জাগিয়ে দিয়েছে, এই শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণে আমরা সন্তানের বল তোমার বিপ্লবের ভিতর দেহ-মন-প্রাণ সব ঢেলে দিয়ে মূর্তিমান বিপ্লব হয়ে সেই মানদণ্ড নিয়ে বিশ্বকে উপহার দেব। তবেই হবে উজ্জ্বল ভারতে উজ্জ্বল ভারতের প্রতিষ্ঠা। মা, মা, আজ আমরা সত্যই বিপ্লবের ভজনা করছি। হে মা, এমন একটা মানের বিপ্লব, এমন একটা হাসির বিপ্লব, একটা নৃত্যের বিপ্লব, এমন একটা পোষণের বিপ্লব এনে দে, যার ভিতর পড়ে ভারতের পরিবার সমাজ জাতির সব অত্যাচারী শক্তি ভারতভূমি ত্যাগ করে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। আমাদের মস্তকে তোমার বিপ্লব-রাতুল চরণ প্রদান কর, আমরা ধন্য হই!

বন্দেমাতরম্

"পুরুষোত্তম-বিশ্ব পচা গলা এই জগতের বাহিরে নয়; সেই বিশ্ব এই বিশ্বেরই পুরুষোত্তম-অগ্নিতে হজম-হওয়া পুরুষোত্তম-রূপ। পুরুষতন্ত্র স্তরকে পুরুষোত্তম স্তরের কাছে সমর্পণ করিলেই এই স্তরের সব বন্ধন খুলিয়া যায়, এই স্তরের সব কিছু মুক্তির অগ্নিতে জারিত হইয়া এই স্তরেরই বুক চিরিয়া (বুঝায়) ভাগবত রূপে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়, যেমন হংসীমাতার বুকের তাপ পাইয়া ডিম হইতে ছানা বাহির হয়।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

দুর্গাপূজার কথা

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

মানুষের কত বুদ্ধি, কত যোগ্যতা। অথচ এই মানব-শিশুই কত অসহায়! অন্য যে কোন জীবজন্তুর শিশু অপেক্ষা মানব-শিশু সব চেয়ে বেশী এবং সব থেকে বেশী দিন পর্যন্ত সর্বরকমে অসহায় থাকে। এই অসহায় শিশু-কাল তার একদিন শেষ হয়। সে নিজের শক্তিতে—কত রকমের সে শক্তি—শক্তিমান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোন কিছুরই জন্য কিছুরই ওপর তাকে নির্ভর করতে হবে না—এইটিই কি মানুষের সত্য স্বরূপ? না, তা নয়। প্রত্যেক মানুষকে জীবনের কোন না কোন স্তরে কোন না কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করতেই হয়। কোন মানুষের লৌকিক শক্তি, বুদ্ধি, অর্থ, সম্মান কিংবা আর যত কিছুরই যত প্রাচুর্য থাক না কেন তবু মায়ের অম্লান স্নেহের একটু স্পর্শের জন্য, স্ত্রীর প্রীতির একান্ততার একটু আস্বাদনের জন্য, সন্তানের মিষ্টিমুখ হাসির মধ্য দিয়ে তাদের কাছে নিজের স্বীকৃতিটুকুর জন্য মানুষের ক্ষুধা আছেই, থাকবেই। নির্ভরতা তার সুস্থতার জন্য। কোথাও কোন কিছুতে নির্ভরতা নেই—এটা অসুস্থ অবস্থা। কিন্তু অহং-স্ফীত মানুষ সে কথা ভুলে যায়। ভারতবর্ষের সাধক-প্রাণ এ কথা ভুলে যেতে চায় নি। জ্ঞান উন্মেষের প্রথমে সে যে-মাতৃত্বকে তার সমস্ত জৈব সত্তা দিয়ে আঁকড়ে ধরে জীবন-পথে অগ্রসর হয়েছিল, যার উপর সম্পূর্ণ সর্বতোভাবে নির্ভর করতে পেরে তার লৌকিক ও অপনকার আন্তর সত্তা সুস্থ অগ্রগতি ও অস্তিত্ব লাভ করে মনোবিকারের হাত থেকে রেহাই পায়—সে মাতৃত্ব বহুলাংশে জীবন-প্রধান সন্দেহ নেই—তবু এই মাতৃত্বেরই একটি ব্যাপক গভীর কল্পনা করেছে ভারতীয় সাধক তার শ্রীশ্রীদুর্গার মাতৃত্ব কল্পনার মধ্যে।

কে এই মা? আপাত দৃষ্টিতে সব রকমে শক্তিমান যে মানবত্ব, তাকেও প্রেরণা দিতে পারে, আশ্রয় দিতে পারে, অতিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যে শক্তি—এ মাতৃত্ব তাই-ই। মানুষের সাধারণ জীবত্ব দিয়ে কিংবা সেই বুদ্ধি দিয়ে যার গোড়ায় রয়েছে ভেদবুদ্ধির তথা অহং-বুদ্ধির প্রাধান্য—তাই দিয়ে এ মাতৃত্বকে কল্পনা করা হয় নি। মনুষ্যত্বের কত স্তর আছে—যে স্তরে কোন কিছুরই প্রতি সাধক আসক্তও নয়, বিদ্বিষ্টও নয় অথচ বিশ্বের অণু পরমাণুটীর প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাশীল, প্রীতিসম্পন্ন এবং সমুখ-প্রধাবিত গতিশীল জীবনের বিকাশে দৃঢ় পদক্ষেপে ধর্মমুখর—এমনই একটি আনন্দময় চেতনার মধ্য থেকে উৎসারিত হয়েছিল শ্রীশ্রীদুর্গা-সম্বন্ধে অনুভূতি, উপলব্ধি। খুব একটা উন্নত উজ্জ্বল চেতন সত্তাও কোন একটি ব্যাপক গভীর স্নেহ-স্পর্শের মধ্যে আশ্রয় চায়—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সেইখানে জন্ম।

আমার চতুর্দিকে শক্তির খেলা—সমস্ত বিশ্ব জুড়ে শক্তির কত না অদ্ভুত প্রকাশ। সে শক্তির সাথে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি-বিশেষের সম্পর্ক কি? সে শক্তিকে আমি কি এতটুকুও আয়ত্ত করতে পারি? সে শক্তির সাথে কি আমার কোনও সম্বন্ধ হতে পারে? আমি তো এখণ্ড ভূমির উপরে আমার ক্ষুদ্র বৃহৎ আবেষ্টন নিয়ে বিদ্যমান—আমার মন দিয়ে তো আমি বাইরেকে সৃষ্টি করতে পারি না—আর পাঁচজনের মনের সঙ্গে তো আমার ঠোকাঠুকি বাধে—অথচ এই আমার বাইরে কি বিরাট শক্তি—সে শক্তি কল্যাণাত্মক, সে শক্তি ধ্বংসাত্মক—কত রকম তার রূপ!

আমার আধার ক্ষুদ্র হতে পারে—তবু তার মধ্যেই কি ঐ বিরাটকে কিছুটাও অনুপ্রবেশ করান যায় না? মানুষে মানুষে শক্তির তারতম্য হয়, আর এমন নিশ্চয়

হতেই পারে না যে মানুষ তার ক্ষমতাকে বাড়াতে পারে না। তাহলে এই বিরাট শক্তিকে আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করাবার পথ কি? দুর্গাপূজার মধ্যে সেই বিরাটকে আমার মধ্যে—যত সামান্যই হোক—অনুপ্রবেশের পথরেখা অঙ্কিত হয়ে আছে।

বিশ্বশক্তির দুটো রূপের সঙ্গে আমাকে মোকাবিলা করতে হবে—একভাবে সে আমাকে বাধা দেবে—আর একভাবে সে আমার সহযোগিতা করবে। দেখতে জানলে, বুঝতে শিখলে বিশ্বশক্তির এই দুই রূপই নিজ আমাকে জীবনের ক্ষেত্রে এগিয়েই দেয়। যে বাধা দেয়, সেও আমাকে একরকমভাবে এগিয়েই দেয়, যে সহযোগিতা করে সেও আর একরকমভাবে অগ্রসর করিয়ে দেয়। শ্রীশ্রীদুর্গাশক্তির সঙ্গে এই সহযোগিতার পথে আমি কি করে তাঁকে একটু আয়ত্ত করতে পারি, একটু উপলব্ধি করতে পারি তারই প্রয়াস আছে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার মধ্যে।

সৃষ্টি জুড়ে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে মা বলে ডাকলাম—আনন্দ হল; আনন্দই কেবল হল না, চিত্ত প্রশান্ত হল, নিশ্চিন্ত হল। আমার এ দেহকে যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁকেও মা বলেছিলাম। বিশ্বকে যিনি সৃষ্টি করছেন, সে শক্তিকে মাতৃ নামে সম্বোধন করলে তাতে ক্ষতি কি? মা, মা, মা! যিনি সৃষ্টি করলেন তিনি মা—মায়ের ভালো রূপও আছে, মন্দ রূপও আছে। কালী মূর্তিতে তাঁর ধ্বংসাত্মক রূপেরই প্রাধান্য—দুর্গা মূর্তিতে তাঁর কল্যাণী রূপ ফুটে উঠেছে। মায়ের দুর্গা-রূপকে নমস্কার—তাঁতে প্রণত হয়ে নিজেকে স্থির করব, শান্ত করব—তাই পূজা করি।

তিনি স্রষ্টা—সে সৃষ্টির নিশ্চয়ই একটা নিয়ম কানুন আছে। আমাকেও তো সৃষ্টি করতে হবেই—তিনি বিরাট বিশ্বের স্রষ্টা, আমার ছোট্ট পরিধিতেও আমি সৃষ্টি করতে করতে চলি। তাঁর সৃষ্ট আমি। তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন—আমার মধ্যেও নিশ্চয়ই সৃষ্টি করবার একটা প্রবণতা তাঁর থেকেই এসে গেছে। একটি আমকে যে গাছটা সৃষ্টি করল, সেই আমটির মধ্যে ঐ রকম একটি আম গাছ সৃষ্টি করবার সমস্ত ক্ষমতা এসে গেল। বিশ্বস্রষ্টা মা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন ঐ আমের মতই। এ বিশ্বে আমাদেরও প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করেই চলতে হয়।

সৃষ্টি করবার কৌশলটা তো শিখতে হবে। দুর্গাপূজার তত্ত্বে সেই সৃষ্টি-কৌশলের খবর আছে। অতীতের ফল বর্তমান—ভাল মন্দ নানা সংস্কার নিয়েই সে বর্তমানে আছে। নূতন সৃষ্টি করবার পথে সেই ভাল মন্দ অতীত সংস্কার বর্তমানের সঙ্গে খাপ খায় না—তাদের অনেককেই কাটিয়ে উঠতে হয়—বাধা দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিধাতার অদ্ভুত ব্যবস্থা। মানুষের মধ্যেই যেমন আছে নূতনকে জন্ম দেবার প্রেরণা, আবার তার মধ্যেই রয়েছে অতীতকে আঁকড়ে থাকবার প্রবণতা—এই দুইয়ের সঙ্গে মানুষকে লড়তে হয়। দুর্গাপূজার তিনদিনের প্রথম দিনে—সপ্তমী পূজার দিনে—এই মন্দ ও ভাল সংস্কারের থেকে মুক্তি পেয়ে নূতনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা অর্জনের প্রয়াস। ভাল সংস্কার যে সব অবস্থায় সব সময়েই ভাল তা তো নয়—একদিনের ভাল আর একদিনে অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমাদের মন অভ্যস্ততার মধ্যে খানিকটা আশ্রয় পায়, তাই যে-রকমটাতে তার অভ্যাস, অপ্রয়োজনীয় হলেও তাকে ছাড়তে চায় না। কিন্তু জীবনস্রোত ভাল মন্দ সবকেই ছাড়িয়ে চলেছে। সপ্তমী পূজার দিনে ভালমন্দ সংস্কারেরই প্রতীক মধু ও কৈটভ অসুর বধ করার শক্তি মায়ের কাছে চাওয়া।

যে সংস্কারটা আমার সমাজ পরিবার ও ব্যক্তির অন্তর-প্রকৃতি ও বাইরের আবেষ্টনের মধ্য দিয়ে আমার মধ্যে দৃঢ় হয়ে আছে—সত্য তো তবু তাতেই নেই—তাই আমার ভালমন্দ উভয় সংস্কারকে পেরিয়েই সত্যের খোঁজে চিরদিন এগিয়ে যেতে হয়। সপ্তমী দিনে মাকে শুধু বলি—মা, সত্য কোথায় কোনটাতে আমাকে বুঝিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও। প্রাণ ভরে আকুল হয়ে বলি, মা আমি সত্য চাই। সত্যের দুই রূপের সন্তোষজনক সমাধান দিয়ে যে সত্য দাঁড়াতে পারে সেইটেই চাই—সত্যের use-value এবং সত্যের in-itself value। প্রয়োজন

প্রত্যেকের আলাদা—কোথায় দাঁড়াবে? আমার crucible-in-self বলে যেটাকে ধরে নেওয়া আছে—তাকে ধরতে গেলে বাস্তব প্রয়োজন মেটান যায় না, তাতেও সত্যের পুরো রূপ নেই। তাই মা, তোমার কাছে চাই সত্যের সন্ধান—সংকীর্ণ কাটানো সত্যের সন্ধান। সপ্তমী পূজার দিনের এই আকুতি—ক্ষুদ্র সংস্কার কাটিয়ে সত্য চাই।

নূতন সৃষ্টির যে পরিকল্পনা আমার ছিল, অতীতের ক্ষুদ্র সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে তাকে রূপ দেবার পথে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু সংঘবদ্ধ না হয়ে তো ব্যক্তিগত ভাবে আজ কোন কিছুই গড়তে পারা যাবে না। এই সংঘবদ্ধতা শিখতে অষ্টমী দিনের পূজা। সংঘবদ্ধতা শেখাবেন বলেই আজ মা-ও একক সৃষ্টি নন, সমবেত সৃষ্টি—সর্বদেবশরীরজা দেবী অষ্টমী পূজার দিনে সংঘবদ্ধতা যে হানি করে সেই মনোবৃত্তির নাম মহিষাসুর। সে অসুরকে বধ করতে দেবী নিজের দেহকে সমস্ত দেবতার থেকে অংশ নিয়ে নিয়ে বানালেন—তাঁদেরই দেওয়া অস্ত্র নিয়ে নিয়ে নিজেকে বহু অস্ত্রধারিণী করে তুললেন তারপর বিচ্ছিন্নতার অসুরকে বধ করলেন। আজকের দিনে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে কোন্ তন্ত্রানুযায়ী? শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল রচনা করেছিলেন যে কৌশলে, সেই নিয়মে। প্রতি দুইজনের মাঝে কৃষ্ণ অর্থাৎ একটী বিশ্বরূপ জীবন। বিশ্বরূপ মানে একই সময়ে ব্যাপক গভীর একটী জীবন যা বন্ধুকে একান্ত স্বকীয় বলেও জানে না, একান্ত পরকীয় বলেও জানে না। অর্থাৎ সে জীবন জানে যে বিশ্বে প্রতিটি বস্তু তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল হয়েও অপরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সত্য। এমনই বিশ্বরূপ জীবনের সঙ্গে অন্যান্য সবকে সম্বন্ধ হয়ে আজ সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, সঙ্ঘ রচনা করতে হবে। বিশ্বরূপকে মাঝখানে না রেখে দুইটি স্বতন্ত্র আমি পৃথীভবন হয়ে সঙ্ঘ রচনা করতে সক্ষম হবে না কেননা সেই দুই তাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ঠোকাঠুকিতে কিছুতেই মিলতে পারবে না। প্রতি দুইটীর স্বতন্ত্র আমি যদি ব্যাপকতর বিশ্বের মধ্যে না মেলে—দেশের স্বার্থে, ধর্মের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে কিংবা অন্য যে কোন ব্যাপকতম আদর্শে—তাহলে তাদের পারস্পরিক অহংবুদ্ধি কিছুতেই সুস্থ সঙ্ঘবদ্ধতা এনে দেবে না। এই সঙ্ঘবদ্ধতা আনবার কথা রয়েছে অষ্টমী দিনের পূজায়। সেদিন মাকে বলি—মা, আমরা মিলব—তোমার ব্যাপক গভীর জীবন-চেতনার মধ্যে আমরা মিলব। মানুষে মানুষে মিলেমিশে আনন্দে থাকবে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকৃতির ঠেলায় একথা মানুষ ভুলে গেছে—অথচ একথাটাও তারা জানে না যে আগেকার দিনের মত মেলা যাবে না এটা যেমন সত্য, তেমনি আজকের দিনের মত না মিলেই মানুষ অধিক পীড়িত এ কথাও তেমনি সত্য। মিলতে মানুষকে হবেই—নূতন পথে, নূতন ভাবে। মানুষের সাথে মিলেমিশে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকবার প্রয়োজন আছে যেহেতু আমরা মানুষ, পশু নই। কিন্তু যতই বাইরে থেকে অনেক মতবাদ প্রচলিত হোক না কেন সত্যিকারের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার পথের রেখা এখনও সেখানে ফুটে ওঠে নি। প্রাণের আঠা ছাড়া কি কোন সত্যকারের সঙ্ঘ হয়? আইন ঘিরে নিয়ম মেনে মানুষের সামগ্রিক জীবনের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষিত হয় না—হৃদয় যদি সেখানে অনুপস্থিত থাকে। নিয়ম শৃঙ্খলা অবশ্য অবশ্যই থাকবে, কিন্তু প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের অহেতুক প্রেমের পথেও শৃঙ্খলা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, অথচ আইনের পথে শৃঙ্খলা আনতে চাইলে তাতে হৃদয়ের স্ফুরণ হয় না। যে সঙ্ঘবদ্ধতায় হৃদয় থাকে না—যে হৃদয় সকলের যথা মর্যাদা, যথা মান, যথা প্রয়োজন স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধি করে—সে সঙ্ঘবদ্ধতায় সমাধান নেই। সে রকম তো অসুরদেরও সঙ্ঘ আছে, কিন্তু সকলের অন্তরের মান মর্যাদা স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি নেই সেখানে। মায়ের অষ্টমী দিনের পূজায় এই হৃদয়ের পথে সঙ্ঘবদ্ধতা আনতে শিখব—সকল দেবতার মধ্য দিয়ে যে মা সৃষ্টি হয়ে উঠেছেন তিনি আমাদের নিশ্চয় শেখাবেন আমরা সকলে কেমন করে মিলতে পারি।

সৃষ্টিতত্ত্ব এখানেই শেষ নয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমার সৃষ্টি রূপ নেল, কিন্তু সেই সঙ্গেই সে সৃষ্টিকে ভোগ করবার বাসনা জেগে উঠতে পারে। তাই নবমী পূজায়

দিনে আমাকে আমার সৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আমার সৃষ্টি যেন আমাকে পেয়ে না বসে —'তোমারে সৃষ্টির মাঝে তুমি যে মহৎ তাই নব জীবনের রথ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় সৃষ্টিরে তোমার বারংবার'। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা মহৎ হতে না পারলে সে সৃষ্টি তামসিকতায় পর্যবসিত হয়—সর্বত্র আজ এই রোগ করার তমঃ-অন্ধকারের আচ্ছন্নতা। মা, তুমি দাঁড়াও—সৃষ্টির মধ্যে আটকে পড়া থেকে দাঁড়াও—নবমী পূজা দিনে সাধকের এই-ই প্রার্থনা। সৃষ্টির ওতঃপ্রোত হয়েও, সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত থেকেও বিশ্বস্রষ্টা মা তার বাইরে আছেন, সব কিছুর অতীত হয়ে আছেন এ কথা যখন সত্য, তখন আমিও তা শিখব না কেন? শিখতে পারব না কেন? নবমী পূজায় তাই-ই শিখব।

তিন দিনের পূজায় সৃষ্টি-তত্ত্ব দিয়ে জীবনটাকে যখন ভরপুর করে নিতে পারি মুক্তির আনন্দ দিয়ে, জীবনে তখন প্রকৃতির অনন্ত ঝাঁপাথে একবারের জন্য বিলয় আসবে, আনন্দ পাব, চারদিকের আবেষ্টনে প্রীতি প্রকাশিত হবে, পথে ঘাটে কুণ্ঠাহীন কোলাকুলির আনন্দ বিচ্ছুরিত হবে। আবার বাঁচা করতে হবে সংসারের মধ্যে সেই পাওয়ার আনন্দটুকু নিয়ে, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া শক্তিটুকু নিয়ে। এমনি করেই জীবন চলে —ঐ যে মায়ের মধ্যে একবারের জন্যও ডুব দিতে পারলাম, ঐটুকুতেই জীবনের পাথেয়ের জোগান হয়। মায়ের নামে যদি আনন্দিত থাকতে পারি জীবনে সেইটে মস্ত লাভ, মস্ত বিজয়। তাই মায়ের পূজা মানি—পূজা যদি এতখানি অর্থ বহে, এতখানি শ্রদ্ধা নিয়ে যাতে মায়ের শক্তি দিয়ে আমরা আমাদের বদলে নিয়ে নূতন মানুষ হয়ে জগতের আনন্দ-যজ্ঞে মানুষের মত যোগ দিতে পারি। জয় হোক সেই মাতৃশক্তির যা আমাদের নূতন মানুষ, অধিকতর সুন্দর মানুষ হবার শক্তি দেবে।

দশপ্রহরিণী

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন ॥

তপস্যাবলে হয়ে বলীয়ান দুর্মদ মহিষাসুর—
দেবতার দলে দলিয়া সমরে জিনিল অমরাপুর।
মিলি সুর সবে ব্রহ্মার সনে
জানাল বার্তা শিব নারায়ণে
"রক্ষ রক্ষ আজি দেবগণে"—ঘটে করুণ-সুর।
শিব ও বিষ্ণু ব্রহ্মা-বদন রোষানলে জ্বলে উঠে
মহাতেজপ্রভা নীল নীলিমায় উদ্দাম বেগে ছুটে।
ইন্দ্র সূর্য চন্দ্র পবন,
রক্ত রাগেতে ভীম হুতাসন,
দেবতা দীপ্তি ব্যাপি ত্রিভুবন নারীমূর্তিতে ফুটে
ব্রহ্মার তেজ ফুটিল দেবীর শ্রীপাদপদ্মদ্বয়
শম্ভু দীপ্তি পড়িয়া তুলিল আনন অমুতময়।
নিম্বিত বাহু বিষ্ণুর বলে,
অগ্নির তেজে ত্রিনয়ন জ্বলে,
হ'ল উদ্ভূতা অম্বা ভূতলে—হাতে লয়ে বরাভয়।
শূল মহাস্ত্র মায়ের হস্তে দানিলেন ত্রিপুরারি
কমণ্ডলু দানেন ব্রহ্মা—চক্র চক্রধারী।
বরুণ শঙ্খ—যম শমন,
দেন ধনুর্বান প্রণমি পবন,
ইন্দ্র দিলেন অশনি ভীষণ ঘীর হস্তের ছড়ি।
আসিয়া উঠেন জগজ্জননী প্রহরণ দশহাতে
ধাইয়া চলেন হানিতে ত্রিশূল মত্ত মহিষ মাথে।
অসুরের সাথে বাধে মহারণ;
অট্টহাসে কাঁপে ত্রিভুবন,
গাহে ওঁকারগান যত দেবগণ বিজয় ঋষি সাথে।

শোপেনহরের দুঃখবাদ

॥ শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায় ॥

শতাব্দীপারের কাব্যরসমোদীর উদ্দেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অভিবাদন জানাইয়া গিয়াছেন, প্রার্থনা এই কবির বসন্তদিনেও যেন শুরিত হইয়া উঠে। বিশ্ব-কবির কাব্যে যে আনন্দ-রস শতধারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে অনাগত যুগের কাব্যরসিকদের চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে। ধূলি-মলিন ধরণীতে কল্পলোকের স্নিগ্ধ আলোক-সম্পাত করিয়া সুখদুঃখের যে বিচিত্র ইন্দ্রধনু রচনা করিয়াছেন তাহাতে সুখ ও দুঃখ একই মাল্যবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে, তাই কবির এই আশা ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু এখন হইতে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে ইয়োরোপের দার্শনিক-কেন্দ্র জার্মানী হইতে যে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নৈরাশ্যের বিরাট মহাকারুণ্যরূপে তাহার আর দ্বিতীয় দোসর হয় কোনও দেশে কোনও কালে রচিত হয় নাই। শোপেনহরের The World as Will and Idea গ্রন্থ ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়া দার্শনিক জগৎকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। আশার কবির বিদ্যুৎস্ফুরণও এই দুঃখতমিস্রার নীরন্ধ্র কালিমা ভেদ করিয়া তাহার শেষ প্রান্তটুকুও আলোকিত করিতে পারে নাই। তাঁহার মতবাদ এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, শোনা যায় একদল অপরিণত-বুদ্ধি ব্যক্তি দুঃখদুর্দশাপীড়িত পৃথিবীকে বাসের অযোগ্য বলিয়া ও জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া স্বহস্তে প্রাণবিয়োগ নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিলেন।

শোপেনহরের দুঃখবাদের মধ্যে যে নৈরাশ্যের কালোছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা ঐ যুগে অনন্য নহে; সমসাময়িক ইয়োরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে তাহা বিলসিত দেখিতে পাই। ইংলণ্ডে বায়রণ, ফ্রান্সে ভ্যুমুসে, ইটালিতে লিওপার্ডি, জার্মানীতে হাইনে, রাশিয়ায় পুশ্কিন প্রভৃতির সাহিত্যে যে ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, অতৃপ্তি ও অবসাদের করুণ সুর ঝংকৃত হইয়াছে শোপেনহরের মধ্যে তাহারই চরমতম দার্শনিক অভিব্যক্তি ও বিলাপ।

এইরূপে সারা ইয়োরোপে যে একদল নৈরাশ্যবাদী কবি ও সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা আকস্মিকতা-মাত্র নহে। ফরাসী মহাবিপ্লব ও নেপোলিয়নের উত্থান পতনের পর পাশ্চাত্ত্য জগতের সামাজিক ও রাজনৈতিক কল্পাবাতময় পরিস্থিতির মধ্যে অতি বড় আশাবাদীর পক্ষেও আশার প্রদীপখানি অনির্ব্বাণ ও অম্লান রাখা সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধ, বিপ্লব, প্রতি-বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও এক-নায়কতার অভিশাপ ঘরে ঘরে দুঃখ দুর্দ্দশার যে কালিমা লেপিয়া দিয়াছিল, তাহার ফলে চিরাচরিত সামাজিক জীবনযাত্রা প্রণালী একেবারেই পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল। সৈন্য ও সমরোপ-করণ চালনা ও প্রতিচালনার ফলে কর্ষিতভূমি ও শস্যসম্ভার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল করিয়া দিয়া দেশে ঘটাইয়াছিল চরম খাদ্যাভাব ও বুভুক্ষা। সমর্থ, সক্ষম ও শক্তিমানের মধ্যে অনেকেই স্বদেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল এবং আরও অনেকে আজীবন পঙ্গু হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য ও অবসাদের মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতেছিল। বিজয়ী ও বিজিত উভয়ের মধ্যে জীবনের সমস্যা সমভাবেই তীব্র ও জটিল হইয়া দেখা দিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী উদ্গীত হইয়াই আবার কোন্ রক্তসমুদ্রের অতল তলে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইল। ভূস্বর্গের কল্পনা আকাশকুসুমের কুঞ্জবনের মতোই হইল অলীক। বিপ্লবদেবতার বরপুত্র স্বয়ং নেপোলিয়ন

অবশেষে প্রতিক্রিয়াদানবের লোহপুতুলরূপে আপনাকে বিলাইয়া দিলেন। বৈপ্লবিক উদ্দীপনার অন্তে আবাহীন জড়তা ও অবসাদ ইয়োরোপের প্রাণশক্তিকে করিয়া দিল নির্বীর্য। বর্তমানের বেদনাময় রিক্ততার মধ্যে যুগের অতীত ও যুবকসম্প্রদায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সান্ত্বনালাভের ব্যর্থ প্রয়াস খুঁজিতেছিলেন; সে অতীত ও ভবিষ্যৎ একদিকে হিজ অভিজ্ঞতার রিক্ত এবং অন্যদিকে অবসন্ন কল্পনার দিশাহারা। জীবন ও জগৎ বুঝি কখনও এরূপ শূন্য, নিরর্থক ও হীন বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। ইয়োরোপের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের কল্পনা দুরদিগন্তের প্রান্তরেখায় বিলীয়মান আলোকরশ্মির মতোই অপসৃয়মান বলিয়া মনে হইল। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর পটভূমিকায় সমসাময়িক দুঃখবেদনা ও অবসাদ যে ক্ষণিক পরিস্থিতি মাত্র এবং সত্য, শান্তি, প্রেম যে জীবনের চিরন্তন ভিত্তি—এই উপলব্ধিতে বুক বাঁধিবার মতো মহৎ শক্তি ও সাহস কয়জনেরই বা থাকিতে পারে? স্বয়ং মহাকবি গোটে পর্যন্ত বলিয়াছেন—'Thank God, I am not young in so thoroughly finished a world'। কবিগুরু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আশার বাণী—

Bliss was it in that day to be born
But to be young was very heaven,

পরবর্তী বিপ্লবোত্তর যুগের রিক্ততা ও ব্যর্থতার পট ভূমিকায় কতোই না করুণ ও মর্মান্তিক।

Problem of Evil সম্ভবতঃ ইয়োরোপীয় দর্শনে ও সাহিত্যে ইতিপূর্বে এমন উগ্র ও অনিবার্যভাবে মাথা তুলিবার অবকাশ পায় নাই। মধ্য হইতে নিম্ন পর্যায় প্রত্যেক জনপদের অধিবাসীই বিস্মিত ও বেদনাহত চিত্তে এই প্রচণ্ড ব্যর্থতা ও পরিহাসের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার কোনও নিগূঢ় ইঙ্গিত ও মঙ্গলময় ইচ্ছা নিহিত থাকিতে পারে এই প্রশ্নে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বজগৎ ও প্রবহমান ঘটনাবলির কোনও মঙ্গলজনক পরিণতি নাই। ইহা কি কোনও অস্থিরচিত্ত ও অতিখেয়ালী দেবতার হুজুগে উল্টা খেলামাত্র? অথবা বুদ্ধির সন্ধানী আলোকের দ্বারা বিশ্বের চরম সত্য অনুসন্ধানের ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল এবং বুদ্ধি-আশ্রয়ী যুগের অনিবার্য পরিণাম? বিশ্ববিধাতা বুদ্ধি এইরূপে অতি বুদ্ধির ধ্বংস ঘটাইয়া সনাতন শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সংশয়হীন প্রত্যয়বুদ্ধিকে আবার তাহার হৃত সিংহাসনে পুনরভিষিক্ত করিবেন। হিগেল, নোভালিস, শ্লাটোমাখার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও গোগল প্রভৃতি মনীষীরা আবার মানুষকে ডাক দিয়া আপনার অন্তর সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিলেন। কিন্তু অপর অনেকে এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নরূপে দিবারও চেষ্টা করিলেন। ইহাদের মতে ইয়োরোপের এই যে বিমুখন বিপর্যয়, ইহা শুধু আকস্মিক নহে, সমগ্র বিশ্বরহস্যের অন্তর্লীন বিরাট স্বেচ্ছাচারী ও সতত সক্রিয় মহাশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। শোপেনহরের দর্শনে এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা সোচ্চার।

শোপেনহরের নৈরাশ্যব্যঞ্জিত মতবাদের মর্মমূলে একদিকে রহিয়া গিয়াছে সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিহাস এবং অন্যদিকে তাঁহার ব্যক্তিগত ও পরিবারিক জীবনের ব্যথাবেদনার করুণ কাহিনী। তাঁহার জনকজননীর চরিত্র ও মনোবৃত্তি পরস্পরের সম্পূর্ণই বিপরীত ছিল; পরস্পরের পরিপূরক না হইয়া তাঁহারা পরস্পর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই বিরোধ ও অসামঞ্জস্য তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনে অনর্থ ঘটাইয়াছিল। পিতা ব্যবসায়জীবী ও বস্তুতান্ত্রিক, মাতা সাহিত্যিক, কবি এবং ভাব-বিলাসিনী। গদ্যে ও পদ্যে এই মিলন সুখকর ছিল না। কোনও অজ্ঞাত কারণে পিতা আত্মঘাতী হইয়াছিলেন এবং বিলাসিনী শোপেনহর-জননী উৎকেন্দ্রিক ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাতাপুত্রে প্রায়শঃই মতান্তর ও মনান্তর হইত। অবশেষে তাঁহাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল এবং মাতার অবশিষ্ট পঁচিশ বৎসর জীবৎকালে আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। মাতৃস্নেহের পরিবর্তে আজীবন বিরাগ ও বিদ্বেষই তিনি পাইয়াছিলেন এবং লজ্জায় ও ক্ষোভে তিনি বিবাহ পর্যন্ত করেন নাই। শোপেনহরের পিতামহী উন্মাদিনী হইয়া পারিবারিক

অশান্তির কারণ ঘটাইয়াছিলেন। শোপেনহরের প্রতিও স্ত্রীদ্বেষী মতবাদের মূলে এই দুঃখের কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। তিনি চিরদিনই ছিলেন নিঃসঙ্গ, আত্মকেন্দ্রিক ও সন্দিগ্ধচিত্ত। কৌমারাবস্থা পর্যন্ত আজীবন একাকী চলিয়াছিলেন এবং রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিবার পূর্বে গুলিদ্বারা পিস্তলটিও সযত্নে পরীক্ষা করিয়া লইতেন। মহাকবি গ্যেটে অপেক্ষাও তিনি স্বাধীনতার সর্বপ্রকার উত্তেজনা হইতে নিজেকে দূরে রাখিতেন। দার্শনিক ফিকটের প্রভাবে একবার মাত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের জন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঐগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং দার্শনিক গ্রন্থাদি রচনে মনঃসংযোগ করিলেন। আরও একবার তিনি নিঃসঙ্গ জীবনের নীরবতা ত্যাগিয়া নিজের মতবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হেগেলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হেগেলের বক্তৃতা করিবার নির্দিষ্ট সময়টি নির্বাচিত করিলেন। ফলে দেখা গেল তিনি প্রায় শূন্য কক্ষেই বক্তৃতা দিতেছেন। ক্ষোভে ও অপমানে তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মাড়ান নাই এবং আজীবন হেগেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করিয়া গিয়াছেন।

জগতে ও জীবনে বিষাদ ও ব্যর্থতার নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়া শোপেনহরের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছিল। দার্শনিকের পক্ষে যে নিরাসক্ত মন লইয়া জগৎ ও জীবন-প্রবাহের নির্লিপ্ত দ্রষ্টার মতো দর্শন ও বৈজ্ঞানিকের মতো উহা বিশ্লেষণ করিবার মানসিক স্থৈর্য ও শক্তির প্রয়োজন, বিক্ষুব্ধচিত্ত শোপেনহরের তাহা ছিল না। তাই তিনি সমসাময়িক যুগ ও নিজের জীবনের পূর্বাবর্তে আবর্তিত হইয়া দিশাহারা হইয়াছিলেন; সামঞ্জস্যের সূত্রটিকেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

দর্শনের সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় শোপেনহর পূর্বগামী দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের মত অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আপাতিক জ্ঞান আমাদের সংবেদন (sensation) অনিত্য ও অবিজ্ঞাতার বাহিরে জগতের অস্তিত্ব নাই—I say the world is my Idea। ফিকটে যখন অন্তরূপভাবে আর একটি মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, দার্শনিক-ভাবে ভাবিত জার্মানী রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করিয়াছিল—What does his wife say? শোপেনহরের অবশ্য সে বালাই ছিল না। সুতরাং সে প্রশ্নও উঠে নাই। বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব বা চরমসত্তা আমাদের সংবেদনার অগোচর এবং কাণ্টের মতে তাহা অজ্ঞেয়। শোপেনহর ইহা পুরাপুরি অস্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বিশ্বের চরমতম সত্তা দুর্জ্ঞেয় হইলেও অজ্ঞেয় নয়। কারণ আমরা সেই চরম সত্তার অংশ এবং তাহা হইতেই উদ্ভূত। সেই শক্তিই আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়তই সক্রিয়। ঐ শক্তির সহিত অনুভূতি ও প্রজ্ঞার দ্বারা একাত্ম হইতে পারিলেই আমরা তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। এই পরমশক্তির স্বরূপ জানিতে পারিলে আমরা নিজেদের স্বরূপও উপলব্ধি করিতে পারি। বলা বাহুল্য, ইহা যেন বেদান্তদর্শনের প্রতিধ্বনি। শোপেনহরের মতে জড় ও চৈতন্যময় বিশ্বের অন্তরালে যে শক্তি ওতঃপ্রোত থাকিয়া তাহার ক্রিয়া চালাইয়াছে, তাহা এক সার্বভৌম নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-শক্তি (will)। এই অন্ধ আবেগ এভাবে যে বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিল তাহার উদ্দেশ্য কি এবং সার্থকতা কোথায়? হেগেল এই শক্তিকে জ্ঞানময় ও মঙ্গলময় বলিয়াছেন এবং এই প্রকাশের মধ্যে কোনও কল্যাণময় উদ্দেশ্য নিহিত আছে যদিও আমাদের সসীম জ্ঞানে তাহা ধরা পড়ে না। কিন্তু শোপেনহর, অনেকটা হেগেল-বিদ্বেষের বশেই, বলেন যে বিশ্বের মূলীভূত উপাদান ও চরমতত্ত্বের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, পরম ও কেবলের কোন উদ্দেশ্য কল্পনা করা দুর্বুদ্ধিমাত্র। এই অন্ধ আবেগ পূর্বে নিষ্ক্রিয়তার অন্তঃপুরে নিলীন ছিল। ইহার বিশ্বপ্রকাশ কেবল খুশী ও খেয়ালের বশে। হয়তো বা ইহাই তাহার প্রথম প্রমাদ (initial mistake) যাহার খেসারত আজিও তাহাকে বহন করিতে হইতেছে।

সে যাহা হউক, নিষ্ক্রিয় ইচ্ছাশক্তি সক্রিয় হইয়া যখনই অন্ধ আবেগে বাহির হইয়া পড়িল তখনই তাহার ঘটিল বিশ্বপ্রকাশ। ম্যাক্সিম তাই বিশ্বকে বলেন ঘনীভূত ইচ্ছাশক্তি (Objectification of Will)। এই প্রকাশের অন্তর্নিহিত রূপে আসল দুঃখ, অতৃপ্তি ও সংঘাত; তাই জগৎ দুঃখ ও সংঘাতময়। পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ যেমন রূপায়িত সংকল্প তেমনই সমস্ত শক্তিই ইচ্ছাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। বহির্বিশ্বে যেমন মানুষের মনোজগতেও সেইরূপ, ইহা সতত ক্রিয়াশীল এবং সমস্ত কিছুই অনিবার্য গতিতে দুঃখ ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

শিশু যেমন নিত্য নূতন খেলার সামগ্রী আবিষ্কার করিয়া আপন মনের খেয়ালে ভাঙাগড়া করিতে থাকে এবং কিছুতেই তাহার পরিতৃপ্তি নাই, এই সর্বময় সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তিও তেমনি 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনও খানে' বলিয়া চলিতে চলিতে মানব-সৃষ্টিতে আসিয়া পৌঁছিল। বিশ্বে প্রকাশিত হইয়া সে কি ভুলই না করিয়াছে। এখন এমন একটি জীবসৃষ্টির প্রয়োজন যাহাতে তাহার যাবতীয় বহুধা কার্যাবলি সঙ্কুচিত ও সুসবদ্ধ হইবে। কিন্তু মানবসৃষ্টিতে তাহা সফল হয় নাই, হইবারও নহে। বরং আরও জটিলতার সৃষ্টি হইল। শোপেনহয়ের মত আশাতিক দুঃখবেদনার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে পুনর্জন্মের বিষয়কে প্রত্যাহার করিয়া নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে টানিয়া লইতে হইবে। অবশ্য মানুষ এই কার্যে খানিকটা সাহায্য করিতে পারে। অন্ততঃপক্ষে ইচ্ছাশক্তির স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিয়া সর্ব-প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইতে হইবে।

ইয়োরোপীয় দর্শনে এতাবৎ মনের যতটা চিন্তা ও চেতনার (consciousness) মধ্যে নিহিত ছিল। ডেকার্তের বিখ্যাত সূত্র Cogito ergo sum (আমি চিন্তা করি অতএব আছি) মানুষের অস্তিত্ব চেতনার মূলে চিন্তা ও ভাবনাকে স্থান দিয়া সর্বপ্রথমে এই মতবাদ প্রচার করে। শোপেনহয় আরও গভীরে গিয়া মন ও চেতনার অন্তরালে এই অন্ধ সহজ শক্তির প্রচ্ছন্ন অথবা স্পষ্ট লীলা দেখিলেন। বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তিনি বলেন, Will is the strong blind man who carries on his shoulder the lame man Reason who can see। ইহা সাংখ্য দর্শনের পুরুষ প্রকৃতি বিষয়ক প্রসিদ্ধ উপমাটি স্মরণ করাইয়া দেয়। সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া মানুষকে বুদ্ধিমান জীব rational animal বলা হইলেও মূলতঃ কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা ও কার্য প্রণালীর অধিকাংশই বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে, আবেগ বা প্রবৃত্তির দ্বারাই অনুপ্রাণিত। মানুষকে চালিত করিতে হইলে যেখা যায় যুক্তিতর্কের অপেক্ষা তাহার প্রবৃত্তি ও স্বার্থবুদ্ধির নিকট আবেদন করাই অধিকতর ফলপ্রসূ। বুদ্ধি ও বিচারশক্তি কখনও কখনও মানুষের কার্যকর্মের নিয়ামক হইলেও তাহারা আসলে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির ভৃত্য মাত্র। স্বরাষ্ট্র বিভাগে ইচ্ছাশক্তিরই প্রাধান্য, বুদ্ধি পররাষ্ট্র সচিব। মানুষের চরিত্র বুদ্ধি-আশ্রয়ী নহে, প্রবৃত্তি-আশ্রয়ী। বুদ্ধি ও জ্ঞান মানব চরিত্রের ভিত্তি নয়, সহায়ক মাত্র। সকল দেশের ধর্মশাস্ত্রে হৃদয়বৃত্তির বিশুদ্ধিতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্বের উপর নহে। আবার মানুষের পক্ষপিপ্ত, সহজাত প্রবৃত্তি ও সংস্কার চিরদিনই অতর্কিতে বুদ্ধিকে পরাভূত করিয়া চলিয়াছে।

মানুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিও ইচ্ছাশক্তির ক্রমীভবন মাত্র। প্রাণ বা প্রাণশক্তিও ইচ্ছাশক্তিরই নামান্তর। রক্ত মাংস দিয়া উপশিরা সমস্তই ইচ্ছা-শক্তির সৃষ্টি। জানিবার ইচ্ছা হইতে মস্তিষ্ক, দেখিবার ইচ্ছাই চক্ষু, শুনিবার ইচ্ছাই শ্রবণেন্দ্রিয়—সমস্তই অন্তর্লীন ইচ্ছাশক্তির বিভিন্ন যন্ত্র মাত্র। The body is nothing but the objectified Will. বুদ্ধি হইতে প্রবৃত্তির এই আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতই পরবর্তীকালে ফ্রয়েড, ইয়ুং ও ল্যামার্ক প্রভৃতির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

বুদ্ধি যুক্তির ধার ধারে, অবসাদ আসে বিশ্ব প্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া নিদ্রার মধ্যেও নিরন্তর সক্রিয় থাকে। মস্তিষ্কের (cerebrium) সহিত অসংযুক্ত পেশী ও যন্ত্রাদি, যেমন হৃৎযন্ত্র, নিদ্রার মধ্যেও তাহাদের ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখে। জৈবজগতে ইচ্ছা-শক্তির একটী বিশিষ্ট প্রকাশ সহজাত সংস্কার রূপে এবং এই সংস্কারগুলির মধ্যে সর্ব প্রধান হইতেছে জিজীবিষা (Will to Live)। এই সংস্কারগুলিতে ইচ্ছাশক্তি প্রায় বুদ্ধি-নিরপেক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। অনিবার্য মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে জীবজগতে সর্বত্রই কি মর্মান্তিক প্রয়াসই না চলিতেছে। শুষ্ক বীজের মধ্যে জীবনীশক্তি বহুকাল সঙ্গোপনে আপনাকে লুকাইয়া রাখে, প্রমাণ মিলিয়াছে—জীবন্ত কেহ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া চূণাপাথরের মধ্যে অতি সঙ্গোপনে প্রাকৃতিক বুদ্ধিপাক এড়াইয়া টিকিয়া গিয়াছে। কিন্তু অবশেষে মৃত্যু আসিয়া জীবনের প্রদীপটি নিভাইয়া দেয়। তবুও কিন্তু বাঁচিবার সাধ মৃত্যুর উপর জয়ী হইয়াছে বংশ পরম্পরার মধ্য দিয়া। জীবসৃষ্টির এই রহস্যময় প্রক্রিয়ার মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তি কার্যকরী হইয়াছে তাহা একান্তই বুদ্ধি-নিরপেক্ষ। শোপেনহর বলেন—Will shows itself here as independent of knowledge and works blindly. The reproductive organs are the focus of Will and from the opposite pole to the brain which is the representative of knowledge. The former is the life sustaining principle—they ensure endless life; for this reason they were worshipped by the Greeks in the phallus and by the Hindus in the lingam.

জীবসৃষ্টির এই নিগূঢ় কৌশল ইচ্ছাশক্তির অনন্ত জীবন লাভ করিবার উপায় মাত্র। সমস্ত প্রাণীজগৎ ইহার দ্বারা প্রতারিত হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে। ইহারই কৌশলে মৃত্যু স্থির জানিয়াও মাকড়সা সন্তান প্রজননের পর, স্ত্রী মাকড়স দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে। মানুষ স্ত্রীপুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য জীবনপাত করিতেছে। নরনারীর মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করিয়া ইচ্ছাশক্তি নিজ-কার্যই সাধন করিয়া চলিতেছে। ফলে জগৎ দুঃখ, অতৃপ্তি নিরাশায় ভরিয়া উঠিতেছে।

সুতরাং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যাহা বলা যায় তাহা আকাশকুসুমের মতোই অলীক। মানুষ ইচ্ছা-শক্তির যথেচ্ছ ক্রীড়নকমাত্র। হস্তচ্যুত প্রক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের যদি চেতনা থাকিত সেও মনে করিত বুঝি এই গতিশীলতা তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। মানুষের পক্ষেও ইহা সমভাবেই সত্য। আবার মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা বিচারশক্তি এই মহাশক্তির যথেচ্ছ লীলা। সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিলেও মূলতঃ মানুষ প্রবৃত্তির দাস। ইচ্ছাশক্তির এই সার্বভৌমিক আধিপত্য তাই বিশ্ব জগতে দুঃখ ও নৈরাশ্যের নৈরাজ্য আনিয়াছে। প্রবৃত্তি ও বাসনা নানা বিচিত্র ধরণের বাসনা কামনার উদ্রেক করিতেছে কিন্তু তাহাদের পরিতৃপ্তি নাই। একটি বাসনার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শত সহস্র বাসনা রক্তবীজের মতো উদ্রিক্ত হইতেছে এবং জীবনকে অক্টোপাসের মতো জড়াইয়া ফেলিতেছে। মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুকের ক্ষুধা আংশিক ও সাময়িকভাবে প্রশমিত করিয়া যেমন পরদিনের অশেষ দুঃখের মধ্যে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখা হয়, আকাঙ্ক্ষার সাময়িক নিবৃত্তিও সেইরূপ অনাগত দিনের অসংখ্য দুঃখদুর্দশার জনয়িতা মাত্র। চিন্তা ও চেতনার মধ্যেও ইচ্ছাশক্তি তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া তাহাকে অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। 'জীবনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিদ্বেষে বেদনায়'। বিচিত্র প্রকারের দুঃখদুর্দশা ভিড় করিয়া বহির্দেশে অপেক্ষমান এবং সময় পাইলেই জীবনের মধ্যে স্থান করিয়া লয়।

মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালার উত্থানপতনের মতো আকাঙ্ক্ষা ও সাময়িক পরিতৃপ্তির পারম্পর্য অবিরাম চলিয়াছে। আমাদের তথাকথিত সুখ আসলে কেবল দুইটি দুঃখতরঙ্গের মধ্যবর্তী অনিশ্চিত ব্যবধানটুকু।

দুঃখই পৃথিবীর মৌলিকতত্ত্ব; সুখ কেবল দুঃখের সাময়িক অভাব, দুঃখ পরম্পরায় হাইডেন—নঞর্থক ও নেতিবাচক। মনীষী আরিষ্টটল তাই যথার্থই বলিয়াছেন, জ্ঞানীব্যক্তি সুখান্বেষী নহেন, দুঃখযন্ত্রণার নিবৃত্তিই তাঁহার কাম্য। কল্পিত সুখ যদি বেশীক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করে পরিণামে আসে অবসাদ। অবসাদময় নৈষ্কর্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মানুষ আবার কর্ম ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। দরিদ্র সাধারণ যেরূপ কর্ম ও দুঃখভার জর্জরিত—ধনী, অভিজাত এবং সৌখীন ও বিলাসী সম্প্রদায় তেমনি নৈষ্কর্ম্যে অবসাদগ্রস্ত শোপেনহর তাই বলেন—Life swings like a pendulum between pain and ennui।

জীবজগতের উর্ধ্বতনের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ব্যাপক ও ঘনীভূত হইয়া উঠে। মানুষের সমস্ত বিচার বুদ্ধি সত্ত্বেও জীবজগতে তাহারই দুঃখ সর্বাধিক এবং সর্বাধিক। সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইহার অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপে দুঃখ যন্ত্রণারও প্রসার ঘটিতেছে, হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা। মানুষের স্মৃতিশক্তি ও তথাকথিত দূরদর্শিতাও তাহার দুঃখের মাত্রা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে। বর্তমানের দুঃখ দুর্দশার সহিত অতীত ও ভবিষ্যতের স্মৃতি ও চিন্তা যুক্ত হইয়া মানুষের জীবন দুর্বিষহ ও তাহার বুদ্ধি ও চেতনা জর্জরিত করিয়া দিতেছে। তাই মৃত্যু ও বিপদ অপেক্ষা মৃত্যু ও বিপদের ভয়ই তাহার নিকট অত্যন্ত মর্মান্তিক।

পরিশেষে জীবন দুঃখময়, কারণ জীবন অনন্ত সংগ্রাম। 'প্রাণ রাখিতে তার সদাই প্রাণান্তকর সংগ্রাম। মৃত্যু বিরতি ক্ষণিক, তাই তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রকৃতি ও জীবজগতে চলিতেছে নিয়তজিয় প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম। যখন কোন প্রতিপক্ষ না থাকে সেই সংগ্রাম আত্মঘাতী হইয়া ছিন্নমস্তার মতো আপনার রুধির আপনিই পান করিতে মত্ত। অস্ট্রেলিয়ার বুলডগ পিপীলিকা আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া নিজেরই মাথা ও দেহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। শোপেনহরের ভাষায়, Thus the Will to Live everywhere preys upon itself। শোপেনহর জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা এতই দৃষ্টান্ত ও তথ্য সমৃদ্ধ যে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। তাঁহার নিকট আশাবাদ is a bitter mockery of men's woes এবং শেষ সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন, The nature of life throughout presents itself to us as intended and calculated to awaken the conviction that nothing at all is worth our striving. Our efforts and struggles, that all good things are vanity, the world in all its ends bankrupt and life is a business which does not cover expenses. Life is an ever-postponed death.

এই আত্যন্তিক দুঃখনিরোধের জন্য মানুষ আত্মহনন করিয়াছে। গ্রীস ও রোম্যান গ্রীক দার্শনিক ডায়োজেনিস্‌ও এই ইচ্ছা-শক্তিকে (will to live) পরাজিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় আপনার শ্বাসরোধ ঘটাইয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত বিষয় মাত্র। ভারতীয় অনেক ঋষিও স্বেচ্ছামৃত্যু ছিলেন। তাহাদের পক্ষে জীবনমৃত্যু উভয়েই ছিল পায়ের ভৃত্য স্বরূপ। সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়। মাঝে মাঝে উন্মত্ততা আসিয়া মানুষকে দুঃখ চেতনার হাত হইতে নিষ্কৃতি দেয়, কিন্তু ইহাও সঠিক শান্তি বা সুখ নয়! মানুষ দুঃখ নিরোধের পথ খুঁজিয়াছে ধর্ম দর্শন ও আর্টের মধ্যে। শোপেনহরের মতে ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। ধর্ম মানুষকে তাহার প্রাত্যহিক দিন যাপনের গ্লানি ও প্রবৃত্তির খেলার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া বিরাটের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে শেখায়। দর্শন তাহাকে শুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী করিয়া প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে শেখায় এবং আর্ট মানুষকে সুন্দর ও সার্বজনীনতার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। যাহা ক্ষণিক, যাহা ব্যক্তিগত এবং যাহা তুচ্ছ তাহার কবল হইতে ধর্ম, দর্শন ও আর্ট মানুষকে যাহা চিরন্তন, যাহা বিশ্বজনীন তাহার মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া দুঃখ বেদনাকে জয় করিতে সাহায্য করে। কবির ভাষায় তখন এই এষণা বা ইচ্ছাশক্তি অন্যভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠে—

রূপহীনা জ্ঞানাতীতা ভীষণা প্রকৃতি
ধরেছে আমার কাছে জননী মূরতি।

তাঁহার চরম পথ নির্বাণ—ব্রহ্ম নির্বাণ নহে, বৌদ্ধ নির্বাণ; বৌদ্ধ ধর্মের তৃষ্ণা (তন্‌হা) ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির পথ শোপেনহয়রকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

বহু অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা এবং অবিরোধী চিন্তা ও কল্পনা সত্ত্বেও শোপেনহয় দুঃখবেদনাময় বাস্তব জগৎ অবলম্বন করিয়া যে দার্শনিক মতবাদ রচনা করিয়াছেন তাহা শুষ্কবুদ্ধি প্রসূত বাস্তব বোধহীন বুদ্ধি সর্বস্ব মতবাদ অপেক্ষা আমাদের সমধিক আকৃষ্ট করে এবং ইহা সমসাময়িক কালেও বিশেষ আলোড়ন তুলিয়াছিল। আর ভাল লাগে এজন্য যে আমাদের ব্যথা বেদনার মর্ম মূলে ইহা অনুরূপ সংকেত করে। তাই ইহার আবেদন চিরন্তনীন কারণ—

Our sweetest songs are those
That tell of saddest thoughts.

সাহিত্যে আধুনিকতা

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

প্রচলিত পথ ও প্রথাকে ভেঙে নতুন পথে চলতে চান তারাই, যাদের মধ্যে আছে প্রাণশক্তি ও সৃষ্টির ক্ষমতা। বাংলাসাহিত্যে এমন প্রতিভাশালী লেখকের অভাব হয়নি বলেই গত এক শতাব্দীতে সাহিত্যের গতি ও মেজাজে বারবার ধারাবদল ঘটেছে। বিষয় ও ভাষা, বচনভঙ্গি ও রচনারীতির এই নিরন্তর পরিবর্তন যেন এক কূল থেকে আর এক কূলে উত্তরণ। সাহিত্যপথের যাঁরা পথিক, তাঁরা বরাবরই পূর্বসূরীদের প্রভাব এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। ফলে যুগকে যুগকে ঘটেছে রীতির বদল। প্রতি ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর যে আধুনিকতার সূচক, তা' মনে করবার কারণ নেই। কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে সার্থক ধারাবদল তখনই ঘটে যখন এই পরিবর্তন নতুন থেকে নতুনতর সৃষ্টির ফসলে স্তীবভূমিকে ভরিয়ে দিয়ে যায়।

প্রচলিত পথ থেকে যাঁরা সরে গিয়ে নতুন পথ গড়ে' নিতে চান, তাঁরা যদি মহৎ স্রষ্টা না হন, তাহলে তাঁদের সাহিত্য-কৃতি যথেচ্ছ হ'তে বাধ্য; সঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্য আনবার জন্য রাগরাগিনীর পথ-পরিক্রমার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই, সুরের সকল পদ্ধতি যাঁর অধিগত। কিন্তু অনভিজ্ঞের হাতকেপে সুর বেসুর হ'তে ওঠে. শিল্পের সম্যক জ্ঞান যাদের নেই তাদের কাছে এই অনধিকার চর্চা ধরা না পড়লেও রসিকচিত্তে তার আবেদন ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই।

সাহিত্যের উপকরণ কি কি—এ' প্রশ্ন তুললে হয়ত বিতর্কের সৃষ্টি হ'তে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাই যদি মনে করি, তাহ'লে উপলব্ধির আনন্দকে সকলের করে তোলাই সাহিত্য। সাহিত্যকর্ম শুধু বহিরঙ্গের ওপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ বিষয়, ভাষা, ষ্টাইল, ও প্রকাশভঙ্গি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সব কিছু নয়। অন্তর্জগতে আছে অভিজ্ঞতার দ্যুতি, উপলব্ধির গভীরতা, মননশীলতা ও জীবনবোধ। আধুনিক হবার প্রয়াসে যে সাহিত্যিক রসের পরিধি ছাড়িয়ে আপন খেয়ালে যত্রতত্র ভ্রমণ করেন তিনি লেখেয়ালী হতে পারেন কিন্তু সাহিত্যিক ন'ন; আধুনিক ত ননই। উপরন্তু রস-সৃষ্টিতে অপারগ যে শিল্পী, শিল্পের আঙ্গিনায় অশ্লীলতার আমদানি করে তিনি ক্ষমার অযোগ্য।

'অশ্লীলতা' কথাটা অবশ্য ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ

করেছি। 'অশ্লীলতা' বিষয়ে নিরুদ্ধ নয়, প্রয়োগের লঘু ও চটুল চেষ্টায় তার সৃষ্টি শিল্পী হিসাবে যে অসৎ, যার লক্ষ্য সৌন্দর্য নয়, মানবতার অনুভবও নয়, যে বিশেষ উদ্দেশ্যে পাঠক বা দর্শক সমাজকে বিভ্রান্ত করতে চায়, শিল্পী হিসাবে তাকে আমি ভালবাসার বলবো। যদিও সাহিত্যের বহিরঙ্গ রচনায় তার কুশলতা সর্বজন স্বীকৃত, তবু গভীর ও সমগ্রদৃষ্টি না থাকায় সে অসার্থক।

বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতার সৃষ্টি করেছিলেন একদা মহাকবি মধুসূদন। তিনি ইংরাজী ও ইতালীয় ভাবের অভিজ্ঞতা আহরণ করে এনেছিলেন বাংলাসাহিত্যে। ভাষার বীণা তাঁর হাতে নতুন সুরে বেজেছিল; তিনি ছিলেন সুর-স্রষ্টা। বিষয় ও ভাবকে তিনি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছিলেন; কারণ যুক্তিবাদ তাঁর চিন্তাকে পরিশীলিত করেছিল। বিষয় ভাব ভাষা ও আঙ্গিক সবদিক থেকে আধুনিক মাইকেল বাংলা সাহিত্যে যে প্রবাহ এনেছিলেন তার ফলে সাহিত্যের নদী কূলপ্লাবিত করে ছুটেছিল।

তারপর মহাসমুদ্রের মত আবির্ভাব হয়েছে রবীন্দ্র-যুগের। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমসাময়িক সমাজ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। তার গুরুদাসের মত লোকও সেদিন রবীন্দ্রকাব্যকে সহজমনচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ রবীন্দ্রনাথ অগ্রগামী চিন্তাধারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতাকে হৃদয়গত করেছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা ও নবীন ইউরোপের বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ভাবের সঙ্গে যুক্তির এবং সৎ বা শাশ্বত চিন্তার সঙ্গে প্রগামী চিন্তার মিলন ঘটিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তিনি চির আধুনিক ছিলেন। তিনি জেনে ছিলেন, সাহিত্য জীবনের মতই গতিশীল; যুগে যুগে রূপান্তর না হলে তার গতি ব্যাহত হ'বে। তাই 'মানসী'র যুগ থেকে স'রে গিয়ে তিনি 'বলাকা'র যুগে পৌঁছেন, বলাকা থেকে 'পুনশ্চ'তে। 'লৌকাডুবি'র রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'তে নতুন ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছেন। তাঁকে আবার রূপান্তর করতে দেখেছি 'শেষের কবিতায়, 'লাবরেটরি'তে কাব্য ও কথাসাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ভাষাকে রূপদীরীতির থেকে ক্রমান্বয়ে মুক্তি দিয়েছেন, বিষয় ও ভাবকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন, এবং আঙ্গিককে সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন। 'কড়ি ও কোমল'-এর কবি 'কিন্তু গোয়ালার গলি'র ছবি এঁকেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি জেনেই সেদিন দুঃসাহসী তরুণের দল নতুন অভিযানের পথে পা বাড়িয়েছিল। তিরিশের দলকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সেই বিদ্রোহস্তরোল নিজের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে অপারগ হয়নি। মোহিতলাল ও রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা অনির্ভর ছিল বলেই তাঁরা নতুন দিক-নির্দেশে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা "চেতনাস্রোতের ওপর লম্পটের পদধ্বনি" শুনতে পেয়েছিলেন, কাব্য শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ব্যর্থ। কারণ শক্তির সাফল্য নির্ভর করে শিল্পীর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দৃষ্টি-গভীরতার ওপর। জীবনানন্দ যিনি আধুনিক ফরাসী কবিদের আঙ্গিক ও ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন—ঐতিহ্যকে অস্বীকার বা লঙ্ঘন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। জীবনানন্দ ইতিহাস-সচেতন ছিলেন এবং ভৌগলিক জ্ঞানও তাঁর আন্তরিকতাবেই ছিল। তাই তিনি সফলতর কবি। কাব্য শক্তির অধিকারী হয়ে এবং প্রচুর পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের সাফল্য পরিমিত।

তাই বলছিলাম যে, আধুনিকতার অর্থ শিল্পরীতি ও 'জীবন-দর্শন'কে ইতিহাসের পরিবর্তিত বা অভিন্ন চেতনায় দেখতে পাওয়া। কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র ও অন্তহীন; ইতিহাসও সতত পরিবর্তনশীল। এই বৈচিত্র্য ও নিত্য পরিবর্তনশীলতার মাঝ থেকে জীবনকে অভিজ্ঞতার আলোকে তিনিই দেখতে পান, যাঁর জীবন-বোধ আছে, যাঁর দৃষ্টি মানবমুখী ও স্বচ্ছ। এবং শিল্প-রীতিকে নতুন ক'রে গড়ে নিতে পারেন তিনি যিনি শিল্পী হিসাবে সক্ষম।

আগে প্রথমটা ধরি। জীবনের অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের কাছে এককেন্দ্রিক। অর্থাৎ অন্ধের হস্তীদর্শনের মত। তাই জীবনকে কেউ শুধু দুঃখময় দেখলো, কেউ জানলো শোষণ আর নির্যাতনের রূপ। বাস্তবতার নামে কেউ শুধু পার্থিবোপভোগকে আশ্রয় করলো, কেউ দেহকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসলো। প্রাচীন ভারতে হিন্দু সমাজ এমনি ভক্তিবাদে ভেসে যেতে বসেছিল। আচার নিষ্ঠা ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতা তার মন ও চিন্তাকে অধিকার করেছিল। ঔপনিষদিক যুক্তিবাদ পরমব্রহ্মের চিন্তায় ইতিকে জলাঞ্জলি দিল। এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণায় জগৎকে আমরা মিথ্যা ও মায়া বলে জানলাম। সেই স্থির ও ধ্রুব বিশ্বাসভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা কর্মকে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করেছি। কিন্তু ধারণার ও প্রত্যয়ের আবার ধারাবদল ঘটেছে। বুদ্ধ মানুষের দৃষ্টিকে মানবমুখী করেছেন, এবং জীবনে চিন্তার সাত্বতা ও গতিকে স্বীকৃত করিয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালের ভারতেও ধর্ম ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে এইভাবেই। যাঁরা দ্রষ্টা, তাঁরা সমাজকে নতুন চিন্তা দিয়েছেন। ভক্তির সঙ্গে কর্মের মিলন ঘটিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের, স্থির সঙ্গে অস্থির ও অনন্তর সঙ্গে ক্ষুদ্রের যে সমন্বয়-চিন্তা, তার প্রকাশ দেখায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-এর মাধ্যমে। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর সমস্ত জীবনের প্রেরণাকে একত্র করে চেষ্টা করেছেন দেশকে বাস্তবজ্ঞানে জাগ্রত ক'রে তুলতে। জীবনে সৎ ও অসৎ এবং জড় ও অজড় যে সমভাবে প্রয়োজনীয়, স্থিতির সঙ্গে গতির উপাসনা না করলে যে জীবন-সত্যকে আংশিকভাবে অনুধাবন করা হয়, এ কথা দার্শনিকভাবে বোঝাবার জন্যই স্বামীজির "উদ্বুদ্ধ ভারত"। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মহৎ চেতনা সমন্বয় দর্শনের এই রূপকে পরিপাক করেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, ঋষি কবি।

বিজ্ঞানের জগৎ ইউরোপ ও আমেরিকায় যেমনেই অতিবৃদ্ধি পেয়েছে। Determinism এমন একটা চিন্তাধারা যার প্রবক্তারা মনে করেন দেহই সব। মন বা চেতনা দেহের অধীন। এই অতিদেহবাদ থেকে অবিশ্বাস ও সংশয় এবং তার থেকে ব্যর্থতাবোধ ও নৈরাশ্য আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। তার সঙ্গে করাবহ বিশ্বযুদ্ধ ও পরমাণুর নির্মম আধিপত্য যে মানসিক অবক্ষয় এনে দিয়েছে তার থেকে মুক্তি পাওয়া শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন আলডুস হাক্সলের মত মহৎ শিল্পীও এই ডিটার-মিনিষ্ট মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু হাক্সলের শিল্পীসত্তা বুঝেছিল যে দেহই যদি চরম হ'ত, তাহ'লে মনুষ্যত্ব, চেতনা ও বিচার, শিল্পীর উন্মেষশালিনী প্রতিভা ও দার্শনিকের প্রেরণাপূর্ণ জীবন-দর্শন—সবকিছুই মিথ্যা হ'য়ে যেত। হাক্সলে তাই দেখেছিলেন দেহ থেকে অদেহে এবং বাস্তব আচ্ছন্নতা থেকে অন্তর্জগতের উপলব্ধিতে মানুষের উত্তরণ।

এই সমস্ত দৃষ্টিই সত্যদৃষ্টি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র'র মত কবিও মানুষকে জানবার ও বুঝবার চেষ্টার ঘুরে বেড়িয়েছেন—"মানুষের মানে চাই—

—গোটা মানুষের মানে !"

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ, মাণিক ও তারাশঙ্করের অনন্ত জিজ্ঞাসা। শুধু আজকের নয় এ' জিজ্ঞাসা চির যুগের। তাই বৈষ্ণব কবির লেখনীতে ফুটেছে—"জাগলাম যুগ ফিরে ফির কাঁদলু তবু ফির ঘুচল না গেল……"; বাউল কবি গেয়ে বেড়িয়েছে—"আমি কোথায় পাবো তারে…"—এই অন্তহীন অনুসন্ধান আছে বলেই ত' জীবন এত বিচিত্র, এত মোহময়।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যে যে ধারাবদল ঘটেছে তাকে আধুনিকতা বলবো কিনা, সে কথা নিশ্চয়ই বিচার করে দেখতে হবে। কিন্তু বিচার করতে গেলে এইটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যা' সাম্প্রতিক তাই আধুনিক নয়। নদীর বেনোজল বাঁধ ভেঙে মাঠে বনে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘূর্ণিত হ'য়ে মহামারির সৃষ্টি করে। কিন্তু কীর্তিনাশার প্রবল স্রোত যখন দু পারে ফসল ফলিয়ে দিয়ে যায় তখনই তাকে সৃষ্টিশালী স্রোত বলি। পথ ভেঙে কেউ নতুন পথের নির্দেশ দেয়, কেউ বিপথে টেনে নিয়ে যায়। রুচি-বিকৃতিকে রুচি-সৃষ্টির সমগোত্র বলে যারা ভাবে, তাদের দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি। সমগ্র দৃষ্টিতে জীবনের ছেঁড়া কয়াংশ নয়, পূর্ণ ও পরিবর্তমান মানবসত্তার রূপই ধরা পড়ে।

ভারতের মাটিতে মার্কসীয় দর্শন

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

[আজকাল প্রায়ই এই প্রশ্ন শোনা যায় যে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত ও প্রচারিত গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি ? এই প্রশ্নটির গুরুত্ব এখন এই জন্য যে, যেখানে কম্যুনিজম ভারতের মাটিতে দিন দিন শক্তিশালী হইতেছে এবং কম্যুনিজম একটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করিতেছে, সেখানে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণসহ উহার পাশাপাশি অপর কোন চিন্তাধারার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা না থাকার ফলে শিক্ষিত যুবকদের নিকট কম্যুনিজম সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। পরিতাপের বিষয়—গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বস্তুটি কি এবং উহার তত্ত্বগত ভিত্তিই বা কি এ সম্বন্ধে আলোচনা কোথাও শোনা যায় না। কংগ্রেস পরিচালিত ভারত সরকার যে শিল্পের ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতির পথ অনুসরণ করিতেছেন, রাষ্ট্রীয় শিল্পের পাশাপাশি বেসরকারী বা ব্যক্তিগত শিল্প-প্রচেষ্টার স্থানও স্বীকৃত হইতেছে, ইহার পিছনে কোন্ যুক্তি আছে যাহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ? এ প্রশ্নের উত্তর কোথাও শোনা যায় না। স্বয়ম্ভূনক বস্তুবাদের শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ খণ্ডন ও তৎস্থলে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিতে না পারিলে যে উহা দেশের ভাবীকালের নেতা যুব সমাজকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না এ কথাটি আমাদের দেশের সকল জাতীয়তাবাদী নেতাগণ যদি এখনও না বুঝিয়া থাকেন তবে কম্যুনিজমের সর্বতোমুখী আক্রমণের গতিরোধ অসম্ভব। বর্তমানে ব্যক্তিগত বা খানিকটা দলগত প্রচারের দ্বারা কিছু কিছু তরুণ কর্মীদের সংগ্রহ করা যাইতে পারে হয়তো, কিন্তু দেশ রক্ষা কিছুতেই হইতে পারে না। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয় আদর্শের টানে, সংগ্রাম করে আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্যে। যেখানে আদর্শের কোন ভিত্তিই নাই বা অস্পষ্ট, সেখানে কোন্ সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া আদর্শ রক্ষার সংগ্রাম করিবে ? আজ কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে যত সংখ্যক প্রাণপণকারী কর্মী আছে, কংগ্রেসের দীর্ঘ দিনের সংগ্রামপূর্ণ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও কি আজ কংগ্রেস সেদিক হইতে ক্রমশঃ ব্যর্থ হইতেছে না ? ইহার পিছনের কারণ কি শুধু আত্মসন্তুষ্টি, না উহা ছাড়া আরও কিছু ? ইংরেজ যতকাল ছিল, ততকাল ইংরেজ তাড়াইবার প্রেরণায় গোটা ভারতবর্ষ কংগ্রেসের মধ্যে সঙ্ঘ রচনা করিয়াছিল। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করার পর সে প্রেরণার উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সে শুধু শুনিয়াছে জীবন যাপনের উন্নতমান, দারিদ্র্যমুক্তি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও অধিক উৎপাদনের কথা। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ শুনিতেছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা, যাহা জন-সাধারণের কাছে একটি সোনাটে শ্লোগান ছাড়া আর অধিক কিছু বেহ বোঝার বলিয়া মনে হয় না। বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদিগকেও এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে দেখি না। "পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা আর চলিবে না"—নতুন ভাবধারায়, নতুন প্রেরণায়, নতুন সমাজের পরিকল্পনা চিত্র যতক্ষণ তুলিয়া ধরা না যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত যত শিল্পই প্রতিষ্ঠিত হোক, জীবনধারণের মান যতই বৃদ্ধি হোক, জাতীয় আয় যতই বাড়ুক (গত ২০ বৎসরে এ গুলির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই), নতুন সমাজ সৃষ্টির বেদনা ও ক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবেই। এখনও সময় আছে—সময় ক্ষতি হওয়ার আগেই যদি ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সামগ্রিক চিন্তাধারা উপস্থাপিত করা যায়, যে ভাবধারার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তা যোগযুক্ত,

যেখানে সর্ব্বত্রই সমতা সাম্য থাকিবে, তাহা হইলে সাম্যবাদেরও পরবর্ত্তী যুগের কোন প্রয়োজনই হইবে না। এই সামগ্রিক চিন্তাধারাটি উপযুক্ত ভাষায় উপস্থিত করিতে না পারিলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবেই এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ কালের সভ্যতার বিচিত্র ইতিহাসের পাতায় অত্যাধুনিকতম কালে প্রয়োজনীয় সমাজ-চিত্রের তত্ত্ব পাওয়া যায়—কিন্তু সে তত্ত্বের নিজ ভাষা, নিজ চিত্রই এতদিন উপস্থাপিত হইয়া আসিয়াছে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-কথিত গীতা ও তাঁহার জীবনী ভাগবত এই আধুনিকতম সমাজ-বিজ্ঞানের খোঁজ দিবে—কিন্তু সে কথা আমরা জানিতাম না। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ আজও গীতা ভাগবত উপনিষদের ভাষার কথা বলিলে তাহাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হইবে যত সহজে, এত সহজে অন্য কোন ভাষা তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবে না। ভাগবতের 'বাস্তব বস্তু' যে মার্কসের বস্তুকে স্বীকার করিয়াও তাহারও অধিক কিছু, এ কথাটি উপযুক্তভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ (বরিশালের পরম কুমার ঘোষ) ১৯১৯ সন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বক্তৃতা ও লেখায় কংগ্রেসের প্রতিটি আন্দোলনে, গান্ধীজীর কর্ম্ম-পদ্ধতিতে, বর্ত্তমান ভারতের পঙ্গুনীল তিন্তিক পররাষ্ট্র নীতিতে, ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও দার্শনিক ব্যাখ্যায় ঐ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বাবলম্বনে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। সেজন্যই তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াও অধিকাংশ মানুষের নিকট বোধগম্য ছিল না। কম্যুনিজমের মূল ভিত্তি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যাহার উপর শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, সেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ব্যাখ্যা করিয়া সামগ্রিক জীবনবাদে তাহার স্থান ও মান নির্দ্দেশ করিয়া যে কয়েকটি প্রবন্ধ এই উজ্জীবনভারত পত্রিকায় ১৩৫৩-৫৪ এবং ১৩৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন ঐ প্রবন্ধগুলি একত্রে নীচে পুনর্মুদ্রিত করা হইল। উদ্দেশ্য, ইহার দ্বারা ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাগণের ও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি কিঞ্চিৎ সফল হয় তবে ধন্য হইব।—সম্পাদিকা]

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ব ক্ষেত্রের অনাদৃত উপেক্ষিতদের স্বতন্ত্র ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠিবার যোগ্যতা দার্শনিক দৃষ্টি সহায়ে সমস্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিয়া মনীষী কার্ল মার্কস নমস্য। বিশ্ব এজন্য তাঁহার কাছে চিরঋণী থাকিবে। এই মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) শ্রীকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত পুরুষোত্তম-কৃষ্টির সংস্পর্শে ক্রমবিবর্ত্তনের সূত্র ধরিয়া ভারতবর্ষের মাটিতে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়ে এক উন্নততর "বাস্তব বস্তুবাদে" গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে। মার্ক্সীয় বস্তুবাদ হইতে ভারতীয় বাস্তব বস্তুবাদের গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে। আবেষ্টনগত পার্থক্যে বস্তুবাদও পৃথক হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষ কোনও দিন রাশিয়া হইবে না। রাশিয়ার বস্তুবাদকে হজম করিয়াই ভারতীয় বাস্তব বস্তুবাদ জীবনের আরও গভীরে অবগাহন করিবে, নবীন রূপে উদ্ভাসিত হইবে। মার্ক্স "বস্তু" বলিতে যাহা বোঝেন, ভাগবত 'বাস্তববস্তু' বলিতে তাহা বুঝাইবার আরও-অধিক কিছু বোঝেন। 'বাস্তবমত্র বস্তু নেতম্'-ভাগবত। এই বাস্তব বস্তুবাদের স্বরূপ কি, কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহা মার্ক্সীয় বস্তুবাদ হইতে পৃথক্ এবং ভারতবর্ষে ইহার সাধনার ধারাই বা কি হইবে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণ-লীলার অনুসরণে তাহারই দিগ্‌দর্শনে প্রয়াস পাইব। 'গিরি' শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত তত্ত্ব, কর্ম্ম ও বস্তুসমূহ। 'শ্রীকৃষ্ণ গিরি ধারণ করিয়াছিলেন' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি প্রকৃতি ও এই প্রাকৃতিক জগতের সব আদর্শ, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এক কথায় লোক-কৃষ্টিকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া চৈতন্যের, আদর্শের অর্থাৎ ভদ্র কৃষ্টির দাবীর সঙ্গে সমন্বিত করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নরনারীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, তাহাদের নিজের ঘরে কি রত্ন লুকাইয়া আছে তাহার একবার খোঁজ করা। তাহার প্রাচীন শাস্ত্রের ভিতর যে রত্ন নিহিত রহিয়াছে।

সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের যে সঙ্কল্প সে লইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-জীবননীলার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া সে ইহার আস্বাদন ও কার্য্যাত্মকরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারে, আজ তাহারই সম্যক পরিচয় ভাগবত শাস্ত্রের মধ্যে পাইব। একমাত্র ভাগবতই গণদর্শন ও গণজীবনের প্রকৃষ্ট ধারক ও বাহক শাস্ত্র। তাই আমরা বর্ত্তমানের জটিল কুটিল রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে ভাগবতের আশ্রয় লইয়াছি। পাঠকগণকে ধৈর্যসহকারে ইহার অনুসরণ করিবার জন্য আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

সহরের দেশ পল্লীগ্রাম আজ উৎসব-মুখরিত; ইন্দ্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রজবাসিগণ তাহাদের সকল শক্তি নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। বিপ্রগণ শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের এ আয়োজন পিতা?" নন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন, "আমরা শাস্ত্রীয় বিধির অনুসরণে যজ্ঞ সম্পন্ন করিব"। "এ যজ্ঞ কাহার উদ্দেশ্যে, আর লৌকিক কোন্ ফলই বা ইহা দ্বারা লাভ হইবে?" "ভগবান ইন্দ্র বর্ষণের দেবতা; যজ্ঞ দ্বারা প্রীত হইলে সর্ব্বভূতের প্রীণন ও জীবন স্বরূপ পয়ঃ তিনি অভিবর্ষণ করিবেন। সেই বর্ষণের ফলে কৃষি-সম্পদে দেশ ভরিয়া উঠিবে, গোবর্দ্ধনের সকল শরীর তৃণাচ্ছাদনে ভূষিত হইবে, গোগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রচুর দুগ্ধ দান করিবে। গোপজাতি আমাদের যাহা জীবিকার একমাত্র উপায়, ইন্দ্র-যজ্ঞ অনুষ্ঠানদ্বারা আমরা সেই জীবিকারই সংস্থান করিব।"

শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য শ্রবণান্তর বলিলেন, "কর্ম্মদ্বারাই জন্তু জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্মদ্বারাই তাহাদের প্রলয় ঘটে। সুখ, দুঃখ, ভয় এবং ক্ষেম শুধু কর্ম্মদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়; কর্ম্মের বাহিরে কর্ম্মের ফল-দাতা কোনও ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি তো কর্ত্তার কর্ম্মেরই ভজনা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম না করিলেও তাহাকে যেমন তিনি ফল দান করিতে পারেন না, কর্ম্ম করিলেও তেমনি তাহার ফল তিনি আটকাইতে পারেন না। এমন একজন অকর্ম্মণ্য ঈশ্বরের কাছে সহজ কর্ম্মের অনুবর্ত্তনকারী পুরুষের মাথা নোয়াইবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? একমাত্র কর্ম্মই মানুষের শত্রু, মিত্র, উদাসীন, গুরু এবং ঈশ্বর। মানুষ স্বভাবতঃ থাকিয়াই কর্ম্মের সম্যক্ রূপে পূজা করিবেন। কর্ম্মের দেবতাকে খুঁজিতে হইলে বৃত্তিদানকারী কর্ম্মেরই অন্তরে ঐ কর্ম্মের স্বরূপে; কর্ম্মের বাহিরে কর্ম্মের ফলদাতা কোনও দেবতা নাই। যে বৃত্তিদ্বারা মানুষ অনায়াসে বর্ত্তমানের বুকে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহাই তাহার দেবতা। অসতী নারী স্বামীর ঘাইয়া পরিয়া উপপতির ভজনা করিলে যেমন কোনও ক্ষেত্রই লাভ করে না, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি কোন এক কর্ম্মের সাহায্যে জীবিকা সংস্থান করিয়া অপর কোনও ভাবের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া থাকে, সে-ও তেমনি ব্যর্থ হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন স্থিতি প্রলয়ের হেতু। রজোগুণ দ্বারাই বিশ্বের উৎপত্তি; এবং নরনারীর অন্যোন্য মিলনের ফলেই এই বিবিধ জগৎ সৃষ্ট। রজোগুণ দ্বারা প্রেরিত হইয়াই এই সব মেঘ জল দান করিয়া থাকে! প্রজাসমূহ তাহাদ্বারাই নিষিক্তাঙ্গ হয়; ইহার মধ্যে আকাশের দেবতা (deus ex machina) মহেন্দ্রকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন কেন? মহেন্দ্র কি করিবেন? আমরা বনশৈলনিবাসী; তাই গো, গোবর্দ্ধন এবং যজ্ঞকর্ম্মকারী ব্রাহ্মণগণই আমাদের দেবতা। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে সব দ্রব্যসম্ভার আপনারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই এই গো, গোবর্দ্ধন ও ব্রাহ্মণদের প্রীত্যর্থে যজ্ঞ বিধান করুন। আপনাদের গ্রামে অনধিকারী মত্ত যে সব চণ্ডাল ও পতিত জাতি এই ব্রজে রহিয়াছেন, তাহাদের সম্মানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করুন, গোদিগকে উৎকৃষ্ট ঘাস প্রদান এবং গোবর্দ্ধনগিরিকে এই সব উপহার নিবেদনপূর্ব্বক আপনারা 'ইন্দ্র-যজ্ঞে'র সত্য বাস্তব সার্থকতা আস্বাদন করুন। ইহাই আমার মত।" শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশানুযায়ী ব্রজবাসিগণ গোবর্দ্ধনগিরির সম্মুখে সমস্ত উপহার সমর্পণের পর তাঁহার প্রদক্ষিণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও "শৈলোঽস্মি"—"আমিই শৈল" বলিয়া সমস্ত উপহার নিজে স্বীকার করিলেন।

যজ্ঞের এই নূতন রূপ প্রদান করিবার ফল স্বরূপ ইন্দ্রের স্বতন্ত্র সত্তা মুছিয়া যাইবার ভয়ে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন, ব্রজধামকে চরম শাস্তি প্রদানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অপমানিত করিবার জন্য অনবরত বর্ষণ, বজ্র ও শিলাপাতদ্বারা ত্রাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্যোপায় ব্রজবাসীগণ

শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন ; বালকের হস্তধারণের মত ছোটদের সম্মানদাতা শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন গিরিকে নীলাচ্ছলে ঊর্ধ্বে ধারণ করিলেন। উত্তোলিত সেই গোবর্ধনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নিরাপদ হইলেন। ঘনিকায়-প্রণত ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ হইল ; ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগত হইয়া নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ইহা ভাগবতের একটি উপাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা প্রকট করিবার জন্যই কি শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কে ভাগবতকার এমন একটী অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন ? আর ইহাতে কি তাঁহার মহিমাই বাড়িয়াছে ? যাহারা লৌকিক চক্ষুরাংসের দ্বারাই কোনও পারমার্থিক মূল্য দান করিতে পারেন না, তাহারাই শুধু এইরূপ অলৌকিকত্ব ও ঐশ্বর্য্য আরোপ করিয়া কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। অথচ শ্রীকৃষ্ণই কিন্তু বলিতেছেন—"ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত"। প্রাণের মূল্য কি ঐশ্বর্যের পূজায় মিটিতে পারে ? প্রাণ সেখানে ফাঁকিতেই পড়িয়া যায়। ঈশ্বর-কৃষ্ণকে খাঁটি করিতে গিয়া মানুষ-কৃষ্ণ আজ তলাইয়া গিয়াছেন। যাহারা ব্রজলীলাকে, বিশেষভাবে প্রাণময়ী শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-জীবনের 'জঞ্জাল' মনে করিয়া তাহা হইতে কৃষ্ণকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে বর্তমান যুগের সুরুচিসম্পন্ন একটী 'ভদ্রলোক' রূপেই উপস্থাপিত করিয়াছেন, আবার যাহারা কৃষ্ণলীলার মধ্যে কুরুচির গন্ধ পাইয়া তাঁহাকে জনসমাজ হইতে একেবারেই নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই ভারতের জন-জাগরণ ও জন কৃষ্টির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের কাছে অচল হইলেও জনসাধারণের মধ্যে কৃষ্ণ আজও সচল।

সাধারণ লোকের তুলনায় শক্তি ও রুচিতার মানদণ্ডে "বড়" বলিয়াই কি শ্রীকৃষ্ণ সত্য সত্য বড় ? সাধারণ হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়ানোটাতেই কি তাঁহার অসাধারণত্ব ! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে সাধারণ লোকব্যবহারের মাঝখানে মানুষীমূর্তিতে উপস্থিত হওয়াই তো ঐশ্বর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠা। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব জীবের জন্য কাঁদিতেছেন, তাঁহার চোখের জলই কি কম ঐশ্বর্য্য ? শ্রীকৃষ্ণ সর্বসাধারণের হইয়াই অসাধারণ। সর্বসাধারণের "বাহিরে" (deus ex machina) থাকিয়া যিনি অসাধারণ, তিনি আজিকার যুগে নিতান্তই সাধারণ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—"অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"—'এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত'। যাহার বিশ্বরূপ জীবনে লৌকিক দাবী ও বৈদিক দাবী দুই-ই সমভাবে সার্থক হইয়াছে, তিনি কেমন করিয়া লোক-সমাজের ঊর্ধ্বে উঠিয়া, লোক-সমাজ হইতে দূরে সরিয়া নিজ অলৌকিকত্বের চাপে তাহাকে পিষ্ট ও শোষিত করিতে পারেন ? প্রাণই শুধু প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে। গিরিধারণের সঙ্গে প্রাণের যোগ কোথায় ? শক্তিহীন জীবের পক্ষে একজন শক্তিমান ঈশ্বরের পূজা নিছক দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাগবত জীবকে শ্রীভগবানের শক্তি-ঘাসরূপে উপস্থাপিত করিবার বিরুদ্ধেই অভিযান করিয়াছেন।

যে শক্তি-প্রভাবে শক্তিমান নিঃশক্তিকে 'বাহির হইতে' শাসন ও শোষণ করেন, সে শক্তি হইতে ভাগবতের ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক। ভাগবত ভক্তিগ্রন্থ। ভক্তিদ্বারা ভগবান ভক্তে এবং ভক্ত ভগবানে হজম হইয়া যান ; ভক্তি ভক্তকে ভগবানের মাঝে সৃষ্টি করেন, ভগবানকে ভক্তের মাঝে সৃষ্টি করেন। ভক্ত, বিশ্ব ও ভগবান ভক্তিসহায়েই পরস্পরকে সৃষ্টি করিয়া কালের বুক চিরিয়া কালাতীতের রাজ্যে নিত্য বর্তমানরূপে আগাইয়া চলিয়াছেন। ভক্তির ভজন নিত্য বর্তমান-ভজন। ভক্তি লৌকিকী ও বৈদিকী দুই-ই। ভক্তি আদর্শ ও বস্তুসত্তার সমন্বয়রূপিণী, পোষণময়ী। সর্ব-ক্ষেত্রের শোষণের বিরুদ্ধেই ভক্তির যা-কিছু সব প্রচেষ্টা। ভক্তিই অধিবিদ্যাকে (metaphysics), আদর্শকে আকর্ষণ করিয়া চোখের সামনে বর্তমান বিজ্ঞানের (science) বুকে, এই মাটির বুকে নামাইয়াছে, তাহার রূপায়ণ সৃষ্টি করিয়াছে ; ভক্তিই আবার এই মাটির জগৎকে আদর্শ-লোকস্থানীয় করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে।

মাটির রক্তমাংসের বাস্তব দাবীকে আদর্শের সমমূল্যে

প্রতিষ্ঠা দান করাই হইতেছে গিরিধারণের মূল তাৎপর্য। "গিরি" হইতেছে জড় বস্তুর প্রতীক। তত্ত্বলোকের পারণায় অতি তুচ্ছ কোনও মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে যেমন প্রতিষ্ঠাদানকারীকে বলা হয় যে, ঐ ছোট লোকটীকে তিনি আকাশেই তুলিয়া ধরিলেন, ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, মাটির মান-অভিমান, হাসি-কান্নাকে আদর্শ লোকে গড়িয়া তুলিয়া ঊর্ধ্বে ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই বলা হইয়াছে যে, তিনি গিরি-গোবর্ধনকে আকাশে তুলিয়া ধরিলেন। দীর্ঘদিনের তত্ত্বকৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই গভীর প্রয়োজনকে এতদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

তত্ত্বকৃষ্টি ও লোককৃষ্টির সমন্বয়ই রহিয়াছে "আমিই দৈন"—এই মহাসত্য প্রচারের মধ্যে। তত্ত্বকৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে প্রজ্ঞাবাদীর (Intellectuals) সাধনায়; লোককৃষ্টির স্রষ্টা হইতেছেন প্রাণবাদীর দল, শ্রমিক-কৃষকের দল। তত্ত্বকৃষ্টির প্রতিষ্ঠা নগর মথুরা-দ্বারকায়; লোককৃষ্টির আবাদন পল্লীতে। শ্রীকৃষ্ণই পল্লীত্রজের কৃষ্টিকে তত্ত্বকৃষ্টিতে উন্নততর করিয়া তুলিতেছেন এবং তত্ত্বকৃষ্টিকে লোককৃষ্টির অন্তরে অন্তরে ছড়াইয়া দিতেছেন, ঘন করিয়া তুলিতেছেন। ইহাই ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরা গমন এবং মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকাগমনের মূল রহস্য।

বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আদর্শের মূল্য, বুদ্ধির মূল্য, যোগ্যতার মূল্য, শুচিতার মূল্য, নিবৃত্তির মূল্য; পক্ষান্তরে প্রাণবাদী শ্রমিক-কৃষক আবাদন করিতে চান মাটির মূল্য, রক্তের মূল্য, কর্মের মূল্য, জীবিকার মূল্য, প্রবৃত্তির মূল্য। উপনিষদ "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রাণ-প্রজ্ঞার সমন্বয়ই বিধান করিয়াছেন। জীবনের মূল্য কিছুতেই একান্তভাবে প্রজ্ঞা-সাধনার তত্ত্বকৃষ্টির সাধনায় কিম্বা একমাত্র প্রাণ সাধনায় লোককৃষ্টির সাধনায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। "এইটাই হ'ল বাঙ্গলার নিজ কালচারের সমস্যা—তত্ত্বসংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন না রেখে জনতার সঙ্গে যুক্ত করা, আর জন-সংস্কৃতিকে উন্নততর কালের সত্যে ও রসিতে সমৃদ্ধ করা তত্ত্ব সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে লোকসংস্কৃতির বিষয়-বস্তু দিয়ে, আর তার প্রকাশকে করতে হবে সহজ ও লোকবোধ্য। আর জন-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে নূতন বিষয়বস্তু দিয়ে আর তার প্রকাশকে করতে হবে আরও উন্নত ও বিকশিত। দুই সংস্কৃতিতে স্থাপন করতে হবে সমন্বয়।" (১)

ভারতের মহাদি ঋষিরাই তত্ত্বকৃষ্টির স্রষ্টা। তাঁহারা এই তত্ত্বকৃষ্টিকে জনগণের নাগালের বাহিরেই (ab extra) কয়েকজন তত্ত্বের বিশেষ সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাকে জনতার সঙ্গে যুক্ত তাঁহারা করিতে পারেন নাই। জন-কৃষ্টিকেও উন্নততর কালের সত্যে ও রসিতে সমৃদ্ধ করিবার খোঁজ তাঁহাদের চিন্তাধারার মধ্যে ছিল না। তাঁহারা গতিহীন স্থিতির ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়াছিলেন বলিয়াই ইহার মধ্যে গতিপ্রধান জন-সাধারণের কোনও প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহাদের ব্রহ্মবস্তু ছিলেন একান্তভাবেই এই ক্ষর বিশ্বের অতীত "অক্ষর"। কিন্তু আজ জগতের আপন্ন ঐ "কাল" (Time) যখন উন্নততর পরিকল্পনা লইয়া জড় বিশ্বকে উন্নততর ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা দিতেছেন, তখন বহিপাশ, তাহার প্রতিপাদ্য অক্ষর ঐ ব্রহ্ম-পুরুষ ও তাঁহারই ভিত্তিতে গঠিত সনাতন সমাজ-কাঠামো আজ অচল, অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই অক্ষর নিষ্প্রাণ ব্রহ্ম-পুরুষকে, তাঁহার অক্ষর শাস্ত্রকে ও সমাজের ইস্পাত কাঠামোকে সংসারের মাঝে প্রাণবান করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ধরার বুকে পদার্পণ করিলেন। তত্ত্বকৃষ্টিকে লোককৃষ্টির বিষয়বস্তু দিয়া সমৃদ্ধশালী করা, তাহার প্রকাশকে সহজ ও লোকবোধ্য করা এবং জনকৃষ্টিকেও নতুন বিষয়বস্তু দিয়া সমৃদ্ধ এবং তাহার প্রকাশকে আরও উন্নত, বিকশিত করাই তাঁহার কাজ। পল্লীগ্রামের নর-নারী, পল্লীর খেয়াঘাট ও নদীর বুকে বাচখেলা, পল্লী-রমণীদের পল্লীর বাজারে দুধ বিক্রির

(১) বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ—শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার, পৃ ১২৭

অভিযান, পল্লীর গোষ্ঠে পল্লীবাসী কৃষকদের লোচারণ ও খেলাধূলা, পল্লীর তরুকোটর, সেই প্রাচীন যুগের মুক্তপ্রাণ নর-নারীর সজ্ঘবদ্ধতা—সবই তো লোকবৃত্তির বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ এইগুলিকেই উচ্চতর স্তরের সত্তা ও ভক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলের বৃন্তে, ফলের ফাঁকে ফাঁকে অক্ষয়ের এই আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের নৌকা-বিলাস, বনি-লীলা, সখা সঙ্গে গোষ্ঠ-লীলা, জল-কেলি, মান-ভঞ্জন, রাস-লীলা প্রভৃতির ভিতর দিয়া জন্মিয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে তত্ত্বকৃষ্টির প্রকাশ সহজ হইল, জনসমূহের সহজবোধ্য হইল; পল্লী ও নগরের সমন্বয়ও সাধিত হইল। যে তত্ত্বকৃষ্টি ছিল "আকাশের" বস্তু, জনসাধারণের নাগালের বাহিরে, ইন্দ্র-যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিয়া আজ তাহাই ধরার বুকে ছড়াইয়া পড়িল।

এই তত্ত্বকৃষ্টি লোককৃষ্টির সমন্বয় নিশ্চয়ই তত্ত্বকৃষ্টিরও অধিক, লোককৃষ্টিরও অধিক। উহা একান্ত লোককৃষ্টির কোটীকৃত তত্ত্বকৃষ্টি নহে। সমন্বয়ের ভিতর রহিয়াছে দুইয়েরই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাংমূল্য। তত্ত্বকৃষ্টি হইতেছে প্রজ্ঞাবান বুদ্ধুজীবীদের; লোককৃষ্টি হইতেছে প্রাণবান শ্রমিক-কৃষকের। কমিউনিজম যখন একবার শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে মানিয়া লইয়াছে, তখন সেই যুক্তির সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিলে তাহার পক্ষে এ কথা বলিবার অধিকারই নাই যে, "দুই সংস্কৃতিকে স্থাপন করতে হবে সমন্বয়"। 'সমন্বয়কে' আশ্রয় করিয়াই সমন্বয়। সমগ্র সমাজের একটি অংশ ঐ কৃষককে অবলম্বন করিয়া স্থাপিত হইতে পারে লোককৃষ্টিই; তত্ত্বকৃষ্টি সেখানে থাকিবে লোককৃষ্টির নিষ্পেষণে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের সাধনায় লোককৃষ্টি ও তত্ত্বকৃষ্টির সঙ্ঘর্ষও অনিবার্য। কমিউনিজম নিজকে অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া ভারতের মাটিতে নিজের অজ্ঞাতসারে সমন্বয়রূপে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে, তাহা "বাঙালী সংস্কৃতির রূপ" পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়ের 'দুই সংস্কৃতিকে করতে হবে সমন্বয়,' এই বাক্যটির মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভাগবতকার ব্রজলীলার মধ্যে কমিউনিজমেরও পরের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গণসাহিত্যের চরম শাস্ত্র এই ভাগবতগ্রন্থখানিকে তথাকথিত তত্ত্বসমাজ এতদিন পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন, ইহার আবির্ভাব ছিল তাঁহাদের পক্ষে ভীতির বস্তু। ভাগবতের ভক্তিসাধনায়ই তত্ত্বকৃষ্টির অবতরণ ও লোককৃষ্টির উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে।

বাস্তববস্তুবাদ

'আমি শৈল'—শ্রিয়িধাবণপ্রসঙ্গে ঘোষিত এই মহাবাণীর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ দার্শনিকদিগকে স্পষ্ট ভাষায় জড় প্রকৃতি (Reality, বস্তু) ও অজড় চৈতন্যের (Idea, ভাব) সমন্বয়ের নির্দেশ দিয়াছেন। বস্তু ও ভাবের সমন্বয়েই বাস্তববস্তুর উদ্ভব—ইহাই বাস্তববস্তুবাদের সিদ্ধান্ত।

আমি শৈল—এই বাক্যটীর মধ্যে রহিয়াছে দুইটি অংশ —'আমি' ও 'শৈল'। 'আমি' হইতেছে অজড় আত্ম-চৈতন্যের (Self-consciousness) নাম; 'শৈল' হইতেছে জড় প্রকৃতির (Nature) দ্যোতক চিহ্নমাত্র (symbol)। শ্রীকৃষ্ণই একাধারে প্রকৃতি ও চৈতন্য। প্রকৃতি ও চৈতন্যের, বস্তু ও ভাবের সমন্বয়ের পক্ষ ভিত্তিতেই শুধু তত্ত্বকৃষ্টি ও লোককৃষ্টির সমন্বয় সম্ভব। এতদিন প্রজ্ঞাবাদীদের (Intellectualists) এক শাখা 'অজড়' বলিতে প্রকৃতির অতীত এক 'আমি চৈতন্য'কে (Idea) এবং জড় বলিতে প্রকৃতি সম্ভূত পরিণামধর্মী বহু গুণ, কর্ম ও বস্তুমাত্রকেই (Reality) বুঝিয়াছেন। এইভাবে তাঁহারা ভাব-চৈতন্য ও জড়বস্তুর মধ্যে এক আপোষহীন শ্রেণী-দ্বন্দ্ব স্থাপন করিয়াছেন। দ্বন্দ্ব শব্দের 'মিথুন' (interpenetrated) অর্থটি ইহাদের দৃষ্টিতে ধরাই পড়ে নাই। প্রকৃতির অতীত, একান্ত এই অজড়বাদের বিরুদ্ধেই ছিল একান্ত প্রকৃতিবাদীদের (Naturalists) অভিযান।

একান্ত জড়বাদীও কিন্তু দ্বন্দ্বগুণের 'বিরোধ' অর্থটীর উপরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, অজড়বাদী যেখানে অজড়কেই জড়ের 'আদি কারণ' মানিয়া তাহারই কার্যরূপে (product) জড়কে দাঁড় করাইয়াছেন, জড়বাদী সেখানে জড়কেই আদিকারণ ধরিয়া তাহা হইতে অজড়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

কেহই দ্বন্দ্ব শব্দের 'বিরোধ' ও 'মিথুন' পরস্পরবিরোধী এই অর্থদ্বয়ের জীবনগত সামঞ্জস্যের উপর দার্শনিক চিন্তাধারা ও সমাজসংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহারই সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তিনিই একদিন কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে সকল বিরোধকে অবিরোধে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্ত চ"—'হে অর্জুন, সমাস সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব।' সমাসগুলির মধ্যে কেন তিনি দ্বন্দ্বসমাস, আজ এই মহাকুরুক্ষেত্রের মাঝে বসিয়া তাহারই আলোচনা করিব।

সমাস চতুর্বিধ—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব। শ্রীকৃষ্ণ দ্বন্দ্বসমাসের অন্তরে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহির সমন্বয় দর্শন করিয়াই দ্বন্দ্বসমাসকে নিজস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যে সমাসে উত্তর পদের অর্থ প্রধান, তাহাই দ্বন্দ্ব সমাস—"উত্তরপদার্থপ্রধানঃ দ্বন্দ্বঃ"। যেমন 'মাতা এবং পিতা = মাতাপিতা'। 'মাতাপিতা'র এই দ্বন্দ্বসমাসে মাতাপদের অর্থ প্রধান, পিতাপদের অর্থও তুল্যভাবেই প্রধান। আমাদের পিতৃতন্ত্র সমাজে মাতার নিজস্ব কোন মান (measure) না থাকায় এবং পিতার মানেই মাতার মান নির্ণীত হওয়ায় প্রাণের দিক পুষ্ট হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মাতৃতন্ত্র সমাজে পিতাকে গৌণ করিয়া মাতারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রজার দিক উপবাসীই থাকে। গীতোক্ত দ্বন্দ্বসমাসের ছাঁচে গঠিত সমাজই সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর; এখানে মাতা পিতা দুই-ই দু'য়ের গুরু। মাতাপিতা এখানে স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া পরস্পরের সেবার ভিতর দিয়া সমগ্র পরিবারেরই সেবা করেন, নিজ মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের রসাস্বাদনেও তৃপ্ত হন। জনকজননী-জীবনের এই সেবার অন্তরে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রত্যক্ষ সাধনার দিকটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহির অন্তর্নিহিত জীবন সাধনাও ইহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে, এইবার তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইব।

"পূর্বপদার্থপ্রধানঃ অব্যয়ীভাবঃ"—"পরপদার্থপ্রধানঃ তৎপুরুষঃ"—"অন্যপদার্থপ্রধানঃ বহুব্রীহিঃ"। যেখানে পূর্বপদের অর্থ প্রধান, তাহা অব্যয়ীভাব; যেমন 'উপকূল'। পরপদের অর্থ যেখানে প্রধান, তাহাই তৎপুরুষ; যেমন 'নীলোৎপল'। যেখানে কোনও পদের অর্থই প্রধান নয়, প্রধান থাকে অন্য একটী পদের অর্থের, সেখানেই বহুব্রীহি; যেমন 'পীতাম্বর'। উপকূল (কূলের সমীপে) এই পদটীর মাঝে রহিয়াছে 'উপ' (সমীপে) এই পূর্ব পদটীর অর্থের প্রাধান্য; নীলোৎপল এই পদটীর মধ্যে 'উৎপল' এই পর পদের অর্থপ্রাধান্য; পীতাম্বর পদটীর মধ্যে পূর্বপদ 'পীত' এবং পরপদ 'অম্বর' কাহারও অর্থের প্রাধান্য নাই; প্রাধান্য রহিয়াছে পীত ও অম্বর পদদ্বয় হইতে 'অন্য' অপর একটী পদের অর্থের। পীতাম্বর বলিতে পীতও বুঝায় না, অম্বরও বুঝায় না, বুঝায় পীত ও অম্বর হইতে 'অন্য' সেই শ্রীকৃষ্ণের অর্থকে যাহার পরিধানে রহিয়াছে পীতবর্ণের অম্বর।

দ্বন্দ্বসমাসের মধ্যেই রহিয়াছে সমাসচতুষ্টয়ের এক অভিনব সমাবেশ। 'মাতাপিতা'র দ্বন্দ্বসমাসে অব্যয়ীভাব তো লুকাইয়া থাকেই; কেননা পূর্বপদ 'মাতা'র অর্থ এখানে প্রধান। তৎপুরুষের প্রকাশও এখানে উপলব্ধি করিতেছি, যেহেতু 'পিতা' এই পরপদের নিজস্ব মানও এখানে সম্পূর্ণ অব্যাহত। দ্বন্দ্বসমাসের অন্তরে বহুব্রীহিরও আস্বাদন পাইতেছি। কেননা যে দ্বন্দ্বসমাসে সন্তানের প্রজ্ঞাসাধনা ও বহির্জগতের সামঞ্জস্য রক্ষার সাধনায় পিতার আসনই অগ্রগণ্য, সেখানে মাতা বা পিতা কেহই একান্তভাবে প্রধান থাকিতেছেন না; প্রধান হইতেছে মাতাপিতার প্রেম অর্থাৎ 'আনন্দময় আমি আছি'র যোগ-সূত্রটী ও তাঁহাদের মিলনক্ষেত্র ঐ পরিবার বস্তুটী। এই প্রেম ও পরিবার বস্তুটী নিশ্চয়ই মাতা হইতেও "অন্য" পিতা হইতেও "অন্য"; ইহাই তো বহুব্রীহির আস্বাদন। দ্বন্দ্ব সমাসেই বহুব্রীহি, তৎপুরুষ ও অব্যয়ীভাব পরস্পরের মাঝে গলিয়া গিয়া, একীভূত হইয়া এক সুন্দর দর্শন গড়িতে পারে।

এখানে "চৈতন্য"বাদী বা 'জড়'বাদী একাকী কেহই সর্বাঙ্গসুন্দর দর্শন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম নন্। কেহই তাহাকে একান্তভাবে স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করিতে

পারেন নাই ; কেননা তাহাতে কোনও 'বাদ'ই (-ism) তো দাঁড়ায় না। অজড়বাদীও জড় মানেন, জড়বাদীও অজড় মানেন, তাঁহারা মানেন না শুধু উহাদের সম 'মান'। অজড়বাদী যেখানে জড়ের স্বযোগের আড়ালে অজড় প্রতিষ্ঠা করেন, জড়বাদী সেখানে করেন জড়েরই অগোচর অজড়ের খাইয়া পরিয়া। কেহই অপরকে খোলা প্রাণে স্বীকার করেন না ; দুই-ই অকৃতজ্ঞ। প্রত্যেকেই চোরের মত (surruptitiously) অপরের যোগ্যতা অপহরণ করেন, অপরেরই অগোচরে পুষ্ট হন ; অথচ সোজা সরল সত্যটি স্বীকার করিবার মত বুদ্ধি ও প্রাণের বল তাঁহাদের নাই। অজড়বাদীরা অজড় 'চৈতন্য'কে পূর্ব্বপদ বা আদি কারণ মানিয়া তাহারই পূর্ব্বস্থিতির (priority) ভিত্তিতে অজড়দর্শন গড়িতে চাহিয়াছেন ; ইহারা ভাববাদী (Idealists)। পক্ষান্তরে যাহারা জড়কেই পূর্ব্বপদ বা আদি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই অর্থের উপর জড় দর্শন রচনা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই জড়বাদী (Materialists)।

মহামতি এঙ্গেল্‌স লিখিয়াছেন—"The great basic question of all philosophy, espicially of modern philosophy is that concerning the relation of thinking and being···spirit to nature... Which is primary, spirit or nature ?···The answers which the philosophers gave to the question split them into two great camps. Those who asserted the primacy of spirit to nature and, therefore, in the last instance, assumed world creation in some form or other...comprised the camp of idealism. The others, who regarded nature as primary, belong to the various schools of materialism"—"সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের, বিশেষতঃ আধুনিক দর্শনের বৃহৎ মৌলিক প্রশ্ন হইতেছে চিন্তা ও সত্তার, চৈতন্য ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় মূলক। কে আদি কারণ ? চৈতন্য না প্রকৃতি ? যে উত্তর দার্শনিকবৃন্দ দিয়াছেন, তাহাতে ইহারা দুইটি প্রকাণ্ড দলে বিভক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃতি অপেক্ষা চৈতন্যের পূর্ব্বস্থিতি (primacy) মূলতঃ প্রচার করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত কোনও না কোন রকমে বিশ্বসৃষ্টিকে মানিয়া লন, তাঁহারা হইতেছেন ভাববাদীর দল। যাঁহারা প্রকৃতিকেই আদিকারণ মনে করিলেন, তাঁহারা জড়বাদেরই বহুবিধ শাখাভুক্ত। এ-দেশে ও-দেশে দার্শনিকদিগের মধ্যে এইরূপ গুরু দুইটি বিভাগ রহিয়াছে।

পাশ্চাত্যের অজড়বাদী হেগেল, কাণ্ট প্রভৃতি চৈতন্য-কেই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ধরিয়াছেন, এবং তাহা হইতেই পরবর্ত্তীকালে উদ্ভূত বলিয়া প্রকৃতির ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণও ঈশ্বর-চৈতন্যকেই পূর্ব্ববর্ত্তী আদি কারণরূপে স্বীকার করিয়া তাহা হইতেই পরবর্ত্তী জীবজগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যানে জীবজগৎ ও তাহার জড়ীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয়, মান-অপমান প্রভৃতির পরম অর্থ হিসাবে কোনও মূল্যই রহিল না। সংসার শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের দৃষ্টিতে চৈতন্যের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়—"ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা"। ইহারই প্রতিস্পর্দ্ধীরূপে দাঁড়াইয়া মার্কসীয় জড়বাদ আত্মচৈতন্যকে জড়ের একান্ত পিছনে ফেলিল, এবং জড়কে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া শাস্ত্র ও সমাজ গড়িতে আপ্রাণ চেষ্টা করিল। 'আদি-চৈতন্য'কে এইভাবে 'প্রকৃতি'র পিছনে গৌণ করিয়া রাখার ফলে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা 'প্রয়োজন-মূল্য' (use-value) প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু একটা 'নিজ-মূল্য' (self-value) স্বীকৃত না হওয়ার ফলে জড়বাদীরা গতির উদ্দাম স্রোতে প্রয়োজন হইলে ব্যাপকতর প্রয়োজনের 'লোভে' কাসিয়া যাওয়াকে নেশা ও উন্মত্ততায় যাহাকে পথের বাধা মনে করিল, তাহাকেই নির্ম্মমভাবে উৎখাত করিতে লাগিল। তখন গীতার 'কাম হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সম্মোহের সৃষ্টি হয়'—এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে থাকে, নীতি (morality) বলিয়া কিছুই তখন থাকে না, দুর্নীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার উক্তিই হইতেছে—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং

জীবেৎ"—"Eat, drink and be merry" (খাও দাও মজা লোট)। তখনকার নীতিই হইতেছে—"No method is too mean"। একান্ত জড়বাদ ও অজড়-বাদ দুই-ই বুদ্ধির 'সুবিধাবাদ'। কেহই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন সমস্যার সমাধান হইবার সাহসী নয়।

পূর্ব্বপক্ষ-পরপক্ষসমন্বিত, কার্য্যকারণসম্বন্ধিত সমগ্রের দিকে ইহাদের কাহারও দৃষ্টি নাই। সমগ্র দৃষ্টি যদি ইহাদের থাকিত, জড় ও অজড়ের সমন্বয়তত্ত্ব ইহাদের কাছে প্রতিভাত হইত। তখন বিজ্ঞানের (science) ক্ষেত্রে জড় ও অজড় দুই দুই থাকিয়াও অধিবিদ্যার (meta-physics) ক্ষেত্রে দুইয়ের অতীত এক সত্তার আস্বাদন করিতে পারিত, বিজ্ঞান-অধিবিদ্যার বিরোধ চিরতরে মিটিয়া যাইত। মার্কসীয় দর্শন যেখানে অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করিয়া একান্তভাবে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়াছে, গ্রীকদর্শন সেখানে বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান রাখিয়াই অধিবিদ্যায় পরিণত তুলিয়াছেন, মার্কসীয় জড়বাদের অনুরূপ জড়ের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দিয়াও অজড়ের সঙ্গে জড়ের সমন্বয় স্থাপন করিয়া-ছেন। দেশে কালে 'বর্ত্তমান' জড়বস্তু কেমন করিয়া নিজেকে ভিঙ্গাইয়া, নিজেরই উর্দ্ধে উঠিয়া নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করিতে করিতে আগাইয়া চলিয়াছে, গ্রীকদর্শন তাহারই একটী নিখুঁত ছবি আঁকিয়া দিয়াছে। নিজের উর্দ্ধে উঠাই হইতেছে জড়ের 'অজড়ত্ব', অধিবিদ্যার দিক্। উপরে উঠিয়াও জড় জড়ই রহিয়া যাইতেছে—ইহাই জড়ের 'জড়ত্ব', বিজ্ঞানের দিক্। অজড় জড়েরই অপরার্দ্ধ।

জড়বস্তু স্বরূপতঃ দেশাতীত, কালাতীত, অনন্ত (Infinite) বলিয়াই জড়ের 'অতীত কালে'র রূপটী দেশ-কালের বুক চিরিয়া 'বর্ত্তমান' রূপে রূপায়িত হইতে পারে, এবং বর্ত্তমান রূপটিও আবার 'ভবিষ্যৎ'রূপে আগাইয়া আসিতে পারিবে। সর্ব্বদেশসমন্বিত হইয়াই জড়বস্তু দেশা-তীত অনন্ত; সর্ব্বকালসমন্বিত হইয়াই সে কালাতীত অনন্ত। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালদেবের "সর্ব্বসমন্বয়"। অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের পক্ষ প্রাচীরবন্ধন বাস্তব বস্তুকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সে সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া অসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। জড় অজড় দুই-ই বাস্তব বস্তুরই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। জড় চৈতন্যের সমন্বয়েই বাস্তব বস্তুর উদ্ভব। সংগ্রামরত জড় ও চৈতন্য দুই-ই শূন্যগর্ভ ভাবুকতা (empty idealisation)। বাস্তব বস্তুর স্তরেই শুধু জড় বাস্তব, চৈতন্য বাস্তব। বাস্তব জড় ও বাস্তব চৈতন্যের সমন্বয়েই বাস্তববস্তু।

ভাব ও বস্তুর এই সমন্বয় সহজ বুদ্ধির (intuition) স্তরেই সম্ভব; খণ্ড মন-বুদ্ধি ইহার নাগালই পায় না। অথচ খণ্ড বুদ্ধির স্তরে, এই কর্ম্মক্ষেত্রে, প্রকাশিত না হইলে ইহার প্রয়োজনগত কোন মূল্যই (use-value) থাকিবে না। যাহার কোনও ব্যবহারিক মূল্য নাই, তাহা নিছক ভাবুকতা। সহজ বুদ্ধির স্তর, সমগ্রের স্তর যখন খণ্ড বুদ্ধির স্তরে অবতরণ করে, তখন তাহা বুদ্ধির 'হয় এটা নয় ওটা'র (Either-or) ভাবকে আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। তাই তো বিশেষ কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে বস্তু (মার্কসের Being) থাকে সামনে, 'ভাব' (Idea) হয় তাহার সহায়ক ও পরিপূরক; আবার সেই কর্ম্মক্ষেত্রই যখন অপর বিপরীত ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন হয় তো দেখিতে পাইব যে, 'ভাব'ই সেখানে রহিয়াছে সামনে, 'বস্তু' শুধু সহায়ক ও পরিপূরক। সমগ্রের দেশে সমগ্রের কোনও অংশেরই একান্তভাবে সামনে থাকার যোগ্যতা বা অধিকার নাই। বর্ত্তমান যুগের আবেষ্টনে অবশ্য 'জড়'ই থাকিবে সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠনের সামনে, অজড় করিবে তাহার অনুগমন।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনও দিন আমি জড়বাদী, আবার পরের দিন সেই আমিই অজড়বাদী; কিম্বা দিনের প্রথম প্রহরে যে আমি জড়বাদী, মধ্যাহ্নে সেই আমিই হয়ত অজড়বাদী। যখন আমি ভোজন করি, তখন জড়েরই অনুগমন করে আমার অজড় চৈতন্য। তখন খাওয়া ও হজম করিবার প্রক্রিয়াগুলিকে স্ব-স্থ রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয় এমন ভাবে উচ্চ চিন্তাসমূহের সংযত থাকা, যাহাতে উহারা দেহযন্ত্রের উপর কোনও চাপের সৃষ্টি না করিতে পারে। সেই জন্যই তো ভোজনের বেলা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উগ্র চর্চ্চা নিষিদ্ধ। যতটুকু যাহা ভোজনের সাহায্য হয়, ততটুকুই শুধু বিধেয়। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে

যে, জ্ঞানানুশীলনের বেলা কর্মেন্দ্রিয়গুলি আপনা আপনি নিরুদ্ধ হইয়া আসে। ধ্যানীর ধ্যান যতই জমিয়া উঠে, ততই কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দুই-ই নিরোধের পথে অগ্রসর হয়। পরস্পরবিরোধী কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যান সবই তো সারা জীবনের প্রাত্যহিক ব্যাপার; কোন্ দুঃসাহসী ইহাদের কোনও একটিকে একান্তভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করিবে? কলিযুগে জড়বাদই প্রধান। অজড় এখানে জড়ের সেবক; অথচ কেহই কাহারও প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইবে না। ইহাই গীতার 'অনসূয়ু'র অবস্থা।

নিরিধারণপ্রসঙ্গে জড়েরই আদিকারণত্ব প্রচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু। রজোগুণদ্বারাই বিশ্বের উৎপত্তি; এবং নরনারীর অন্যোন্যমিলনের ফলেই এই বিবিধ জগৎ সৃষ্ট। রজোগুণদ্বারা প্রেরিত হইয়াই এই সব দেব জন্ম দান করিয়া থাকে। প্রজাসমূহ তাহাদ্বারাই সিক্তিলাভ করে। ইহার মধ্যে আকাশের দেবতা মহেন্দ্রকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন কেন? মহেন্দ্র কি করিলেন?"

এই উক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে একজন পাকা জড়বাদী ছাড়া আর কিছুই কি মনে করা যায়? শ্রীকৃষ্ণ যে এইরূপে 'নিরীশ্বর সাংখ্য' মতকেই খুব উঁচু করিয়া ধরিলেন, তাহা শ্রীধরস্বামী প্রমুখ ভাগবতের টীকাকারগণও ভাগবতের টীকায় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সকল আর্ষশাস্ত্র-সম্মত পরম-ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আজ ব্রজে নিরীশ্বর সাংখ্যমতের প্রচারক ও আস্বাদক। কি আশ্চর্য্য তাঁহার জীবন ও দর্শন! ইহা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য যে, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি অজড়বাদী চিন্তানায়ক ও যুগপ্রবর্তকগণ বেদান্ত-ভাষ্যসমূহে যে নিরীশ্বর সাংখ্যের খণ্ডনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যে নিরীশ্বরসাংখ্যকে বেদের সঙ্গে সমন্বিত করিবার কোনও সূত্রই তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই, প্রয়োজনও মনে করেন নাই, দুঃসাহসী শ্রীকৃষ্ণ নিজে 'বেদান্তবেত্তা', 'বেদান্তকৃৎ' হইয়াও সেই নিরীশ্বর সাংখ্যের সঙ্গেই আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন! শ্রীকৃষ্ণ যেখানে নিজ জীবন ও দর্শনে নিরীশ্বর ও সেশ্বরবাদের সমন্বয় আস্বাদন করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি জড়বাদীদের, বিশেষভাবে মার্ক্সেরও পরের কথা বলিয়াছেন। কার্ল মার্ক্সের দর্শন ও নিরীশ্বর সাংখ্য সমজাতীয়।

মার্ক্সীয় বস্তুতন্ত্রক বস্তুবাদেরই বিবর্তিত রূপ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত বাস্তববস্তুবাদ। বাস্তব বস্তু একান্ত জড় বা অজড় কিছুই নয় বলিয়া প্রত্যেকেই ইহাকে আশ্রয় করিয়া যে যাহার বুদ্ধি ও প্রয়োজনের অনুকূল মতবাদ স্থাপন করিতে পারিতেছেন। যে মানুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন (এঙ্গেলসের ভাষায় product of nature), সেই মানুষই তো প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিজেরও স্রষ্টা, প্রাকৃত বস্তুসমূহেরও উৎপাদক (producer)। মানুষ কি একান্ত উৎপাদক না উৎপন্ন? সে একাধারে দুই-ই। তাহাকে কোনও একটি বলিলে ভুল করা হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—"ভাবে এক, বস্তুতঃ দুই।" প্রকৃতি ও মানুষ দুই-ই অঙ্গাঙ্গিভাবে (organically) যুক্ত। 'Man is organic to nature'—'Nature is organic to Man.' জড়ের পাশ্চাত্যোক্ত কোনও রূপ নাই—ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। আইনষ্টিনের আপেক্ষিকবাদ ইহাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। ব্রহ্মধামে চিৎ (চৈতন্য) ও মৃৎ (মাটি) এক। নিউটনের মৃত (dead), নিরেট (block) জড় (matter) এত দিন পাশ্চাত্যে জড়-অজড়ের ঝগড়া মিটাইয়া রাখিয়াছে। আইনষ্টিন তাহারই অবসান আনিলেন।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃই যখন সৃষ্টির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ, তখন কোনও ঈশ্বরকে বাহির হইতে (deus ex machina) আমদানী করিবার পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে? সৃষ্টির বাহিরের কোনও স্বতন্ত্র সত্তাকে অস্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিরই পরমোজ্জ্বল, আশ্চর্য্য রহস্যময় এক দিব্য রূপের খোঁজ দিয়াছেন। কিন্তু সে কোন্ সৃষ্টি? জড়বাদীদের একান্ত জড়ীয় তাহা নিশ্চয়ই নয়। তবে কোন্ পথে তাহার খোঁজ মিলিবে? শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিতে স্রষ্টা সৃষ্টির অঙ্গীভূত (organic); এবং বিশ্বের স্ত্রীপুরুষ সংযোগের ছন্দের অন্তরেই খুঁজিতে ও আস্বাদন করিতে হইবে জীবজগৎ-সৃষ্টির রহস্যকে। সৃষ্টির বাহির হইতে, কোনও চিন্ময় লোক হইতে এই মাটির দেশে জীবের

আবদ্ধানী হয় নাই, মাটির সমস্ত অঙ্গের রস নিংড়াইয়াই 'আত্মিকম' রূপে সে জনম লাভ করিয়াছে। বিবিধ জগৎ সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে স্ত্রীপুরুষের অন্যোন্যমৈথুন—'অন্যোন্যং বিবিশুং জগৎ'—ভাগবত। স্রষ্টা আজ সৃষ্টির অঙ্গগত থাকিয়া ও সৃষ্টির মাঝে আত্মগোপন করিয়াই নিজের চেয়েও সৃষ্টির ভ্রূত্ব (বড়ত্ব) আস্বাদন করিতেছেন। স্রষ্টার চেয়েও সৃষ্টি রসের দুইকোণে বড়। সৃষ্টির মাঝে তাই সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্য স্বামী—ইহাই ব্রজে "রাইরাজা"-লীলার নিগূঢ় অর্থ। সৃষ্টির পা' ধরিয়াই স্রষ্টা-ঈশ্বর তাঁহার স্বাধিকার প্রমত্ততার উগ্র বিষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন—এই পরম সত্য আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে "দেহি মে পাদপল্লবম্ উদারম্"—মন্ত্রে শ্রীরাধার পা' ধরিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

কার্ল মার্ক্সের মতে মানুষ প্রকৃতিসম্ভূত। অন্যান্য জীবের ন্যায় নিজ উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণও বলিতেছেন "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন"—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—'হে অর্জ্জুন, তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে'—'আত্মমায়াদ্বারা স্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আমি সম্ভূত হই।' 'সম্ভবামি' পদটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ আত্মমায়াদ্বারা (Higher naturalism) স্বপ্রকৃতিতে (Lower Nature) অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতির সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া 'আত্মিকম' মূর্ত্তিতে 'সম্ভূত' হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজকে প্রকৃতিসম্ভূত বলিলেও পরনিশ্বাসে কিন্তু আবার শুনাইতেছেন, "ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"—'আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর এই জগৎ প্রসব করিতেছেন'। শ্রীকৃষ্ণ কেন এবং কেমন করিয়া একাধারে প্রকৃতির 'কার্য্য' ও 'কারণ' দুই-ই হইতে পারিলেন, তাহা আমরা ধীরে ধীরে আস্বাদন করিব। শ্রীকৃষ্ণ এইখানেই মার্ক্সদর্শনেরও পরের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বিশেষর হইয়াও তিনি যে প্রকৃতিসম্ভূত, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকিতে পারি। এবং কার্ল মার্ক্সের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি একমতও।

কিন্তু এই ঐক্যমত্য থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে প্রচুর। কার্ল মার্কস যেখানে চৈতন্যকে একান্তভাবেই জড়াপেক্ষ ধরিয়া লইয়াছেন, চৈতন্যের জড়নিরপেক্ষ কোনও স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে জড়ের স্বাতন্ত্র্য-স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের স্বতন্ত্র মান ও স্থানেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশোপনিষদের সংপ্রতীত অনুবাদকল্পে লিখিয়াছি—"জড়ের প্রতি অংশের বুকে নিজকে ভিজাইয়া পূর্ণ হইবার একটি খোঁচা আছে বলিয়াই জড় আগে পিছের, আগে পাশের, উপর নীচের অনন্ত খণ্ডসমূহের বুকে বুক মিলাইয়া সেই পূর্ণ বস্তুকে আস্বাদন করিবার জন্য অনবরত আগাইয়া চলিয়াছে। এমন করিয়া কালের প্রতি অংশ ঐ ক্ষণের বুকেও নিজকে ভিজাইয়া সনাতন হইবার খোঁচা রহিয়াছে, যাহার জন্য সে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের বুকে বুক মিলাইয়া সেই সনাতনকে আস্বাদন করিবার জন্য আগাইয়া চলিয়াছে"। এইভাবে জড়ের বুকেই যে জড়ের অতিরিক্ত একটী অজড়-ধর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে, অজড় একান্তভাবে যে জড়ের বাহিরেও নয়, একান্ত ঘরেরও নয়, জড় ও অজড় দুই-ই যে অন্যোন্যমিথুন (interpenetrated),—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই দিতেছে।

কিন্তু জড়ের প্রতিটি অংশ যদি বাস্তবের দেশে তাহার আগে পিছের, আগে পাশের, উপর নীচের অনন্ত খণ্ডসমূহের বুকে বুক মিলাইয়া সেই পূর্ণ বস্তুকে আস্বাদন করিতে পারিত, যদি অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের সব খণ্ডগুলির সঙ্গে রচনা সম্ভবপর হইত, তবে জড়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও চৈতন্য বা ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজনই থাকিত না। রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিত, রাষ্ট্রপতির কোনও প্রয়োজনই থাকিত না। বিশ্বের সব সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, গণতন্ত্রসহ বিশ্বের সব ধূলিকণা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিত, তবে 'বিশ্বপতি' বলিয়াও স্বতন্ত্র কোন সত্তাকে মানিবার দরকার হইত না। কিন্তু ইহা যখন কোনও দিনই বাস্তবে পরিণত হইবে না, বাস্তবে পরিণত করিবার দিকে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াও যখন তাহার শেষে কোনও দিনই পৌঁছিতে পারিবে না, তখন রাষ্ট্রপতি বা

বিশ্বপ্রকৃতির প্রয়োজনও অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়াই থাকিবে, চৈতন্য বা ঈশ্বরকে কিছুতেই একান্তভাবে অস্বীকার করা যাইবে না। এই বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্য জড়বাদীদের স্বীকার করিতেই হইবে। মার্কসীয় দর্শন কোন দিনই 'dictatorship of the proletariat' তুলিয়া দিতে পারিবে না। এইখানেই মার্কসীয় utopian জড়বাদ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জড়বাদের পার্থক্য।

ধরার বুকে সঙ্ঘ যত ব্যাপকরূপ ধারণ করিবে, চৈতন্য ও ঈশ্বর তত তাহার ভিতর ধীরে ধীরে আত্মবিলয় করিবেন, চৈতন্য ও ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ততই কমিয়া যাইবে। বিশ্বসঙ্ঘ যদি সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ হইতে পারিত, বিশ্বে চৈতন্য ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই অসিদ্ধ হইত। কিন্তু ইহা তো হইবার নয়। এই সঙ্ঘমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াই ভগবান্ বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরুত্তর ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে যিনি জগতের বাহিরে একান্ত ঈশ্বর, বাস্তবের বেশে তিনিই প্রকাশিত হন সঙ্ঘমূর্ত্তিতে। ঈশ্বর সঙ্ঘমূর্ত্তিতেই নিরীশ্বর। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—ইহাই নিরীশ্বরবাদের গূঢ় রহস্য।

শ্রীকৃষ্ণের মতে সমগ্র জীবনের মধ্যে 'আমি চৈতন্য' হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির স্থিতিভূমি; এবং প্রকৃতি হইতেছে সেই আমি চৈতন্যেরই আপনার্দ্ধ, তাহারই ঘনীভূত আত্মায়ন, গতির দিক। দুই-ই এক অখণ্ড জীবনের দৃষ্টিকোণ মাত্র। দুই-ই যে দুইকে পরস্পরের বাহিরে রাখিয়া পরস্পরকে পরিপূরণ করে ("complete, by excluding each other"—De Broglie), এবং এক অখণ্ড জীবন-সত্তাকে গড়িয়া তোলে—বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রচার্য্য এই মহাসত্য অজড়বাদী বা জড়বাদী কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

"In Physics, as in every other branches of knowledge, the problem of continuity and discontinuity has existed at all times: for in this science, as elsewhere, the human mind has always manifested his tendencies at once antagonistic and complementary"—(১) "পদার্থ বিদ্যার মত অন্যান্য শাস্ত্রেও (বস্তুসমূহের) সাতত্য (continuity) ও বিচ্ছিন্নতার (discontinuity) সমস্যা অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কেননা অন্যান্য বিদ্যার মত এই বিদ্যাতেও মানব মন সর্ব্বদাই যুগপৎ প্রতিস্পর্দ্ধী (antagonistic) ও পরিপূরক (complementary) দুইটি প্রবণতা প্রকট করিতেছে'। পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ, নর ও নারী পরস্পর স্পর্দ্ধী হইয়াও পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে; সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যই আপনাকে পদে পদে ঠেকায়। মেয়ে তার শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে; পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিমুখ। এমন কেন হোলো? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে ঘুর করে মিল, সেইখানেই মস্ত বিকৃতি"। —শেষের কবিতা।

বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেখান হইতে বিশ্বের ছোট-বড় সকল ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র জীবনের মধ্যে জড় ও অজড়ের সমন্বয়ই প্রমাণিত হইবে। প্রতি জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আধ্যাত্মিক যে কোনও ঘটনা ঘটে, তাহার অনেকগুলির সহজ সরল ব্যাখ্যান জড়বাদের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই হয় না। পক্ষান্তরে জীবনে এমন সব ঘটনাও ঘটে, অজড়বাদের আশ্রয় না লইলে কিছুতেই যাহাদের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। একমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে (যাহা মার্কসপন্থীরা চাহিতেছেন) যেমন সমাজ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সহজ ব্যাখ্যান সম্ভব হয় না, তেমনি ধর্ম্মের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াও (যাহা ভারতের প্রাচীন পন্থীরা চাহিতেছেন) অর্থনীতির ব্যাখ্যা সহজ সরল হইবে না। যে কোনও একটী

(১) Matter and Light—Louis De Broglie. P. 217

দৃষ্টিকোণে জীবনের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গেলে যুক্তির টানাহ্যাঁচড়া করিতেই হইবে। জীবনের সঙ্গে যেমন প্রত্যেক দৃষ্টিকোণের সম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তেমনি জীবনের মধ্য দিয়াই শুধু প্রতিটি দৃষ্টিকোণের সঙ্গে অপর দৃষ্টিকোণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে সমগ্র জীবনের বাহিরে যান্ত্রিক (mechanical) দৃষ্টিতে কোনও দৃষ্টিকোণই অপর দৃষ্টিকোণের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহের সহজ সরল ব্যাখ্যান দিতে পারে জীবনের কোনও ঘটনাকে মুখ্য বা গৌণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যেও মুখ্যত্ব বা গৌণত্ব আসিয়া পড়িবে, যাহা জীবন্ত মানুষের পক্ষে মোটেই সত্য নয়, কল্যাণজনকও নয়।

"Each cell must live for itself as well as for the whole organism"—Huxley "In cell itself, considered as nucleus of life, all the parts are correlative to the whole, and the whole to the Parts,"—Paul Janet. প্রতিটি জীবকোষ নিজের জন্য (for itself) যেমন বাঁচে, ঠিক তেমনি সমগ্র জীবনের জন্যও (for the whole organism) বাঁচে,—'জীবকোষের মধ্যেই, যা জীবনের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত, সমস্ত অংশগুলি সমগ্রের অপেক্ষা রাখে, সমগ্রও অংশগুলির অপেক্ষায় থাকে।' ইহা দৈহিক জীবকোষের পক্ষে সত্য, মনস্তত্ত্বের মধ্যেও সত্য। কিন্তু প্রতি অংশেরও যে একটি নিজের দ্বারা নিজের জন্য (by it and for it) বাঁচিবার অধিকার আছে, সমগ্র (whole) যে অংশেরও উপায় (means), তাহা মার্কসীয় দর্শন স্বীকার করে নাই। মার্কসীয় দর্শনের মতে অংশ শুধু সমগ্রের জন্যই বাঁচিবে, নিজের দ্বারা নিজের জন্য বাঁচিবার কোন প্রয়োজন বা অধিকারই অংশের নাই। মার্কসবাদ যতই 'জীবন্ত' হইবার দাবী করুক, এইখানেই সে যান্ত্রিক (mechanical) হইয়া পড়িয়াছে। এই ছিদ্র-পথেই তাহার বিপদ প্রবেশ করিয়াছে, যাহার ফলে ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনে তাহার সমস্ত কার্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণই অংশ ও সমগ্রের এই বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বর্তমান যুগে শ্রীনিতাই-গোপাল গোস্বামী তাঁহার 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' ও 'ভক্তি যোগ দর্পণ' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

—শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণপ্রেমের বিশেষের ক্ষেত্রে কার্যোন্মুখ-রূপিণী হ্লাদিনী শক্তি; সুতরাং রাধাকৃষ্ণ একাত্ম হইয়াও অনাদি অনন্ত বিশেষের ক্ষেত্রে অনাদিকাল হইতে রসাস্বাদন লালসায় অনন্তীতলে দেহভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা 'ভাব আস্বাদিতে' উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। রাধাভাব ও রাধাকান্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ এই কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥
এই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

পরস্পরবিরুদ্ধ জড়বাদ ও অজড়বাদ এই বাঙ্গলার বুকেই বাঙ্গালীর ঘরে বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরিয়া, বাঙ্গলার অঙ্গনে পুষ্ট হইয়া শ্রীগৌররূপে ৪০০ বৎসর পূর্বে প্রকট হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার কাব্য, বাঙ্গলার নাটক, বাঙ্গলার বিগ্রহ, বাঙ্গালীর চোখের জল, বাঙ্গলার খোলকরতাল, বাঙ্গলার কোলাকুলি, বাঙ্গলার ধূলায় গড়াগড়ি, বাঙ্গলার হরিধ্বনি সবই শ্রীগৌরাঙ্গের দান। এক কথায় বাঙ্গলাই শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গই বাঙ্গলা। এই গৌরসুন্দরকে বুকে লইয়াই বাঙ্গালী আজ বিশ্বের জড়বাদ ও অজড়বাদের টানাটানির মধ্যে জড়বাদের উৎকট রূপ ঐ কম্যুনিজম এবং অজড়বাদের উৎকটরূপ এ দেশের অধ্যাত্ম-

বাদকে সমন্বিত করিয়া ধরার আশা দূর করিতে পারিবে। কেন্দ্রীকরণের যে বিভীষিকা একদিন ইঙ্গ-আমেরিকা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আবার তাহারই বিপরীত দিকে বিকেন্দ্রীকরণের যে বিভীষিকা রাশিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কে এই দুই বিভীষিকার মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইহার মধ্য হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সক্ষম? একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের ঐতরপুত বাঙ্গলাই তাহা পারিবে। আমরা এই ষোল পূর্ণিমার দিনে তাঁহার আবির্ভাবের সামনে আজ তাই জড়-অজড়সমন্বয়মূর্তি শ্রীগৌরসুন্দরের চরণতলে বার বার লুণ্ঠিত হইতেছি।

অপরা প্রকৃতির (brute nature) ক্ষেত্রেই জড় ও অজড়ের সংঘাত। সেখানে 'অজড়' চাহিয়াছে 'জড়'কে পিষিয়া মারিতে, তাহাকে ব্যবহারিক সত্তায় (phenomenon) পরিণত করিতে, আবার তাহারই প্রতিক্রিয়ায় 'জড়' চাহিতেছে 'অজড়'কে নিজের সৃষ্টি বলিয়া গড়িয়া তুলিতে, অজড়ের নিজস্ব মর্যাদা জড় বিশ্বের বুক হইতে মুছিয়া ফেলিতে। অজড়বাদ দাঁড়াইয়া আছে মস্তকের উপর ভর করিয়া, জড়বাদ তাহাকেই উল্টা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ দেশেও অজড়বাদী ও জড়বাদীর মধ্যে এই সংঘাত চলিতেছে। ও দেশে Hegel-এর বিরুদ্ধেও তাই Marx-এর অভিযোগ। "My dialectic method," says Marx "is fundamentally not only different from the Hegelian, but is its direct opposite. To Hegel, the process of thinking, which under the name of 'the idea', he even transforms into an independent subject, is the demi urge (creator) of the real world, and the real world is only the external phenomenal form of 'the idea.' With me, on the contrary, the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind, and translated into forms of thought."—Capital —Karl Marx.

হেগেলের idea-র কাছে এই বিশ্ব শুধুই phenomenal, পক্ষান্তরে মার্কস-এর কাছে Ideal হইতেছে human mind-এরই reflection ও forms of thought-রূপ ঐ human mind-এরই translation। হেগেল বা মার্কস কেহই জড় ও অজড়ের সামঞ্জস্য স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দুই-ই নৈর্ব্যক্তিক অমূর্ত বুদ্ধি (abstract intellect) দ্বারা বিচার করিয়াছেন, তাই সেখানে জড় ও অজড় একান্তভাবে যুধ্যমান হইতে পারিয়াছে। প্রত্যেকেই অপরকে 'surreptiously' ধ্বংস প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলার শ্রীগৌরাঙ্গ জীবন ও দর্শনে বিশ্ব পরা প্রকৃতির (Deeper nature, Higher nature) স্তরে স্থিত থাকিয়া দুই-এরই সমন্বয় বিধান করিয়াছে। সেখানে হেগেলীয় ও মার্কসীয় বুদ্ধিরও বিসর্জন সম্ভব হইয়াছে। এই স্তরেই বুদ্ধির গুণগত উন্নয়ন সম্ভবপর। এই উন্নয়নের process সম্বন্ধে মার্কস-এর ভাষায় আমরা বলিব, "the process of development should be understood not as movement in a circle, not as simple repetition of what has already occurred, but as an onward and upward movement, as a transition from an old qualitative state to a new qualitative state, as a development from the simple to the complex, from the lower to the higher." —Philosophy of Marxism by Stalin.

অপরা বুদ্ধি 'simple,' পরাবুদ্ধি 'complex,' অপরা বুদ্ধি 'lower,' পরা বুদ্ধি 'higher,' অপরা বুদ্ধির গুণগত অবস্থা হইতে পরা বুদ্ধির গুণগত অবস্থা উন্নততর। এই পরা বুদ্ধির একটা onward and upward movement রহিয়াছে। তাই এই স্তরে জড় ও অজড়ের রহিয়াছে 'inter connection and inter dependence।' এই inter connection ও interdependence-এর ফলে জড় ও অজড়ের মধ্যে এমন একটি গতির জন্ম সম্ভব হয়, যাহার ফলে এই দুইয়েরই প্রতি মুহূর্তে

'change' 'development', 'coming into being,' এবং 'going out of being' সম্ভব হইতেছে জড় ও অজড় দুইই অন্যোন্যানুপ্রবেশের (interpenetration) ভিতর দিয়া বিবর্তিত হইয়া যে অবস্থাটিতে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন বা পুরুষোত্তম-দর্শনের প্রতিপাদ্য। এই দর্শনেরই মূর্তিমান দৃষ্টান্ত স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীরাধাই পরা প্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণই পরপুরুষ। ভারতীয় দর্শনে ইহারা পূর্ণেও একাত্ম, গৌরাঙ্গরূপে পরেও একাত্ম, মধ্যেই শুধু রস আস্বাদন লাগি দুই দেহ। জড় ও অজড় দেহই একান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী বা একান্ত পশ্চাৎ নয়। দুই-ই দুইকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। Matter সৃষ্টি করিতেছে 'human mind'-কে, ইহা যেমন শ্রীগৌরতত্ত্বের একটি দৃষ্টিকোণ, মানব-মনও সৃষ্টি করিতেছে অহরহ জড়সত্তাকে, ইহাও তেমনি তুলামূল্য অপর একটি দৃষ্টিকোণ। সমাজ-জীবনেও ইহাকে খুটাইয়া তুলিলে ইহাই দাঁড়াইবে যে, বুর্জ্জোয়া ও প্রোলেটারিয়েট দুই-ই এক সমগ্র সমাজশরীরের দুইটি তুলামূল্য দিক। দুইয়ের মধ্যে যেমন আছে দ্বন্দ্ব (war), তেমনি উহাদের মধ্যে রহিয়াছে 'inter connection', 'interdependence' ও interpenetration-এর সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধত্রয়ের ভিতর দিয়া উহারা যেমন পরস্পরকে গড়িয়া চলিয়াছে, তেমনি উহারা এক সমগ্র সমাজকেও গড়িয়া তুলিতেছে। এইখানেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম সার্থক হইয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্র এই স্তরে দাঁড়াইয়াই কাড়ুয়ার বেশে জনসাধারণের মধ্যে নামিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। এইখানে দাঁড়াইয়াই ষোলা-বেচা শ্রীধর শ্রীগৌরাঙ্গের পরম প্রেমাস্পদরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন।

'জবিবিরিকির বাহিত যে ধন গোরা
জগতে ফেলিল চালি।
কাঙালে পাইয়ে খাইয়ে নাচয়ে
বাজাইয়ে করতালি॥'

সমগ্রই (integral) পূর্ণে, এবং বুর্জ্জোয়া ও প্রোলেটারিয়েট সমগ্রেরই দুই দিক বলিয়া উহারা সমগ্রের পশ্চাৎ ; কিংবা অংশদ্বয়ই পূর্ণে, অংশদ্বয়ের অন্যোন্যানুপ্রবেশের ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজ পশ্চাৎ—ইহার কোন একটিকেই একান্ত সত্য বলা চলিবে না। "There is no contradiction in this, that our independent being should be at the same time a member of a system : It lives at once *by* and *for* it : it is, therefore, as Kant says, both *means* and *ends*. And finally, that in the cell itself considered as nucleus of life, all the parts are correlatives to the whole, and the whole to the parts."—Paul Janet. প্রথমটি deductive method, দ্বিতীয়টি inductive। এক এক দর্শন এক একটিকে অগ্রে ধরিয়া যাত্রা করিয়াছে। অজড় দর্শন deductive, জড়দর্শন inductive। কিন্তু প্রত্যেকটিই সত্য।

এই দুই-ই যে তুল্যভাবে সত্য হইতে পারিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে, উহারা একই সমগ্র জীবনের দুইটি দৃষ্টিকোণ মাত্র। ভারতীয় ন্যায়দর্শন (Logic) তাই যুক্তির অবয়বগুলির মধ্যে 'উদাহরণ' বা example-এর অবতারণা করিয়াছেন। "The Hindu Anuman, it will be seen, anticipates J. S. Mill's analysis of the syllogism as a material inference, but is more comprehensive ; for the Hindu Udaharana, the third or "universal proposition with an example combines and harmonises Mill's view of the major premise as a brief memorandum to extend its application to unobserved cases, with the Aristotelian view of it as a universal proposition which is the formal ground of inference. The Formal-Material-Deductive-Inductive process thus turns on one thing—the establishment of the invariable concomitance (ব্যাপ্তি) between

the mark and the character inferred—in other words—an inductive generalisation."—Positive Sciences of the Hindus by Dr. Seal.

এই উদাহরণই হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ, এবং ঐতিহাসিক জীবন শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি পরা জড়সত্তা এবং অপরটি হইতেছে পরা অজড়সত্তা। তিনিই idea in terms of matter এবং তিনিই matter in terms of idea। জড়সত্তাবাদীদের সাধন inductive, অজড়সত্তাবাদীদের সাধনা deductive, প্রথম দল ঘটনার অবলম্বনে অর্থকে খোঁজেন; দ্বিতীয় দল অর্থকে আশ্রয় করিয়া ঘটনার ব্যাখ্যা করেন। জীবনে দুই-ই সমানভাবে সত্য।

জড়বাদী বলেন, জড়ের ক্রমবিবর্তনের ফলেই অজড়ের উদ্ভব। এই উদ্ভূত অজড় তখন জড়ের উপর 'react' করে। তখন এই প্রতিক্রিয়ার ফলে জড় অজড়ের ছাঁচে গড়িয়া উঠে। 'It is not the conciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their conciousness.'—Marx. মহামতি ষ্ট্যালিন লিখিতেছেন, 'Thus Social ideas, theories and political institutions having arisen on the basis of the urgent tasks of the development of material life of society, the development of social being, themselves then react upon social being, upon the material life of society, creating the conditions necessary for completely carrying out the urgent tasks of the material life of society, and for rendering its further development possible.'—Philosophy of Marxism—by Stalin.

'Urgent tasks of the development of the material life of society'-র 'basis'এ প্রথমে জন্মলাভ করিল 'social ideas, theories and political institutions'। তাহার পর এই সব সামাজিক আইডিয়াগুলি স্বাভাবিকভাবেই 'react' করিবে জন্মদাতা ঐ 'social being'-র উপর। এই সৃষ্টিক্রিয়া ও তাহার প্রতিক্রিয়ার মিলন দিয়া উৎপন্নে জন্ম হয় নূতন coditions-এর অর্থাৎ 'necessary for completely carrying out the urgent tasks of material life of society'। এই উপায়ে সমাজের 'further development' possible হয়। এই পর্যন্ত মার্কস যাহা বলিতেছেন, তাহার মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। কিন্তু একটী গভীর রহস্য তাঁহার দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে নাই যে, যখনই 'urgent tasks of the development of material life of society'র ভিত্তিতে social ideas বা theories জন্মগ্রহণ করিল, তখনই উহারাও স্বয়ং মূল্যবান, ভিত্তি-নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র একটি সত্তা লাভ করিল। তখন শুধু ভিত্তির পরিবর্তনে সে আর পরিবর্তিত হইবে না। সেখানে বিবর্তন আনিতে হইলে অপর আর একটি উচ্চতর ideaদ্বারা তাহাকে পরিপাক করিতে হইবে। স্রষ্টা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করে, তখনই স্রষ্টা সৃষ্টির dependent হইয়া পড়ে। স্রষ্টা-নিরপেক্ষ সৃষ্টি-সত্তাকে তখন পরিপাক করিবার জন্য স্রষ্টাকে বেশ বেগ পাইতে হয়; সৃষ্টির স্বয়ংমর্যাদা স্বীকার করিয়াই তবে প্রেমের পথে তাহাকে আত্মসাৎ করিতে হয়। 'Parent steam'-এর বিদ্রোহ করিবার শক্তি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টির বুকে জাগিয়া উঠে। ইহা প্রকৃতির প্রতিটি অণুর সনাতনী প্রবৃত্তি। শক্তির চাপ দিয়া তখন শক্তিমান স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে বশ করিতে পারে না। তখনই শ্রীগৌর-সুন্দরের 'আর কি পাতকী আছে নদীয়ায়' বলিয়া পাপীদের প্রেম ভিক্ষা করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে হয়। তাই যেমন তেমন করিয়া পিতা পুত্রকে পায় না, গুরু শিষ্যকে পায় না, ঈশ্বরও জীবকে পায় না। এই পাওয়ার পথ শক্তির পথ নয়, উহা ভক্তির পথ।

Marx-এর matter যখন 'human mind' সৃষ্টি করিল, তখনই human mind-এর matter-নিরপেক্ষ

এক স্বয়ংসত্তা-রূপে অস্তিত্ব লাভ হয়। তখন matter-এর আবেষ্টন বদলাইলেই শুধু পূর্ব সৃষ্ট human mind বদলাইবে না। তখন ঐ 'human mind'-এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে নূতনতর, ব্যাপকতর 'human mind'-এর স্পর্শের প্রয়োজন হইবে। দেখা গিয়াছে যে, ২০০ বছরের দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে জড়ীয় আবেষ্টনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফল এদেশের হিন্দু শ্রাদ্ধ-বিবাহাদির অন্তর্গত খুঁটিনাটি অবান্তর আচার-গুলির এতটুকুও পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। জড় সভ্যতার চাপেও এই যুক্তিহীন আচারগুলির টিকিয়া থাকিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় নাই। যে 'feudal system' জন্মিয়াছিল সেই কোন্ অতীত এক জড় আবেষ্টনের মধ্যে, আজিকার বৈজ্ঞানযুগের ক্যাপিটালিজমের চাপেও তো তাহা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে। যাহা একবার জন্মিল তাহা আর মরিবে না, যদি তাহারই উন্নততর ব্যাপকতর রূপ আসিয়া তাহাকে পরিপাক না করে। জড় হইতে চেতনের জন্ম স্বীকৃত হইলেও, চেতন যখন জড়ের বুক চিরিয়া জন্মিয়াছে, তখন পিতৃস্থানীয় জড় নিজের ভিতর শত পরিবর্তন আনিয়াও পুত্রস্থানীয় চেতনকে বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। চেতনই চেতনের ক্রম উন্নয়ন সাধন করিতে পারে। 'We are to meet Idea by Idea.'

মার্কসীয় দার্শনিকগণ এখানে হোঁচট খাইয়া তাঁহাদের সমস্ত মতবাদটাকে আবার mechanical করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা 'Dühring', 'Feuerbach'-এর দর্শনকে যুক্তিতর্কে অতিক্রম করিয়াও শেষ পর্যন্ত ঠিক ঠিক organic হইতে পারেন নাই। Evolution-এর প্রকৃত তাৎপর্য তাঁহাদের চোখেও ধরা পড়ে নাই। তাঁহারা যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, উহাই সে সময়ের জন্য যথেষ্ট। ভারতবর্ষ এই বিবর্তনের সত্য বাস্তব পরম চরম রূপ নিজের দর্শন ও জীবনে প্রকাশিত করিবে। সৃষ্ট-সৃষ্টি-স্রষ্টা—তাহা জড়দর্শনের ক্ষেত্রেই হউক বা অতীন্দ্রিয়দর্শনের ক্ষেত্রেই হউক—প্রত্যেকটি অনন্যনিরপেক্ষ স্বয়ং সত্তাবান বস্তু। উহাদের interconnection, interdependence ও interpenetration-এর ফলেই এই বিশ্ব জীবন্ত বাস্তব। ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাঙলায় মার্কসীয় দর্শনের এই পরম রূপ ফুটিয়া উঠিবার জন্য আকুলতা করিতেছে।

বাংলার শ্রীগৌরসুন্দরের জীবনে এই দর্শনের প্রথম আস্বাদন ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তিনি "রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" বলিয়া নমস্কৃত ও পূজিত হইয়াছেন। পরা প্রকৃতির ভাব ও দ্যুতিসুবলিত তিনি, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ। দার্শনিক ভাষায় তাঁহা হইতে Divine matter-এর, Divine nature-এর ভাব ও দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তিনি 'Ideal in terms of Material,' তাই তিনি 'Material in terms of Ideal'ও বটেন বাঙলার বুকে আজ উচ্চতম আদর্শ মাটির ভাষায় ব্যাখ্যাত, Marxism-এর চরম ভারতীয় পরিণতি, বর্তমান বিশ্ব-সমস্যার চরম সমাধান। বাঙলার বুকেই বাঙালীর সাধনার মধ্যে Marxism পরিণামপ্রাপ্ত হইবে, তাহারই প্রস্তুতি চারিদিকে চলিতেছে। শ্রীগৌর-সুন্দর মূর্তিমান Marxism বলিয়াই 'Ideal' সন্ন্যাসী হইয়াও গর্ভধারিণী মা শচীর জন্য কাঁদেন—'কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন। যবে সন্ন্যাস কৈল, দুঃখ হইল মন।' ভাবুক সন্ন্যাসী হইয়াও Matter-এর টান, মাটির টান, রক্তের টানের অপমান তো করেন নাই, বরং ধরার মাটিতেই, 'যুবি বৃন্দাবনেই' তিনি Ideal, Eutopian গোলোক-বৈকুণ্ঠের চরম বিশ্রাম স্থান গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি গোলোক হইতেও ধরার ধূলির গৌরব দিয়াছেন অনন্ত গুণ। তাই ধরার ধূলিতে তিনি গড়াগড়ি দেন, ধরার মাটির তিলক করেন, ধরার মানব-মানবীর দুয়ারে দুয়ারে প্রেম ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, পণ্ডিত-কুলীন-ধনীদের এক কথায় সকল বুদ্ধিমানদের গর্ব চূর্ণ করিবার জন্য বলেন, 'পণ্ডিত-কুলীন-ধনীর বড় অভিমান'। অথচ class war সৃষ্টি তিনি করেন নাই। তিনি প্রেমের এমন এক উচ্চ তাপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে তাপের ফলে ধনীদের ধনাভিমান গলিয়া যাইবে, নির্ধনের অপমান ঘুচিয়া যাইবে। সকল superiority

complex ও inferiority complex দূরীভূত হইয়া সমগ্র সমাজের বুক চিরিয়া ধরার বুকে আত্ম-প্রকাশ করিবে 'মানুষ'। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই মানুষ, মানুষই শ্রীগৌরসুন্দর। আর প্রমাণিত হইবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য', বুঝি বা ঈশ্বরেরও উপর। তাঁহার আবির্ভাব এই ষোলপুণিমার দিনে আমরা মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণে বার বার নমস্কার করিতেছি।

ভূমিদান মহাযজ্ঞ

গত ৪ঠা ও ৫ই বৈশাখ ভারতওহারবার হইতে ৪ মাইল দূরবর্তী হটুগঞ্জ পল্লীতে একটি ভূদান যজ্ঞ সম্মেলন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের তিন শত পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি মিলিত হন। কংগ্রেস, কৃষক-মজুর-প্রজা পার্টি, জনসঙ্ঘ ও সোস্যালিষ্ট পার্টি এই আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমর্থন করেন। এই সভায় আহ্বায়ক হইতেছেন কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী। ইহার সভাপতি ছিলেন পল্লীসেবা সঙ্ঘের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত আর, এস, ঘোষে মহোদয়।

এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া ভূদান যজ্ঞের প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাবে চারুবাবুর নিকট নিম্নলিখিত পত্র দেন: "বর্তমানে বাংলা দেশে ভূদান যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। বাংলার ত্যাগ আছে, দেশপ্রেম আছে, শক্তিও যথেষ্ট আছে: কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে খুবই দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলের উচিত, দলাদলি ভুলিয়া সর্বোদয়-প্রেমিক হইয়া এই কার্যে আত্মনিয়োগ করা। বাংলা দেশ যদি এই কার্যে আত্মনিয়োগ করে, তাহা হইলে সারা ভারতের কাছে ইহা এক উদাহরণ স্থাপন করিতে পারিবে। 'দরিদ্রনারায়ণ' পদের স্রষ্টা বাংলার মনীষী ছিলেন। তাহার এই পদ গান্ধীজী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। সেই দরিদ্র-নারায়ণকে সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ভূদান যুদ্ধের কার্যের ভার পরমেশ্বর আমাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমরা উহাকে সফল করিবার জন্য আমাদের শক্তি একাগ্রতা সহকারে যেন নিয়োগ করিতে পারি"।

সভাপতি শ্রীযুক্ত ঘোষে বলেন, "গণতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজীর যে ধারণা ছিল, তাহা হইতেছে 'জনসাধারণের শতকরা ৯০ জন নিজেদের কল্যাণের জন্য কাজ করিবে'। সরকারই সব কিছু করিয়া দিবে, এইরূপ ধারণা তাঁহার মতে গণতন্ত্র-বিরোধী। গান্ধীজী অহিংস উপায়ে বিনা জবরদস্তিতে মানুষের মানস প্রকৃতির পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন। এই মহান আদর্শের ভিত্তিতেই ভূমিদান আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী প্রথা বিলোপের চেষ্টা চলিতেছে। এমন লোকও আছেন, যাঁহাদের এক হাজার একরের উপর জমি আছে, তাঁহাদের জমি জবরদস্তি দ্বারা ছিনাইয়া লওয়া সমীচীন হইবে না বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে, বেদখল দিয়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ক্ষমতাও সরকারের নাই। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্বন্ধে বিধান সভা ও পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যেও মতবিরোধ আছে। আচার্য বিনোবাজী গান্ধীজীর অহিংস আদর্শ অনুসরণ করিয়া পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাজের বুক হইতে আর্থিক অসাম্য দূরীকরণ এবং ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের জন্য ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে কিছু লোক তাঁহাকে জমিও দিয়াছেন। আগামী ২ বৎসরের মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভূদান যজ্ঞের আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ একটি নূতন চিন্তাধারা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে চাহেন। তাঁহারা মনে করেন যে, দেশমাতৃকার সন্তান হিসাবে প্রত্যেকের সম্পত্তিতে সমানাধিকার রহিয়াছে। ইহাই গান্ধীজীর অহিংস সমাজবাদের মূল কথা। এই কার্য সাধনের জন্য তাঁহারা কংগ্রেস সরকার এবং অন্যান্য সকলের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবেন"।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ বলিয়াছেন: "যে হিংসাত্মক ধনবৈষম্যের উপর বর্তমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, গান্ধীজী তাহার আমূল পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজী

বলিতেন, জমি ভগবানের। আচার্য বিনোবা ভাবেও গান্ধীজীর এই অভিমত অনুযায়ী বলিয়াছেন যে, বায়ু, জল ও সূর্যালোকের ন্যায় প্রত্যেকেরই নিজের ও পরিবার-বর্গের বাঁচিবার মত জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। বিনোবাজী অহিংস উপায়ে ভূমি-সমস্যার সমাধান চাহেন। চাষীকে জমির প্রকৃত মালিক করিতে হইবে, অন্যথায় কখনও খাদ্য-সঙ্কটের সমাধান সম্ভব নয়। জমির মালিক যদি স্বেচ্ছায় জমি না দেন, তবে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে কল্যাণ হইবে না। ভূমিযজ্ঞ দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান এবং অহিংস উপায়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে সহায়তা করিবে"।

জনসঙ্ঘের নেতা শ্রীযুক্ত মধুরনাথ দাসও বক্তৃতা করেন। উক্ত অধিবেশনে পশ্চিম বঙ্গে ভূমিদান যজ্ঞ-অভিযানের প্রারম্ভ হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রভাবতিনী ভাণ্ডারী ১১ বিঘা ৮ কাঠা, বীরভূমের শ্রীলালবিহারী সিং ১৫ বিঘা এবং ভাগলপুরহারবাঙ্গের শ্রীমাখনলাল দাস ৬ বিঘা—মোট ৩২ বিঘা ৮ কাঠা ভূমি দান করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী জানান যে, ভূদান যজ্ঞ অভিযান করিয়া যে জমি সংগ্রহ করা হইবে, তাহা একটি কমিটির মারফতে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। এই কমিটিকে ভূমি কমিটি বলিয়া অভিহিত করা হইবে। বণ্টনকালে ভূমিহীন হরিজন কৃষকদিগকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। কর্মিগণ বিনা আড়ম্বরে পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়া ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে জমি সংগ্রহ করিবেন। এই জমি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিতে পারা যাইবে, কিন্তু ভূমিযজ্ঞ কমিটির অনুমোদন ব্যতীত উহা হস্তান্তর করা চলিবে না।

এই সম্মেলনে এইরূপ একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্যমে এই বৎসরে এক লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করিতে হইবে।

মার্কসীয় দর্শনের 'শ্রেণী সংঘর্ষের' (class war) ভারতীয় পরিণতি হইতেছে এই 'ভূমিদান যজ্ঞ'। ভূমিদান যজ্ঞ হাতেকলমে দেখাইবে যে, কৃষক ও ভূমির মালিকের সম্বন্ধ শুধু সংঘর্ষমূলকই নয়, উহাদের মধ্যে একটি হৃদয়ের সম্বন্ধও রহিয়াছে। তাহারা দুই-ই অংশীদার, স্বতন্ত্র অথচ একে অপেক্ষা না করিয়া অপরের চলিবারই যো নাই। কৃষক-স্পর্শহীন ভূমিমালিক এবং ভূ-স্বামীদের স্নেহস্পর্শহীন কৃষক বিমূর্ত প্রত্যয় (abstract concept) ছাড়া আর কিছুই নয়। একান্ত কৃষকরাজ বা একান্ত ভূস্বামীরাজ স্থাপনার প্রচেষ্টা কল্পনাবিলাসীদের কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষক বা ভূস্বামী কেহই বস্তুতন্ত্র নয়। বাস্তব হইল একত্র সমাজ, যাহার এক অংশ কৃষক, অপরাংশ ভূস্বামী। উপরোক্ত কল্পনার মধ্যে যতটুকু বাস্তবিকতা আছে, ততটুকু বাস্তবিকতাই রাশিয়া ও চীনে সম্ভব হইতে পারিয়াছে। কিন্তু কঠোর বাস্তবের চাপে সেই কল্পনাবিলাস অচিরাৎ ব্যর্থতায় পরিণত হইবে। ভারতের বুকেই মার্কসীয় দর্শনের এই কাল্পনিকতা ধরা পড়িবে। বহুবার বলিয়াছি, ভারতের বুকেই মার্কসীয় দর্শনের শেষ পরীক্ষা হইবে। সেই পরীক্ষা সুরু হইয়াছে। পরীক্ষা ভারতবর্ষকেও দিতে হইবে—কোন্ সাহসে কোন্ যুক্তিতে কোন্ প্রাণে সে কৃষক-ভূস্বামীর মধ্যে শোষণমূলক ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া ভূ-ভার হরণের কল্পকে ডাকিয়া আনিয়াছে?

পূর্বযোগের যুগে যুগে ভূ-ভার হরণের জন্য ধরার বুকে অবতীর্ণ হন। তখন তিনি রাখালরাজ, গোষ্ঠবিহারী রূপে কৃষকদের সঙ্গে রঙ্গলীলা আস্বাদন করেন, রাখালের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি পত্তন করেন। ক্রমে তিনি যত হ্রস্ব হইবেন ততই রাখালরাজ প্রতিষ্ঠা বাস্তব হইবে। ভূ এবং ভূমি তখনই হয় নিজের কাছে 'আর'-স্বরূপ, যখন ভূ-পতির বল, ভূমিমালিকের বল শোষকের দৃষ্টিতে 'ভূ'-এর দিকে, ভূমির দিকে তাকান। ভূ ও ভূমি এইভাবে শোষিত ও ধর্ষিত হইলেই ভূমির বুক চিরিয়া রুদ্রের আবির্ভাব হয়। আজ বিশ্বে তাঁহারই তাণ্ডবনৃত্য ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে, প্রাকৃতিক বিধানে ইহা অনিবার্য। কম্যুনিজমই রুদ্রের এই তাণ্ডবলীলা। ইহা

আসিবেই, না আসিয়া ইহার গত্যন্তর ছিল না। যতদিন ও যতখানি কৃষাণীদের 'লোভ' সত্য, ততদিন এবং ততখানিই কম্যুনিজম সত্য। কম্যুনিজমকে বাহির হইতে ঠেকা দেওয়া চলিবে না। ইহার প্রতীকারের জন্য মূলের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কম্যুনিজম আসার মূলে রহিয়াছে ধনিক ও কৃষাণীদের অন্তরের 'কাম'। অন্তরের 'কাম'কে বাহিরের চাপে, দৈহিক ও বাহ্যিক শক্তির চাপে কিছুতেই হটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। এই কামের উপর যতই বাহিরের নিগ্রহ চলিবে—যাহা কম্যুনিষ্টদের একমাত্র পথ—ততই কাম নিগৃহীত হইয়া জাতির অবচেতনে চলিয়া যাইবে, জাতির অন্তরকে আরও বিষাক্ত করিবে এবং ইহার ফলে তখন আবির্ভাব চেতন-সমাজকে অধিকতর বিপন্ন করিবে। কম্যুনিজমের পথ যে বর্তমান মনঃসমীক্ষণেও সমর্থিত নয়, তাহা বুঝিবার দিন আজ আসিয়াছে।

'কাম' যে ধনিক বা কৃ-স্বামীদের মধ্যেই রহিয়াছে, নির্ধন বা কৃষকদের মধ্যে নাই, তাহা বুঝিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যে পুরুষ পুরুষ-কৌলীন্যের নেশায় নারীকে কামনয়নে দেখে এবং যে নারী স্বেচ্ছায় এই কামদৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ করে, দুই-ই তুল্য কামুক। কিংবা যে পুরুষ সমাজে-শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া নারীকে পুরুষ-পরতন্ত্র রাখিবার জন্য ব্যগ্র এবং যে নারী পুরুষের সঙ্গে বুভুৎসু মনোবৃত্তি লইয়া পুরুষের হাত হইতে অধিকার ছিনাইয়া আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাহারাও একই কামের সেবা করিয়া কলুষিত হইতেছে। নর-নারী আজ প্রেমীনজরে মত্ত। কিন্তু এ পথ তো পথ নয়। নরনারী সমগ্র মানুষেরই দুইটি স্বয়ং-মূল্যবান আস্বাদন মাত্র। ইহারা দুই দুই থাকিয়াই যেমন সত্য, ইহারা আবার দুইকে হৃদয়ের আগুনে গলাইয়া এক হইয়াও সত্য। নরনারী যেমন যুগপৎ এক ও দুই, ঠিক তেমনি কৃষক ও কৃষাণীও দুই থাকিয়াই এক হইবে। হৃদয় ছাড়া এ সাধনার খবর তো বুদ্ধির জানা নাই। বুদ্ধির সাধনাই হিংসার সাধনা। বুদ্ধির সাধনায় হয় কৃষক-মজদুর প্রভু থাকিবে, নয় তো ধনিক-কৃষাণী থাকিবে। ইহা নির্বাধ নীতিই (Law of Excluded middle) তাহা। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এ ভাষা অচল। ইহার সর্বধ্বংসী কুফল সম্বন্ধে জেমস্ জিন্স্ তাঁহার Physics and Philosophy গ্রন্থে সাবধান-বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। একান্ত কৃষকদ্বারা সমাজ চলিবে না। যেমন পরিধি না থাকিলে কেন্দ্রের কোনও অর্থই হয় না, কেন্দ্র না থাকিলেও পরিধি হয় না, তেমনি পরিধিস্থানীয় কৃষক-মজদুর না থাকিলে বৃত্তই হয় না, আবার কেন্দ্রস্থানীয় ধনিক-কৃষাণী না থাকিলেই বা পরিধিস্থানীয় 'বহু' কৃষক-মজদুরদের মধ্যে কে ঐক্য স্থাপন করিবে? বহুর মাঝে একটি ঐক্য স্থাপন করিবার জন্যই না রাশিয়ার একজন ডিক্টেটর প্রয়োজন হইয়া গিয়াছে? 'বহু'র মধ্যে এই 'এক'ই হইতেছেন এই ডিক্টেটর: কিন্তু এই ডিক্টেটরকে তত্ত্বতঃ মানিয়া লইতে ইহারা পারিতেছে না। কেন না, উহা যুক্তিবিরুদ্ধ, অথচ কাজ চালাইবার জন্য না রাখিয়াও উপায় নাই। 'একদিন এই ডিক্টেটর থাকিবে না'—ইহা তাহাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেদিন কি কোনও দিনই আসিবে? আসিবে না, আসিতে পারে না। ফলে হইল, একটা না-মানা ও ধারে ঠেকিয়া মানার গোঁজামিল দিয়া তাহাদের চলিতে হইতেছে। ডাইলেক্‌টিকের হাত এড়াইয়া কি তাঁহারা চলিতে পারিতেছেন, না পারিবেন? কৃষক-কৃষাণী-ডাইলেক্‌টিকের হাত এড়াইয়া আবার ডিক্টেটর মানা ও না-মানার ডাইলেক্‌টিকের গর্তে পড়িয়াছেন।

তাহা হইলে উপায়? 'বহু' ছাড়া যখন দুনিয়া দুনিয়াই হয় না, এবং সেই বহুকে সুশৃঙ্খলিত ও সুশক্তি-চালিত করিতে হইলে যখন একজন মানুষের, একজন প্রেসিডেন্ট বা ডিক্টেটরের প্রয়োজন থাকিয়াই যাইতেছে, যদিও কম্যুনিষ্টগণ বলিতেছেন যে একদিন ডিক্টেটর থাকিবে না, তখন কি ডিক্টেটরকে তত্ত্বতঃ 'বহু'র সঙ্গে সমন্বিত করিয়া নেওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল না। ভারতবর্ষের মায়াবাদও এমনি একজন ডিক্টেটর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল, যদিও

শেষ পর্যন্ত তাঁহার অস্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিবার সঙ্গেই শুনাইয়াছে বর্তমান যুগের পুরুষোত্তম-দর্শন বিশ্ব শুনাইতেছে যে, এই ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। কোনও-দিনই 'ঈশ্বর' মুছিয়া গিয়া একান্ত ব্রহ্মই থাকিবেন না নির্বিশেষ ব্রহ্মও অনাদি-অনন্ত, সবিশেষ ঈশ্বরও অনাদি-অনন্ত; 'বহু' যেমন অনাদি-অনন্ত, বহুর ঈশ্বরও তেমনি অনাদি অনন্ত, নির্বিশেষ ব্রহ্মও তেমনি অনাদি অনন্ত। যতই কম্যুনিষ্টগণ গলার জোরে শাস্ত্র গড়িয়া ক্রিষ্টেটরের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করুন না, বর্তমানের প্রগতিশীল দর্শন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে তাহাদের ক্রিষ্টেটর কোনও দিনই মরিবেন না। লাভের মধ্যে এই দাঁড়াইল যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরিকল্পিত classless সমাজের সঙ্গে কেমন করিয়া এই ক্রিষ্টেটর খাপ খাওয়াইয়া থাকিতে পারিতেন, শ্রেণীবিহীন সমাজের মূর্ত উদাহরণরূপে সমাজ পরিচালনা করিতে পারিতেন, তাহার কোনও খোঁজ রাখিলেন না। এইখানেই ঘটিবে কম্যুনিজমের মরণ।

Class ও Mass যখন থাকিবেই, একান্ত শ্রেণী-বিহীন বলিয়া কোনও কিছু কাল্পনিক বস্তু যখন বাস্তবে সম্ভবই হইবে না, তখন ইহাই বুঝিতে হয়, কেমন করিয়া এক বৃহত্তর synthesis-এর মধ্যে এই class ও mass দুয়ের পরিবর্তন করিয়া একই সমগ্রকে গড়িয়া তুলিতে পারে। বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যা পর্যন্ত ধরিয়া ফেলিয়াছে যে, complementary ছাড়া একান্ত antagonistic বলিয়া বিশ্বে কিছুই নাই। class-mass ও পরস্পর-স্পর্ধী হইয়াও পরস্পরের পরিপূরক। মহাত্মাজী রাজনীতির ক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাই চাহিয়াছিলেন। 'কুরুক্ষেত্র যজ্ঞ' এই দর্শনেরই কার্যাত্মক রূপ। আমরা ইহাকে বার বার অভিনন্দন করিতেছি। 'যজ্ঞ' সম্বন্ধে গীতা তারস্বরে শুনাইয়াছে: সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতি। অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ যজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি সৃষ্টির কানে কানে বলিয়াছিলেন, "এই যজ্ঞদ্বারাই তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞই তোমাদের ইষ্টকাম দোহন করুক"

পুরুষোত্তম যজ্ঞের সার্বজনীন রূপই বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়াছেন। পুরুষ যজ্ঞমূর্তি: তাহা হইতে মুদ্রা পর্যন্ত সকলই যে উপনিষৎ-সিদ্ধান্তে 'যজ্ঞ' কুরুক্ষেত্রগণকে আজ বিরাট বিশ্ব-যজ্ঞ ক্ষেত্রে সক্রিয় মূর্তিতে দাঁড়াইতেই হইবে। যজ্ঞ ব্যতীত যে যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে না—ইহা ভারতের কি আজও বুঝিতে পারিবে না? গীতা আজ রাজনীতিক্ষেত্রেও সার্থক হইবে। ভূমি লইয়া কৃষকগণ নামিয়া আসুন ভূমিহীনদের মাঝে: ভূমির বুকে চরম হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া ভূমিহীন ও কৃষকদের অদ্বৈত মিলন। তাঁহাদের এই অদ্বৈত মিলনের আকর্ষণে কম্যুনিষ্টদের শ্রেণীসংঘর্ষ থামিয়া যাইবে, অহিংসার অমরত্ব লাভ হইবে, বিশ্বের হৃদয় জুড়াইবে।

বাংলা যে এই আন্দোলনকে আন্দোলন হিসাবে সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও বাংলার পক্ষে যোগাই হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনও বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জনকে বুকে লইয়া ভারতব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভূদান যজ্ঞও তেমনি দাবানলের মত প্রদেশে প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহার মধ্যে একটা মত্ততা আছে। এই মত্ততা একবার জাতিকে পাইয়া বসিলে লক্ষ লক্ষ ভূস্বামী ভূদান করিয়া সার্থক হইবেন। আমরা কি দেখি নাই কেমন করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে মানুষ যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, জাতিমুক্তিলীলে জলাঞ্জলি দিয়া, নারী তাহার অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া মহাত্মাজীর আন্দোলনকে জমাইয়া তুলিয়াছিলেন? সেই ত্যাগের উন্মাদনা আবার আসিবে। 'ভূদান যজ্ঞ' আন্দোলন নূতন বটে! এই নূতনকে পাইয়া জাতি আবার নূতন উদ্যমে স্বরাজের পথে অগ্রসর হইবে। আমরা বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিতেছি কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টিকে ও তাহার নেতা প্রফুল্লবাবুকে, যাঁহারা এই আন্দোলনের ধারক ও বাহক হইবার সাধনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রফুল্লবাবুকে আমরা বহুদিন কাউন্সিলের পিছু না ছুটিয়া জনসাধারণের মধ্যে আসিয়া উজ্জ্বলরূপে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহার কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় আমরা

খুনীই হইয়াছি। ঐ স্থান তো তাঁহার যোগ্য স্থান নয়। তাঁহার যোগ্য স্থান যে জনসাধারণের হৃদয়ে। জনসাধারণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মত বলিতে পারিবেন 'জয় ব্রহ্ম আমিবেক আমার হৃয়ারে'। লোকমত, বিধানসভা সবই যে জনসাধারণের আধিনায়। মহাত্মাজী তাহা জানিতেন বলিয়া কাউন্সিল-বয়কটের কথা বলিয়াছেন। এতদিন নেতিমূলক আন্দোলন তাঁহারা চালাইয়াছেন, আজ তাঁহারা গঠনমূলক আন্দোলন সুরু করুন। কংগ্রেসকে যদি সত্যই তাঁহারা একদিন ভালবাসিতেন, তবে কংগ্রেসের এই দুর্দিনে তাঁহারা কংগ্রেস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। দেশ কংগ্রেস হইতেও বড়। বড়কে ধরিলে কংগ্রেস আবার তাঁহাদের বরণ করিবে।

জনসঙ্ঘের নেতা শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস মহাশয়কে এই আন্দোলনের পুরোভাগে দেখিয়া আমরা আশ্বস্তি বোধ করিয়াছি। আমি তিনি কংগ্রেসকে কত ভালবাসেন: কংগ্রেসের জন্য তিনি কি না দুঃখ বরণ করিয়াছেন? প্রাণের জ্বালায়ই তিনি কংগ্রেসের বাহিরে গিয়াছেন। কিন্তু এ-পথ তো পথ নয়। এইবার ঠিক পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া আমরা বার বার তাঁহাকে প্রীতি-আলিঙ্গন জানাইতেছি। তিনি কর্মী: তুফান যজ্ঞ আন্দোলনকে তিনি নেতৃত্ব দিয়া দিন, কংগ্রেস তাহা হইলে আবার আসিবে—তাঁহারা তো ইহাই চান।

যাঁহারা এই আন্দোলন উপলক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা প্রাণের সাধুবাদ জানাইতেছি। তাঁহারা বাংলা দেশকে রক্ষা করুন, ঘরে ঘরে স্বাবলম্বনের প্রতিষ্ঠা করুন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাঁহারা ছুটিয়া চলুন, যজ্ঞের বার্তা পৌঁছাইয়া দিন।

যাঁহারা এই যজ্ঞে সর্বপ্রথমে নিজের 'ভূমি' আহুতি দিয়াছেন: শ্রীযুক্তা প্রভাবতিনী ভাণ্ডারী, শ্রীযুক্ত লালবিহারী সিং ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল দাস—তাঁহাদিগকে আমি আমার সকল প্রাণ দিয়া সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। যজ্ঞের পুরোভাগে যজ্ঞসংযোগিনী নারী দেখিয়া জুড়াইলাম। তাঁহার জয় হউক। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অনুযুক্ত হউন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ বন্দেমাতরম্।

মায়ামুকুরী

॥ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ॥

তোমার যে মূলাকৃতি
তুমি দেখ মুকুরে বিম্বিত
তাহা তুমি নহ, বন্ধু
নহ তুমি অস্থিচর্মাবৃত,—
মাংসের পুতুল মাত্র
নহ গৌর কৃষ্ণ গাত্র
সে তোমার শুধু ছায়া-ভবি
ছায়ার পতির মত
তুমি রহ নিত্য স্বতঃ
কায়াবৃত সে ছায়ার রবি ॥

কার্ডিনাল নিউম্যানের ধর্মান্তর গ্রহণ

॥ জনাব রেজাউল করীম ॥

উনবিংশ শতাব্দী ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট যুগ। এ যুগে যেমন পৃথিবীর চতুর্দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, সেই রূপ এই যুগে ইংলণ্ডের ভিতরে মানসিক দিক দিয়েও বহু উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও ইংলণ্ডে নানাবিধ আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল এই যুগে। কোন কোন সাহিত্যিক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলেন। এই সব আলোচনার ফলে অক্সফোর্ড আন্দোলনের উদ্ভব হয়। এই আন্দোলন সমগ্র ইংলণ্ডকে বিচলিত করে তুলো। বহু সাহিত্যিক এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন কার্ডিনাল নিউম্যান। তাঁর মত ধর্মবিশ্বাসী ও ব্যক্তিত্বশীল মানুষ সে যুগে খুব কম ছিলেন। তিনি সে যুগের বৃটিশ সমাজ জীবনের উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। নিউম্যান একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্, কবি ও ধর্মসংস্কারক। প্রোটেষ্টাণ্ট পরিবারে লালিত পালিত হয়েও তিনি যখন অনুভব করলেন যে ক্যাথলিক ধর্মের আদর্শটাই ঠিক, তখন তিনি সমাজের নিন্দা গ্লানিকে অগ্রাহ্য করে ক্যাথলিক মতবাদকে অকাতরে বরণ করলেন। গদ্য লেখক হিসাবে তিনি আজ ইংরাজি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তাঁর ষ্টাইল বা রচনারীতি অনবদ্য ও অনুকরণীয়। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর মত ব্যক্তিত্বশালী মানুষ খুব কম ছিলেন।

লণ্ডন শহরে ১৮০১ সালে প্রোটেষ্টাণ্ট পরিবারে নিউম্যান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পোদ্দারের ব্যবসায় করতেন। তাঁর মা ছিলেন ফ্রান্সের লোক। হিউগেনোট প্রোটেষ্টাণ্ট বংশে তিনি লালিতপালিত হয়েছিলেন। ধর্মভীরু ও চিন্তাশীল বলে নিউম্যানের মায়ের একটা সুনাম ছিল। এই মায়ের তত্ত্বাবধানে শিশু নিউম্যান গোড়া প্রোটেষ্টাণ্ট পরিবেশেই প্রতিপালিত হতে লাগলেন। ১৮১৫ সালে ইংলণ্ডে একটি অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিল। তাতে নিউম্যান পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। কিন্তু তাঁর মা ছেলের শিক্ষা দীক্ষার জন্য কোনও রূপ চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। এই রূপ সুযোগ্যা মায়ের শিক্ষাগুণে নিউম্যান অল্প বয়সেই বহু গ্রন্থ পড়ে ফেলেন। তিনি বিশেষ করে ভালবাসতেন স্কটের গ্রন্থ, নিউটনের বৈজ্ঞানিক রচনাবলী, আর পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ। প্রাথমিক শিক্ষালাভ শেষ করে নিউম্যান অক্স্ ফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে পাঠ আরম্ভ করলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সেখান থেকে ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করলেন। তিন বছর পরে ওরিয়েল কলেজে একটি ফেলোশীপ লাভ করলেন। নিউম্যান যখন অক্স্ফোর্ডে পাঠাভ্যাস করছিলেন, তখন তিনি সুচরিত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নানা বিষয়ক যোগ্যতার জন্য শিক্ষক ও সহপাঠিদের প্রীতি ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর আচরণ ও চালচলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। তাতে কোন আড়ম্বর ছিল না, তাঁর মধ্যে কোনপ্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। ১৮২৭ সালে তিনি অক্স্ফোর্ডের অন্তর্গত সেণ্ট ক্লেমেণ্টে যাজক শ্রেণীভুক্ত হলেন। এবং চার বছর পরে সেণ্ট মেরী গির্জালয়ের ভাইকার বা উপাচার্য্য নিযুক্ত হলেন। এই সময় পর্য্যন্ত তিনি নিষ্ঠাবান প্রোটেষ্টাণ্ট বলেই পরিগণিত ছিলেন।

অবসর সময়ে নিউম্যান প্রচুর পড়াশুনা করতেন। এর ফলে তাঁর সামনে উপস্থিত হ'ল কয়েকটি বিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব। দ্বিধা ও সঙ্কোচ তাঁকে উতলা করে তুলো। তাঁর মনে এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগলো, তা তাঁকে অনেক

ঘুরে নিয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে তিনি আবাল্যপোষিত প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ঐতিহ্য থেকে সরে আসতে লাগলেন। ইত্যবসরে ১৮৩২ সালে নিউম্যান তাঁর একজন বন্ধুর সহিত দক্ষিণ ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হলেন। সেখানে গিয়ে সুপ্রাচীন ক্যাথলিক ধর্মের মহিমা গরিমার নিদর্শনগুলি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করলেন। ইউরোপ ভ্রমণে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা তাঁর মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিনি মনে করলেন যে এখন থেকে তাঁর জীবনের মিশন হবে বৃটিশ চার্চের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মের স্পিরিট আনয়ন করা। এই সময় মনের আবেগে তিনি রচনা করলেন বিখ্যাত স্তোত্র "Lead kindly light"। দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ মন থেকে স্তোত্রটি লিখিত হলেও এটি আজ সর্বজনীন প্রার্থনারূপে সর্বত্র সকল সমাজে আদৃত হয়ে থাকে। ইউরোপ ভ্রমণের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই সময় কেব্‌ল্ (Kebl) একটি আন্দোলন আরম্ভ করেন তার নাম ট্রাক্‌টেরিয়ান আন্দোলন। নিউম্যান এর সার্থকতা উপলব্ধি করে এতেই যোগদান করলেন এবং এই আন্দোলনের সমর্থনে তিনি কয়েকটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

সুকুমার বাল্যকাল থেকেই নিউম্যান ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছেন। মাত্র পনর বছর বয়সে তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি পুস্তক পাঠ করেন। তিনি ইতিহাস, চার্চের ক্রমবিকাশের ধারা ও ধর্মতত্ত্ব এই সব বই বেশী ভালবাসতেন। ইউরোপে ভ্রমণের ফলে তাঁর মনে এল একটা পরিবর্তন। বাল্যাবধি তিনি ছিলেন গোঁড়া প্রোটেষ্টাণ্ট। অক্সফোর্ডে অবস্থান করার সময় তিনি নূতন যুগের প্রভাব অনুভব করলেন। সে সময় অক্সফোর্ড ছিল ধর্মীয় অশান্তি ও ধান্ধাবাজের কেন্দ্রভূমি। এখানকার পরিবেশে তাঁর মনে উঠতে লাগলো নানা প্রকার প্রশ্ন। তাঁর তখনকার মনোভাবকে তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন—I was then drifting in the direction of liberalism —আমি উদারনৈতিক মতবাদের দিকে চলে পড়ছিলাম। সুতরাং স্থির বিশ্বাস লাভের জন্য তিনি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। এই সময় তাঁকে কয়েকটি আত্মীয়-বিয়োগ বেদনা ভোগ করতে হয়েছিল। গভীর পাঠ, আত্মীয় বিয়োগ ও অন্তরের মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এই সব তাঁকে বিচলিত করে তুললো। এবং এর পরেই তিনি মধ্যযুগের ক্যাথলিক চার্চের প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাতে লাগলেন। ইউরোপ ভ্রমণ কালে ইটালিতে তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের আড়ম্বরপূর্ণ ঐশ্বর্য, গৌরব, দক্ষতা ও শক্তিসামর্থ্যের বহু পরিচয় লাভ করলেন। খৃষ্টান ধর্মের অতীত গৌরবের নিদর্শন সমূহের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি মনে পেলেন একটা সান্ত্বনা ও স্বস্তি। এই বার তাঁর বহু সন্দেহের নিরসন হল।

যখন নিউম্যানের মনে আরম্ভ হ'ল মানসিক ও আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব, তখন তিনি স্থির করলেন যে বিবেকের নির্দেশে চলতে গেলে তাঁর পক্ষে প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চের অধীনস্থ সেণ্ট মেরীতে কাজ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং ১৮৪৩ সালে তিনি পদত্যাগ করলেন। অতঃপর ১৮৪৫ সালে বহু অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে আন্দোলিত হ'তে হ'তে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন। এবং মনে করলেন যে এইখানে তিনি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করলেন। ধর্মান্তর গ্রহণ করার পর তিনি কিছুদিন রোমনগরে পোপের সান্নিধ্যে বাস করলেন। তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু স্বদেশে এসেই দেখলেন যে বার্মিংহাম অঞ্চলে বিসূচিকা রোগের প্রচণ্ড প্রতাপ। তিনি কাল বিলম্ব না করে আর্ত ও রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। পরে কতিপয় উৎসাহী যুবককে নিয়ে তিনি একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন। ১৮৯০ সালে এই বিরাট পুরুষ দেহত্যাগ করলেন।

কার্ডিনাল নিউম্যানের কথা বলতে গেলে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে এসে পড়ে অক্সফোর্ড আন্দোলনের কথা। সে যুগে জড়বাদ ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি সুধীশ্রেণীর লোক একটা ধর্মনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এঁরা শুধু আন্দোলন করেই ক্ষান্ত থাকলেন না। তাঁরা তাঁদের আদর্শ ও মতবাদকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য মানুষের

চিন্তাকে অতীতের মধ্যযুগের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেন। এই আন্দোলনের ছিল দুটি দিক—একটি এস্থেটিক বা নান্দনিক দিক অপরটি ছিল ধর্মের দিক। যাঁরা নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন তাঁদের কেউ কেউ শিল্পের আদর্শ প্রচারের জন্য গঠন করলেন প্রি-রাফেলাইট ব্রাদ্‌র সঙ্ঘ। আর যাঁরা ধর্মের কথা চিন্তা করলেন তাঁরা ঢলে পড়লেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের দিকে। অক্সফোর্ড আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল এথালিকান চার্চের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করা, চার্চের অতীত যুগের রীতিনীতি ও ক্রিয়াকাণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করা। এ আন্দোলনের নেতারা সাহিত্যকে তাঁদের আদর্শ প্রচারের বাহন রূপে গ্রহণ করলেন। এবং ট্রাক্ট অব দি টাইমস্ এই নাম দিয়ে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সেজন্য এই আন্দোলনের নেতারা 'ট্রাক্টেরিয়ান' নামে অভিহিত হতেন। তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উদার-নৈতিক বা লিবারেলিজমকে সর্বপ্রকারে বাধা দেওয়া, এবং প্রথম যুগের চার্চের নীতি ও গোঁড়ামীকে পুনরুদ্ধার করা। "I bellve in one Catholic and Apostolic Church"—এই হ'ল তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শের মূলনীতি। এই আন্দোলন প্রথমে আরম্ভ হয় অক্সফোর্ডে। অন্যতম নেতা কেবল (Keble) ১৮৩৩ সালে ধর্মের উপর একটি বিখ্যাত বক্তৃতা দেন—National Apostacy। এই বক্তৃতাই হ'ল অক্সফোর্ড আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু এর প্রকৃত নেতা হলেন নিউম্যান। আন্দোলনের কয়েক-জন নেতা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমত পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু তাই বলে ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করলেন না। কিন্তু নিউম্যান মনে করলেন যে অতঃপর আর প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মে আস্থা রাখা চলে না। তাই তিনি প্রকাশ্যভাবে ক্যাথলিক ধর্মমতে দীক্ষা নিলেন। রোমের মহামান্য পোপ তাঁকে কার্ডিনাল বা মন্ত্রী সভার সদস্য মনোনীত করলেন। নিউ-ম্যানের ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করার পর অক্সফোর্ড আন্দোলনের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগল।

প্রোটেষ্টাণ্টের ঘরে লালিত পালিত হয়েও কেন নিউম্যান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করলেন, তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তাঁর এই ধর্মান্তর গ্রহণের মূলে আছে আদর্শবাদের সংঘাত। তাঁর যুগে একদিকে যুক্তিবাদ মানুষকে ধীরে ধীরে অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতার দিকে দুর্বার গতিতে নিয়ে যাচ্ছিল। যুক্তিবাদ থেকে আসে সন্দেহবাদ, আর সন্দেহবাদ থেকে আসে অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতা। সে যুগের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরবাদের প্রতি আস্থা হারিয়েছিল। চার্লস্ ডারউইনের অরিজিন অব স্পেসিস্ মানুষের মনে বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে তুললো। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে যে বাইবেল ঈশ্বরের নির্ভুল বাণীরূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল, সেই মহা গ্রন্থের একটি বিষয়ে ভ্রান্ত প্রমাণিত হলে অপরাপর বিষয়ে ও তথ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বস্তুতঃ আলোচনা ও বাদানুবাদের ফলে বহু মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেল। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারানোর কাজ আরম্ভ হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। পরবর্তী শতাব্দীতে অনেকে চিন্তা করতে লাগলেন কেমন ক'রে হৃত বিশ্বাসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায়। বিশ্বাসের যে অভাব হয়েছে তা অনেকে স্বীকার করলেন। রাসকিন স্বীকার করলেন যে, বিশ্বাসের অভাব হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর একটি মারাত্মক ত্রুটি। এই যুগে যুক্তি ও বিশ্বাসের লড়াই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুক্তিবাদীগণ কেবলমাত্র যুক্তিকেই প্রাধান্য দিতে লাগলেন। যুক্তিবাদের নেতারা মনে করলেন যে বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনবার এই যে চেষ্টা হচ্ছে তার একমাত্র পরিণতি হচ্ছে মানুষকে মধ্য-যুগের চিন্তার দিকে নিয়ে যাওয়া। এটা এমন ধরণের প্রচেষ্টা যা মানুষের স্বাধীন চিন্তার গতিকে ব্যাহত করে। কিন্তু রক্ষণশীলগণ বললেন যে বর্তমান যুগ বিপথগামী। তাঁদের মতে অতীতের যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয় সেই যুগেই আছে স্বর্গের আলো। সেই যুগেই পাওয়া যাবে মানুষের আশ্রয়। তাঁদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'ল যে, মহৎ ও উচ্চ বিষয় শিখতে হলে সেই অতীতের মহামানবদের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। তাঁদের মতে মধ্যযুগ বহু বিষয়ে গ্রীক ও রোমানদের যুগের চেয়ে নিকৃষ্ট হলেও মানুষের জন্য চরমতম কল্যাণের

ব্যাপারে মধ্যযুগই আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়। এই প্রবাহ সৃষ্টিতেই অক্সফোর্ড আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পূর্বে বলেছি, এই আন্দোলনের দুটো দিক ছিল —একটা নন্দন তত্ত্বের দিক, অপরটা হল মানসিক দিক। বুদ্ধির দিক দিয়ে যারা সে যুগের প্রতি সহানুভূতি দেখান নি, তাঁরা সে যুগের সৌন্দর্য-প্রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধি দিয়ে এই আন্দোলনের সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ক্যাথলিক ধর্মের দিকে ঢলে পড়লেন। কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজ সাহিত্যিক অক্সফোর্ড আন্দোলনের ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়া দেখে শিউরে উঠলেন।

অক্সফোর্ড আন্দোলনের সামনে চরম সঙ্কট উপস্থিত হ'ল যখন ১৮৪৫ সালে নিউম্যান রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের পর আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেল। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বহু প্রবন্ধ লিখিত হ'ল—কোনোটা সপক্ষে কোনোটা বিপক্ষে। কিন্তু সবগুলি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেনি। তবে এ সম্বন্ধে নিউম্যান যে Apologia লিখলেন তার একটা সাহিত্যিক মূল্য আছে। তাঁর এই গ্রন্থের প্রতি লাইনে আছে একটা প্রাণ-চাঞ্চল্যের নিদর্শন। এর মধ্যে আছে একটি বিশাল আত্মার আন্তরিকতা ও আকুতির স্বাক্ষর। বহু ধর্মপরায়ণ লোক তিনি যে কোন সম্প্রদায়ের হোন না কেন, নিউম্যানের এই গ্রন্থ উপভোগ করবেন। এতে নিউম্যান প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে ধর্ম ও যুক্তির লড়াইয়ে নিউম্যান পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু দ্বিধা ও সঙ্কটের মধ্যে বেঁচে থাকা অপেক্ষা সুদৃঢ়ভাবে নিজের পথ বেছে নেওয়া অনেক ভাল। এই প্রসঙ্গে ব্রাউনিংয়ের "টাচু এণ্ড বাই" কবিতার কথা মনে পড়ল। ভুল যদি করতে হয় তবে তা করতে হবে সাহসের সঙ্গে। কে ভ্রান্ত আর কে ঠিক তা নির্ণয় করা সব সময় সহজ নয়। কিন্তু যা করতে হবে তা সাহসের সঙ্গেই করতে হবে। নিউম্যান যেমন সঙ্কটের সম্মুখে পতিত হয়েছিলেন, তেমন সঙ্কট বহু লোকের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিধায় যথো যথলোক পথ বেছে নিতে পারে নি। সঙ্কট ও সন্দেহ অপেক্ষা বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভাল। এই শিক্ষাই আমরা নিউম্যানের জীবন থেকে লাভ করতে পারি। আজ ধর্মত্যাগী বলে কেউ নিউম্যানকে ধিক্কার দেয় না বরং অলভ বিশ্বাসের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল বলে তিনি সর্বত্র সমাদৃত।

কথাকলি

॥ শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার ॥

ফুল ফোটে বাস ছোটে
দীপ দেয় আলো
ধূপ পোড়ে গন্ধটা
লাগে বড় ভালো।

ফুল, দীপ, ধূপ হবে
এই যদি চাহ
সহ তপনের তাপ
আগুনের দাহ।

এলোপাথারি

॥ শ্রীগ্রাম ॥

মুখ শুকনো করে বসে আছেন কেন? কি হয়েছে? জ্বর আসি হয়নি ত? অমিতা জিজ্ঞেস করলে অধ্যাপক সাগর চৌধুরীকে।

—না না মুখ শুকনো কোথায়? হ্যাঁ তা হবে হয়ত, বৃদ্ধ বয়সে মুখ শুকনো দেখাবে না ত কি? আমার কিছু হয়নি দিদি। বললেন অধ্যাপক।

—হয়েছে নিশ্চয়ই, আপনি বলছেন না। আমি বলব কি হয়েছে?

—বেশত, বলই না কি হয়েছে।

একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে অমিতা বলে, আজ রুমার বিয়ে তাই আপনার মন খারাপ, কারণ—

থামিয়ে দিয়ে অধ্যাপক বললেন, রুমার বিয়ে, এ তো আনন্দের কথা, মন খারাপ হবে কেন?

—না না, বিয়ের জন্য মন খারাপ হবার কথা বলছি না। মানে বলছিলাম কি, আপনি রুমার আবাসের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন, রুমা বলেছিল বিয়ের পর আপনাকে তার শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে রাখবে। ওর হবু শ্বশুর ও হবু স্বামীও নাকি রাজী হয়েছিলেন। আর এখন বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রটি পর্যন্ত আপনাকে দিল না, তাই ভাবছিলাম, আপনার মনে কষ্ট হয়েছে, মুখ শুকনো করে বসে আছেন।

অধ্যাপক চৌধুরী চুপ করে রইলেন। তাঁর বয়স হয়েছে যথেষ্ট। পূর্বে সরকারী চাকুরী করতেন। এখন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।

অধ্যাপকের মনে পড়ে যায় অনেকগুলো কথা। তিনি অবিবাহিত, সংসারে তাঁর কেউ নেই। শেষ বয়সটা কিভাবে কাটবে, তাই তাঁর একসময় চিন্তার বিষয় ছিল। কিন্তু তা নিয়ে তাঁকে খুব বেশী চিন্তা করতে হয়নি।

একদিন তাঁর এক ছাত্র নাম রঞ্জন গুপ্ত তাঁকে এক চিঠি লিখেছিল। চিঠিতে জানিয়েছিল সে ভাল চাকুরী পেয়েছে, অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর পিতৃতুল্য, অতএব কোন চিন্তার কারণ নাই। তাঁকে সেখানেই গিয়ে শেষ জীবনটা থাকতে হবে। অধ্যাপক চৌধুরী তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, তখনও তিনি সরকারী আশ্রয়ে, অর্থাৎ চাকুরীতেই আছেন, অবসর গ্রহণ করার পর তিনি রঞ্জনের কথা ভুলবেন না।

কিছুদিন কেটে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ কি মনে হল, অধ্যাপক স্থির করলেন রঞ্জনের বাড়ী যাবেন। ব্যাগে করে ক'খানা কাপড় জামা নিয়ে রওনা হলেন রঞ্জনের বাড়ী। তখন ছুটির সময়। রঞ্জনও বাড়ী এসেছে। পর পর দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন রঞ্জনকে ষ্টেশনে থাকতে, কারণ ষ্টেশন থেকে রঞ্জনের গ্রাম খানিকটা দূরে অবস্থিত। হেঁটেই যেতে হবে, সাথে লোক চাই।

সারারাত অধ্যাপক ট্রেনে ঘুমাননি। ভাবছিলেন ভবিষ্যৎ আশ্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আসবেন। খুব ভোরে ট্রেন ষ্টেশনে পৌছাল। রঞ্জন ষ্টেশনে আসে নি। তবু তিনি নেমে পড়লেন। ভাবলেন রঞ্জন হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে তাই ষ্টেশনে আসতে পারেনি। তিনি দু'মাইল হেঁটে রঞ্জনের বাড়ী পৌছলেন। শোনা গেল রঞ্জন আগের দিন অন্যত্র চলে গিয়েছে। অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ ফিরলেন।

অধ্যাপক চৌধুরীর আশ্রয় সন্ধানের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল।

অনিমেষ কুণ্ডু রঞ্জনদের কিছু কাল আগের ছাত্র। সে প্রায়ই অধ্যাপক চৌধুরীকে চিঠি লিখত। পিতৃতুল্য অধ্যাপককে সে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবেই, এ বিষয়ে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ছোট তার সংসার—অনিমেষ ও তার স্ত্রী, তাদের ছোট ছোট দু'টি ছেলেমেয়ে, আর আছেন

অনিমেষের বৃদ্ধা পিসিমা। অধ্যাপক ভাবছিলেন দ্বন্দ্ব হবে না ওদের ওখানে গেলে। বাচ্চাদের সাথে মিশে যেতে পারবেন। অবসর গ্রহণ করার পর অধ্যাপক সপরিবারে চলে গেলেন অনিমেষের বাড়ী। অনিমেষ ও বাচ্চারা ছুটোছুটি করে সমাদরে অধ্যাপককে গ্রহণ করল। অনিমেষের স্ত্রী একবারও এল না।

অধ্যাপক চৌধুরী ভাবলেন, অনিমেষের স্ত্রী হয়ত লজ্জাশীলা, পরে হয়ত দেখা করবে। অনিমেষও সেইরূপ ইঙ্গিত দিয়েছিল। অনিমেষের পিসিমা খুব আদর যত্ন করছিলেন।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে উঠে অধ্যাপক চৌধুরী বাচ্চাদের ডেকে পাঠালেন। মেয়ের নাম নীলা আর ছেলের নাম কমল। ছেলে ছোট।

নীলা ও কমল অনিমেষের সাথে ঘরে এসে প্রবেশ করল। কমল কাঁদছিল।

অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁদছ কেন কমল?"

কমলের কান্না থামল না, বেড়েই চলল।

নীলা এগিয়ে এসে বলল, "কাঁদছে কেন দাদু, জান?"

না ভাই, আমি জানব কি করে?"

"মা চলে গিয়েছে কিনা, তাই কাঁদছে।"

অনিমেষ রেগে বলল, "কি বলছিস্ তুই নীলা, পালা এখান থেকে।"

নীলা বলল—"কেন, মা চলে যায় নি? বুড়ো দাদু এসেছেন বলেই ত মা রাগ করে চলে গেল। বলে গেল আর মা ফিরবে না। তাইত তাই কাঁদছে। আমি বড় হয়েছি কিনা তাই আমি কাঁদছি না।" এই বলে সেও কেঁদে ফেলল।

অনিমেষ রেগে গিয়ে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে ফেলল।

অধ্যাপক চৌধুরী অনিমেষের হাতের মুঠি ছাড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "ওকে মারছ কেন? আমি এখুনি যাচ্ছি অনিমেষ, বউমাকে এই মুহূর্তে ফিরিয়ে আন"।

এই বলে অধ্যাপক চৌধুরী তৎক্ষণাৎ জামা গায় দিয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে নীলা ও কমলকে একটু আদর করে বের হয়ে এসেছিলেন।

অনিমেষ বাধা দিতে পারে নি।

আশ্রয় অন্বেষণের দ্বিতীয় পর্ব শেষ হল।

চাকুরীতে থাকাকালীন সহকর্মী শ্রীবরুণ রায় অধ্যাপককে বলেছিলেন, "দাদা, আমি থাকতে আর আপনার ভাবনা কি।" মুর্শিদাবাদে বদলি হয়ে গেলাম। অবসর নিয়েই সেখানে চলে যাবেন। একখানা ঘর দেব, বই দেব, আর চাইবেনা, আমার যা জুটবে তাই আপনাকে দেব"।

অনিমেষের বাড়ী থেকে ফিরে বরুণ রায়ের কথা অধ্যাপকের মনে পড়েছিল। পর পর তিনখানা চিঠি লিখলেন তিনি। তৃতীয় চিঠির জবাব এল। বাড়ীতে লোকজন বেশী, ঘরগুলো ভরতি রয়েছে। ঐ অসুবিধার জিতর অধ্যাপক গেলে তিনি যেতে পারেন।

অধ্যাপক চৌধুরী বরুণ রায়ের ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিলেন।

অধ্যাপক চৌধুরী ভাবছিলেন, কি করবেন। স্থির করেছিলেন আর চাকুরীর পেছনে ছুটবেন না, নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবেন।

এর পর প্রায়ই নানা জায়গায় গিয়ে থাকার জন্য আমন্ত্রণ আসতে লাগল। সবই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। কিন্তু অনিমেষের ব্যাপারের পর থেকে কোথায়ও গিয়ে থাকবার সাহস আর তিনি পান না। ছাত্র বা ছাত্রী তাঁকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু তাদের স্ত্রী ও স্বামীরা? তারা কোন্ দায়ে অধ্যাপককে ভালবাসতে যাবে।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক চৌধুরীর সহকর্মী সুধাংশু মুখুজ্যের সাথে তাঁর কলেজ ষ্ট্রীটে বইয়ের দোকানের পাড়ায় দেখা। তিনি বহুকাল পূর্বে অধ্যাপকের সহকর্মী ছিলেন, অবসর গ্রহণও করেছেন সাত আট বছর আগে।

সুধাংশুবাবু সব কথা শুনে বললেন, 'ভাই, আমি আপনার মত ভুল করিনি। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছি তার কাছেও একদিন থাকতে চাইনি। মেয়ের সংসারে আমি কে? আর যে সংসার একটি বিশেষ ছন্দ নিয়ে গড়ে উঠেছে, আমি সেখান গেলেই ছন্দপতন হবে। মেয়ে জামাই, নাতি-নাতিনীদের খুব ভালবাসি। কিন্তু দূর থেকে, চিঠির মারফত। আপনাকেও বলছি, ছাত্র-ছাত্রী-

যেন ভালবাসুন, তাতে আর কি আপত্তি আছে। কিন্তু ওদের কাছে কখনো যাবেন না। আপনাকে ওরা ভালবাসতে পারবে না। আপনার উপস্থিতি অসহ্য বোধ করবে, আপনাকে এড়িয়ে চলবে। মনে রাখবেন, বয়স আপনাদের এক নয়। অসুস্থ বৃদ্ধকে দেখাশুনা করার হাঙ্গামা অনেক। অতএব সাবধান। আপনাকে ত্রিশ বৎসর দেখেছি ও আপনার সব কিছু খবর আমার জানা। জীবনে প্রতিপদে আপনি ভুল করেছেন। আর ভুল করে জীবনকে বিষময় করে তুলবেন না। মানুষ বয়ঃ পিতাকে সহ্য করতে পারে না, আর সহ্য করবে আপনাকে? সুধাংশু মুখুজ্যের কথা গুলি মনে রাখবেন। বেশী কথা যদি বলে আমার নাম আছে। তাই বেশী কথা বলার আশা করি মনে কিছু করছেন না। একটা কথা বলি কি, শুনুন। একটা চাকুরী দেখে নিন, তারপর পড়াশুনা করে, পড়িয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দিন।"

অধ্যাপক চৌধুরী সুধাংশু মুখুজ্যের কথার সারবত্তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণ করেন।

ঐ প্রতিষ্ঠানেই মেয়েরা তাঁর বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কত আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ। অধ্যাপক শুনে যান, কিছু বলেন না।

রুনু বলে গিয়েছিল, আর্ট শিখতে প্যারিসে যাবে। অধ্যাপককে তাঁর সাথে যেতেই হবে। বাবা মত দিয়েছেন।

কল্যাণী বলেছিল, সে যাবে আমেরিকা। অধ্যাপককে তাঁর সাথে যেতে হবে, না হলে পড়তে সাহায্য করবে কে? টাকা? টাকার জন্য চিন্তা নেই। টাকা দেবেন বাবা।

অধ্যাপক চৌধুরীর মনে পড়ে যায় শ্রীদুর্গা মুখার্জীর তিন ছেলের কথা। তারা তুন স্কুলে পড়ত। ছুটিতে বাড়ী এলে অধ্যাপককে তাদের পড়াতে হত।

শ্রীমতী মুখার্জি একদিন বলেছিলেন, "আপনি সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিন মাষ্টার মশাই। আমার তিন ছেলে তিন সময় বিলেত যাবে, তাদের আপনিই নিয়ে যাবেন, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন

ব্যবস্থা হবে।

সবাই টাকার কথা ভেবেছে, তাঁর আশ্রয়ের কথা কেউ ভাবেনি!

•

অমিতা বলল "এত কি ভাবছেন দাদা।"

অধ্যাপক চৌধুরীর চমক ভাঙল। বললেন, "ভাববার আর কি দিদি, ভাবছি কবার জীবন সুখী হোক। এ ছাড়া আর কি ভাবব।"

অমিতা বলল, "আমার একটা কথা ছিল।"

"বল।"

"আমি আপনাকে বলেছিলাম, এবার পুজোয় বেড়াতে যাবার সময় আপনাকে নিয়ে যাব। কিন্তু বাবা বলেছেন, আপনার জন্য বার্থ পাওয়া গেল না। সে কথাই বলতে এসেছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।

অধ্যাপক চৌধুরী হেসে বললেন, "না না, বেড়াতে যাবার মত আমার শরীরের অবস্থাই নেই দিদি। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে বেরিয়ে এস"।

"ঘরে আছেন?" ডাক এল বাইরে থেকে।

অধ্যাপক চৌধুরী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "এস এস।"

প্রতিষ্ঠানের এক অধ্যাপিকা প্রতিমা ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে বলল, "ক্ষমার শশুর বাড়ী কবে যাচ্ছেন?"

অধ্যাপক নীরব।

ফ্রান্স, আমেরিকা, ইউ. কে, হনলুলু, কিম্বাকটু কিংবা নিজের পক্ষে রাজস্থান কবে যাচ্ছেন?

অধ্যাপক তবু নীরব।

যে বয়সে যা, তাই হওয়া কি ভাল নয়? হয়েছেন বৃদ্ধ, আর ভাবছেন যুবকের মত। যেখানেই যান, অসুস্থ হয়ে গেলে দেখবে কে? দেখবে রুনু, কল্যাণী আর অমিতা? বেশ, যা ইচ্ছা তাই করুন।

বলে প্রতিমা ঝড়ের বেগে ঘর হতে বাইরে চলে গেল।

অধ্যাপক তবু নির্বাক।

আজ অশ্রদ্ধা সর্বস্তরে

॥ শ্রীনলিনী কিশোর গুহ ॥

ইতিহাসে ভারতের তামস-যুগের পরিচয় আছে আবার উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে দেখি আবির্ভাব-অভ্যুদয়ের যুগ। সে-যুগের যুগন্ধরগণ ছিলেন ভাবভাষার বাণী-বাহক মহাবিপ্লবী সর্ব ভারতের তথা এক অখণ্ড ভারতের অভ্যুদয়ের প্রেরণাই দিয়াছিলেন—বাংলার বিপ্লবী মনীষিগণ প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের সাধনা লব্ধ পরম সত্য—পরম এক; এক ভগবান, এক মানবত্ব, এক বিশ্ব। এই উপলব্ধির ফলেই ভারত একদা "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" বলিয়া বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাইয়াছিল। কিন্তু যুগে যুগে সত্যেরও বিকৃতি ঘটে—অসত্য ও অধর্মের, বিভেদ ও অনৈক্যের, অপ্রেমের, অনাচারের প্রাদুর্ভাব সমাজ জীবনকে বিকৃষিত করে। সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তখন বিপ্লবী যুগন্ধরগণের ঘটে মহা আবির্ভাব। সত্য ও ভগবৎ বাণী গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন বিপ্লবী-মহাপুরুষগণ। বাংলায় সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম।...ধর্ম ও সমাজে যৌগিক রূপান্তরের বাণী আসিল—বিরোধ নয় ভেদ নয়, ঐক্য—সামঞ্জস্য সমন্বয়। আসিল পরাধীনতার গ্লানি ও লজ্জা দূর করিবার অমোঘ বাণী। বাংলার সেই স্বদেশী (বঙ্গ বিভাগের বহু পূর্বেই যাহার আরম্ভ) যুগকেই বলা হয় বঙ্গ-বিপ্লব যুগ, অগ্নিযুগ। দেশপ্রাণতার ত্যাগ তপস্যার তেজের আগুনে অগ্নি-শুদ্ধ যুগ। দেশ-সেবা ভগবৎ সেবা, স্বেচ্ছা ত্যাগের দুর্লভীয়া'-র যুগ। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—পরমুখাপেক্ষিতা পরিহারের, আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ; আবেদন-নিবেদন অথবা প্রার্থনায়ই নামান্তর যাচী-ভোলার যুগ নয়। স্বদেশী ও বিপ্লব যুগের প্রেরণা সংস্কারাত্মক নয়, স্বধর্ম বিদ্বেষ ভিত্তিক নয়। বাংলার বিপ্লবী প্রেরণা স্বজনধর্মী বিদেশী বর্জন তাই বাংলার বড় কথা ছিল না স্বদেশী অর্থন তথা স্বদেশী শিল্প গড়িয়া তোলাই বড় কথা—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লইবার—স্বজনের—জাতি নির্মাণের যুগ।

আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই বিপ্লবীর আত্মসমীক্ষা আত্ম-বিচার, তাই আসিল জাতির দুর্বলতার মূলে যে অসত্য কুসংস্কার অনাচারের আবর্জনা পুঞ্জীভূত তাহা মার্জনের প্রেরণা দিবার যুগ। প্রত্যেক জাতির চিত্তে সর্বব্যাপী পরাধীনতার জন্য বেদনার অনুভূতি ছিল, তাই আসিল সেই লজ্জা দূর করিবার শুদ্ধ সংকল্প গ্রহণের যুগ। বিপ্লবী বাংলার এই উপলব্ধি ছিল যে তাঁহার আদর্শের নব-ভারত গঠনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন অপরিহার্য আর তাহারই জন্য চাই জাতীয় ঐক্য—এক জাতি এক প্রাণ-একতা। বিভেদ বিরোধ অনৈক্য ব্যক্তি স্বার্থ চেতনা দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণকে তুচ্ছ করার আত্মঘাতী মূঢ়তা আনিয়া দেয়। লক্ষ্য শুধু লক্ষ বাসনা বিল বিল করিয়া, এক-জাতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়।

বাংলার স্বদেশী ও বিপ্লব যুগে রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেসই একমাত্র প্রধান। কোথাও মতভেদ থাকিলেও বিভেদের অশ্রদ্ধা দেখা দেয় নাই। সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই জন নেতারা নেতৃত্ব কার্যকরী হইয়াছে। নেতৃবর্গের নির্দেশ মান্য করাই ছিল স্বদেশী যুগের নিয়ম। কংগ্রেসের বিবর্তন—মত পথ চরম পন্থা—দেখা দিয়াছে বটে কিন্তু শিক্ষিত সমাজ এক সূত্রে কথা বলিয়াছে, এক লক্ষ্যে চলিয়াছে। আবার গান্ধীজীর আবির্ভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রভাব জাতীয় ঐক্যের আনুকূল্য করিয়াছে—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ অতিক্রম করিয়া প্রসারিত হইয়া কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছে। দেখা গিয়াছে

ঐক্য, বিরোধ বড় হইতে পারে নাই। জাতির মুক্তি-সাধকদেরও ছিল দেশনেতা একজন। সে ঐক্য-কেন্দ্রের পাশের গড্ডালিকা প্রবাহ নয়। ব্যক্তি-স্বার্থ লেশহীন স্বেচ্ছাসেবকের নিয়মানুবর্তিতা।

"১২ রাজপুতের তের হাঁড়ি" এক জাতিকে একেশ্বর করার সর্বনাশা মূঢ়তার পরিণাম ভারতে কি হইয়াছিল সেই ইতিহাস আমরা দেখিয়াছি।

বস্তুতঃ শতধা বিচ্ছিন্ন জাতি শুধু শক্তিহীনই হয় না, কোন বড় রকমের আকস্মিক আঘাত হইতে জাতি হিসাবে আত্মরক্ষার জন্যও সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত দেশেই ব্যক্তির আত্মপরতা উৎকট হইয়া উঠে। জনসাধারণের প্রবৃদ্ধি ও আস্থা কোথাও আশ্রয় করে না বলিয়া একটা বিশৃঙ্খল সমাজ-বিরোধী চেতনা স্ব-স্ব প্রধান হইতে প্রেরণা দেয়, কাণ্ডারীহীন সমাজ-জীবনে অরাজকতার আগমনী ধ্বনিত হইতে থাকে। দেশের সেই অবস্থায় রাষ তার বহু মধু অতি সহজেই যে কোন নামে একটা দল খাড়া করিতে পারে। এবং জনসাধারণের অবাক হতাশা, প্রতিকারহীন দুঃখ দৈন্যের বেদনা, অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য যে কোন ব্যক্তি ও দলকে আশ্রয় করে। বর্তমানে এ-দেশে যে বহু দল গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মূল কারণ জনসাধারণের মনে কোথাও বিশ্বাস আস্থা আশ্রয় করিতেছে না বলিয়া। শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহা সীমাবদ্ধ থাকে না, রাজনীতি ক্ষেত্রের এই অস্থিরতা এবং অশ্রদ্ধার ব্যাপকতাই সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে সমাজের সর্বস্তরে। ফলে গণতন্ত্রের মূল নড়িয়া পড়িতেছে। ইহা বর্তমানে তীব্র ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাসের ফলে। একটা জাতীয় ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেস জনগণের যে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল, কংগ্রেসের উপর যে বিশ্বাস-আস্থা ঘনা বাঁধিয়াছিল, তাহাই যে কোন রাষ তামাকে দল গঠনে নিরংকুশ সাহিত করিত, বাধা স্বরূপ ছিল। কারণ যে-কোন লোক ইচ্ছা করিলেই একটা দল খাড়া করিতে কল্পনা পাইত না কিন্তু আজ কল্পনা পাইতেছে। এজন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব-হ্রাস কাহারও দায়ী নহে কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাসের যথার্থ হেতু উহার পরিমাণই বা কতটা—এ ক্ষেত্রে তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছি না, তাহা কংগ্রেসের নিজের। আমরা শুধু বলিতেছি কারণ যাহাই হউক, উহার ফলে দেশে যে বহু সংখ্যক দলের উদ্ভব হইয়াছে এবং হইতেছে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা। দেশের জন্য দল গড়াই যেন বড় প্রয়োজন' ফলে দেশ গড়িতেছে না দলই গড়িতেছে। শুধু দলই নয়, সেই সূত্রে বিরোধ বিদ্বেষ আসিয়া যায়, সঙ্গে নিন্দা-মুখরতা। এমন কোন দলের কোন নেতা নাই, যাহার বিরুদ্ধে যে কোন সাধারণ যে কোন বিদ্বেষণ প্রয়োগ না করে। শুধু তাহা নহে, অশ্রদ্ধার ফলে সমাজ-জীবনে নিয়ম শৃঙ্খলা ও সংহতি বিলুপ্ত হয়। সংহতি নাশের ফল জাতির শক্তি নাশ। দেশ গড়ার প্রশ্নই তুচ্ছ হইয়া যায়। রবিগুরুর কথা স্মরণীয়: 'আর কিছু না পারো, খবরের কাগজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া (অর্থ, আত্মপ্রচার ছাড়িয়া) যে কোন একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোন দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জানে দাও, আপা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও, মানুষ বলিয়া তাহার আত্মা আছে, জগৎ সংসারে সে অবজ্ঞার পাত্র নয়।" কাজের কি অভাব?

বিপ্লব যুগ বা অগ্নি যুগের গোড়াপত্তন কালে দেশ ও জাতির সেবার যে সিদ্ধ মন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শুনাইয়াছিলেন তাহা আজও আমাদের স্মরণ করা ভাল। স্বামীজীর আহ্বান: আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা মনের মধ্যে অন্য কোন ভুয়া দেবতাকে স্থান দিব না। এক মাত্র জাগিয়া আছেন যে দেবতা, সেই দেবতা আমাদের জাতি। সর্বত্র তাঁহার হাত, সর্বত্র তাঁহার পা—সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন তিনি। অন্য সকল দেবতা এখন ঘুমে অচেতন। আমাদের চতুর্দিকে যে বিরাটকে প্রত্যক্ষ করিতেছি সেই দেবতার যখন পূজা করিতে পারি না তখন আর অন্য কোন্ দেবতার আমরা অর্চনা করিব? সকল পূজার পূর্বে আমরা

বিরাটের পূজা করিব, যিনি বহু রূপে আমাদের ঘিরিয়া আছেন তাঁহার পূজা করিব। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' তাই-সেবা, স্বদেশ-সেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, চাই উহার সত্য অনুভূতি। স্বামীজির বাণী: "সেই অনুভূতি সক্রিয় হইয়া তোমাকে সর্বত্যাগে প্রেরণা দেয় কি? জাতির জন্য দেহ মন বিলাইয়া দিয়াছ কি?" আমাদের জাতির মধ্যে যে দাস-সুলভ ঈর্ষা বিদ্যমান, সেই সম্পর্কে স্বামীজী বলেন, 'একজন বড় হইয়া উঠিতেছে দেখিলে সকলে মিলিয়া তাহাকে টানিয়া নামাইবার জন্য তোদের প্রচণ্ড ইংলাহ দাস-জাতি সুলভ এই চরিত্র বিশ্লেষণ সকলেই আত্মদান করিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে নয়; কিন্তু আজ্ঞা পালন করিবার পরিচ্ছ বিনত সেবকের চরিত্র দেখা দিলে তবেই আজ্ঞা করার, নেতা হইবার যোগ্য চরিত্র দেখা দেয়";

জাতির স্বপ্ন-ঘোর কাটিয়া গেল স্বামীজীর বজ্র বাণীতে শঙ্খনাদে। সে দিনের তরুণ স্বামীজীর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত কঠিন চরিত্র গঠনের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাও মানি, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর বাণীও বর্তমান অশ্রদ্ধার পরিবেশে ভাসিয়া যাইবে, কারণ আজিকার অশ্রদ্ধায় বিকৃত সমাজে যে তাঁহাদের বাণী গ্রহণের (রিসেপ্টর) আধার বা ক্ষেত্রেরই অভাব। এতো জানা কথা, ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকিলে বীজ (যত উৎকৃষ্টই হউক) উপ্ত হয় না। বর্তমানে এই ক্ষেত্র প্রস্তুতের অভাব লক্ষ্য করিয়াও তবু তাঁহাদেরই বাণী স্মরণ করি হতাশ হই না, বিশ্বাস রাখি—

"হালের কাছে মাঝি আছে সবারে তরী পার।"

চারিদিকে বিপথগামিতার উদ্ধত ঔদ্ধত্যের আস্ফালন লক্ষ্য করিয়া মনে হয় ভারতের ভাগ্যাকাশ ঘন মেঘে আবৃত। কিন্তু পরে আবার আশার আলো দেখি—"মুখে এসে পড়ে অরুণ" কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে। দেখি, আজও জাতির মধ্যে সত্যাশ্রয়ী সত্যনিষ্ঠ মনুষ্যত্বের সাধক তরুণ আছে। এই তো সেদিন বার'সাত রেল ষ্টেশনে কলেজের ছাত্রগণ অধ্যাপকদের সঙ্গে মিলিয়া যাত্রী সাধারণকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছেন, 'বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করিবেন না'। ছাত্র ও যাত্রীর মধ্যে এই যে আত্মবিচার, সমাজ-বিরোধী প্রবণতার মধ্যে সুস্থ সমাজ সচেতন শুভবুদ্ধির সক্রিয় উদ্যম—দুর্নীতিমুক্ত থাকিবার ও করিবার সঙ্কল্প, জাতির কল্যাণ সাধনের ইহাই তো ধ্রুবপথ। তাই হতাশ হই না, বিশ্বাস করি। এতো সব সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের জাতি-নির্মাণের সাধনা কখনো ব্যর্থ হইবে না। তাই হতাশ হই না, বলি 'ভয় নাই ওরে ভয় নাই'! ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভগবানই জাতির কাণ্ডারী। তিনি এ যুগে কোন্ পথে কোন্ কঠিন আঘাতে জাতির জীবনে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-সংহতি আনিয়া দিবেন, তিনিই জানেন, কিন্তু নিশ্চয় দিবেন। আমরা শুধু প্রার্থনা করি, "সংকোই সম্ভবি যে ভগবান।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ কর্তৃক

১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকা কালীন লিখিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

অবধূত-ভাষ্য

মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে জড় ও চেতনের যে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার সহিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক জীবন-চেতনার দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে, তাহা বর্তমান সমাজ-পরিশোধনে বিপ্লবী দর্শন। যে-কেহ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ- কথিত এই বিপ্লবী চিন্তাধারার অনুরাগী, তাঁহাকেই এই গীতা-ছাপানোর কাজে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দান করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে।

একানব্বই বৎসর বয়স্কের দৈনন্দিন দিন-যাপন

॥ বন্ধুবর ॥

রাশিয়ান লেখক লেখত লিখিয়াছেন, সেদিন 'কম্পাস' নামক কাগজে দেখিলাম,—'বলা যায়, বাঁচার গড়পড়তা সংসারের চেয়ে অধিকতর ক্লান্তিকর ও অকারিয়ক আর কিছু নাই—এই সংগ্রাম জীবনের সব আনন্দটুকু শুষে নেয় এবং মানুষকে জড়ত্বে ঠেলে নিয়ে যায়।' একজন একানব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধও তাঁহার বাঁচার সংগ্রামে জীবনের আনন্দটুকু পর্যন্ত হয়তো পৌঁছাইতে পারেন না—তবু তাঁহার জীবন যে অলসের বিড়ম্বিত জীবন নয় কিংবা অসুস্থের একঘেয়ে পোঁছানিও নয়, তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-যাপনের খবর হইতে তাহা পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশের অল্প বয়স্কেরাই যেমন কর্মহীন জীবন-যাপন করে, তাহাতে একানব্বই বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের দিনযাপন কাহিনী সকলের সম্মুখে তাঁহার আমাতেই উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হইল।

"যিনি প্রথম জীবনে ১৯০৩ সনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি তখন অর্থাকাঙ্ক্ষী হইলে আজ এত দারিদ্র্য দুঃখ অনুভব করিতেন না। একবেলা অন্ন তাহা যতই মোটনের কলম চাল-পরু-ফুটা-জোয়ার যাহা সম্বলিতই হউক—জুটিলে পরবর্তী-বেলায় জুটিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই, তথাপি তিনি সর্বদা হাস্য মুখর। চিরদিন ব্যবসার ব্যবসায় করিয়া আজ হইয়াছেন বাধ্যতামূলক বিধিক দেশসেবী উদ্বাস্তু উপনিবেশের উৎসুই সরপ, কথা বলিবার ও শুনিবার লোকের অভাবে দৈনন্দিন কার্য হইল তাঁহার বাগানে। সামান্য কয়েক কাঠা ভূমি লইয়া তাঁহার ভূখণ্ড। ফুটাবের পর অবশিষ্ট জমিটুকুতে শেখদের উপদেশ মত তিনি বৃক্ষ-লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে ব্যস্ত। ভোর ৪ ঘটিকায় পার্শ্ববর্তী আশ্রমের ঘণ্টাধ্বনির সহিত শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি নিজের সৃষ্টির বাগান হইতে লাঠি ভরিয়া ফুল তোলেন। তারপর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পবিত্র হইয়া ঠাকুরের সমক্ষে আসন নিবেদন করেন। গীতা ও শুব স্তোত্রাদি পাঠের পর বৃক্ষ লতাদির পরিচর্যা করেন। অল্প পরিসর জমিটুকুতে তিনি এই উদ্বাস্তু জীবনের ১৭ বৎসরে আম, জাম, নারিকেল, শুবাক, কাঁঠাল, পেয়ারা, তেঁতুল, মোহুয়া, বেল, ডেঁয়া, খেজুর, কলা, লেবু, তাল, আনড়া, নোনা ও যাবতীয় কচু অঞ্চলাবে ঝিঙা, ঝিঙাকুমড়া, রেখা, পলা, চালকুমার, টমেটো, ঢেরস, কাঁকরোল, উচ্ছে, লাউ, মানকচু, ওল, পাল শাক, লঙ্কা, বেগুন, মূলা, পটল, ফুল প্রভৃতি উৎপাদন করেন। টগর, সন্ধ্যা মালতী, গন্ধরাজ, চিনা জবা প্রভৃতি নানাবিধ, নানা বর্ণাকৃতি পুষ্প বৃক্ষের বাড় তৈয়ারী করেন। ঔষধীবৃক্ষ যথা, বাসক, নিশিন্দা, পাথর চোপা, পেওরা, আঠাল, ওলয়া, পানফুলি, কলমী, হেলেঞ্চা। প্রত্যহ প্রাতঃ ও বিকালে এই বাগানের জন্য তিনি নিজ হস্তে কোদালি দ্বারা মাটি কাটিয়া বৃক্ষাদির গোড়ায় সার সংযোগ করেন। বাড়ীর সম্মুখের রাজপথের প্রাঙ্গণের জন্য অংশগুলির তিনি সংস্কার সাধন করেন। এ বৎসরই প্রায় ৭৪ ফুট দীর্ঘ×১৪ ফুট×৮ ফুট উচ্চ জন্য অংশগুলি মেরামত করিয়াছেন, দীর্ঘ ৩৩ মাস প্রত্যহ নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে ধৈর্য ও নিষ্ঠার সহিত পরম বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি সুনিশ্চেন তরোরিব সহিষ্ণু হইয়া শুধু পথ যাত্রীদের পদধূলি পাইবার জন্য, আর সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিয়াছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।'

দিনের অবশিষ্ট কাল নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন ও সাময়িক পত্রিকা সমূহের জন্য প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। আর্যা, অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার, বিচার, কম্পাস,

জনবাণী, উদ্বোধন ভারত, যুগবাণী, সত্যপ্রকাশ, যুগ ও জীবন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার লেখা প্রকাশিত হয়। বরিশাল জিলার ইতিহাস প্রকাশক কমিটির তিনি সভাপতি। এই ইতিহাস সংগ্রহে তাঁহার দান অতুলনীয় বেহেতু তিনি আজীবন বরিশালের দেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ জীবনে তিনি এই জেলার ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন ও বরিশাল হিতৈষীর মারফতে তাহা প্রচার করিয়াছেন। আজও তিনি সে ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছেন।

সময় সময় যাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন তাঁহারা মুগ্ধ হন তাঁহার বাক্যালাপে, অবাক হন দেখিয়া যে তাঁহার স্মৃতি শক্তি অটুট এবং সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের। তিনি তাঁহার বক্তব্য সমর্থনে বাংলা ইংরেজী, সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের এমন সম্পূর্ণ খাপ-খাওয়া দেখা আবৃত্তি করিয়া থাকেন যে শ্রোতাগণ বিস্মিত হন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী যেন তাঁহার মুখস্থ, ছোট বড় সকল কবির লেখাই যেন তাঁহার কণ্ঠস্থ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাব শতক, গোবিন্দ দাসের প্রেম ও ফুল, কামিনী রায়ের আলো ও ছায়া, নবীন চন্দ্রের সকল গ্রন্থ, মানকুমারী, কবিতা নিধান, রঙ্গলাল, কালিদাস রায়, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি হইতে তিনি অনর্গল apt quotation করিতে পারেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি চিরজীবন চরমপন্থী। আজও তিনি প্রাচীন কংগ্রেসপন্থী সুস্থ দৃঢ়দৃষ্টি সম্পন্ন অগ্রগামী দলের অগ্রণী। বর্ত্তমান মন্ত্রীগণের সহিত তিনি পত্র-সংযোগ রক্ষা করেন। এইভাবে সমস্ত দিন কাটাইয়া দিন ফুরাইলে সন্ধ্যা হইলে নিজের ঠাকুরের নিকট আত্ম নিবেদন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশীর ঠাকুর মন্দিরে আরতি দর্শন করেন ও রাত্রি ৮টা অবধি রেডিও শ্রবণ করেন। তৎপর আহার তাহা বৈষ্ণবের বিধান অনুসারে "ভাল না খাইবে, ভাল না পরিবে" ও বর্ত্তমান শাসকদের কণ্ঠরোধ (control) নিয়মে যাহা কিছু সংগৃহীত হয় তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করেন। তারপর শয্যা গ্রহণ। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা" শ্লোক আবৃত্তি করিয়া হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলিতে বলিতে নিদ্রার কোলে আশ্রয় লন। হৃদয় শক্তি অটুট আছে, সুনিদ্রাও হয়।

পল্লী পরিক্রমা—এক বৃক্ষ সমাকীর্ণ নানা পক্ষী বিহঙ্গমা
প্রভাতে দশদিক যাহি কাকস্য পরিদেবনা

উদ্যান্ত উপনিবেশবাসীগণকে এই পক্ষী সমূহের সহিত তুলনা করা যায়। নানা জিলার নানা শ্রেণীর উদ্বাস্তুগণ যে যেখানে পারিয়াছে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই করিয়া লওয়ার ফলে যে উপনিবেশগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ঐক্যমন স্থাপনের সম্ভাবনা ঘটে নাই। তাই একই উপনিবেশের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হইতেছে না। বহু বৎসর গত হইল তাহাতে পরস্পর পরিচয় হয় নাই, ঠিক কলিকাতার মতনই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

ইটের উপরে ইট মাঝে মানুষ কীট
নাহিক ভালবাসা নাহিক মায়া।

কিন্তু এই বৃদ্ধ কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম, তিনি তাঁহার প্রাচীন স্বভাব অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। করতাল বাজাইয়া নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রত্যহ কয়েক মাইল পরিক্রমা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। এক বালক একদা বলিয়াছিল উনি কি হরিনাম করেন, উনি কাহার বাড়ী কি গাছে কত ফল হইল তাহা গণিয়া বেড়ান। কথাটি খাঁটি সত্য। ইনি নানা স্থানের বীজ ভাণ্ডার হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া পল্লীতে বিতরণ ও তাহা রোপণ ও পরিপোষণের উপদেশ দিয়াছেন। তদুপলক্ষে প্রতিবেশীদের বাড়ীর সকল খোঁজ খবর লইয়াছেন। তাইতো তিনি আজ পল্লী এবং পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয় সমূহে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার তিনি 'দাদু'। তিনি স্থানে স্থানে গৃহ চিকিৎসকের কাজও করেন। অসংখ্য মুষ্টিযোগের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ছোট খাট রোগের মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। এমন কি দুরারোগ্য নিঃস্ব রোগীদের স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আর তাহারি সঙ্গে বেকার যুবক-যুবতীদের চাকুরী লাভের জন্য বহু সুপারিশ পত্র প্রদান করেন, এইভাবে তিনি অনেকের আত্মীয় হইতে পরম

আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছেন। ইনি দরিদ্র শিশু ভরণপোষণ। তাই দরিদ্র কেহ তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাহাদের সাহায্য করিতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন। কলিকাতার মতন বিরাট নগরের পরিচিত লোকদের নিকট ভিক্ষা করিয়া অনেককে সাহায্য করেন।

তিনি এই বৎসর এই বয়সে বন্ধুদের একান্ত অনুরোধে দরিদ্রশাল সেবা সমিতির বার্ষিক সভায় ৩১.৩৮ তারিখে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে গিয়াছিলেন, তথায় তিনি একটি ভাষণ দিয়াছেন। গত ২৬.২৭ শে মে তারিখে শিয়ালদহ কেন্দ্র ব্রাউন ইনস্টিটিউটে সারা বাংলা বিপ্লবী সম্মেলনে প্রদান করিবার জন্য তিনি একটি অভিভাষণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন

উপরোক্ত জীবনের খবর আমাদের দেশের অনেকের কিছু জানা নাই—ইহাই করুণ করিব। বুঝবে, শ্রীদুর্গা মোহন সেনকে, অনেকেই জানেন। আমরা তাঁহার শতায়িক বর্ষের 'আনন্দপূর্ণ' জীবন কামনা করি।

মাতৃ-উদ্বোধন

।। শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী কাব্যতীর্থ

দোরে আজিকে মঙ্গলঘট, বাজারে শঙ্খ ঘণ্টা
জননী আসিছে বনফুল তুলে পূজার অর্ঘ্য সাজা।
সারা জীবনের ব্যর্থতা গ্লানি বিষাদ বেদনাজীর্ণ
বেজেছে আজিকে সুমধুর সুরে সুপ্ত হৃদয়বীণ।
গগন ভেদিয়া উঠিতেছে ঐ শঙ্খ ঘণ্টা রোল—
মধুর ছন্দে আনন্দ আজ দিয়ে যায় প্রাণে দোল।
ভুবনে ভবনে জাগে সমারোহ
আনন্দ ধারা বহে অহরহ,
ঘুচে গেছে যত ব্যথা দুঃখের—বেদনার অবসান,
জননী আবার আসিছে দুয়ারে
সাদরে বরে নে আজিকে তাঁহারে
ঐ ঐ শোন ওঠে চারিধারে শুভ আগমনী গান।
শিশির সিক্ত শিউলি, বেলালী ধূলিতে পড়িছে ঝরে—
শুভ্র বলাকা মেলি তার পাখা ছুটিছে দিগন্তরে।
কাশের গুচ্ছ দুলিছে বাতাসে তটিনী তুলিছে তান—
পুলকে শিহরি উঠিছে হৃদয় হরষে লুটিছে প্রাণ।
এ মধুর দিনে আসিছে জননী এসো এসো তুমি মাগো—
দানব দলিত লাঞ্ছিত দেশে মানব জননী জাগো।
অসুরগুলোর অত্যাচারেতে শঙ্কিত ভীত প্রাণ
কেমন করিয়া গাহিবো মা তোর শুভ আগমনী গান?
নিপীড়িতদের ওঠে ক্রন্দন—ঝরিছে অশ্রু বারি
অসুর পশুর লালসা মিটাতে লাঞ্ছিতা সতী নারী।
কোথা মাগো তোর দশ প্রহরণ,
অসুরের সাথে শুরু করো রণ,
করিতে হবে মা দানব নিধন দানব দলিত দেশে—
এসো চিন্ময়ী—তব রূপছবি
ধরুক উঠুক। বাজুক পূরবী।
এসো কল্যাণী! ভীমা ভৈরবী! প্রলয়করী বেশে।
শক্তি রূপিনী! রক্ষা করো গো আজি এ মর্ত্যধাম—
অসুর নাশিয়া সার্থক করো অসুর নাশিনী নাম!!!

সাময়িকী

যো মাং জয়তি সংগ্রামে—অনাদি কাল হ'তে বিশ্ববাসীগণের প্রতি প্রকৃতির আহ্বান—"যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতিবলো লোকে, স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি"। মার্কণ্ডেয় পুরাণোদ্ভূত শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তম চরিতে বর্ণিত প্রকৃতির ঘনীভূত মূর্ত্তি মহারাজা হিমালয়-দুহিতা মানবী উমা মহাসরস্বতী-রূপিণী ঐ আহ্বান সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছেন তপস্তপ্ত মহাশক্তিধর, স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালের অধিশ্বর অধিতাচারী ভোগসর্ব্বস্ব শুম্ভনিশুম্ভকে। বাঙ্গলার জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর এই সংগ্রাম-আহ্বানকে আলোচনা ও আস্বাদন করবে। বিশেষভাবে এই সময়ে যখন প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি দল, প্রতিটি জাতি সকল মানুষ, সকল দল, সকল জাতির কথা না ভেবে একান্ত ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থের তাড়নায় বিভোর, সেই সময়ে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতারৈ" এই আহ্বানের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

জীব জগতে প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্তঃ পুরুষরূপেন কালরূপেন বহিঃ বিরাজিত। অন্তরস্থ পুরুষ ভোক্তা, কালরূপা বহির্জগৎ, প্রকৃতিজগৎ ভোগ্যা। অন্তঃপুরুষ তার ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে কালরূপা বহির্জগৎ, প্রকৃতিজগৎকে ভোগ করে। শুম্ভ নিশুম্ভও ভোগ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আসক্তি বিদ্বেষের পথে ভোগ করতে গিয়ে প্রকৃতির হাতে ধ্বংস হ'য়ে গেল। উপাখ্যানটি এই—হিমালয়-দুহিতা উমা গঙ্গাস্নানে বহির্গতা—তাঁর রূপে জগৎ মোহিত। শুম্ভ নিশুম্ভের চর হিমালয়ের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় কোথায় কি হচ্ছে তার সন্ধানের জন্য। শুম্ভের চর চণ্ড মুণ্ডের নজরে পড়ল একটি পরমা-সুন্দরী নারী, যার সৌন্দর্য্যের তুলনা জগতে কোথাও মেলে না, একটি পাথরের উপরে উপবিষ্টা। চর মনে মনে ভাবল, এমন পরমাসুন্দরী নারী কার ভোগে লাগবে! চর অতি দ্রুত এই রূপসীর হিমালয়ে অবস্থিতির সংবাদ শুম্ভের নিকট পৌঁছিয়ে বলল—প্রভু, এমন রূপবতী নারী আপনি কখনও দেখেননি। আপনার প্রাসাদে যত মহিষী আছে তাদের কারুর সঙ্গেই এই রূপসীর রূপমাধুর্য্যের তুলনা হয় না। এই সুন্দরীকে ভোগ করার আপনিই উপযুক্ত অধিকারী। চরের মুখে এই সংবাদ শুনে শুম্ভ দূতরূপে সুগ্রীবকে পাঠাল উমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আসার জন্য। দূত উমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে জানাল শুম্ভের ইচ্ছা—বলল, শুম্ভের ন্যায় এমন শক্তিশালী সম্রাট যার সৌর্য্যের কাছে, যার বীরত্বের কাছে জগতের সকল দেবতা সকল দানব পরাভূত, যার ভাণ্ডারে স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালের সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরিত ও রক্ষিত আছে, যিনি স্বর্গের পারিজাত থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রের গজরাজ ঐরাবত পর্য্যন্ত সকল কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু জয় করে এনেছেন, এমন যে শক্তিধর বীরশ্রেষ্ঠ শুম্ভ, আপনার ন্যায় সুন্দরী রমণীর পক্ষে একমাত্র তাঁরই অঙ্কশায়িনী হওয়া সাজে। তিনি আপনাকে তাঁর প্রধানা মহিষী করার ইচ্ছা জানিয়েছেন। আপনাকে সসম্মানে তাঁর অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। উমা দূতের সকল কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, 'তোমাদের সম্রাটের কথা যা কিছু ব'ললে সবই সত্যি; এমন শক্তিমান সম্পদশালী পুরুষই তো স্বামী হওয়ার যোগ্য। কিন্তু ছোট বেলায় বালিকাসুলভ চপলতাবশতঃ আমি একটি প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলাম—যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। তোমার সম্রাট কি আমাকে সংগ্রামে জয় করতে পারবে? তোমার সম্রাট কি আমার দর্প চূর্ণ করতে পারবে? তোমার সম্রাটের বল কি আমার বলের সমান? তোমার

সম্রাটের নিকট গিয়ে আমার এই আহ্বান জানাও, যদি আমাকে সংগ্রামে জয় করবার সামর্থ্য তাঁর থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে আমার স্বামীরূপে বরণ করব'। দূত শুম্ভের নিকট ফিরে গিয়ে যথাযথ্য জ্ঞাপন করল। শুম্ভ উমার এই স্পর্দ্ধিত কথা শ্রবণে ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়ল। সামান্য একটি মানবীর মুখে কিনা তাঁর মত মহাপরাক্রমশালী শক্তিধরকে সংগ্রামে আহ্বান। শুম্ভ তার সেনাপতিকে ঐ গর্বিত নারীর কেশাকর্ষণ করে নিয়ে আসার জন্য আদেশ প্রদান করল। পরবর্তী পরিণতি শুম্ভ নিশুম্ভের সসৈন্যে উমা ভগবতীর নিকট পরাজিত হওয়া ও তাঁর হস্তে নিহত হওয়া।

এই শুম্ভ নিশুম্ভ যে উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি বোঝবার বিষয়। এই উপাখ্যানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে একটি অবলা নারী, অপরদিকে প্রচণ্ড সৈন্যবলসম্পন্ন শুম্ভ নিশুম্ভ। একজন ভোগ্যা, আর একজন ভোক্তা, সৈন্যিক বলপ্রয়োগের দ্বারা ভোগে বিশ্বাসী। অহঙ্কারে অন্ধ শুম্ভের মত এই বিশ্বচরাচরের কর্তা অহম্ ইতি মন্যতে। এ জগতে পুরুষোত্তম-বিধানে প্রতিটি অণু পরমাণুতেও যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, অসুর স্বভাবের নিকট এ তত্ত্বটি ধরা পড়ে না। এ জগতের প্রতিটি অংশ যে পূর্ণ, প্রতিটি অংশই যে যুগপৎ অণোরণিয়ান্ মহতোমহীয়ান্' কামাহতস্বভাব অসুরের মন এ কথা জানে না বলেই ছোটকে একান্ত ছোটই দেখে, তার যথাযোগ্য মান-দান, মূল্য-দান করতে পারে না। কোন বস্তুকেই যে তার স্বমূল্য দান না করে লাভ করা যায় না, এ কথা শুম্ভের জানা না থাকার ফলে বলাৎকারের পথে সে সুন্দরী নারী উমাকে ভোগ করতে প্রয়াসী। এই পথে তার এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত তার সমূহ বিনষ্টিই আনয়ন করেছে। ভোক্তা কর্তা অসুরত্ব দ্রষ্টা সাক্ষী ঐ অন্তঃপুরুষ এবং কালরূপ ভোগ্যা ঐ বহির্জগৎকে জানি-অজানির সহিত না জেনে কোন বস্তুকে ভোগ করতে গেলে যে দুর্ভোগ এবং মৃত্যুই আনয়ন করে এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এই উপদেশই পাচ্ছি। ভোগ করতে চাইলে বস্তুর, তা চিৎ বস্তুই হোক আর জড়বস্তুই হোক, তখনি করে ভোগ করতে হয় "যাকে তুমি রাধারূপেও নাহি পেয়েছ অনেক আগে" দুই ধাতু থেকে ভোগ ও তখন এর নিষ্পন্ন তখনি অর্থ হচ্ছে নিজ জীবনে বস্তুর স্বাধীন ও স্বয়ংমূল্যের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা। এই মূল্য কম দিলেও বিপত্তি, বেশী দিলেও বিপত্তি। "মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদা"— এই মাত্রা স্থির করাই হচ্ছে জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান— জ্ঞান বিজ্ঞান দুধ আমাদের জীবন দান করে, ঘৃতও আমাদের জীবন দান করে। দুধের ঘৃতের এবং আমার উদরের হজমশক্তির তত্ত্ব না জেনে যদি তিনপত্র গ্রাম ঘৃত খেয়ে হজম করতে পারি বলে তিনপত্র গ্রাম ঘি খেয়ে বসি তবে ঐ ঘি আমার জীবন দানের পরিবর্তে মরণও আনতে পারে। ভোগ করতে হলে তত্ত্বতঃ জেনে ভোগ করতে হয় যা দেবী সর্বভূতেষু সংস্থিতা ঐ মহামায়া হইতে জাত প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই মহামায়ার সর্বভূতেষু সংস্থিতিরূপ বিরাজিত বস্তুর ঐ সর্বভূতেষু-রূপকে অস্বীকার করে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায় ব্যবহার করতে গেলে বস্তু যে স্বমূল্য না পেয়ে অনুকূল হওয়ার পরিবর্তে প্রতিকূল হবে, বিদ্রোহী হবে এই তো স্বাভাবিক সকল শক্তির মূলাধার, যা হতে সকল জীব ও জগৎ জাত সেই মহামায়ার অর্চনায় যেন আমরা এই প্রার্থনাই জানাই—হে দেবী প্রতিটি বস্তুর প্রতি আমাদের ভক্তি-শক্তি দান কর, বস্তুর প্রতি কামদৃষ্টি থেকে আমাদের রক্ষা কর। মাগো, তুমিই মহাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী সরস্বতী। দেবশক্তি অসুরশক্তি মহাবিদ্যারই দুই দিক। তোমা হতেই তো, মাগো, দেবতা ও অসুরের জন্ম তোমার মধ্যেই দেবতা ও অসুর সমন্বিত, তাই তো মা তুমি অপরাজিতা ভগবতী। দেবতারা একান্ত প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির উপাসক, নৈর্ঋত্যের উপাসক, আলোর উপাসক। পক্ষান্তরে অসুর প্রাণের উপাসক, কর্মের উপাসক, আধারের উপাসক। তুমি তো মা বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা, আবার ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। তাই তো তুমি সুখারূপেণ, পুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা। অসুরগণ আত্মকারণাৎ, প্রাণতর্পণার্থ শোষণের পথে হরণের পথে

সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। শোষণ-হরণের পথে সঙ্ঘ রচনা খুব সহজ। বুদ্ধির উপাসক সঙ্ঘ গঠনে তেমন দায়দর্শী হয় না—তাই দেবতাদেরও তাদের আলো সত্ত্বেও সকল কর্মক্ষেত্র থেকে শুম্ভ নিশুম্ভ কর্তৃক অধিকারচ্যুত হলেন বিশ্বের সকল শোষণ-ক্ষেত্রগুলি শুম্ভ নিশুম্ভ অধিকার করে বসল। পুরুষের প্রাণশক্তি (self-life) কতদূর পর্যন্ত জয় ক'রতে পারে শুম্ভ নিশুম্ভের জীবনে তাই পরিস্ফুট। কিন্তু মাগো, পুরুষোত্তমপ্রসূবিণী পরাশক্তি তোমাকে ছাড়িয়ে না হওয়াতে শুম্ভ নিশুম্ভের ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধি সকলই কাম-কবলিত। বুদ্ধি সে যত তীক্ষ্ণই হোক বা শুদ্ধই হোক সেও রক্ষা করতে পারে না। শুদ্ধচিত্তের ভাবে সঙ্ঘটি (organisation) যদি মোল আনা আমার হাতে না থাকে তবে শুদ্ধ হ'তে পারে না। এ শুদ্ধ-বুদ্ধিও কাম। মাগো, আমাদের শুদ্ধাশুদ্ধ পরিত্যাগী ভক্তিমান কর। শুদ্ধাশুদ্ধ পরিত্যাগ ভক্তির একটি লক্ষণ। শক্তিরই প্রতিফল ভক্তি। ভক্তিই শক্তি। তাই তো দেবগণ "সহ ইন্দ্রেন ব্রহ্মণা চ সর্বেতা যৈ দুর্গাং ভগবতীং ভক্ত্যা সংস্তুতঃ অপরাজিতাম্"। ভক্তি দ্বারাই দেবতারা ব্রহ্ম ও ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। পরাজিত দেবতারা "সমেতা", সমিতিবদ্ধ হয়ে, মাগো, অপরাজিতা ভগবতী তোমাকে সংস্তবে করেছিলেন। আমরাও আজ দেবতাগণের ন্যায় তোমার শরণ নিচ্ছি, শান্তির সকলের সঙ্গে সমবেত হ'য়ে তোমাকে স্তবে বন্দি দেবতাগণকে শুম্ভ নিশুম্ভের শোষণশক্তির নিকট হতে যে ভাবে রক্ষা করেছিলে, আমাদিগকেও তদ্রূপ রক্ষা কর বর্তমানে সকল কর্মযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, সকল সাধন ভজন কামের অধিকারে। কামাত্মা শুম্ভ আজ সব যজ্ঞের ভোক্তা। মাগো, তুমি আমাদের হৃদিস্থ হয়ে আমাদের প্রাণ ও বুদ্ধির সমবয় বিধান কর। কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি যা কামাত্মা শুম্ভ কর্তৃক অধিকৃত, ঐ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত কর। উপনিষদ-মন্ত্র "ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্' এই বাণী আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর, সহজ কর। আমাদের সকল সত্তা দিয়ে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় তুরীয়াতীত সকল স্তরে তোমাকে নমস্কার—নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

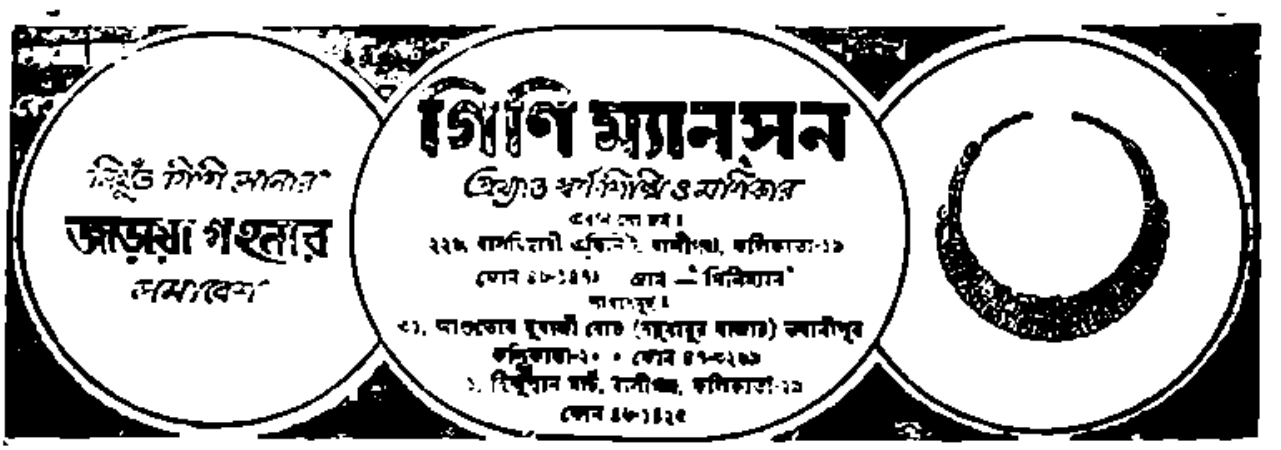

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪, হইতে মুদ্রিত।

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ব্রহ্মসূত্র (অখণ্ড ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)

২। ঈশোপনিষৎ
৩। কেনোপনিষৎ
৪। কঠোপনিষৎ
৫। প্রশ্নোপনিষৎ
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতাজয়ন্তী
১২। উজ্জীবনবাণী (পুস্তিকা)
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-পুস্তিকাদিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মুদ্রিত হইতেছে)
৪। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির জন্মকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
রবীন্দ্র-স্মরণ
প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৫, ১৯৬৮ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র একবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটি উল্লেখযোগ্য বই

প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত
প্রাগৈতিহাসিক বাংলার প্রথম মানবজীবন সম্পর্কিত

প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া

রচনা : শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
মূল্য : দশ টাকা

প্রাপ্তি সংস্থান : চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

●

বাঁকুড়া জেলা গেজেটীয়ার

সম্পাদনা : শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস
জনসমাজ, কৃষি ও সেচ, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য
যোগাযোগ-ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি
দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সমন্বিত।
১৮টি আর্ট প্লেট ও ১১টি ম্যাপ

মূল্য : পঁচিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : অধীক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ২৪৩৭৬/৬৮

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০
কর্মযোগী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·০০

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·৫০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

স্থলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

ছোটোদের জুতো দেখেশুনে কিনবেন
নতুবা পায়ের গঠনে
আজীবন খুঁত থেকে যেতে পারে

বাটা লিলিপুট ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি।
ছোটোদের জন্য নরম চামড়ার এমন হালকা এবং নরম যা পায়ের গঠনের
সামান্য অবিকল মিলে যায়। সকলের আরামের জন্যই গড়াই ও ফাটা, যাতে
প্রয়োজনে পা বাড়তে পারে। এমন মোড়কের ডাক্তারের যা সুস্থ চলনে সাহায্য
করে। নমনীয় প্রায় তলতে এবং জুতোর তলি, প্রয়োজনের
সংযোজনের সহায়ক। আর চামড়ার এর মোড়কটি, যা পায়েপায়ে হারাবে না।
বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে তৈরি, উপকরণে আর নির্মাণে, ছোটোদের
জন্যেই তৈরি বাটা লিলিপুট। রংয়ের রঙে নানান স্টাইল
এখন বাটার দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আজই নিয়ে আসুন, আমরা
ফিট করে দিই বাটা লিলিপুট, দেখুন কেমন
[illegible] এবং ওই ছোটোদের পা।

Bata

লিলিপুট

ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি

গান্ধী শতাব্দীতে
গান্ধীজীর রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ পড়ুন

	মূল্য
আত্মকথা—বীরেন্দ্রনাথ গুহ	১২·০০
গীতাবোধ—ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীসুমার জানা	
সত্যই ভগবান—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ	
পল্লী পুনর্গঠন—শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	
নারী ও সাম্প্রতিক অভিচার—শ্রীউপেন্দ্র রায়	৪·৫০
সর্বোদয়—শ্রীঅমলেন্দু দাশ গুপ্ত	১·৫০
পঞ্চায়েত রাজ—শ্রীমতী সাধনা সোম	·৭৫
অভিচার—শ্রীমতী সাধনা সোম	·৬২
উৎপাদক শ্রম—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
আমার সমাজবাদ—শ্রীঅমিয়কুমার বসু	
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি—শ্রীশিশির সান্যাল	
গান্ধী-রচনা-সংকলন—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
মোহনমালা (গান্ধীবাণী)—শ্রীঅনাথ বসু, শ্রীসুধীর লাহা	৩·৫০

গান্ধীজীর সম্পর্কিত ও অন্যান্য বই

মহাত্মা গান্ধী—ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ	৫·৫০
(কাপড়ে বাঁধাই)	৬·৫০
গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন —শ্রীরথীন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫·৫০
মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি—স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ	৩·০০
সর্বোদয়ের পথ—গান্ধীসঙ্ঘী নেতৃবর্গের ভাষণাবলী	৩·০০
ধর্মের সন্ধান—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রিচার্ড গ্রেগ-এর 'আই ওয়াণ্ট এ জব'-এর বঙ্গানুবাদ)	·৭৫
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ—শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (যন্ত্রস্থ)	
স্বাস্থ্যবন্ধু নিম, তুলসী, বেল—শ্রীসরোজ মজুমদার	·৫০
গান্ধীচরিত কথা—শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার বসু (যন্ত্রস্থ) (রামায়ণের মত পয়ার ছন্দে লিখিত গান্ধীজীর জীবনকাহিনী)	

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

বিজ্ঞপ্তি

উজ্জলভারত

উজ্জলভারত পত্রিকার একবিংশ বর্ষ শেষ হইল। মাঘ ১৩৭৫ (১৯৬৯) হইতে ইহার দ্বাবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। সর্বসাধারণের সহযোগিতাই ইহার একমাত্র পাথেয়। আমরা সকলের সঙ্গে নিজেদিগকে যুক্ত করিয়া সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি যাহাতে ভবিষ্যতে সর্বসমন্বয়ের—বিপরীতের সমন্বয়ের—সামগ্রিক জীবনবাদ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারি।

কার্যাধ্যক্ষ, উজ্জলভারত

সূচীপত্র : অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৫, ১৯৬৮

১।	যুগদমস্যায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীবেণু মিত্র	২০১
২।	অবধূত শরৎকুমার শ্রীহৃষীকেশ দে	২০৪
৩।	প্রকৃতি ও মানুষ শ্রীশান্তশীল দাশ	২১০
৪।	স্বামিজী-স্মরণে জনাব বেজাউল করীম	২১১
৫।	সমপ্রতার সাধনা শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী	২১৩
৬।	স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ৮৬-তম জন্মদিন শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী	২১৫
৭।	কাঠমাণ্ডুতে আটদিন শ্রীলাহুজী বস্তি	২১৭
৮।	নারী কে শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত	২২৪
৯।	প্রার্থনাকালীন ভাষণ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রণত	২৩০
১০।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৬৮)	২৩৩
১১।	নিগমান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি) শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল	২৩৭
১২।	সাময়িকী শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জন্মোৎসব গীতা-জয়ন্তী,	২৪১

উদ্বোধন

অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৮ একবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

যুগসমস্যায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্ম-ভগবতে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম ভগবৎ-পুরুষোত্তমায় নিত্যলোপালায়।

ওঁ আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতম্
সংকীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষম্
বিশ্বপ্রেমদৌ নরনারায়ণসেবীম্
বন্দে নমন্নরগুরুং পুরুষোত্তমানন্দম্॥

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৬৬-তম জন্মতিথি আজ ২৪শে কার্তিক ১৩৭৪। আপনারা তাঁকে স্মরণ করে এসেছেন, আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই।

জন্মমরণ ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারায় অশৌচ, অশুচি,—মরণও। জন্মও অশুচি, মরণও অশুচি—তাই সেখানে জীবিত থাকাটাই পাপ, বিড়ম্বনা। কিন্তু পুরুষোত্তম কৃষ্ণের ভাগবত ধর্মে জন্মমরণ অশুচি নয়—উৎসব; জন্মও উৎসব, মরণও উৎসব। জন্ম এক রকমের উৎসব, মরণ আর এক রকমের উৎসব। আমরা আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জন্মে আনন্দিত হয়ে উৎসব পালন করতে সমবেত হয়েছি। যে জীবন সার্থক, সর্বভূতহিতে রত, সে জীবনের জন্মেই উৎসব পালনও সার্থক। নয়তো উৎসব-পালন পদ্ধতিও বিড়ম্বনা বৈকি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জীবন সার্থক, সর্বভূতময়। কি রকম করে সেই কথা বলি।

মানুষ জীবনে কি চায়? চায় আনন্দ, চায় জীবনের অর্থ বুঝতে, চায় সকলের সঙ্গে গলাগলি করে সকলের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে সুন্দর জীবন যাপন করতে। সকলের সঙ্গে থেকেও যে জীবন মুক্ত, ঝরঝরে, হিংসা-বিদ্বেষ-ক্রোধ-মোহ-মৃত্যুর আবিলতা-মুক্ত, সেই জীবনই মানুষের কাম্য যদিও এ অত্যন্ত কঠিন। ব্রহ্ম-পুরুষোত্তমমুখী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ এমনি জীবন যাপন করেছিলেন। তাই আজ তাঁর জন্মোৎসব পালন করা সার্থক।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ কত সহজে বলতে পারতেন 'আমি আনন্দিত'। বিশ্বসৃষ্টিকে তিনি অসূয়া করেন নি—তাই সৃষ্টির কোন কিছুকে তিনি হিংসাও করেন না, ঘৃণাও করেন না, বিদ্বেষও করেন না, ভয়ও করেন না। আবার কোন কিছুতে আটকে যাওয়ার ভয়ও তাঁর ছিল না। অবাধে সৃষ্টির মধ্যে বিচরণ করে তিনি আনন্দই সঞ্চয় করে গেছেন। জানতে মানতে কিছুতেই আটকে যান নি বলেই তাঁর জীবনাস্বাদন আনন্দের স্তরেই থেকেছে। বস্তুর অনুপম সত্তা আস্বাদনেই কেবল তাঁর আনন্দ ছিল তা নয়, সব কিছুর অতীত থাকার একটা স্তর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল বলেই বস্তুর অতীত থাকার আনন্দও ছিল তাঁতে; সঙ্গে আর সেই জন্যেই বস্তু থেকে তাঁতে ক্লেদও জন্মায় নি। জীবনের এই তো চূড়ান্ত জিজ্ঞাসা—বস্তু-জগতের সঙ্গে ভাব-জগতের সম্পর্ক কি, কার মূল্য ও স্থান কোথায় কতটুকু? শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই দুইয়ের সম মান ও মর্যাদা দিয়েই দুইকেও

ছাড়িয়ে আনন্দিত থেকে গেছেন। সর্বভূত তাঁর কাছে পরম মূল্যে সম্মানিত ছিল বলেই সকলের সঙ্গে গলাগলি করে সকলের সুখ দুঃখকে নিজের সুখদুঃখ বলে মনে করেও তাঁর ব্রহ্মত্বের অটুট থেকে গেছেন। আজ তাঁর জন্মোৎসব পালন করছি জীবন থেকে তাঁর যত আনন্দ সঞ্চয় করতে চাই বলে, জীবনের অর্থ বুঝতে চাই বলে। মানুষমাত্রকে তিনি কত সহজে কত আপনই না মনে করতে পারতেন—সে এক বিস্ময়। দুহাত দিয়ে ভুবনখানা ধরতে পাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল একান্ত সহজ—সেইজন্যই আনন্দ ছিল তাঁর সহজাত সম্পদ। এই আনন্দকে পাওয়ার জন্য তাঁর নাম করে সমবেত হই।

আনন্দ তাঁর সহজাত সম্পদ—কিন্তু দুঃখ কি তাঁর ছিল না? হ্যাঁ ছিল, খুব ছিল। কিন্তু আনন্দের বিপরীত তো দুঃখ নয়। তাঁর দুঃখ সংসারের কোন কিছু না-পাওয়ার বেদনা নয়, কিংবা ভগবানকেও না-পাওয়ার বেদনাও নয়। সামঞ্জস্যের বা সর্বসমন্বয়ের সুষমায় যে উপাধিবিহীন বিস্তীর্ণ-গভীর ভাগবতী আনন্দ তিনি বুক ভরে পেয়েছিলেন, মানুষের কাছে, মানুষের বাস্তব জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে তা পৌঁছে না দিতে পারার বেদনা—যা পেয়েছিলেন তা মানুষকে দিয়ে যেতে না পারার বেদনা—ছিল তাঁর প্রচুর। কিন্তু তাঁর এ দুঃখ বেদনার স্বরূপ আর কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসা-আসক্তি-মূঢ়তাজাত বা ক্ষমতা-গর্বী অহং-এর বিচ্ছিন্নতার প্রকাশের দুঃখের স্বরূপ এক নয়। এই দুই দুঃখে 'বহুত অন্তর'। বিদর্ষণও তাঁর [redacted] অভ্রান্ত ছিল। জড়ধর্ম যে অজড়-ধর্মেরই [redacted]ভাবিত রূপ এ কথা জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে গিয়ে লাঞ্ছনা তাঁকে অনেকই পেতে হয়েছে। নূতন কথা নিয়ে যাঁরা আসেন, সর্বসাধারণের বোধ-বুদ্ধিতে অবোধ্য বলে লাঞ্ছনা তো তাঁদের হবেই। তাই বহু দুঃখবেদনা-বিদর্ষণ নিয়েও তিনি পরম আনন্দিত। জীবন-চেতনার নূতন কথা-জাত সেই আনন্দকে বুঝতে চাই বলেই তাঁর কথা আলোচনা করি।

সেই নূতন কথা কি?

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বলতে যা বোঝা যায় তা বাস্তব জীবনের অস্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বাস্তব জীবনটাকে মায়া মিথ্যা বলে, যেন তেন প্রকারেণ এই জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে এর বাইরে ভগবান বা ব্রহ্মলাভই তার সার কথা ছিল। কিন্তু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকথা অন্য রকম। ভারতবর্ষ কৃষ্ণ-জীবন ও কৃষ্ণ-দর্শনকেও অবশ্য বাস্তব-বিমুখী করে ঐ একই খাতে তাঁকেও স্থাপন করে নিয়েছিল বটে, কিন্তু ঐ কৃষ্ণ-দর্শন যে বাস্তব-বিমুখী ঋষির চিন্তাধারা নয় এ কথা বর্তমানকালে প্রথম প্রস্থাপন করলেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল আজ থেকে প্রায় নব্বই বৎসর আগে। তাঁরই জীবনের আলোয় পুরুষোত্তমানন্দ ভারতবর্ষের মূল শাস্ত্রগুলির—ব্রহ্মসূত্র, প্রধান এগারখানা উপনিষৎ ও গীতার—সঙ্গতিধর্মাত্মক ভাষ্য রচনা করে দেখিয়েছেন যে, বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করাই যেমন ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের একমাত্র রূপ নয়, তেমনি বর্তমান যুগে যে চিন্তাধারা আমাদের দরকার—যে চিন্তাধারার প্রতি ব্যক্তি-মানুষের, যে কোন স্তরেরই হোক না কেন, মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি ও তার যথা-মান সত্ত্বেও সমগ্রের মধ্যে তাকে বিধৃত করে সুস্থ সামগ্রিক সমাজ-জীবন সৃষ্টি—সেই চিন্তাধারা আমরা ঐ কৃষ্ণ-দর্শনেই পেতে পারি। অথচ এতখানি প্রগতিপন্থী সামগ্রিক চিন্তাধারা মার্কসবাদের কোন ব্যাখ্যাতেই পাওয়া যাবে না। সমগ্র জীবনটাকে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক-ভাবে ভিন্ন বিভক্ত করে কিংবা সমগ্র সমাজকে ধনিক ও শ্রমিকে ভিন্ন বিভক্ত করে উচ্চ নীচ, শোষক শোষিত নামে বিশেষ স্তর, দল বা গোষ্ঠী হিসাবে মার্কামারা চিরস্থায়ী ছাপ দেওয়া সত্য সিদ্ধান্ত নয়। নর-নারী, ধনিক-শ্রমিক, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ এমনই বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষ নিয়ে সমগ্র সমাজ। অধ্যাত্মবাদীও সেই সমাজেরই একজন। কাজেও একান্তভাবে বাদ দিয়ে কোন একটী দল বা গোষ্ঠী নিয়ে বৈচিত্র্যহীন একমুখীন সমাজ রচনা করতে চেষ্টা করা বাতুলতা, আরও দুর্ভাগ্যপূর্ণ সেই মনোবৃত্তি যা বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর একটে অন্যের পরিপূরক বলে না ভেবে উভয়কে উভয়ের একান্ত বিপরীত বা বিরুদ্ধ বলেই

দেখেছে এবং একের অস্তিত্ব বা নিঃশেষ আত্মবিলয়ের উপর অপরের প্রতিষ্ঠা এটুকু বিশ্বাস করে সেই পথে অন্তহীন পারস্পরিক শ্রেণীদ্বন্দ্বকেই, সংঘর্ষকেই সর্ব মীমাংসার পথ বলে, সমাধান বলে জানে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন যে, প্রতি ব্যক্তি বা শ্রেণী একান্ত বিরুদ্ধ বা বিপরীতই নয়, তারা পরস্পরকে পরিপূরণ করে একই সমগ্রের অনন্ত অংশ এবং পরস্পর-সাপেক্ষ হয়েও তারা একই সঙ্গে পরস্পর নিরপেক্ষ। তিনি তাঁর গীতার ভাষ্য-ভূমিকায় লিখছেন, 'এখানে প্রতি স্তরই স্ব স্ব মূল্যযুক্ত, অথচ প্রত্যেক স্তরকেই অপর স্তরকে জড়াইয়া ধরিতে হইবে; কোনও স্পর্দ্ধার স্থান এখানে নাই, সমিতি গঠনের মত পরিণতী-ভাব বিলুপ্ত। প্রতি স্তরই সর্বস্তর, অথচ প্রতি স্তরের সমন্বয় ব্যতীত পূর্ণ স্তরের সাক্ষাৎকার অসম্ভব'। এই ভাবেই কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম সহযোগে বাস্তব জীবনে উন্নত উজ্জ্বল সামগ্রিক জীবন যাপন করলেই সকল উপাধির ঊর্দ্ধে অন্তর বাইরের সুস্থতা লাভ করা যায়। দেহবান মানুষের পক্ষে দেহ-মনের সুস্থতা লাভের এই পথ সর্ব দেশের সর্ব মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। বর্তমান যুগের এই জীবন-দর্শনই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে রয়েছে।

কর্ম বন্ধনের কারণ বলে অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ কর্ম ত্যাগ করেছিল, এদিকে জড়বাদী সভ্যতা যেন তেন প্রকারেণ কর্ম করে বাস্তব জীবনে যেন তেন প্রকারের প্রতিষ্ঠা লাভকেই চরম ও পরম সার্থকতা বলে জানে। বর্তমানে ভারতবর্ষও প্রতিক্রিয়ার একান্ত জড়বাদীয় মনোবৃত্তিদ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে এদেশীয় জীবনযাপনের যে সৌন্দর্যটুকু তাও হারিয়েছে, জড়বাদকে দুইহাতে না হোক, ও দেশীয়ভাবে আচরণ করলেও বাস্তব জীবনে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত, তাও অধিগত করতে পারে নি। অধ্যাত্মবাদ বা জড়বাদ উভয়েরই কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে যে-ভাবে কর্মকে গ্রহণ করতে হবে সে সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, "দেখিলে মনে হয় 'কাজ কথা' খুবই সরল, কিন্তু কর্মের পিছনে রহিয়াছে প্রেরয়ন অদ্বৈতজ্ঞানময় নৈষ্কর্ম্য। এই কর্মের আদর্শই শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন, ইহাই পুরুষোত্তম-কর্ম।...বিশ্বে আমরা আজ কর্মক্ষেত্রে সকলের পশ্চাতে। কর্মক্ষেত্রের সহিত একেবারে অপরিচিত থাকার বিপদ হইতে বাঁচিবার একমাত্র পথ—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধ কর্মীর কর্মজগতে কর্ম-ভার গ্রহণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ব্রহ্মেরই মত সমান মানদানের শাস্ত্রপ্রচার এবং সেই আদর্শে কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করা। মাটিতে আলু পটোল হয়, ইহাই জানিতাম। তাই না ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আমরা খুঁজিয়াছি চিৎ-এর ক্ষেত্র? কিন্তু মাটি খুঁড়িয়া যে আলু পটোল ও ব্রহ্মজ্ঞান দুই-ই যুগপৎ মিলিতে পারে, একথা শ্রীকৃষ্ণই নির্ভীক ভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন"।

দেখা যায় বাস্তব জীবনটা যে আমাদের বদলে গেছে এই বদলে যাওয়া অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব—সেখানে আমাদের চিন্তার সাথে ব্যবহারের, আমাদের অতীতের সাথে বর্তমানের সামঞ্জস্য নাই—তাই সৌন্দর্যও নাই। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জড়ের বৈজ্ঞানিক ধারণাদ্বারা জড় অজড়ের সম্পর্ক নূতন ভাবে প্রদর্শন করে আমাদের দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানে ঐ সামঞ্জস্য আনবার পথ করে রেখে গেছেন। কি অধ্যাত্ম জীবনে, কি সমাজ-জীবনে সামঞ্জস্য আনবার শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-প্রদর্শিত এই দর্শন আজ বিশেষ প্রয়োজন। অতীতের অনেক কিছুই ভাঙতে হয়েছে, হচ্ছে—সেই ভাঙনের মধ্য দিয়ে যদি সামগ্রিক জীবন-চেতনা গড়ে না ওঠে, তবে দাঁড়াবার দৃঢ় ভিত্তির অভাবে আমাদের মনুষ্যত্বের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না—একেবারে সর্বৈব জড় জানোয়ার হয়ে যাব। প্রকৃতির জৈব সত্তার সাথে প্রকৃতিরই শিব-সত্তাকে যুক্ত করে নিতে না পারলে মনুষ্যত্ব অর্জন সম্ভব নয়—নূতন জগতে আমাদের পরিচয় হোক নূতন মানুষ হিসেবে। তারই দর্শন দিয়ে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আজও অজ্ঞের দুর্বোধ্য থেকেও অন্তহীন কালে অক্ষয় পদচিহ্ন রেখে গেছেন। আমরা যেন বুঝে নেবি কি তিনি বলতে চেয়েছিলেন। আপনাদের সকলের সঙ্গে সমবেত হয়ে প্রণাম নিবেদন করি তাঁর জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিতাগোপালকে, প্রণত হই তাঁতে। ওঁ হরি ওঁ।

অবধূত শরৎকুমার

॥ শ্রীঋষীকেশ দে ॥

মহাপুরুষদের জীবন-কথা ও দর্শন আলোচনা কেন ?

আজ এই পুণ্য তিথিতে যে আমরা মহাপুরুষের জীবনকথা ও জীবনদর্শন আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছি, তা কেন হয়েছি ? কি তার হেতু ? এই হেতু জীবনের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের সঙ্গে কতখানি যুক্ত ? যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মনীষীরা বলেছেন—মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বর হওয়া। দেখা মানে পাওয়া, পাওয়া মানে হওয়া। এই ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে প্রধান সহায়গুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সাধু-সঙ্গ সাধক জীবনে সাধু সঙ্গের প্রভাব যে কত প্রবল পুরাণ থেকে তার একটা কাহিনী বলছি সুকঠোর তপস্বী ও উদ্যোগী পুরুষ রাজা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টায় বিফল হলেন, মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণত্বের স্বীকৃতি না দিলে ভারতের ঋষি-সমাজ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করবেন না। বশিষ্ঠ তাঁকে রাজসিক, অবিজিতক্রোধ প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণ্যগুণ-রহিত বলেন। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের একশত পুত্রকে নানা প্রকারে লৌহাস নামক এক নরমাংস-লোভী উন্মাদের হাতে ঠেলে দিলেন। মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পিতামহ শক্তি প্রভৃতি বশিষ্ঠের শতপুত্রের নির্মম মৃত্যুর পর তার দেখিয়ে ব্রাহ্মণত্বের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে গেলেন। ক্ষমাসুন্দর মহর্ষি তাঁকে বললেন "বিশ্বামিত্র, তুমি এখনও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করনি, যা সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময় এই ভাব বিচারের দ্বারা বুদ্ধিগম্য ভাবেও গ্রহণ কর নি—আমি কেমন করে তোমায় ব্রাহ্মণ বলি !"

"আমি কোথায়, কার কাছে এই ব্রহ্মবিদ্যা পাব ?"

"ভগবান অনন্তদেব পাতালে পৃথিবী ধারণ করে আছেন, তিনি যোগ্য আচার্য।"

বিশ্বামিত্র ছুটলেন অনন্তদেবের কাছে। সব শুনে তিনি বললেন "তুমি যদি পৃথিবীকে কিছুকাল কোন উপায়ে ধরে রাখতে পার, আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করি"।

"কিসের দ্বারা পৃথিবী ধৃত হবে ?"

"মহৎ পুণ্যের প্রভাবে।"

"আমি আমার সমগ্র যাগ যজ্ঞ ও দানের পুণ্যফল অর্পণ করছি, পৃথিবী তুমি স্থির হও।"

অনন্তদেব পৃথিবীকে ত্যাগ করলেন। পৃথিবী তির্যক পথে (Tangetial direction-এ) নিজকক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে কেঁপে যেতে লাগল। ক্ষণমধ্যে অনন্তদেব তাকে আপন শক্তিতে সূর্য্যাবর্তন কক্ষে নিয়োগ করলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্র চিৎকার করে বললেন, "আমি আমার দীর্ঘকাল ব্যাপী সুকঠোর তপস্যার পুণ্যফল দান করছি, পৃথিবী তুমি ধৃত হও"।

অনন্তদেব পৃথিবীকে ত্যাগ করলেন,—সেই একই পরিণাম। অনন্তদেব বললেন—বিশ্বামিত্র, তুমি কি কখন সাধু-সঙ্গ করেছ ? যদি তা করে থাক সেই পুণ্য দান কর।

"সাধু-সঙ্গ ! আচার্য্য ঋষি ও মুনিরা আমাকে গ্রহণ করেন নি। একমাত্র শত্রুভাবে বশিষ্ঠের সঙ্গে কিছুকাল সঙ্গ করেছি—তিনি যদি সাধু হন—"

"সেই সাধু-সঙ্গের ফল দান কর।"

চূড়ান্তদর্শী হতমান বিশ্বামিত্র করযোড়ে বললেন, "হে ধরিত্রি, মহর্ষি বশিষ্ঠের সাহচর্য্য-সঞ্জাত পুণ্যফলে তুমি স্থির হও"।

সমস্ত জীবন্তার সমেত পৃথিবী আপন কক্ষপথে বিমূঢ় বিশ্বামিত্রের চোখের সামনে চলতে লাগলেন। তিনি

বললেন, "আচার্য্য, এইবার আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন"।

"মূর্খ, দাম্ভিক! যে মহাসত্তের অধিক সজলাভ-পুণ্যে পৃথিবী ধৃত হলেন, তুমি তাঁকে ত্যাগ করে আমার কাছে এসেছ ব্রহ্মবিদ্যা নেতে? ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র সদ্‌গুরু সেবাদ্বারাই লাভ হয়—সর্ব্বপ্রকার সাধনা ও চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ।"

ভ্রমমুক্ত বিশ্বামিত্র শিষ্ট ও প্রণত হয়ে বশিষ্ঠের শরণাগত হলেন।

এটা শুধু একটা পৌরাণিক কাহিনী মাত্র নয়—চির-দিনের পথ-নির্দেশ। আত্মিক উন্নতির পথে সাধুসঙ্গ একটি অবশ্য পালনীয় ব্রত।

এই সাধু-সঙ্গ উত্তম মধ্যম ও সাধারণ ভেদে তিনপ্রকার। প্রথম সদ্‌গুরু পরমাচার্য মহাত্মাদের প্রত্যক্ষ সেবা, সাহচর্য্য ও নির্দ্দেশ পালন; দ্বিতীয় তাঁদের জীবন-কথা আলোচনা, আদর্শের অনুধাবন, প্রচারিত তত্ত্বকথার অর্থবোধ। তৃতীয় যে কাজটা আজ আমরা এখানে করছি সদ্‌গুরু ও আচার্য্য পুরুষোত্তমানন্দের স্মৃতি বাসরে তৃতীয় সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সেবাধর্ম্মন ও তীর্থভ্রমণ।

১২৯০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ বাখরগঞ্জ জেলার কাঁকবধা গ্রামে পিতা নীলকমল ঘোষ ও জননী মুক্তকেশী দেবীর গৃহে শরৎকুমার জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই পরবর্ত্তী যুগে আচার্য্য অবধূত পুরুষোত্তমানন্দ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন আজন্ম সৎ বা সাধু। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা এই—যাঁরা সদ্‌গুরু তাঁরা কেবল উপদেশ ও দীক্ষা দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করেন নি, নিজ জীবনে তা পালন করে আদর্শ স্থাপন করেছেন। নারদ বেদব্যাসকে শ্রীমৎ ভাগবত রচনার প্রাক্কালে বলেছিলেন—"গীতায় তুমি যে আদর্শ যোগীর কথা বলেছ সেই কর্ম্মসন্ন্যাসী, প্রাজ্ঞ, আদর্শ পুরুষ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ"। সমন্বয়বাদের প্রবক্তা পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-জীবন-দর্শনের একটি জীবন্ত ভাষ্যের উদাহরণ।

ষোল সতের বছরের কিশোর শরৎকুমারকে তাঁর পিতা নিজ স্বার্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলেন। সত্যাশ্রয়ী শরৎ কিছুতেই মিথ্যা কথা বলবেন না। ক্রুদ্ধ পিতা তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গাছতলায় বসে বসে কাঁদতে লাগলেন তিনি, আত্মীয়ের জন্য অনেকেই অনুরোধ করলেন, পীড়াপীড়ি করলেন। সেকালে আত্মীয় করলে রাবণকে অপমান করা হয়—পিতৃদ্রোহ প্রকাশ করা হয়। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। অসত্য সমন্বয়বাদী শরৎকুমার সেদিন সমন্বয় দর্শনের এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করলেন। সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি ও পিতার অসাধুতার প্রতি বিরোধিতার সমন্বয় সাধন করলেন। "বাবা না ডাকলে যাব না।" নম্র হলেন নীলকমল ঘোষ পুত্রের সমুজ্জ্বল আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠার কাছে—আদর করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন ছেলেকে।

অবধূত কি?

শরৎকুমার ছিলেন—অবধূত। অবধূত বলতে আমরা কি বুঝি? সংস্কারমুক্ত প্রেমময় পুরুষ—যিনি সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে মিলনকে বোধ করেছেন তিনি শাস্ত্র বলেন—

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্র
ন শৈব ন শাক্ত ন বা বৈষ্ণবশ্চ
রাজতেঽবধূতো দ্বিতীয় মহেশঃ॥

সংসারীর আদর্শ হলেন শিব, বৈরাগীর আদর্শ হলেন নীলকণ্ঠ। দেবতা ও অসুর, সৎ ও অসৎ, সপক্ষ বিপক্ষ সকলে মিলে করলেন সমুদ্র মন্থন, উঠল অমৃত—ভোগসুখ আনন্দের উপাদান। তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। শক্তি ও বুদ্ধিতে যারা প্রবল তারা নিজেদের স্বার্থে সেই অমৃত সরিয়ে ফেলল। বঞ্চিতের দল ছাড়বে কেন? তাদেরও চাই—আবার সমুদ্র-মন্থন, উঠল আশাভঙ্গ, ক্ষোভ ও বঞ্চনার মন্থন-জাত বিষ। সে বিষ কাউকে রেহাই দেবে না, সারা পৃথিবী জ্বালিয়ে ফেলতে চায়। বিপন্ন বিশ্বকে বাঁচালেন বৈরাগী শিব—সবার কল্যাণে তিনি সেই বিষ আকণ্ঠ পান করলেন, হলেন নীলকণ্ঠ। বৈষ্ণবেরা বলেন—সকলের পাপ গ্রহণ করেন গঙ্গা। গঙ্গা পাপ মুক্ত হন বৈষ্ণবের স্পর্শে। যুগে যুগে বৈরাগীরাই জগতের সব দুঃখ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক সদ্‌গুরুই তাঁর সন্তানদের দুঃখতাপ গ্রহণ করেন, নিরাকরণ করেন। পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন সদ্‌গুরু এবং অবধূত। একাধারে

আদর্শ সংসারী আদর্শ বৈরাগীই হচ্ছেন অবধূত—সর্ব-সংস্কারমুক্ত সমাধিস্থিতি।

অবধূত যাঁহাই সমন্বয়ী তাঁর কাছে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' নয়। তাঁর কাছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। এ কেমন সত্য? যেমন সমুদ্র সত্য, তার তরঙ্গও সত্য। সদা চঞ্চল পরিবর্তনশীল তরঙ্গ সমুদ্রেরই অঙ্গ, তরঙ্গও সমুদ্র দিয়ে গড়া। এই জগৎ যেখানে যারে তারে ভালবাসায় নীড় বাঁধে, আবার ঘর ভাঙে, ফুল ফল হয়, নদী শুকায়, প্রমিক কর্মঘণ্টা বাড়ান কমান নিয়ে অধিক বেতন চায়, মালিক কর্মচারীকে সঙ্গত বেতন দিতে অনিচ্ছুক, স্বার্থে আঘাত পড়লে লড়াই বাঁধে, আবার পরার্থে প্রাণ বিসর্জন যেয়—এই দ্বন্দ্ব-সমাকুল জগৎ; এও সেই সনাতন ব্রহ্মের লীলা। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের লীলা, ব্রহ্ম হিসাবে তিনি স্থিতি; সত্ত্ব-রজ-তমের নিষ্ক্রিয় সাম্যাবস্থা নিরাকার নির্গুণ, নিরবয়বহীন অবিশেষ সত্তা। জগৎ হিসাবে মায়া হিসাবে তিনি গতি—সত্ত্ব-রজ-তমের সক্রিয় অবস্থা সগুণ, সাকার, পরিবর্তন ও পরিণামশীল সত্তা। সমন্বয়বাদী বলেন—যিনি জড় তিনিই চেতন, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার, যিনি জীব তিনিই পরমাত্মা, অনিত্য বলে যাকে ভাবছি তা নিত্যের লীলা—অবিচ্ছেদ্য সত্তা। সুধী শরৎকুমার, সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ খাঁটি অবধূত, খাঁটি সমন্বয়বাদী।

গীতা বলেন—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্য-সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। ৫।৩

হে বীর, যিনি কাহাকেও ঈর্ষা বা দ্বেষ করেন না, কোন কিছু কামনা করেন না, যিনি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখ দুঃখে সমভাবে বীতরাগ, তাঁহাকে 'নিত্য সন্ন্যাসী' বলিয়া জানিবে। তিনি সুখে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

অনাশ্রিত কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিঃ চাক্রিয়ঃ। ৬।১

কর্মফল আশ্রয় বা কামনা না করিয়া যিনি কার্য অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী তিনিই যোগী। পরন্তু যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদান প্রভৃতি বৈদিক কর্ম বা গৃহস্থ-জনোচিত দান পূজা প্রভৃতি কর্ম ত্যাগ করে যিনি অক্রিয় বা কর্মহীন হয়ে বসে আছেন তিনি সন্ন্যাসী নহেন।

অধ্যাত্ম-জীবনে অগ্রগতির পথে সন্ন্যাস একটি উচ্চ মানসিক অবস্থা। যখন সাধকের ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, স্বার্থ-গ্রহণের লোভ থাকে না, তখন তাঁর আত্মত্যাগ-সন্ন্যাস, খাঁটি সন্ন্যাস হয়েছে বুঝতে হবে। বিরজা হোম ও আত্মশ্রাদ্ধ করে যে নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসগ্রহণ, তা এই আত্মত্যাগ-সন্ন্যাসে উন্নীত হওয়ার জন্য অভ্যাস যোগের সাধনা। বিধিপূর্বক সচেষ্ট হওয়ার ব্রতে অভিষেক বা দীক্ষা। সন্ন্যাসের পরিপক্ক অবস্থায় যখন সব সংস্কার খসে পড়ে তাকে বলে অবধূত অবস্থা। অবধূত যখন নীলকণ্ঠ হন, সর্বজনের দুঃখহরণ হন তখন তিনি পুরুষোত্তম। শরৎ কুমার ছিলেন খাঁটি পুরুষোত্তমানন্দ।

কাম, প্রেম ও অনাসক্ত ভোগ সমন্বয়—

শ্রীনিত্যগোপাল বললেন "নিত্য অনিত্যের সমন্বয়—দ্বৈত অদ্বৈত সমন্বয়" পর্যন্ত। নাম করে করে আর কত বলবেন, শেষ বললেন 'সর্বসমন্বয়'। রামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যেমন বিবেকানন্দকে বোঝান যায় না, শ্রীনিত্য-গোপালকে বাদ দিয়ে পুরুষোত্তমানন্দকে বোঝান যায় না। শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয়-দর্শনের প্রচার ও প্রকাশ রূপ হচ্ছেন পুরুষোত্তমানন্দ। যত কিছু সমন্বয়ের কথা আমরা বলিনা কেন, মোটামুটি সব আমরা মেনে নিই বুদ্ধি বিচারের কষ্টিপাথরে কষে। কিন্তু কাম ও প্রেমের সমন্বয়, কাম প্রেম ও অনাসক্ত ভোগের সমন্বয়—এ বোঝা বড় শক্ত। শরৎকুমারকে নিজের জীবন আদর্শ দিয়ে বোঝাতে হয়েছে—এখানেও সমন্বয় আছে।

এই সমন্বয়ের আদর্শ প্রাচীন ভারত থেকেই আছে। গোপালতাপনী গ্রন্থে এর একটা সুন্দর কাহিনী আছে। বৃন্দাবনে গোপীগণ ইচ্ছা করলেন মহাতপা ঋষি দুর্বাসাকে উত্তম ভোজ্যাদিদ্বারা সেবা করবেন। তিনি যমুনার পরপারে আছেন। প্রত্যুষে নিত্যে নদীতীরে এসে তাঁরা দেখলেন নদীতে প্রবল স্রোত, না আছে নৌকা না আছে মাঝি। বিপন্না গোপীরা কৃষ্ণকে বললেন "কি উপায়

মাধব"? ঠাকুর বললেন, জালিজীকে গিয়ে বল, "হে যমুনে, যদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হন তুমি আমাদের পায়ের পথ করে দাও"। গোপীগণ তাই করলেন। বিস্ময়বিষ্ট হয়ে দেখলেন—স্রোত মন্থীভূত হয়েছে, নিচে অগভীর জলে বালুচর দেখা যাচ্ছে। তাঁরা পায়ে হেঁটেই নদী পার হয়ে গেলেন। গোপীরা তীরে উঠলেন, নদী আবার পূর্ববৎ বইলেন। সেবার পরিচয়ই দুর্বাশাকে বললেন গোপীরা, "তরঙ্গসঙ্কুল যমুনা আমরা কেমন করে পার হব"? ঋষি বললেন—"তাঁকে গিয়ে বল দুর্বাশা যদি কোনদিন কিছু আহার না করে থাকেন, হে যমুনে, তুমি আমাদের পথ করে দাও"। যমুনাকে এই কথা বলায় তিনি পূর্ববৎ পারে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিলেন। নদী পারাপার হওয়া গেল। কিন্তু সমস্যা ত মিটল না। শ্রীমতী প্রমুখ গোপীরা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন দুর্বাশাকে—"ঋষি, শ্রীকৃষ্ণ কেমন ব্রহ্মচারী আর আপনি কেমন নিরাহারী আমরা বুঝতে পারলাম না, আপনি এই সমস্যার নিরসন করুন"। দুর্বাশা বললেন—"যারা কামের যারা (১) কাম (২) কামনা করে তারা কামী (৩) আর যারা অকামযারা (৪) কাম (৫) কামনা করে তারা অকামী (৬)। শরৎকুমার ছিলেন এমনি অকামী মানুষ।

উমাশিশী ও শরৎকুমারের মধ্যে ছিল সুগভীর প্রেম। কিন্তু সে প্রেম ছিল জগৎ প্রেমের মহা প্রেমের অঙ্গ। তাঁদের সন্তান সন্ততি ছিল। স্বামীর নিষ্করুণ দারিদ্র্যের জন্য স্ত্রী কোন দিন অভিযোগ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। এঁদের অনাবিল স্বাস্থ্যকর প্রেম অনেকের কাছেই সুগভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আকর্ষণ করে। শরৎকুমার সন্ন্যাস নিয়ে যখন বৃন্দাবন থেকে ফিরলেন, সুপ্রসিদ্ধ চারণ কবি মুকুন্দদাস তাঁকে বলেছিলেন—"তোমার লাল কাপড় আমি খুলে দেবো, কোন্ দোষে তুমি বৌদিকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হলে"? শরৎকুমার বলেছিলেন, "সন্ন্যাসী হয়ে আমি ত তোমার বৌদিকে ছাড়ি নি"। একথা বলে শরৎকুমার যেন আর সত্য বলেছিলেন। তিনি ছিলেন সাধু নাগ মহাশয়ের মত, লাহিড়ী মহাশয়ের মত সংসারে সন্ন্যাসী—অনাসক্ত যোগের ভিত্তিতে। একথা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সবাই জানতেন শরৎবাবু সন্ন্যাস নিয়ে পুরুষোত্তমানন্দ হয়েছেন শুনে মহাত্মাজী বলেছিলেন, "শরৎবাবু থেকে বেশী কি সন্ন্যাসী হলেন? আগে কি কিছু কম সন্ন্যাসী ছিলেন"।

বস্তুতঃ তিনি যখন সন্ন্যাসের দিক্ষা তখন বেহুঁসে তাঁর যৌন জীবন ছিল। কিন্তু তা ছিল মহাজীবন ও মহাপ্রেমের ভিত্তিতে। স্ত্রীকে লেখা তাঁর একখানা পত্র থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি করছি—তাতে বোঝা যাবে তিনি কত বড় বৈরাগী প্রেমিক।

'আমরা ত একটা কামের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হই নাই।...স্থির জানিও যেদিন আমি সকলের বন্ধু হইব, সেইদিনই আমি প্রকৃতপক্ষে তোমার হইলাম,...জগৎকে যে না ভালবাসে সে কি কখন নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে?...শুধু তোমাকে ভালবাসা মোহ, জগৎকে ভালবাসিতে ভালবাসিতে তোমাকে ভালবাসার নাম প্রেম। যতখানি জগৎকে ভাল চক্ষে দেখিয়াছি, তোমাকে ততখানি প্রকৃত সুন্দর দেখিয়াছি।...যতটুকু জগতের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া ভালবাসিতে পারিয়াছি, তোমার সঙ্গেও ততটুকু পারিয়াছি, ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহার নাম মোহ।...তুমি, জগবান ও জগৎ এমনভাবে যুক্ত যে একটাকে বাদ দিয়া অপরটাকে ভালবাসিতে গেলে উহা ভালবাসা না হইয়া মোহ হইয়া যায়। একটাতে আটকাইয়া থাকিবার নাম মোহ, আবার শ্রীভগবানে আটকাইয়া থাকিবার নাম প্রেম। কারে জীব কোন একটা বিশেষ বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া থাকে, কারণ কাম স্বার্থযুক্ত, আর প্রেম বৈরাগী, স্বার্থশূন্য—কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে আসক্ত না করাইয়া

---

(১) আত্মসুখ ইচ্ছা করিয়া (২) নারী সাহচর্য (৩) বাসনা তৃপ্তির জন্য কামী (৪) নিজের জন্য সুখভোগের অভিলাষ না রাখিয়া (৫) অনুরাগী জনের সহিত মিলন (৬) বৈরাগ্যবান।

শ্রীভগবানের চিন্তায় দিয়া জগতের সঙ্গে মিলন করার আগে স্বামীকে জগতের কাছে অর্পণ কর, পরে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ কর। যে দিন জগৎ আমাকে আঘাত করিবে সেই দিনই আমি তোমার বুকে অমর হইয়া বিহার করিব, নচেৎ স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হইতেই হইবে।...জীবনে মরণে আমি তোমাকে ভুলিব না। তুমি যে আমার সাধনার মূর্তি, আমি তোমাকে দিয়াই নিত্যগোপালকে পাইতেছি এবং পাইব।"

এ যুগের সমন্বয়বাদ

সমন্বয়বাদ অতি প্রাচীন দার্শনিক তত্ত্ব। চণ্ডীতে জগন্মাতা বলছেন, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"। সকল সম্প্রদায়ের তত্ত্ব সকল তীর্থ ভ্রমণ এবং কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন সাম্প্রদায়িক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা মাত্র। বেদ, উপনিষদ, গীতা ও চণ্ডী সকল সম্প্রদায়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত। এ যুগে সমন্বয়বাদের প্রথম প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বললেন—যত মত তত পথ। সব ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য একই। সেখানে কেহ নাই দ্বন্দ্ব নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন মহাত্মা শ্রীনিত্যগোপাল। সমন্বয়বাদের পথের অন্বেষী তিনি ছিলেন। তাঁর দর্শনে বিপরীতের সমন্বয়। পেঁচামি-মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে, ছয়টী মত নিয়ে অনুকরণ করতে চেষ্টা করলে দেখা যায় পথও কেহ কারো বিরোধী নয় বরং অখণ্ড সত্যের ধারক। জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্মী কেউ কারো বিরোধী নয়। শুধু ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়—জগতে যা কিছু পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, শ্রীনিত্যগোপাল তার মধ্যেও মিলন ও সমন্বয়ের সূত্র বের করেন। টাকাকড়ি বৈষয়িক ব্যাপার প্রভৃতির পরিচালনা এবং একই সময়ে সমাধিতে সাধনার উচ্চতম ভূমিতে থাকা শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর সমন্বয়ী জীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "টাকাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব"। এতবড় বিরাট শক্তিধর সমন্বয়ী অবধূতের শিষ্য ও উত্তর সাধক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ।

১৩১০ সালের অগ্রহায়ণে শরৎকুমার বিবাহ করেন, ঠিক দুই বৎসর পরে ১৩১২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ তিনি দীক্ষা নিলেন, শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূতের (শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের) কাছে। গুরুর ভাবধারায় অনুবর্তন করে তিনি বুঝতে পারলেন ব্যক্তি সত্তার মধ্যে সমষ্টি সত্তা বর্তমান। একটি সত্তা যদি পীড়িত হয়, ব্যথিত হয়, নিষ্পিষ্ট হয়—সমষ্টি তাতে অনিবার্য হয় দুর্বল হয়। ইংরাজ ভারতবাসীকে পীড়ন করেছে, শাসনের নামে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে—তাতে কেবল যে ভারতবাসী দরিদ্র ও দুর্গত হয়েছে তা নয়—ইংরাজও এই দুর্গতির ভাগ নিতে বাধ্য। তেমনি ঈর্ষা-দগ্ধ প্রতিরোধের মনোবৃত্তি নিয়ে যদি ইংরাজকে আমরা আঘাত করি, সে আঘাত আমাদেরও লাগবে। তাই বার বার কারারুদ্ধ হলেও তিনি ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর রাজনীতি ছিল ধর্ম নীতি—প্রেম ধর্মনীতি—প্রেম ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। শোষণের প্রতিবাদ। এইখানেই তাঁর রাজনীতি ও ধর্মনীতিতে, স্বদেশী ও বিদেশীতে, শাসক ও শাসিতে সমন্বয়। নিকট দূর, স্বজন বিদেশী সকল মানুষের জন্য ছিল তাঁর সীমাহীন প্রেম। তিনি বলেছিলেন, "ভগবানকে অযাচিত করুণায় পাইয়াছি, তাঁহার জন্য বেশী কাঁদি নাই, কাঁদিয়াছি শুধু মানুষ মানুষ করিয়া"।

কমিউনিজম ও সমন্বয়বাদ

পৃথিবীর নবতম ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির সমষ্টি নীতি হচ্ছে কমিউনিজম—বিরাট একটা বলের এই মত। সাম্যবাদ—সব সমান—এই তাদের প্রচারবাণী—classless society শ্রেণীহীন সমাজ। এই শ্রেণীহীন সমাজবাদ প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা ধনিক, শিল্পপতি ও ভূস্বামীদের উপর মারমুখী হয়েছেন। বিগত যুগে এই সব সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর শোষণ ও প্রভুত্ব-পরায়ণতার বিরুদ্ধে ঈর্ষাদগ্ধ প্রতি আক্রমণই শুধু হয়েছে। সংশোধন, সংস্কার বা সমন্বয়ের চেষ্টা এতে নাই। ফলে হয়েছে কি? রাশিয়া ও চীনে যার বাস্তব রূপ হয়েছে, উৎপাদন কম হয়েছে, ভোগ্য পণ্যের দারুণ অভাব গিয়েছে ও আছে। আজ বাংলা দেশেও এই ধরণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিণামে শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে—

সেবাধী সেক্টেছে, চারিদিকে অশান্তি ও বিদ্বেষ। Classless society'র (শ্রেণীহীন সমাজের) ভিগির মুখে রেখে দুর্ভোগের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা পেরে রাশিয়া আজ অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করাও যেখানে নিছক শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হোত, সেখানে গীর্জার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরোপাসনা আর অপরাধ নয়। সমস্ত জমি সরকার বাজেয়াপ্ত ও নিজস্ব করে নিয়েছিল—এখন কৃষকদের ব্যক্তিগত কৃষিসম্পত্তি ভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে। সকল যেখানে ভাগিদে বন্টনা করা হলে গণ্য করা হোত আজ সেখানে বার্ষিক্য, পীড়া, স্বল্প উপার্জনের আয় এবং একটা সীমার মধ্যে পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সঞ্চয় করতে দেওয়া হয়। খাওয়াপরার মানও সবার জন্য এক নয়। অফিসার, ডাক্তার, গবেষক, সরকারী কাজে বিশেষে নিযুক্ত কর্মচারীগণ, উচ্চমানের শিক্ষক ও পরিচালকগণ ও সামরিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজ নিজ যোগ্যতা, পদমর্যাদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন ধাপে অনেক বেশী পারিশ্রমিক পান। Classless society থাকছে কি? পুরাতন class-এর নতুন রূপান্তর ঘটছে মাত্র। নিজে Karl Marx ই বলেছেন, "Man is a born capitalist"। মানুষ জন্মেছে ধনতন্ত্রী হয়ে, সে সঞ্চয় চায়, নিজের যোগ্যতার সমস্ত পাওনাটুকু চায়—পেলে আরো চায়, বঞ্চনাও করতে চায়। পুরুষোত্তম-মানবের সমন্বয়ী ভাষায় mass ও class দুটি মনোবৃত্তি মাত্র। জনপূর্ণ ট্রেনে ওঠবার জন্য যে ব্যক্তি আসনশোলে বলছে—আমিও ত যাব স্যার—খুব জরুরি কাজ, সবার সঙ্গে আমারও একটু জায়গা হোক, সেই বর্দ্ধমানে দরজায় পিঠ চেপে আর একজনকে বলছে—ভিতরে দাঁড়াবার জায়গা নেই মশাই, অন্য গাড়ী দেখুন।

সমন্বয়বাদীর মতে শ্রমিককে তার শ্রমের মর্যাদা ও যোগ্য মজুরি দিতে হবে, কৃষককে ঋণমুক্ত সাধারণ সার্বজনীন comfort বা স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন দিতে হবে। সকল শিশুকে শিক্ষার, চিকিৎসার ও প্রতিযোগিতামূলক উন্নতির সমান সুযোগ দিতে হবে—কিন্তু কেউ যদি অধিকতর যোগ্যতা, কর্মশক্তি, প্রতিভা ও দায়িত্ববহনের জন্য অধিক উপার্জনক্ষম হন সেটা একটা ভদ্র ও সুস্থ সীমার মধ্যে রেখে তাঁদেরও এই উন্নত মানের মর্যাদা দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলেই সুস্থ সমাজ গড়বে না। সম্প্রতি আইন ও গুপ্তচরের এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও রাশিয়ার কয়েক জনের কালোবাজারির জন্য মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। বস্তুতঃ বিশ্বনাগরিকের আদর্শ সমাজের জন্য সমন্বয়ী দর্শনের প্রবক্তা পুরুষোত্তমানন্দ যা বলেছেন—সেইটিই খাঁটি সাম্যবাদ, communism তিনি বলেছেন, "অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করতে হবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—উপনিষদের এই মহাবাণী হতে লোভ করোনা, ধন কারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের।"

সমন্বয়বাদের শেষ কথা

সমন্বয়বাদী এই মহাপুরুষের শেষ কথা জগৎ ঈশ্বরের, ঈশ্বরই জগৎ। তুমি আমি সবাই ঈশ্বরের। বিশ্বজনের সেবার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। 'সেবার মধ্যে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও বিরোধ থাকে না, হিংসা বিদ্বেষ থাকে না।" প্রেমের দ্বারা সব দুঃখ সহজ হয়—"সন্তানের জন্য রাত জাগলে কষ্ট হয় না"। সকল নীতিই ধর্মনীতির অনুগামী হবে। "গান্ধারী বলছেন, সাপে আঙুল কাটলে সে আঙুল যেমন কেটে ফেলতে হয়, মহারাজ, দুর্যোধনকে তেমন কেটে ফেল। কত বড় বীর্য—মায়ের চরিত্রে এত বড় বীর্য থাকে বটে···· মায়ের দৃষ্টিতে অমৃতের আছে যে বৈকারিক ক্ষমতা দুর্যোধনের নাই। তাই যুধিষ্ঠির যখন অমরত্বলাভের উপায় বলে-ছিলেন উলঙ্গ হয়ে মায়ের কাছে যেতে যাতে সর্বাঙ্গে মায়ের দৃষ্টির আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, তখন সে কথা দুর্যোধন শুনতে পারেনি। যুধিষ্ঠির শত্রুকেও ফাঁকি দেবে না, তাই দুর্যোধন ভিন্নে অমর হয় তার সঠিক পথই বলে দেন। কি চমৎকার—যতো ধর্ম স্ততো জয়"। বস্তুতঃ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সব নীতিই হবে ধর্মনীতির অনুগামী। প্রেম, সেবা, অন্তর্যামিতা ও

ভবিষ্যতের সঙ্গে হবে সমন্বয়। সেই সমন্বয়ী সমাজ হবে আদর্শ সমাজ।

আজ অবতার পুরুষোত্তমানন্দের ষষ্টিতম জন্মতিথিতে আমরা এই প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তর প্রেমে পূর্ণ হোক, কর্ম সেবার বল হোক, আমরা পরের প্রতিও অবিচার না করি, আমাদের সকল কর্ম ঈশ্বরে নিবেদিত হোক। আমরা বার বার সেই মহান পুরুষকে প্রণাম করি।

প্রকৃতি ও মানুষ

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

নিমেষে নিঃশেষ করে' মানুষের সব অহঙ্কার
প্রকৃতি রাক্ষসী
নিয়ে গেল কত প্রাণ ; কত সৌধ, কত সাধনার
গড়া জনপদ আর প্রতিভার কত নিদর্শন
শেষ করে দিয়ে গেল। রেখে গেল বিস্তীর্ণ শ্মশান,
আর সেই শ্মশানের বুকে আর্তনাদ—
অগণিত মানুষের।

এ মানুষ কত অসহায়। কত না শক্তির অধীশ্বরী
এ প্রকৃতি—ভীষণা প্রকৃতি !
বারবার ভেঙে দিয়ে সব অভিমান মানুষের,
জানায় সে কত না দুর্বল, কত তুচ্ছ তার অহঙ্কার।
সহস্র বর্ষের গড়া সৃষ্টি তার নিশ্চিহ্ন নিমেষে।

তবু পরাজয় মানে নাক এ মানুষ। শ্মশানের বুকে
গড়ে তোলে সৃষ্টি তার আবার আবার তিলে তিলে।
নতুন উদ্যম নিয়ে ধ্বংসের বুকে
সৃষ্টি করে প্রতিভার নব নিদর্শন।
মানে না সে হার কোনদিন—
কোনদিন মানবে না সে তো।

স্বামিজী স্মরণে

।। জনাব রেজাউল করীম ।।

[২৪শে কার্তিক ১৩৭৫ রবিবারে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের অন্ত্যেষ্টিসভায় সভাপতির ভাষণের সারাংশ]

আজ প্রায় এগার বছর হ'ল স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করে অমর ধামে চলে গেছেন। আজ তাঁর স্মৃতি-সভায় তাঁর আত্মার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। শ্রদ্ধেয় স্বামিজী ছিলেন প্রকৃত কর্মী। কেবল ধ্যান ধারণা নিয়েই তিনি নিজের আত্মার মঙ্গলের জন্য সাধনা করেন নি। তাঁর সাধনা ও বিরাট ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে ছিল একটি অপরূপ কর্মপ্রেরণা। তাঁর ধর্মবোধ গড়ে উঠেছিল জীবের কল্যাণের আদর্শকে আশ্রয় করে। তাই তিনি যেমন ছিলেন জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগী তেমনি ছিলেন কর্মযোগী। ইংরেজিতে যাকে বলে To die in harness—কাজ করতে করতে মৃত্যুবরণ—স্বামিজী ঠিক সেইভাবেই কাজের মধ্যেই আত্ম-বলিদান করেছেন। সে কাজটা কি? সে কাজ ছিল সর্বমানবের কল্যাণের কাজ। তাঁর জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের সমাধিস্থান কলিকাতার মহা-নির্বাণ মঠে একটি আলোচনায় ভাষণ দিবার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং তারপরেই সব শেষ। এইভাবে একজন মহান সাধক, একজন প্রকৃত কর্মযোগী আমাদের মধ্য থেকে অনন্ত ধামে চলে গেলেন। একটি মুটলজ্জল নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে গেল। তিনি যে সব কাজ করেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত অথবা পরিবারগত কাজ নয়। তাঁর সে কাজ জাতি-ধর্মনির্বিশেষে মানব-জাতির সেবা। তিনি নিপীড়িত মানুষের ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি মানবতার এমন আদর্শ স্থাপন করেছেন যে আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে তিনি সর্বমানুষের প্রতিনিধি স্থানীয়। তাঁর অন্তর্ধানে সত্যই বাস্তবিকপক্ষে একজন মহাপুরুষকে হারালো, তবে এই ভেবে মনে আশ্বাস পাই যে স্বামিজী তাঁর নামধেয় নরদেহে আমাদের মধ্যে উপস্থিত নাই সত্য, কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ ও কর্মনীতির মধ্যে, তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

স্বামিজী শুধু বিরাট মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটা বিরাট তত্ত্ব। তাঁর গুরু শ্রীনিত্যগোপাল তাঁকে সমন্বয়ের যে আদর্শ শিক্ষা দেন সেই মহান আদর্শকে তিনি নানাভাবে বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা করেন জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা। বিগত একশ বছরের মধ্যে ভারতে তথা বঙ্গদেশে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ও পরস্পর বিরোধী ভাবধারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। মানুষ একটি আদর্শকে অপর একটি আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট করে দেখতে এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে তাদের মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় সম্ভব এ কথা তারা চিন্তা করতে পারেনি। তদুপরি ছিল সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ইত্যাদি নানা প্রকার বিভেদকারী ভাবধারা। শ্রীনিত্যগোপালের আদর্শ গ্রহণ করে স্বামিজী ভেদবুদ্ধি-কলুষিত এইসব দেখে নানাপ্রকার যুক্তির সাহায্যে সমন্বয়ের তত্ত্বকে রূপ দিতে লাগলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে বিভিন্ন চিন্তাধারা মূলতঃ একই সূত্র থেকে উদ্ভূত ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হল এ যুগের নেতাদের প্রকৃত কাজ। বস্তুতঃ স্বামিজী ছিলেন সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক।

স্বামিজীর সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে তিনি সকল মানুষকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। নারায়ণ জ্ঞানে সকল মানুষকে আপনার আত্মীয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামের সহিত জড়িত নয়। সে আশ্রমের নাম 'নরনারায়ণ' আশ্রম। অর্থাৎ এ এমন

আশ্রয় দেখানে সকল শ্রেণীর নিপীড়িত মানুষ আশ্রয় লাভ করতে পারবে। এই ত চাই এমন sanctuary গড়ে তুলতে হবে যা সকল মানুষের আশ্রয় স্থান হবে, যা করবে সকলের কল্যাণে সত্যই তাঁর নিকট কোন-প্রকার ভারতের ছিলনা। তিনি সকল মানুষের প্রতিনিধি ও আশ্রয় কেন্দ্র।

প্রাচীন গ্রীসের মহাজ্ঞানী দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, যখন দার্শনিক হবেন রাজনীতিবিদ্ আর রাজনীতিবিদ হবেন দার্শনিক, তখনই প্রকৃত নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ কেবল তত্ত্ববিদ্ হলেই চলবে না অথবা কেবল রাজনীতিবিদ্ হলেও চলবে না। এই দুয়ের সমন্বয় চাই। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে পারি যে প্লেটোর আদর্শ অনুসারে স্বামিজী সত্যই সেই ব্যক্তি, কেননা তিনি দর্শন ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। স্বামিজী কোনরূপে দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ তাঁর মতবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পড়লে মুগ্ধ হতে হয়। আবার সেই ব্যক্তিই স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে এসে অকাতরে কারাবরণ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। প্লেটোর আদর্শকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়েছেন। তিনি নিছক ভাবপ্রবণ ছিলেন। দেশ ও সমাজের দুর্বল অংশগুলি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তাই তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে সেগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শকে ও তাঁর স্বরাজের পরিকল্পনাকে স্বামিজী অন্তরের সহিত গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগের অনেক নেতা অহিংসার আদর্শকে রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই অহিংসার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতাও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামিজীর বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি অহিংসাকে কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি অহিংসাকে একটা সত্যকার জীবনদর্শন বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অহিংসার ব্যাখ্যাগুলি পড়লে মুগ্ধ হতে হয়। আজ গান্ধীশতবার্ষিকী উৎসবের বছরে স্বামিজীর সেসব কথা ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা দরকার। বস্তুতঃ স্বামিজীর চিন্তা-ধারার মধ্যে কোন প্রকার ফাঁকি ছিল না। একথা তিনি ভাল করেই জানতেন যে অহিংসার শেষ পরিণতি প্রেম ও ভালবাসা। সাধারণ লোক যাকে শত্রু বলে মনে করে, কোন অহিংসার পূজারী তাকে তা মনে করে না। সে মনে করে খুব জোর তার প্রতিপক্ষ ভুল করছে। অথবা ভুল পথে চলছে। অহিংসার মধ্য দিয়ে তার ভুল সংশোধন করতে হবে—এই হ'ল অহিংসাবাদীর নীতি। স্বামিজীর অহিংসার আদর্শ এত ব্যাপ আগ্রাসনো। তাঁর বিভিন্ন রচনায় ও ভাষণে একটা বিশ্ব-প্রেমের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।

স্বামিজীর বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। ইংরাজি সংস্কৃত বাঙলা ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। ধর্ম রাজনীতি সমাজনীতি এমন কি বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের সহিত তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্যদেশের যে সব বড় বড় পণ্ডিতদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিতেন তাতে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বুঝা যাবে। সংস্কৃত ও বাঙলার ত কথাই নাই। বহু মূল্যবান ব্রহ্মসূত্র-উপনিষদ-গীতা গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করে তিনি দেশের মহদুপকার সাধন করেছেন। তাঁর আর একটা বিশেষ গুণ ছিল। সেটা এই যে তিনি ছিলেন সুবক্তা—বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতায় যেমন থাকত যুক্তি তেমনি থাকত আবেগ। তাঁর আবেগ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা যে শুনেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে।

"আমাদের দেশের বহু সজ্জন ব্যক্তি পার্থিব জীবনের মর্ম ও সার্থকতা বুঝতে পারেননি। তাই তাঁরা মনে করতেন যতশীঘ্র এই জড়ের বন্ধন ছিন্ন করে পরজগতে যেতে পারি, ততই মঙ্গল। এই শ্রেণীর লোকের মনের কথা হচ্ছে—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে"। স্বামিজী এ কথা শুনে বলতেন, না, না, ছেড়ে যাব কেন? এ ত কাপুরুষতা। বরং বলতে হবে "কবে তৃষিত এ মরু সজিয়া তুলিব তোমার রসাল নন্দনে"। সত্যিই স্বার্থপর লোকেরা এ সোনার সংসারকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। প্রকৃত মহৎ ব্যক্তির কাজ হচ্ছে এই মরুকে নন্দনে পরিণত করা। এ কথা সত্য যে স্বামিজী সন্ন্যাসী

ছিলেন। কিন্তু এ সন্ন্যাসী গেরুয়া বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী নয়। তাঁর জীবন-দর্শনে escapism-এর কোন স্থান ছিল না। বরং সংসারে থেকে সংসারের সুখদুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার সঙ্গে সমানভাবে পরিচিত হয়ে সংসারটাকেই উন্নত-জীবনের মহৎ আদর্শ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়ে মহৎ করে তোলা এই ত সাধুজনের জীবনের আসল কাজ। একজন দুজন লোক সংসার ছেড়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু কোটি কোটি নরনারীর কল্যাণের কাজ সে করবে? সুতরাং সংসার ছেড়ে যাওয়া আদর্শ জীবন নয়। এইখানে থেকেই এখানকার সুখদুঃখের অংশভাগী হয়ে নরনারায়ণের সেবা করে যেতে হবে, তাদের দুঃখ দূর করতে হবে। এই দিক দিয়ে স্বামিজী এ যুগের একজন আদর্শ মানুষ।

স্বামিজী প্রায় বলতেন "চাই একটা বিপ্লব" ভারতীয় দর্শনে, চিন্তায়, কাজে কর্মে ধ্যানে ও ধারণায় চাই একটা আমূল পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। তা না হলে দেশ-সেবাই বল, আর অধ্যাত্ম-সাধনাই বল কিছুই হবে না। তাঁর এই উক্তিটি যে কত মূল্যবান তা প্রত্যেককে সমাকভাবে উপলব্ধি করতে বলি। বস্তুতঃ স্বামিজী আধ্যাত্মিকতা ও ঐহিকতা এই দুয়ের সমন্বয় চেয়েছিলেন এবং সারাজীবন তারই সাধনা করেছিলেন। তাই সন্ন্যাসী হয়েও তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী, সংগঠনকারী এই বিংশ শতাব্দীতে যখন জড়বাদী সভ্যতা মানুষকে গ্রাস করতে উদ্যত তখন তিনি সেই ধ্বংসের সম্মুখে এমন একটি আদর্শের কথা বলেন যা বিভ্রান্ত মানুষকে পথের সন্ধান বলে দিতে পারবে আজ এই পুণ্য সভায় জনদরদী মানব প্রেমিক মহান সংঘকের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সমগ্রতার সাধনা

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

প্রায় উনিশ বছর আগেকার কথা। কালিঘাটে শ্রিল গোলাম মহম্মদ রোডের একটি বাড়ীতে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে আমি আধুনিক কবিতা পড়ে' শোনা-ছিলাম। আমি পড়ছিলাম প্রেমেন্দ্র মিত্র'র কবিতা

—"মানুষের মানে চাই
গোটা মানুষের মানে"

স্বামীজী উঠে বসলেন। বললেন, আবার পড়ো। আমি পড়ে' গেলাম। তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—আমার কথাও তাই। আমি যে মানুষের মধ্যে সেই মানুষকে খুঁজছি যে পূর্ণ, যে পুরুষোত্তম।

স্বামীজী সেদিন যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলি উদ্ধৃত করতে পারলো না, কিন্তু তার তাৎপর্য আমার মনে আছে। তাঁর মনে সবচেয়ে বড় যে দুঃখ প্রতিমুহূর্তে লক্ষিত হ'ত তা' হ'ল—মানুষ আজ সন্ধান ভুলে যাচ্ছে। সে জানতে চায়না জীবনের কি অর্থ। খণ্ডিত বোধের আত্মতৃপ্ত ধারণা থেকে পুরুষোত্তম পূর্ণের আদর্শ আজ অনেক দূরে সরে গেছে।

হঠাৎ একটি চিন্তাশীল মনের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পেলাম। গেরুয়ার বহিরাবরণ যাকে আড়াল করে রেখেছিল তাঁর মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় যেন পলকে মুক্ত হ'য়ে গেল।

সাহিত্যের রূপ ও গতি সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু সে ধারণার রূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হ'লে স্বামীজীর ব্যক্তিগত পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করা দরকার।

প্রথম জীবনে তিনি লেখক।

দেশের ও মানুষের। দেশের প্রকৃতির উৎস কি? না, ভালোবাসা। মানুষের প্রতি অহেতুক ভালোবাসা। বলা-বাহুল্য এই ভালোবাসার মধ্যে একটি সক্রিয় ও শক্তিমান হৃদয় ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ যে পরিবেশ ও গণ্ডির ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, মানুষকে সেই পরিবেশ ও চিন্তার সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে হ'বে। ব্যক্তিমানব সমাজ-মানবকে অনুসরণ করবে, জাতীয়তাবোধ বিশ্বজনীনতায় রূপান্তরিত হ'বে। মানুষ বিশ্ব-মানুষ হবে।

বস্তুতঃ জীবনের এই সঙ্কোচন ও রৌগলিক সঙ্কীর্ণতা ছেদ করে' অমৃত হবার সাধনা তার চিরদিনের। অথচ মানুষকে তার পরিবেশ মেনে নিয়েই চলতে হয়। আত্মার অমূর্ত চিন্ত' abstract মনে হবে যদি মানুষের মনে তার দৈহিক অস্তিত্বের ধারণা না থাকে অন্যদিকে দৈহিক অস্তিত্বের চিন্তাতেই যে আছে, সে আজন্ম বুদ্ধি; সে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাহীন; গতিহীন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের উক্তি—'এগিয়ে চলো'—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানুষকে এগিয়ে যেতেই হ'বে। শিশুকে হ'তে হবে যৌবনময়; ব্যক্তিকে হ'তে হ'বে বিশ্বময়। কামকে হ'তে হ'বে প্রেম। ক্ষুদ্রতা থেকে হবে বৃহত্তের দিকে অভিযান মৃত্যুময় মানুষ পাবে অমৃতত্বের স্বাদ।

কিন্তু দেহহীন আত্মা যেমন অস্তিত্বের বাইরে, আত্মার অনুভূতিহীন মনও তেমনি নিছক জড় অস্তিত্ব। যা আছে, আর যা হবে আছে এই দুই নিয়েই ত' জীবন। যা পাইনি অথচ যা' না পেলে আমি অসম্পূর্ণ তাকে পাওয়ার সাধনাই ত' জীবন-সাধনা!

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ধারণায় তাই "জীবন একটা সমগ্র বস্তু—এ'র মধ্যে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, সংসার বা সন্ন্যাস প্রভৃতি কোন আলাদা নীতি নেই এবং সমগ্র বস্তু বলেই এ' মন বা বুদ্ধির প্রকাশ দিয়ে চলেনা, এ' চলে এবং একে চালাতে হবে হৃদয় দিয়ে"।

এই হৃদয় বৃত্তির চর্চাতেই সমগ্রতার সাধনা। হৃদয় দিয়েই সেই সমগ্র জীবনের ধারণা। বিজ্ঞান দিয়ে নয়।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কারণ সে আন্দোলনের দুটো রূপ ছিল; যার মধ্যে জীবনের ও কর্মের আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। প্রথমঃ অসহযোগ কার সঙ্গে? না, অত্যাচারীর সঙ্গে। পীড়কের ও শোষকের সঙ্গে। যে নিষ্পীড়িত প্রবঞ্চিত সে নিজেকে বিমুক্ত করবে মানুষে না অর্থহীন, প্রেমহীন, প্রাণহীন পরিচালনা। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে রয়েছে সংঘনীতি। মানুষ একক নয়; সংঘবদ্ধ হ'য়েই সে দাঁড়াবে। কারণ সত্যাগ্রহধান তাকে অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করবে। তৃতীয়তঃ—এ' আন্দোলনের মূল কথা ভালোবাসা। আমরা মুক্তি চাই কারণ মুক্তির আলোকে ছাড়া-ছাড়া' ভালোবাসার মিলন সম্ভব নয়। যে অন্যায় সত্যের প্রতিরোধ করেছে, আমরা সে অন্যায়কে দূর করতে চাই, কিন্তু আমাদের মনে নেই বিদ্বেষ। ভালোবাসা ও মৈত্রীর মঙ্গল-আলোকে যে বন্ধন, তারই মধ্যে আছে মুক্তির মন্ত্র।

আরও আছে। আমাদের সংঘবদ্ধতা সবলের সঙ্গে। এখানে কোন বৈষম্য নেই। রক্তকরবীর রাজাকেও নন্দিনী বলে টেনেছিলো। যে নিপীড়ক তাকে সঙ্গে নিয়েই তার নীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়বো।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ধ্যানরূপ হ'ল শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ জীবনের চিন্তায় ও কর্মের মিলনরূপ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সেই পুরুষ যাঁর মধ্যে একদিকে বিশ্বরূপ, অন্যদিকে ঘুঁটের উন্মাদনা। তিনি জগতের অতীতে অথচ জগন্ময়। পুরুষোত্তমানন্দও বললেন, আমরা স্থিতিকে মানি, কিন্তু গতিহীন হ'তে চাইনা। আমরা সৎকে জানবো কিন্তু স্থাণু হ'য়ে থাকবো না। আমরা জীবনকে প্রেমময় করবো কারণ প্রেমে একই সঙ্গে কাম অর্থাৎ উপভোগ এবং ত্যাগ অর্থাৎ উত্তরণ।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবশ্য তাই অস্বীকার করেছেন কোন বন্ধনকে। জাতির বন্ধন না, সমাজ বন্ধন না, এমন কি ধর্মের বন্ধনও না। অথচ তিনি সকল বন্ধনকেই অতিয়ে নিয়েছেন। তিনি পরিবেশ বা আবেষ্টনের মধ্যে মিশে গিয়ে নতুন হ'য়ে উঠতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—"পুরুষ ও আবেষ্টন পরস্পর পরস্পরকে ভাবনা করিবে। ভাবনা করা অর্থ সৃষ্টি করা।"

জীবনকে সমগ্রভাবে জানা ও পাওয়ার এই সাধনাই

তিনি সাহিত্যে প্রতিফলিত হ'তে দিতে চান। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাই গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠেছেন। মুক্ত ও উদার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন জীবনের বিভিন্ন দিক। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার যে প্রেমোপভোগ নিয়ে ভাগবত গড়ে উঠেছে স্বামীজি তাকেই ধরেছেন আদর্শ করে'। বলেছেন পরম আনন্দানুভূতি থেকেই আদীম উপলব্ধির আভাস। শ্রীরাধা তাঁর কাছে ধ্বনিত মানবাত্মার প্রতীক।

মানুষ যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলেছে—অনন্তের দিকে। পথ যদি অনন্ত না হ'তো তবে সে অনেক আগেই ফুরিয়ে যেতো। অনেক দুঃখ ও কৃচ্ছ্রতার পথ ভেঙে তার যাত্রা। পৌঁছনোটা বড় কথা নয়,

"আনন্দে আজ এক হ'ল তার
পৌঁছান আর চলা"

মুহূর্তের মধ্য দিয়ে অনন্তকে জানা এবং ক্ষুদ্রতার মধ্যে বৃহৎকে আস্বাদন করা, প্রকৃতির মধ্যে পরাশক্তিকে দেখতে পাওয়া, দুঃখ ও অমঙ্গলের মধ্যেও সফলতা ও প্রেমের স্পর্শকে অনুভব করা এই হ'ল তাঁর সাধনা। কারণ সকল কিছুর মধ্যেও রয়েছে অন্তর্যামী, গুণহীন, রূপহীন, বিশ্বাত্মা যিনি মুহূর্ত, ধ্বনি ও রূপের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে যুগ যুগ ধরে' শুধু নিজেকে সন্ধান করে' চলেছেন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ : ৮৬তম জন্মদিন

॥ শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ॥

আজ আবার সেই দিনটী সমাগত যে দিনটীতে বিশ্বের এমন একজন মানুষ বাংলার পল্লীগ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন যে মানুষের ভিতরে ছিল এক অপূর্ব্ব সত্তা, পুরুষোত্তম-সত্তা। সেই পুরুষোত্তমময় মানুষটি আমার জীবনের আচার্য্যদেব, আমার পথ-প্রদর্শক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে আমার সকল সত্তা দিয়ে বার বার সহস্রবার প্রণাম জানাই, আর প্রণাম জানাই পুরুষোত্তম তত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান শ্রীনিত্যগোপালদেবকে যাঁর কৃপা-আলোকে পুরুষোত্তমানন্দ নিজের স্বরূপ সত্তা দেখতে পেয়েছিলেন, আচরণ করে গেছেন পুরুষোত্তম-জীবন, প্রচার করে গেছেন পুরুষোত্তম-দর্শন। তাঁরই সমাধিস্থল এই নরনারায়ণ আশ্রম তাঁদেরকেই বুকে ধরে বড় আশা করে বসে আছে বিশ্বান্ত মানুষের কাছে তাঁর দর্শন পৌঁছে দেবার জন্য।

পুরুষোত্তমানন্দ কেন এলেন যখন ভাবতে বসি তখন এইটুকু অন্ততঃ বুঝি যে আমাদের মত শুধু খাওয়া পরা, সুখে থাকার চেষ্টা বা নাকি সাধারণ মানুষের কাম্য তা ত তাঁর জীবনে একেবারেও ছিল না। চির ফকির পুরুষোত্তমানন্দ একদিনের জন্যও ভাল খান নাই, ভাল পরেন নাই—নিজের বলতে যা কিছু দেশের সেবায় উৎসর্গ করে গান্ধীজির আন্দোলনকে লক্ষ্য করে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। সেদিনের পরম ঘোষের শুধু কণ্ঠের গর্জ্জনে ব্রিটীশ সরকার কম্পিত হয়েছিল, ভারতবাসী আশ্বস্ত হয়েছিল এমন একজন দরদী বীরকে পেয়ে। সাহিত্যের বেদনার নিভৃতস্থানকে তাঁর হৃদয় দেখতে পেত, সেই বেদনাকে দূর করবার জন্য পুরুষোত্তমানন্দের ছিল প্রাণ-স্পর্শী তীব্র প্রতিবাদ। ব্রিটীশ সরকার এই মানুষটীকে কত বার কারারুদ্ধ করেছিল—কিন্তু স্বরাজ সংগ্রামী, স্বরাজ-তপস্বী পুরুষোত্তমানন্দের স্বরাজ-সাধনা কারাগারেও আবদ্ধ রইল না। কারাগারের ভেতরেই তিনি মানুষের জন্য নতুন আলোকের পথের সন্ধান দিতে লাগলেন—গীতা উপনিষদের নতুন ভাষ্য রচনা করে চিন্তা-জগতে এক নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব যে সর্ব্ব, সমন্বয়ের বারতা নিয়ে এসেছিলেন, সেই সর্ব্ব সমন্বয়-দর্শন

পুরুষোত্তমানন্দ নিজ জীবনে আচরণ করে বিশ্বের কাছে প্রকাশিত করে গেলেন। কোনো প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীনিত্যগোপালদেবকে লক্ষ্য করে বিশ্বাসের কাছে বলেছিলেন "টাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব"। এমন এক সময় ছিল যখন অর্থের কোন মূল্য স্বীকার না করেও শুধু ব্রহ্ম-মূল্যেই সব কিছু মীমাংসা চলত। তাই প্রতিক্রিয়ার রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ চারদিকে অর্থ-মূল্য, বাস্তবের মূল্য ব্রহ্ম-মূল্যের, আদর্শের মূল্যের গলা টিপে ধরেছে। আজ আদর্শ পদদলিত তাই বুঝি পরমহংসদেব সেই মানুষটীকে জগতের সামনে প্রকাশিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন—যাঁর কাছে অর্থ এবং ব্রহ্ম সম মূল্যে মূল্যবান, আজ যাঁর অমৃত-কথা বিশ্বের একমাত্র বাঁচার কথা। অর্থকে, বাস্তবকে ব্রহ্মমূল্যে না দেখলে সেই অর্থই মানুষের মৃত্যু এনে দেয়। আবার বাস্তবহীন ব্রহ্মমূল্য শুধুই ভাবুকতা মাত্র। আমরা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের অপূর্ণিত ভাবণের মধ্য দিয়ে তাঁর বাস্তব সত্যতা উপলব্ধি করছি। তাঁর এই অপূর্ণিত ভাবণের কেতরে মানুষের পথ-চলার পথের রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এই ছন্দের কথা, এই সহজ ছন্দের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারছি না। নিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দের এই অপূর্ব দর্শন মানুষের কাছে উপস্থিত করবার জন্য মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে পরিচিত নরনারায়ণ আশ্রম তাঁদেরই চরণ তলে বসে আছে। সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ, কর্মিন পুরুষোত্তমানন্দ আর দশজনের মত গুরুগিরি করেন নাই, গুরুগিরি তাঁর পেশা ছিল না। তাঁর পেশা মানুষকে ভালবাসায়, তাঁর পেশা ছিল বেদনাতুরকে কোলে তুলে নেবার। তাই তাঁর আজ শিষ্য-বলও নাই। আমার মত দু চার জন যারা নাকি সর্বহারা, এমন কি স্নেহ-বলও হারা তাঁরাই স্বামীজির কৃপা পেয়েছিলেন। আজ তাঁরই জন্ম-বাসরে বেদনার সঙ্গে বলছি এই যে অপূর্ব মানুষটীর কাছে আসবার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম তাঁকে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে তুলে ধরতে পারছি না—এ যে আমাদের মৃত্যুতুল্য। সাধারণত দেখা যায় আমরা কোন সুন্দর জিনিস দেখলেই আর পাঁচ জনকে তা না দেখাতে পারলে আনন্দ পাই না। এই যে সুন্দর মানুষটীকে দেখলাম তা আর পাঁচজনকে দেখাতে না পেরে অন্তর বেদনায় ভরে উঠেছে।

দুই সংসারী পুরুষোত্তমানন্দ, দুই প্রেমিক পুরুষোত্তমানন্দ, দুই সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ, দুই সাধক পুরুষোত্তমানন্দ, দুই সমাজ-সংস্কারক পুরুষোত্তমানন্দ, দুই সত্যাগ্রহী পুরুষোত্তমানন্দ ধর্ম-জগতে, সমাজ-জগতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করলেন। মধ্যযুগীয় সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব সীমাহীন কুসংস্কারের চাপে ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে লাগল। মানুষ পৃথিবীকে মরীচিকা আখ্যা দিয়ে গোলোক বৈকুণ্ঠের ধ্যানই জীবনের একমাত্র করণীয় বলে বেশ কিছুদিন চলতে লাগল। কর্ম-জীবন হল মানুষের কাছে হেয়। যার ফল আমরা আজ পদে পদে ভোগ করছি। দীর্ঘ শতাব্দী পরের জুতো মাথায় বহন করেছি, শোষিত হয়েছি, লাঞ্ছিত হয়েছি, সত্য শ্যামলা ভারতবর্ষ আজ ভিখারী ভারতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য আজ আমাদের পরের জুতো বইতে হয়না বটে, বাইরের দিক থেকে আমরা বিদেশী শাসন-মুক্ত হয়েছি। কিন্তু স্বাধীন হয়েও কি আমরা সুখ হয়েছি? আমরা কি শোষণ ও লাঞ্ছনার থেকে মুক্তি পেয়েছি? আমরা আজ নিজেদের নিজেরা শোষণ করছি। আমাদের আজ পরিবারে পরিবারে দ্বন্দ্ব, সমাজে দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব—কোথায় দ্বন্দ্ব নেই? সর্বহারা মানুষের বেদনার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিজম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশ্বন্দ্য মার্কস্ মানুষের এই বাস্তব বেদনার মূল্য দিয়ে সাম্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করে গেলেন। যে জড় জগৎ ছিল এতদিন হেয়, তাকে তিনি সম্মান দান করে নিজে ধন্য হলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই দর্শনের ভিত্তিতেও মানুষ সুখ হল না, মানুষ এই জড়েরও অতি সম্মান দিয়ে একান্ত জড়-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে, আমরা হয়ে গেছি জড়ের হাতে পুতুল। একান্ত জড়-দর্শনের চাপে আত্ম-দর্শন আজ বিলুপ্ত। সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান সত্ত্বেও মানুষের সত্যতা আজ অংশের সমুখীন। এলেন শ্রীনিত্যগোপাল, তিনি রেখে গেলেন জড়-অজড় সমন্বয়ের ধারণা।

তিনি মার্কসের চেয়ে আরও ব্যাপকতর কথা বলে গেলেন, যা নাকি মানুষের জীবনের শেষ সমাধান দিতে পারে। তিনি ব্রহ্ম এবং মায়ার নিজ নিজ সত্য মূল্য স্বীকার করে রেখে গেলেন সর্বা সমন্বয়ের দর্শন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাই-ই নিজ জীবনে ব্যাখ্যা করে গেলেন, আচরণ করে গেলেন জীবনে সর্ব-সমন্বয়ের চলার ছন্দ শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তমরূপই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান। সাম্যবাদই ছিল পুরুষোত্তমানন্দের সকল ক্ষেত্রের মূল নীতি। তাই তিনি কার্ল মার্কসকে স্বীকার করেও আরও ব্যাপক ও গভীর কথা মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই তাঁর সাম্যবাদের ঘনীভূত মূর্তি। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ is the Communist of all Communists। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধনপত্রিকায় শ্রীমৎ স্বামীজির লেখা "ভারতের মাটীতে মার্কসীয় দর্শন" আজ অনেক দিশেহারাকেই পথ দেখাবে।

সাম্যবাদী পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে দেখেছি কি ধর্ম জীবনে, কি পরিবার জীবনে, কি রাষ্ট্র জীবনে কী অমৃত অখণ্ডতা। আমরা রাজনীতি করতে গেলে পারিবারিক জীবনে সামঞ্জস্য রাখতে পারিনা, ধর্মজীবন যাপন করতে জগৎকে অস্বীকার করে ব্রহ্মকেই ছোট বড় করে ফেলি। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী হয়েও পুত্রকন্যার দুঃখে যেমন কেঁদেছেন, তেমনি কাঁদতেন বিশ্বের মানুষের দুর্দশায়। দেখেছি অপরিচিতা পুত্র-শোকাতুরা মায়ের কান্নায় সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দের আকুল কান্না! দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর সান্নিধ্যে যারাই এসেছে, তাদের সাংসারিক সুখ দুঃখের খবর নেওয়া, দুঃখ সমাধানের উপায়ের পরামর্শ দেওয়া যেন্নাতিবিৎ পুরুষোত্তমানন্দের কোনও দিনও ভুল হত না। তিনি বলতেন "আমি দেবতা চাই নাই, চাই মাটীর মানুষে পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠা। আমি গোলোক বৈকুণ্ঠের চেয়ে ধরাকেই ভালবাসি। গোলোক বৈকুণ্ঠের দেব দেবীর চেয়ে ধরার শোকতাপক্লিষ্ট মানুষই আমার ধ্যেয়। তোমরা বিশ্বের সঙ্গে সম দুঃখী হও, বিশ্ব শান্ত হোক, তোমরা শান্ত হও"। শ্রীনিতাগোপালের বাণী "আমি বিশ্ব-নাগরিক, এই বিশ্বই আমার মহামঠ" শ্রীনিতাগোপালের যোগ্য শিষ্য স্বামীজি বিশ্ব-নাগরিক জীবন যাপন করে এই সচা গলা বিশ্বকেই মহামঠ রূপে আস্বাদন করে গেছেন। তিনি জগতের ওপারে জগতের নাথকে ধ্যান করেন নি। তাই তিনি গাইতেন "তবে এ তৃষিত মরু পড়িয়া তুলিব তোমারই বরণে নন্দনে"।

তাঁর বিরাট জীবনের অনন্ত অমৃতময় কথা। আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে তাঁর সবখানি কথা ভাষায় প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। এক-জগৎ রচনায় যে আহ্বান আজ বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করছে তারই দার্শনিক ভিত্তিভূমি শ্রীনিতাগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ ভারতের মাটীতে রেখে গেছেন। আজ বিশ্বের কাছে এই চিন্তাধারা তুলে ধরতে পারলে বিশ্ব স্থিত হবে, সুস্থ হবে।

আজকের দিনে যারা তাঁর এই সমাধি স্থানে এসেছেন, যারা তাঁকে ভালবাসেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, নরনারায়ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের কাছে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ আহ্বান জানাই, আপনারা তাঁর লেখাগুলো পড়ে দেখুন তিনি আজকের ধ্বংসোন্মুখ বিশ্বের রক্ষার জন্য কী আলোক-বর্তিকা রেখে গেছেন।

আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পুণ্য জন্ম স্মৃতি-বাসরে তাঁরই শ্রীচরণতলে সকলে মিলে এই প্রার্থনাই জানাই—তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্বের মানুষকে ব্রহ্ম-মানুষ গড়বার—তাঁর সে স্বপ্ন সার্থক হোক। তিনি সার্থক হোন, জয়যুক্ত হন। তাঁরই ভাষাতে বলি—"ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ, ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি।

কাঠমাণ্ডুতে আটমুণ্ডু

॥ শ্রীমতী গায়ত্রী বসু ॥

"What people Travel for is a mystery" —says T. B. Macauley। সত্যি কেন যে মানুষ বেড়াতে যায় তার ছোট্ট উত্তর সহজে মেলে না। অনেকে অবশ্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বেড়াতে যেমন কোন প্রিয় আত্মীয় দর্শন অথবা পাখির কোন লাভের আশায়। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যারা এঁদের কোনো দলভুক্তই নন তাদের বেলায় কি বলা যাবে? নেশা—হ্যাঁ, তা হয়তো খানিকটা বলা যায়; তবে এই নেশায় হয়তো বা মাদকতা থাকতে পারে কিন্তু উন্মত্ততা নেই—তাতায় কিন্তু মাতায় না—cup that cheers but not inebriate—অনেকটা চায়ের নেশার মত।

এরকম এক নেশায় পেয়ে বসল আমাদের পাঁচজনকে। কোথায় যাই কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে এক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর কথা মনে পড়ল। চিঠি লেখা হোলো যথাসময়ে তারিখ জানিয়ে। চিঠি দিয়ে সন্দেহ হোলো নাও পেতে পারেন, আবার গেল টেলিগ্রাম। ইতিমধ্যে বিশেষ কাজে রওনা হওয়ার তারিখ গেল পিছিয়ে। আবার পত্রাঘাত, পরে টেলিগ্রাম—Programme changed। দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধু ভদ্রলোক চিঠি পেলেন আগে, টেলিগ্রাম পেলেন পরে—এটা অবশ্য তাঁর ও তার বিভাগের কল্যাণে এরকম অদল বদল। ভদ্রলোক ষ্টেশনে আসার জন্য তৈরী হয়েছিলেন কিন্তু টেলিগ্রাম পেয়ে ভাবলেন হয়তো আসছেন না কেউ। বোধহয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন কিন্তু এ সময়ে আবার টেলিফোনে টেলিগ্রামের খবর। ২ তারিখে এসে গেছে ষ্টেশনে সেই পাঁচ যাত্রী। তক্ষুণি ষ্টেশনে যাওয়ার মনস্থ করলেন; কিন্তু অনেক দূরের পথ, আবার এতজনের দায়িত্ব—তার শরীরটা অত্যন্ত দুর্বল—সবেমাত্র ভুগে উঠেছেন, বোধহয় এশিয়ান ফ্লুতে। তাই প্রসাদ গুণলেন—সঙ্গে নিলেন কাজেই আমার রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাবরক্ষক হিসাবে। হিসাবে পটু তাই সর্ব্বদাই তাগাদা করতে ready এবং Prospero-র Arealএর মত দ্রুত আজ্ঞাবহ।

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঁচজন হাওড়া ষ্টেশন থেকে অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করল। দিনটি ছিল শুভবিজয়াদশমী। কি জানি এবার নেপাল যাত্রা কেমন হবে? এ পথে সবাই নতুন। কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে কোনো নির্দ্দেশ নেওয়া নেই। আলো অন্ধকারে যাত্রা মন্দ লাগছে না। যদি সেই শুভাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোককে পাই তাহলে হয়তো কোনো অসুবিধা হবে না।

ট্রেন যথাসময়ে আত্মীয়বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে মন্থর গতিতে প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়ল; তারপর হস্ হস্ শব্দে একে একে লিলুয়া, বালি, বেলুড় ইত্যাদি ছাড়িয়ে চল নর্থ বিহার এক্সপ্রেস। ট্রেনটির আভিজাত্য আছে, কাজেই ছোট ছোট ষ্টেশনকে উপেক্ষা করে চলতে লাগল বৃহতের পানে। এমন সময়ে একই স্লিপিং কোচে কয়েকজন বাঙালী মিলে জটলা পাকালেন এবং স্থির করলেন বিজয়া সম্মিলনী করার। আমরাও এতে পিছিয়ে না থেকে আমাদের সম্মতি জানালাম। ভালই হোলো—সামনে বর্দ্ধমান; ভালো মিষ্টি সীতাভোগ, মিহিদানা কিনে ভালোভাবে কাজ সারা যাবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। অতি উৎসাহে কয়েকজন সহযাত্রী লাফিয়ে নামলেন প্ল্যাটফর্ম্মে ও কিনে আনলেন প্রচুর মিষ্টি। পরে খেতে গিয়ে দেখা গেল সীতাভোগ প্রায় বর্দ্ধমান ভোগে পৌঁছেছে—মনে হোলো চিঁড়ে ভিজিয়ে রসে ফেলেছে—ছানার নাম গন্ধ নেই তাতে। মিষ্টি খেয়ে শিষ্ট হয়ে খানিকক্ষণ গান শোনা গেল। তারপর ঘুম, রাত ৩টে

নাগাদ বারৌনী। হৈ চৈ শুনে ঘুম ভাঙল। আমাদের কয়েকজন সহযাত্রী নেমে গেলেন বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে। তারপর সকাল ৬-১০টা নাগাদ সমস্তিপুর।

আধো জাগা সমস্তিপুরে পৌঁছে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে আবার এক ছোট্ট ট্রেনে উঠতে হবে। ভাবলাম আমরা বোধহয় ট্রেনে প্রথম যাচ্ছি কারণ ট্রেন ছাড়বে ৭-১০টায়। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই কিন্তু তিল ধারণের জায়গা নেই। তবুও দ্বিতীয় ট্রেন নেই; সারাদিনে একটি মাত্র ট্রেন। ওদিককার মানুষকে খুব বেশী ট্রেনে যাতায়াত করতে হয় কারণ ওখানে মোটরজাতীয় গাড়ী যাওয়ার কোনো বড় রাস্তা নেই। যাদের রোজই যাতায়াত করতে হয় তাদের অত টিকিট কাটলে চলে না তাই বিনা টিকিটেই তাদের যেতে হয় এবং প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীও মানলে চলে না। সর্বত্রই তাদের অবাধ গতি, জায়গা পেলেই হোলো, কাজেই ওখানকার মানুষের মতোই আমাদের ছোট্ট একটু স্থান করতে হোলো।

সমস্তিপুর থেকে যারভাঙ্গা হয়ে গাড়ী যাবে রসৌলে। পথ মাত্র কয়েকমাইল কিন্তু গাড়ী অত্যন্ত মন্থরগতিতে বিরক্তি উৎপাদন করে এগোতে লাগল। বিকাল ৫টা নাগাদ রসৌল ষ্টেশনে পৌঁছলাম। ষ্টেশনে কোনো পরিচিত মুখ না দেখে enquiryতে গেলাম। ওখানে ছিলেন একজন বাঙালী ভদ্রলোক। তাঁকে Retiring room এর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। উনি আমাদের ১ খানা ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ফেরার Reservation করতে চাইলাম। উনি Form fillup করে দিতে বলেন এবং Reservation করে দেবেন আশ্বাস দিলেন।

চমৎকার ঘর পেয়ে সারাদিনের ক্লান্তি খানিকটা ভুলে গেলাম। কিন্তু অসময় ক্ষোধের তাড়নায় refreshment roomএ তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করা হোলো। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে দেখা হোলো এক পরিচিত দিদির সাথে। তাঁর কাছে জানলাম আমাদের পাশের ঘরেই আছেন। ভোরবেলা বীরগঞ্জ থেকে বাস ছাড়ে। বীরগঞ্জ নেপাল রাজ্যের প্রথম শহর। বাসের টিকিট আগের থেকে কাটার রীতিই বেশী, না হলে ভালো জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই রস্ করে টিকিটটা কেটে ফেললাম। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান সেরে খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নেওয়ার পালা। সবারই একটা চিন্তা রয়েছে ভোরে আবার রওনা দিতে হবে। পথে ২।৩ জায়গায় কড়া পাহারা। সমস্ত জিনিষপত্র ওলট পালট করে তবে তাঁদের সন্দেহ নিরসন হয়।

সবাই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ মাঝরাতে আমাদের ঘরনেত্রীর নাম কোনো এক পরিচিত গলায়। আমরা দরজা খুলে দেখলাম মূর্তিমান মামা-তাত্রে! আমাদের খুঁজে পাওয়ার adventurous গল্প শুনতে লাগলাম। তখন রাত দুটো। সারারাত ওঁরা জেগে এসেছেন তাই যদি ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিতে পারেন তাই আমরা বেশী কথা না বাড়িয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম। আমরা সবাই ঘুমাবার চেষ্টা করলাম—সবাই সতর্ক কাজেই কেউই ঘুমালাম না।

ঠিক সময়ে উঠে জিনিষপত্র নিয়ে রওনা হলাম। ভারতীয় প্রহরী তেমন কড়া চোখে দেখলেন না। বীরগঞ্জে ঢুকলাম একটা ছোট্ট স্রোত পার হয়ে, তারপর বাসষ্ট্যাণ্ডে গেলাম। বাসের নাম্বার দেখে উঠে বসলাম সুন্দর বাসটিতে। তখন বেশ শিরশিরে ঠাণ্ডা। আমাদের মধ্যে অনেকেই চায়ের সন্ধানে এদিক ওদিক গেলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন খানিকটা চা। চামোষিরা চা পেয়েই খুশী—হোক তা ঠাণ্ডা।

বীরগঞ্জের ঘুম ভাঙছে। কোনো কোনো পুণ্যার্থী আবার স্নান সারছেন রাস্তার পাশের কলে। আবার কোনো কোনো পুরোহিত শ্রেণীর মানুষ হাতে ফুলের ডালা নিয়ে পরদেশীয়দের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানালেন। আমরা অবশ্য বিনিময়ে কিছু দক্ষিণা রাখলাম।

এরপর বাস ছাড়ল রোদের ঝিলিমিলি নিয়ে। প্রথম সূর্যের প্রভাত আলো পড়েছে কতকগুলি তুষারশৃঙ্গে। মনটা খুশীতে নেচে উঠল। মামা আর তাঁরে বসেছে আমাদের সামনের seatএ। পরে এসে আগে বসার জন্য

কৃতিত্ব যাদের, না তাদের, বোঝা গেল না। কিন্তু তুষার-মৌলী থেকে চোখ নামিয়ে যেমনি সামনের দিকে দেখা অমনি দিনের আলো নিভে আসতে লাগল। প্রথমে মুখড়ায়, তারপর অভ্রভিন্দু। অভ্রভিন্দু দেখে আমাদেরও অভ্র আসে বুঝি। ট্রেনে একজন বলেছিলেন বটে ওখানে এখন বারিশ হচ্ছে। মনে মনে প্রার্থনা পেয়ে ভাবছিলাম বোধহয় কাঠমাণ্ডুতে হচ্ছে না বৃষ্টি, কিন্তু যতই বাস এগোয় ততই দেখের ঘনঘটা। তাও তো যেতে হবে। দুখ কালো করে বসে আছি—তাছাড়া তখন সবার সঙ্গে আলাপ হয় নি তাই মাঝে মাঝে খাবার বিনিময় ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিল না।

কিছুদূর এগোনোর পর দেখলাম এয়ারপোর্ট চোখে পড়ল। তখনও দুপাশে সমতল ভূমি। বাংলাদেশের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ মনে হোলো না। তখনও ঘন বন-ভূমির শ্যামলিমা আরম্ভ হয় নি। আরও কিছুদূর এগোনোর পর মামা দেখালেন এখান থেকে Forest area আরম্ভ হোলো। বিভিন্ন জাতীয় গাছপালা দেখতে দেখতে চলেছি হঠাৎ সশব্দে চাকা গেল ফেটে। চাকা বদলাতে হবে। জায়গাটা অবশ্য খুবই সুন্দর। সুন্দরী পার্বত্য নদী বয়ে চলেছে তার শান্ত শীতল রূপ নিয়ে। সুন্দর পাথর খোঁজার জন্য গেলাম নদীর ধারে কিন্তু হরিদ্বারের নীলধারার মত সুন্দর পাথর নেই। কাজেই বিফল মনোরথ হয়ে বাসে ফিরলাম। তখনও টুপটাপ ফোঁটা পড়ছে। বাসে উঠে একটু একটু খেলাম সংরক্ষিত খাবার। বেলা ১১টা নাগাদ একটি পাহাড় ঘেরা মনোরম পরিবেশে বাস আমাদের নামিয়ে দিল। দূরদর্শী মামা বল্লেন জাত খেয়ে নেওয়া যাক্ আর বাস খুব তাড়াতাড়ি থামবে না। সঙ্গে একজন নেপালবাসী সহযাত্রী ছিলেন। মামা তাকে খুব সামাজিক কাজেই তাঁর অধিকার নিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি। তিনি আমাদের একটা ভালো হোটেলে নিয়ে গেলেন। নতুন ঘর কাঠের তৈরী, বেশ সুন্দর তাজা ঘাসের ছাওনি। পরিষ্কার আছে থাওয়া যাই হোক। নিরামিষ, আমিষ দুইই বরাদ্দ হোলো, কিন্তু হোটেলওয়ালা কি আর জানত যে তার দোকানে এত জনের অন্ন মাপান আছে? তাহলে সে তৈরী হয়ে অনেক ভাত রেঁধে রাখত। যাই হোক আমরা খাওয়ার পর ভাত চড়ল। মাংস ভাত দিল—মাংস খেয়ে মনে হোলো বেড়াতে ঘাটে চড়া অবস্থায় খাচ্ছি—তার গায়ের সমস্ত গন্ধটা সংরক্ষিত হয়েছে ঝোলে। ইতিমধ্যে বাস এসেছে। কাজেই হোলো সবটা খেতে হোলো না। হাত ধুয়ে বাসে উঠলাম। তারপর আবার যাত্রা। বাস এবার বেশ উঁচুতে উঠতে আরম্ভ করল এই সময় পথের অপূর্ব সৌন্দর্য চোখে তেমন ঠেকে পড়ল না। তবে বাসের রাস্তা পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত উঠেছে এবং ওখান থেকে নীচের প্রত্যেকটি রাস্তা ধাপে ধাপে নেমেছে দেখা যায়। এটাই এই পথের বিশেষত্ব মনে হোলো। বিকাল ২-৩০টা নাগাদ আমরা পালং এ পৌঁছলাম। ওখানকার চা কেমন তা সবাই আস্বাদন করতে চাইলেন, আরও ঘণ্টা দেড়েক বাকী।

আমরা কোথায় যাচ্ছি—অর্থাৎ উঠব কিছুই জানি না। মামা বাসের সহযাত্রীদের আমাদের কানে আসে নি। কাজেই একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। কাঠমাণ্ডুতে ঢোকার আগেই মামা বাসের পাশের এক বাঙ্গালী দোকানে পেয়ারা কিনলেন। মামার তাড়াতাড়ি মনে পড়ল যে জায়গাটার নাম নানিবেচি। পেয়ারা দেখে বাকইপুরের কথা বুঝি বা মনে পড়ল। তারপর কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছলাম—তখন খুব জোরে বর্ষণ শুরু হয়েছে। মামা বাসে প্রায় সম্পূর্ণ ভিজে জিনিষপত্র সামলে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুলেন Life Insurance Corporation-এর অতিথি শালায়। তখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে এবং ভিজে গিয়ে মনে হচ্ছিল জীবনীমার নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে। সেদিন স্নানহাতের কাজ সেরে সবাই তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নিলাম।

পরের দিন ঘুম ভাঙলে শুনি বর্ষারাণীর নূপুরধ্বনি। মনটা গেল খারাপ হ'য়ে। কোথাও বেরোন নেই। সেদিন দুপুরে এলেন মামা বাসে, সঙ্গে পরিচিত একজন নেপালবাসী বাঙালী, যদিও তিনি নিজেকে নেপালী বলেই পরিচয় দেন। আপনভোলা আত্মপাগলা মানুষটির সাথে

আমাদের প্রথম পরিচয় পাওয়ার সময়। একটু বেশী formal মনে হোলো—এবং এই formalityই বোধ হয় আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। মামা তাঁর সাথে আলাপ করে জেনেছেন যে যদি একবার শুরু হলে মেঘগুলি উপত্যকায় ঢুকে অনেকদিন আটকে থাকে। মনটা আমাদের আরও খারাপ হয়। জানিনা কোন মুহূর্তে আমরা যাত্রা করেছিলাম!

ঠিক হোলো পরের দিন বৃষ্টি না কমলেও আমরা বিকালে বেরুব, কিন্তু ঐ বৃষ্টিতে বেরুলে অসুখ ক'রে পড়তে পারে সেউ সেউ বিশেষতঃ মামার শরীর ভালো নয়। তাই উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। এই দুর্যোগে পড়ে আমার মত নাস্তিকও আস্তিক হ'য়ে উঠল। আমাদের করুণ প্রার্থনা বোধহয় দেবতা শুনলেন। রাতে পাহাড়ের চূড়োগুলি চাঁদের আলোয় স্নান করল, আমাদের মুখেও হাসি ফুটল।

আমরা নামেমাত্র ভ্রমণকারী। A traveller must have a jalcau's eye, an ass's ears, an ape's face, a merchant's wards, a camel's back, a hogs mouth and a stag's legs। কিন্তু আমাদের সবগুলিরই অভাব রয়েছে। তাই আজ লিখতে বসে bancrupt মনে হচ্ছে। সম্বলহীন বেশী না এগুনোই ভালো।

ভালো আবহাওয়া দেখে ভোরেই আমরা পশুপতিনাথ দর্শনে গেলাম। মন্দিরে ঢোকার সময় দেবতার আশীষ বারিরূপে ঝরে পড়ল হালকা এক টুকরো মেঘ, মন্দিরে অবশ্য ভীড়। তবু ফুল নিয়ে পূজা, দেবতাকে কোন খাবার দেওয়ার রীতি দেখলাম না। প্যাগোডা টাইপের বিরাট মন্দির—মন্দির চূড়োগুলো সোনার পাতে মোড়া। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়জিৎ মিত্র এই মন্দির নির্মাণ করেন। পশুপতিনাথের বিগ্রহ আছে—কালো রঙের বিগ্রহ—সোনার চোখ, সোনার মুখোট। মন্ত্র নিজে নিজেই বলে সবাই ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে। একটু আলাদা রকমের পূজো। পুরোহিত আছেন। আশীর্বাদ চাইলে চরণামৃত ও চন্দন দিচ্ছেন তিনি। পাশে অনেক ছোট বড় মন্দির ও বিগ্রহ। সামনেই বিশালকায় gold plating শিবের বাহন শুয়ে আরাম করছে। বাঁ দিকে মহাকালের বিরাট মূর্তি, তার কাছেই ১০৮ শিব বসান আছে একটা গোল কাঠের মধ্যে। এর মধ্যে একবার ঢুকলে সব শিব প্রদক্ষিণ করেই তবে বেরুনো যাবে। প্রবাদ আছে এগুলো গুনলে ১০৮ জন্ম আর জন্মাতে হবে না। আমরা ওখান থেকে নীচে নেমে গেলাম বাগমতী নদী দেখতে। বাগমতীর ধারে বাদশ শিবের মন্দির আছে। সমস্ত মন্দির দেখে আমরা গাড়ীর কাছে ফিরে জানলাম গাড়ীর তেল ফুরিয়ে গেছে। খানিকটা হেঁটে অন্য গাড়ী নিয়ে আমরা বাসায় ফিরলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার বেড়ানো।

বিকালে গাড়ী নিয়ে গোকর্ণ রওনা হলাম। ৪.৫ রাস্তার জীপ প্রায় নৌকোর মত সাঁতার কাটতে কাটতে নিস্তেজ হয়ে গেল। আমরা খানিকটা হেঁটে বৌদ্ধস্তূপ দেখলাম। বিশাল স্তূপ এবং স্তূপের চূড়োয় বুদ্ধের (অবলোকিতেশ্বর) চোখ আঁকা, তারপর অন্য একটা জীপ নিয়ে রওনা হলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সব জন্তুরাই আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত তবুও একপাল হরিণের দর্শন মিলল। আবেশ মাখা চোখ তুলে আমাদের অভ্যর্থনা করল। মামার শরীরটা খারাপ তাই বেশী না ঘুরে বাসায় ফেরার মতলব করলাম। সেদিন ২বার গাড়ীটা বিগ্রাট হওয়ায় জল্পনা কল্পনা চলল কে আমাদের মধ্যে অপয়া। তা কি আর সহজে বের করা যায়?

পরের দিন আমরা বুড়া নীলকণ্ঠ দেখতে গেলাম। পথটা অত্যন্ত খারাপ। ঝাঁকুনীতে আমরা প্রায় শুষ্ক-কণ্ঠ হয়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম এক কৃত্রিম হ্রদের মধ্যে নীলকণ্ঠ নয়, অনন্তশয়নম্ বিষ্ণু মূর্তি। বিরাট সুন্দর মূর্তি—বাসুকীনাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানকার বিশেষত্ব হোলো ঐ মূর্তির অধিকল প্রতিরূপ পাশে থেকে জলে পড়ে। কেন ছাড়া জলে স্পষ্ট দেখা যায় এর ব্যাখ্যা সাধারণবুদ্ধির মানুষ দিতে পারে না। কাছেই পাহাড়ের উপর স্যানাটোরিয়াম। দূরে একটা ঝর্ণার ধারা অপূর্ব দেখায় এখান থেকে।

ফেরার পথে 'বালাজু' গার্ডেনে গেলাম। বাগানটি খুব সাজান, সুন্দর তবে এখন মরশুমী ফুলের পসরা নেই, তাই অনেকটা নষ্টশ্রী। এখানে অনেকগুলো ঝর্ণার ধারা মানুষের স্নানের কাজে লাগান হয়েছে। স্নানার্থীদের স্নানের বেশ ভালো ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও সাঁতারের জন্ত সুন্দর জলাধার আছে। নীল পরিষ্কার জল তার সবাইকে হাতছানি দেয়। আকর্ষণ যাদের কাছে দুর্নিবার তারা নেমে পড়েছে পোষাক পরে।

বিকালে গেলাম সিংহদরবার দেখতে। ২৫০০ ঘর সম্বলিত সুন্দর বাড়ীটি ধাঁচিয়ে অত্যাচারী মন্ত্রীর কীর্তিরূপে এখন সেখানে সরকারী অফিসএর কাজকর্ম হয়। তারপাশে বিরাট নাচঘর, পিছনদিকে অপূর্ব মুরগীর আস্তানা—এরা কেবল রাজভোগেই লাগে। সমস্ত পরিবেশটি বেশ রুচিসম্মতভাবে ফোয়ারা মূর্তি ও রঙিন মাছএর আধার দিয়ে সাজান। এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে আকাশবাণী ভবন, বিদ্যুৎ দপ্তর ইত্যাদি।

এখানে আসার পথে রাজপ্রাসাদএর অভ্যন্তর উঁকি দিয়ে দেখেছি, আর দেখেছি রাজার বাড়ীর গৃহদেবতা। সহস্র প্রহরারত নারায়ণএর প্রাণ বোধহয় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে প্রহরীদের বুটের শব্দে। এখানে ঘর করার কেউ নেই বুঝলাম।

সেদিন ছিল সূর্যগ্রহণ। আমরা সন্ধ্যায় সেই নেপালী বন্ধুর অতিথি হলাম। এঁদের বাড়ীর সবাই আমাদের যথেষ্ট অপ্যায়িত করলেন। বাসায় সেদিন অসুস্থ মামা একা, তাই বেড়ানর অবহানি হোলো। তারপর বাসায় ফিরলাম। দেখলাম দূর থেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মামা ছাদে আমাদের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

পরের দিন Gorge দেখতে বেরুলাম যেখানে বাঘমতী নদী নেমে এসেছে উচ্ছল ছল ছল জলরাশিতে। কিন্তু সেখানে বিধি বাম। রাস্তা-কাটা জীব সাঁতার কাটতে পারবে না মনে করে অন্ত পথ ধরলাম। আমাদের guide নিয়ে চলেন স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির দেখতে। পথে চা-টা খাওয়া গেল একটি প্রমীলার দোকানে। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির, পাহাড়ের কোল পর্যন্ত গাড়ী যায়। পথে দুপাশে মিলিটারী ব্যারাকের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গাইড বলেন "দেখেছেন কি সুন্দর সুন্দর বাড়ী"? ভাবলাম বলি একেবারে নিউ আলীপুর মনে হচ্ছে। কলকাতার মানুষ সহজে মন ভরে না। গাড়ী থামলে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম উপরে। বিরাট এক বৌদ্ধমূর্তি আছে—খুব সমারোহ করে পূজা হয় তার নিদর্শন সব দেখলাম। আমরাও প্রদক্ষিণ করলাম। পুতাঁথি আছে ১৫ বছর এক নাগাড়ে জলছে। ওখান থেকে সমস্ত কাঠমাণ্ডু সহর খুব ভালো দেখা যায়। ওখান থেকে অসংখ্য বানরসৈন্ত খাইয়ে আমরা এলাম যাদুঘরে।

যাদুঘরটি ছোটর উপর খুব ছিমছাম। রাজাদের পুরুষানুক্রমিক সাজ সজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, ব্যবহৃত অন্যান্ত জিনিসপত্র ও শিকারের ছবি ও অন্ত জানোয়ার রয়েছে। এখানে বেশ বড় এক গজমতী সংরক্ষিত দেখলাম। এখানে বড় বড় উল্কাপাতের নিদর্শনও রক্ষিত আছে। রাজভক্ত দেশ। রাজাদের সমস্ত জিনিস এরা শ্রদ্ধাভরে রক্ষা করে। রাজারাণীর ছবি এরা প্রায় পূজা করে। প্রত্যেক দেবমন্দিরে এদের রাজা রাণীর ছবি।

কাঠমাণ্ডু শহরটি খুব বড় নয়। লোকবসতিও খুব বেশী নয়। তবে মন্দিরের প্রাচুর্য দেখে মন্দিরময় কাঠমাণ্ডু বলা চলে। কাঠমাণ্ডু শহরটির নামকরণ একটি প্রাচীন কাঠমণ্ডপ থেকে হয়েছিল বলে শোনা যায়। শহরটিকে সমস্ত নেপালএর প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। শহরটির দৈর্ঘ্য ২০ মাইল এবং চওড়া ১৫ মাইল—দেখতে অবশ্ত একটু অদ্ভুত রকমের—অনেকটা দেবী দুর্গার হাতের তরবারির মত। প্রকৃতির অকৃপণ হস্তের দান এই কাঠমাণ্ডু। মানুষের আবিলতার স্পর্শ কম, এখানে নানান দেশের রঙবেরঙের মানুষ কেমন নির্ভয়ে পাশাপাশি বাস করে। সবারই অবাধ গতি—এমনকি অপরাধীরাও নিশ্চিন্ত মনে বাস করার সুযোগ পায়।

শহরের ঠিক মাঝখানে আছে মহাকালীর মন্দির। দোতলার মত উঁচু, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে অনেকটা দুর্গামূর্তির মত মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। প্রণাম দিয়ে পুরোহিতের কাছ থেকে আমরা আশীর্বাদ নিলাম।

এরই পিছনদিকে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা সুন্দর একটি মাঠ সেখানে রাজোয় বিশিষ্ট অতিথি এলে সম্বর্ধনা করা হয়। V. I. P. মঞ্চটিও খুব সুন্দরভাবে নির্মিত। এরই পাশে আছে একটি মঞ্চ যেখান থেকে দর্শকগণ পেয়ে থাকেন আনন্দের রসদ।

ঘাণ্টী ঘরের নামে বেশ সুন্দর একটি সাজান পার্ক আছে কাছেই। সেটা শহরের মাঝখানে কাজেই সবাইএর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের চাখে দাঁড়ালেই চোখে পড়ত রাণী পোখরা—বিরাট এক পুকুর। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কালের প্রহরা সেই বিখ্যাত ঘড়ীঘর যার সঙ্গে আমাদের মিতালী গড়ে উঠেছিল অল্পদিনেই। রাতে তার প্রত্যেকটি ঘণ্টা আমরা শুনতাম যে সব সময় সাবধান করত আর বেশী সময় নেই।

হ্যাঁ, আর মাত্র ২৭ ঘণ্টা সময়। এরই মধ্যে ও কিছু কেনাকাটা শেষ করতে হবে। গেলাম সবাই মিলে। ছেলে মিতে কিছু কিনলাম অবশ্য অত্যন্ত অল্প অল্প।

বিকালে গেলাম পাটনে। সেখানে অপূর্ব কাঠের কাজ করা অনেক মন্দির, মাঝে কৃষ্ণ মন্দির আমি বল্লাম এটা পাটন না বলে বলা উচিত মন্দিরের বাজার। কৃষ্ণমন্দিরটি রাজা সিদ্ধি নরসিংহ মল্ল ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন।

কাছেই ছিল "সুন্দরীচোক"—কোনো সুন্দরীর চোখ নয় কিন্তু। এখানে একটি পুরণো রাজপ্রাসাদ। তার স্নান-ঘরটি দ্রষ্টব্য—সুন্দর পাথরের মূর্তি ও খোলার পরাজ্ঞা আছে যা দেখলে এখনও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

আমাদের বিদেশ যাত্রার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। প্লেনে আসব মনস্থ করেও টিকিটাভাবে আসা হোলো না। মামা দুহাতে আমাদের জন্য খরচ করেও পাড়ি দেবেন না বোধহয়। পথে ফেরার আগে মামার বাড়ী গেলে হয়তো খানিকটা সস্তাই হ'তেন কিন্তু সেখানেও বিধি বাম। বাস খারাপ কাজেই দেরী। সুতরাং মামার বাড়ী আর যাওয়া হোলো না।

তবে নেপালের প্রচুর দর্শনীয়ই আমাদের সময়াভাবে অদৃষ্ট থেকে গেছে। গাইড কথা দিয়েছেন আবার গেলে ভালো করে দেখাবেন। আবার হয়তো যেতে পারি কিন্তু মামা কাছে না থাকলে অজহানি হবে এটুকু নিশ্চিত বলতে পারি।

আমরা রওনা হয়েছিলাম ৪ মুণ্ড, পথে হলাম ৭ মুণ্ড, এবার ফেরার আগে হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখলাম আরও একটি মুণ্ড বেড়ে হয়েছি আট মুণ্ড।

"পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বের প্রতি স্তরে, প্রতি মতবাদে, ধর্মক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে রাসমণ্ডল-রচনার যে নিগূঢ় রহস্য গুপ্ত রহিয়াছে, পুরুষোত্তম তাহাই রাস-ক্রীড়ার ভিতর দিয়া বিশ্বের সামনে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বিশ্ব-রচনার ইহাই আশ্চর্য কৌশল যে, বিশ্বের স্পন্দনগুলি প্রত্যেকেই স্বয়ংপূর্ণ, এবং তাহারা এতই বিলক্ষণ যে উহাদের মধ্যে কোন যোগসূত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যোগসূত্র খুঁজিয়া না পাওয়ার কারণও হইতেছে এই যে, দুইটী স্পন্দনের ফাঁকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন বিরাট বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর। অথচ যোগেশ্বর এমন 'বিলক্ষণ' স্পন্দনগুলিকেও কণ্ঠে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া সংহত, সংযত করিয়া রহিয়াছেন। ইহাই রাসবিহারীর রাসমণ্ডলরচনা ও রাসবিহারের কৌশল। দুইটী দেহ সম্পূর্ণই বিলক্ষণ, অথচ দুয়ের ফাঁকে দাঁড়ানো বিশ্বরূপধারী তাহারা গৃহীতকণ্ঠ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

দায়ী কে ?

॥ শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত ॥

ভাষা কি শুধু বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম ? একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে যে আমরা যা কিছু চিন্তা করি সবসময়ই কোন-না-কোন ভাষাকে অবলম্বন করেই আমাদের মস্তিষ্কে গড়ে ওঠে। হতে পারে চিন্তার সময় ভাষার সেই ধ্বনি থাকে না বা ব্যাকরণ-সম্মত, কিন্তু ভাষার থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রূপে আমরা কোনও কিছুই চিন্তা করতে পারি নে মনে রাখা দরকার যে চিন্তার ক্রিয়া আর প্রবৃত্তির তাড়না এক জিনিষ নয় প্রবৃত্তির তাড়নাতে চালিত হওয়াই ইতর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য, কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো প্রবৃত্তির অতিরিক্ত তার চিন্তাশক্তিতে।

ক্ষুধা পেলে মানুষের শিশুও কাঁদে, তার প্রবৃত্তি তখন তাকে কাঁদায়, প্রবৃত্তির তৃপ্তি হলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন তার সমস্ত আচরণেই ইতর প্রাণীর লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। কিন্তু আস্তে আস্তে বড়োদের কথা শুনতে শুনতে তার ভাষাবোধ গড়ে ওঠে, অস্ফুটভাবে সে বড়োদের কথা নকল করতে থাকে, এবং তার এই ভাষাবোধ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাশক্তি জেগে উঠতে থাকে। প্রথম দিকে শিশুর পক্ষে নীরবে চিন্তা করা সম্ভব হয় না। আমরা ভাবি, শিশু বুঝি শুধুই বকবক করে, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, সে আসলে চিন্তাই করে, তখন তার মুখের এলোমেলো কথার মতোই তার চিন্তাও এলোমেলো থাকে। বয়স তার মুখের ভাষা পরিষ্কার হয়ে আসতে থাকে ততই তার চিন্তাও পরিষ্কার হয় আবার বয়স সে প্রথমে ঠোঁটে ঠোঁটে ও পরে মনে মনে চিন্তা করতে সমর্থ হচ্ছে ততই তার নিদ্রার সময়ও কমে আসে, কারণ তখন তার প্রবৃত্তির তৃপ্তিতেই ঘুম পায় না। এভাবেই আস্তে আস্তে ভাষাবোধ গড়ে ওঠার ফলে ইতর প্রাণিকুলের লক্ষণাদি শিশু কাটিয়ে ওঠে।

শিশুর বিকাশের ক্রম আমরা হাজার হাজার বছর ধরে হয়ে ঘরে দেখে আসছি বটে, কিন্তু এই ক্রমটার তাৎপর্য আমরা কতটুকু বোঝার চেষ্টা করি ? অন্তত দেশের বর্তমান নেতাদের হালচাল দেখে মনে হয় না যে ওঁরা শিশু-বিকাশের তাৎপর্য কখনও বোঝার চেষ্টা করেছেন। হয়তো ওঁদের ঘরে শিশু নেই, কিংবা থাকলেও শক্তি-প্রতিপত্তির সেচনে দিনমান ছোটার পথে শিশুটির বিকাশ লক্ষ্য করার মতো সময় নেই এবং একথাও ঠিক না হলে বুঝতে হবে যে ওঁরা চিন্তাশক্তিশূন্য সেই প্রাণিকুলে পরিণত হয়েছেন যারা নিছক প্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হয়। কেননা তা না হলে ভাষার প্রকৃত স্বরূপ কী এবং মানুষের উন্নতির মূলে ভাষার কী মূল্য সে-সম্বন্ধে ওঁদের এতখানি অজ্ঞান ও অসচেতন মনে হতো না।

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষ এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য দেশ এবং এই দেশের সব রকম উন্নতির উৎসমুখে ইংরেজ শাসনের যে জগদ্দল পাথর চাপানো আছে তা সরাতে পারলেই এ-দেশ স্বর্গে পরিণত হবে। কিন্তু স্বাধীনতার দু যুগ পরে আমরা দেশের কোন্ ছবি দেখতে পাচ্ছি ? সাহিত্যে শিল্পে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অসংস্কৃত মনের অপরাহত বিস্তার। এই দু যুগে খুব উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, কিন্তু আজকের দর্শক চাইতে জনপ্রিয় এই শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ওই চলচ্চিত্রগুলিও আদৌ জন-সমাদৃত হয় নি। এর কারণ কী ? শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে গেছে, পাড়ায় পাড়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংখ্যাও ক্রমেই বিবর্ধমান। কিন্তু সংস্কৃতি এমন একটা জিনিষ যার পরিমাপ সংখ্যা দিয়ে হয় না। সত্যি বলতে

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা অনীহা ছাড়া আর কিছুই আমাদের শিক্ষা দেয় নি। এটাকে গণতন্ত্রের একটি লক্ষণ বলব কিনা বুঝতে পারছি নে।

আমার এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পাশে পাশে দেখতে পাই, যে-ভারতবর্ষ মাত্র দু যুগ আগেও অধীনতা ও অবিদ্যাজাতার কলঙ্কে উদ্বুদ্ধ ছিল তার দিকে দিকে বিভাজনের প্রক্রিয়া ও প্রবণতা প্রবল প্রতাপে মাথা তুলছে। ইতি মধ্যেই কতকগুলি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এবং আরও কতকগুলি অঞ্চলের অধিবাসী নিজেদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবি উত্থাপন করেছে: এ ছাড়াও কোনও কোনও রাষ্ট্রে অন্য ভাষাভাষীদের উপর হামলা হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে যারা স্বাতন্ত্র্যের দাবি উত্থাপন করছে তাদের অধিকাংশেরই মূল বক্তব্য স্থাপিত হয়েছে ভাষা প্রশ্নের ভিত্তিতে, ভাষাই সব রকম স্বাতন্ত্র্যের মানদণ্ড রূপে নির্ণীত হয়েছে। এসব থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে শিক্ষা ও ভাষার সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে কতখানি জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

এই প্রশ্নের উত্তর রাজনৈতিক নেতাদের কাছে জানতে চাওয়া বৃথা। এ সব বিষয় নিয়ে তাঁরা চিন্তাই করেন না, তাঁদের চিন্তার অদ্বিতীয় বিষয় হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা অথবা অর্জিত ক্ষমতা রক্ষা করা। যে দেশে জনসাধারণ গণতন্ত্রের ধারণা ও শিক্ষা থেকে একেবারেই বঞ্চিত সেই দেশে গণতন্ত্রের পরীক্ষা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে উঠতে বাধ্য। গণতন্ত্রে ভাবালুতা এবং অন্ধ অনুসরণের কোনও স্থান নেই। এখনও অধিকাংশ গ্রামের মানুষ দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। গ্রামের মাতব্বর বা পঞ্চায়েতের সদস্যগণ যাকে ভোট দিতে বলে তাকেই তারা ভোট দেয়। যে সব গ্রামে বাম-পন্থীদের প্রভাব প্রবল সে সব গ্রামের মাতব্বরেরাও বামপন্থীদের দ্বারা প্রচারিত বিভিন্ন স্লোগানের তাৎপর্য এতটুকু জানে না। আগেকার কালে পুরোহিতদের দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রগুলি যেভাবে তারা না বুঝে আবৃত্তি করত ঠিক সেভাবেই তারা আজও স্লোগান উচ্চারণ করে। মন্ত্র আর স্লোগানের ভাষা আলাদামাত্র, কিন্তু দুটোরই উদ্দেশ্য এক। তখনকার মানুষ ছিল অশিক্ষিত, আর এখনকার মানুষ অশিক্ষিত হতে লজ্জা পায় বলে কুশিক্ষিত হচ্ছে। যেখানে অশিক্ষা সেখানে শিক্ষা হলো মাত্র এক পদক্ষেপ এগুনো, কিন্তু যেখানে কুশিক্ষা সেখানে শিক্ষার জন্যে আমাদের এক পা পিছিয়ে আবার এক পা এগুতে হবে।

তাহলে আমরা পথের নিশানা জানতে চাইব কার কাছে? তাঁদের কাছেই জানতে চাইব যাঁদের 'সমাজের শিক্ষক' বলে বঙ্কিমচন্দ্র অভিহিত করেছেন। এজন্যে এ বছর ২৪শে আগষ্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত ভাষণ আমাদের গভীর অভিনিবেশ দাবি করে। সুনীতিকুমারকে আমরা মুখ্যত আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক বলেই জানি। কিন্তু আগেই বলেছি যে ভাষা হলো সেই জিনিস যাকে অবলম্বন করে আমাদের চিন্তা বিকশিত হয়। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিকমাত্রেই মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। 'ইউরোপ ১৯৩৮', 'ভারত সংস্কৃতি', 'জাতি সংস্কৃতি সাহিত্য' 'বৈদেশিকী', 'সাংস্কৃতিকী', 'রবীন্দ্রসমবে বীণময় ভারত ও জ্ঞানদেশে' অথবা 'আফ্রিকানিজম' প্রভৃতি সুনীতিকুমারের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে মানবসংস্কৃতির এমন বিষয়ের কথা মনে আনা কঠিন যেখানে সুনীতি-কুমারের কর্তৃত্ব কুণ্ঠিত, সাংস্কৃতিক ধারণায় তাঁর সমকক্ষ পুরুষ ভারতে বোধকরি একজনও নেই।

আমার শিক্ষক হিসেবেও সুনীতিকুমার অগ্রগণ্য এবং তিনি হলেন সেই ধরনের শিক্ষক যাঁকে 'ঐতিহ্যগত অর্থে গুরু বলা হয়। শুনেছি একবার তিনি প্রশ্নকারী একজন শিক্ষককে কঠিন প্রশ্নপত্র রচনার জন্যে ডেকে পাঠিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর লিখতে অনুরোধ করেছিলেন এবং পরে বলেছিলেন, স্বয়ং প্রশ্নকারী শিক্ষক যা করতে অসমর্থ তা অনভিজ্ঞ ছাত্রদের কাছে দাবি করা অন্যায়, তিনি প্রশ্নকারী শিক্ষককে মনে করিয়ে

দিয়েছিলেন যে পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষক কতটা জানেন তা প্রচার করা নয়, ছাত্রেরা কতটুকু জানে তা যাচাই করা। এবারের উপলক্ষ্যে বর্তমান লেখকও সুনীতিকুমারের কাছে প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং লক্ষ্য করেছে যে এই প্রবীণ শিক্ষক উত্তরপত্রের সময় সর্বদা নিষ্ঠাবান ছাত্রের ভূমিকা পালন করেছেন, এবং প্রশ্নকারীরূপে যে উপস্থিত সে-ই যেন তাঁর আসল পরীক্ষক। এমন একজনের কথাও আমি জানি যার কোনও কৌতূহল নিবারণে কখনোও দ্বিধাবোধ করেননি সুনীতিকুমার অথবা তাঁর লেখার জন্যেও দেখিয়েছেন। মতের মিল হোক চাই না হোক সকলের সব রকম প্রশ্নের নিরসন তিনি আপন সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়ে করবেন এবং তাঁর সাধ্যের পরিমাপ করা যেকোন ডাকসাইটে পণ্ডিতবর্গেরও অসাধ্য বললে অত্যুক্তি হবে না।

এতদ্ভিন্ন আজ দেশের সর্বত্র যে সব দুর্লক্ষণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার প্রতিকারের পথ সুনীতিকুমারের মতো আচার্যের কাছেই আমরা জানতে চাইব। তিনি জ্ঞানী, জ্ঞানার্থী এবং ছাত্রবৎসল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বিনম্রচিত্তে নিজেকে একজন শিক্ষাবিদমাত্র রূপে পরিচয় দিয়েছেন এবং শিক্ষাবিদরূপেই দেশের বর্তমান সমস্যাকে উপস্থাপন করেছেন ও তার সমাধানের পথে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। উক্ত ভাষণের এক স্থানে বলেছেন যে বর্তমান অবস্থার জন্যে দুটো ব্যাপার দায়ী, প্রথমত, Irresponsible and unrestricted Experimentation, by theorist (and by some busy-body 'reformers') in seeking to bring in new ideas and to rehaul the old system and reshape it into something new, in our Education এবং Intrusion of party Politics in our Education.

সুনীতিকুমার একথা স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছেন যে গত প্রায় এক শত বছর ধরে যে-শিক্ষাব্যবস্থা চলে আসছে আজ তাতে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তাঁর এই ঘোষণাতে অনেক বিপ্লবীই যে রক্ষণশীলতার গন্ধ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষা হলো সেই জিনিস যার সঙ্গে বর্তমানে কোটি কোটি ভারতীয়ের স্বার্থ জড়িত, যার উপরে ভবিষ্যতের ভারতের আশা নির্ভর করছে। একথা খুলে খোলাসেও না বলে উপায় নেই যে সরকারী শিক্ষা বিভাগ আমাদের প্রদত্ত করে পুষ্ট এবং শিক্ষার খাতে ব্যয়িত সমস্ত টাকাই আমাদের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের টাকা। আমাদের শিশু আমাদের নোড়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙবে এ ব্যাপারটাকে সহ্য করার নাম সহিষ্ণুতা হতে পারে না। সুনীতিকুমার খুলে সবটা উচ্চারণ করেননি, কিন্তু শিক্ষার নামে অনাচারের উল্লেখ করেছেন। আমাদের কর থেকে যে-টাকা ব্যয় হচ্ছে তার যথার্থ বিচারের অধিকার আমাদের আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা বিপ্লব সাধন করতে চাইছেন তাঁরা যথার্থই বিপ্লবী কিনা এ প্রশ্ন আমরা তুলব। বিপ্লবীর মুখোস পরে যাঁরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে চান তাঁরাই প্রতি প্রশ্নে রক্ষণশীলতার গন্ধ পান। কিন্তু আমাদেরও আজ একথা বোঝার সময় এসেছে যে মুখোসের ভিতর দিয়ে সত্যিই রক্ষণশীলতা অথবা প্রগতিশীলতার কোন রকম গন্ধ নাকে পৌঁছতে পারে কিনা।

গত দু যুগে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি। তার ফলে অশিক্ষা দূর হয়ে যাওয়া দূরে, কিন্তু অশিক্ষার বদলে যা এসেছে তা হলো কুশিক্ষা। এই কুশিক্ষাকে মুছে আবার দেশকে অশিক্ষার ফিরিয়ে এনে শিক্ষা দেওয়ার কাজ অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়েছে। কুশিক্ষার প্রধান লক্ষণ এই যে তা শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মিথ্যা অহমিকা গড়ে তোলে। এই অহমিকাজনিত সন্তোষ দেশকে বিপথে চালিত করবেই এবং যথার্থ শিক্ষাকে পথে পদে লাঞ্ছিত করবেই। কারণ মিথ্যাই তার একমাত্র আশ্রয় এবং মিথ্যার উপর সেতো সে আপনাকে চিরিয়ে রাখে। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চলছিল ইংরেজী ও সংস্কৃতের কাঁধে ভর দিয়ে। ইংরেজী যেমন একদিকে আমাদের

চোখ খুলে দিয়েছিল আধুনিক মূল্যবোধের দিকে, তেমনই সংস্কৃত আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল সনাতন মূল্যবোধের দিকে। পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও পাঠক্রমের পরিমাণ ছিল ছাত্রদের বয়সের উপযুক্ত। এতে ছাত্রদের মূল্যবোধ একটা রফা করার মতো ভাবসাম্য খুঁজে পেত আর সই পড়ার পরে যে-অবকাশ পেত তাতে মস্তিষ্ক চালনা করতে পারত।

কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবপন্থীরা এই ব্যবস্থাকে চালু রাখতে চান না। শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাঁরা সংস্কৃতকে নির্বাসন ও ইংরেজীকে বিতাড়ন করে জাতীয় সংস্কৃতি সম্পাদনে ব্রতী। মাতৃভাষাকেই তাঁরা শিক্ষার বাহন করতে চান এমন ভাষা ভুল। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে বাঙালীকে বাংলার মাধ্যমে, অসমীয়াকে অসমীয়ার মাধ্যমে, ওড়িয়াকে ওড়িয়ার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কোন রকম উদ্দেশ্যই এই সব তথাকথিত বিপ্লবী শিক্ষাব্রতীদের নেই। এঁরা অনতর্ক মুহূর্তে এসব মাতৃভাষাকে অভিহিত করে থাকেন আঞ্চলিক ভাষা বলে এবং এর থেকেই আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে এঁদের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশিত। এঁদের কাছে অসমীয়া বাংলা ওড়িয়া তেলেগু তামিল কানাড়ী প্রভৃতি সমস্তই নেহাৎই আঞ্চলিক ভাষা, মেপালী বা ওইরূপ অন্যান্য ভাষার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এগুলোকে আঞ্চলিক বলে অভিহিত করার তাৎপর্য এই যে এগুলি আমাদের কারও মাতৃভাষা নয়, আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়ের সত্যিকার মাতৃভাষা হলো সেই ভাষাটি যাকে আঞ্চলিক বা বিদেশী বলে অভিহিত করা হয় না, এক কথায়, আমাদের মাতৃভাষা হলো হিন্দী।

আজকাল প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব বেতার কেন্দ্র রয়েছে। এ সব বেতার কেন্দ্র থেকে হিন্দী অনুষ্ঠানের প্রচার কতখানি বেড়ে গেছে তা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। এর ফলে ওইসব রাষ্ট্রের আপন ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানের সময় কম করে দেওয়া হয়েছে। এটাকে আঞ্চলিক ভাষার উপরে হিন্দীর আগ্রাসন বলা যায়। এখনও হিন্দীর স্থান দ্বিতীয়। তবু সরকারী উদ্যোগে হিন্দীর জন্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উল্লেখযোগ্য স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এ তো সবে কলির সন্ধ্যা। এভাবে হিন্দীর অধিকার বৃদ্ধি পেতে থাকলে অচিরে তা ভারতে হিন্দী সাম্রাজ্য স্থাপন করবে এমন আশঙ্কার যথার্থ কারণ আছে। কিন্তু শুধু হিন্দীর সাম্রাজ্য বিস্তারের চাইতেও বড়ো বিপদ আসবে যা ইতিমধ্যে এসে গেছে জাতীয় সংস্কৃতির বিনাশে। ইয়োরোপের ইতিহাসে দেখি নেপোলিয়নের পড়ে তোলা সংহত ইয়োরোপ ভেঙে যাওয়ার পরে সাময়িক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। যা এক নয় তাকে জোর করে এক করতে গেলে আজ হোক কাল হোক প্রলয় ঘটিয়ে তা আলাদা হবেই। যতই নিত্তির ভাষাভাষীদের উপরে হিন্দী চাপানো হবে ততই হিন্দীর বিরুদ্ধে 'আঞ্চলিক' ভাষাভাষীরা রুখে দাঁড়াচ্ছে এবং দাঁড়াবে।

ভারতে ইতি মধ্যে বিভাজনের যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা যদি একদিন গৃহযুদ্ধের রূপ নেয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেশ আজ গৃহযুদ্ধের দিকেই চলছে। এই ভয়ঙ্কর পরিণামকে প্রতিরোধ করা সম্ভব শুধুমাত্র যথার্থ শিক্ষা দিয়ে। যথার্থ শিক্ষার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে একই সঙ্গে সনাতন মূল্যবোধ ও আধুনিক মূল্যবোধ আত্মস্থ না করতে পারলে যথার্থ শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয় না। অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী চর্চার পুনরুদ্ধার ব্যতীত আসন্ন গৃহযুদ্ধের প্রতিকার সম্ভব নয়। সুনীতিকুমার সংস্কৃত ইংরেজী চর্চার পুনরুদ্ধারের পরামর্শই দিয়েছেন। কেন এই পুনরুদ্ধার আজ নিতান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে সেকথা তিনি খুলে না বললেও কারণ অনুমান করা সম্ভব।

ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু একটি অশিক্ষিত দেশও বটে। এখানে অশিক্ষিত দেশ মানে রাজনীতি-অচেতন দেশ। অশিক্ষিতদের ভোটেই সরকার গঠিত হয়। এই সরকার কিছুতেই জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধি হতে পারে না। এই সরকার সাময়িকভাবে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র। এই সরকার জানে যে এর স্থিতি দেশের অশিক্ষার উপরে

নিশ্চয়ই। যতদিন দেশ অশিক্ষিত থাকবে ততদিন এই সরকারের নিরাপদ স্থিতি। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে নিজেদের গদি কায়েম করার জন্যেই এই সরকার দেশ জেনেশুনে দেশের মানুষকে রাজনীতিতে অচেতন অবস্থাতে রাখতে চায় এবং যেসব পথে রাজনৈতিক চেতনা প্রবেশ করতে পারে সেসব পথ বন্ধ করে দিতে চায়। খবরের কাগজ খুললেই আমরা যেসব খবর পাই তা আধা আদিম সমাজের ঘটনার বিবরণ। দেশের বিপুল জনসমষ্টিকে পশ্চাতে রাখলে সে নেতাদেরও পশ্চাতে টানবেই দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব বিক্ষোভ হামলা রক্তপাতের খবরে নেতারা বিচলিত বোধ করছেন তার অনেকগুলি কারণ আছে এবং এই অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে দেশের নেতারা নিজ নিজ স্বার্থে আমাদের আধা আদিম মূল্যবোধের গুহায় আটকে রেখেছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব হিংসাত্মক ঘটনাবলী বিস্ফোরিত হচ্ছে সেসবে ছাত্র সমাজ একটা বড়ো অংশ গ্রহণ করছে। রাজনীতিজ্ঞানহীনদের পক্ষেই এসব ঘটনার সমস্ত দায় ছাত্রদের কাঁধে চাপানো সম্ভব। কিন্তু সুনীতিকুমার মনে করেন যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই ছাত্রদের স্বধর্মোচিত আচরণের পথে ঠেলে দিয়েছে। ছাত্র-অসন্তোষের কারণ ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনার জন্যে প্রচুর সমিতি বৈঠক পর্ষদ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। ছাত্রদের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতিশূন্য এসব উদ্যম থেকে কোনও সুফল আসতে পারে না বুঝতে অসুবিধে হয় না। প্রত্যেক ছাত্রকে এক একটি চলন্ত ক্ষুদ্র বিস্ফোরণে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিপুল পাঠক্রম ও বইয়ের পাহাড় ছাত্রদের মাথায় চাপানো হচ্ছে সুনীতিকুমার তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন। গবেষণাগারের গিনিপিগ হিসেবে নয়, এক-একটি অমূল্য মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার জন্যে তাঁর আহ্বানে নৌবিদ্রোহীরা সাড়া দেবেন কিনা জানিনে। বিদ্যা যদি দুর্বহ একটা বোঝা হয়ে ওঠে তবে তার সেখানে বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হয়ে যাবেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বোধ ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করা। যার বোধ ও বুদ্ধি আছে সে কোনদিন উট না দেখে থাকলেও উটের পায়ের ছাপ দেখে বলতে পারবে যে এটা একটা চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের ছাপ। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বোধ-বুদ্ধি জাগরণের স্প্রিংটাই বাদ পড়ে গেছে, তাদের মধ্যে যারা উটের সঙ্গে তার পায়ের ছাপ কোনদিন মিলিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি তারাই শুধু ওই পায়ের ছাপের সঙ্গে চতুষ্পদ একটা জন্তুর সম্পর্ক দেখতে পাবে, অন্যেরা পারে না। অর্থাৎ বিদ্যার সঙ্গে বিষয়ের মিলন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ঘটছে না।

এর ফল যা হবার তা-ই হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যে শিক্ষালাভ করছে কর্মজীবনে এসে তা প্রয়োগের ক্ষেত্র পাচ্ছে না। পুঁথির বিদ্যা ছাপার হরফেই আবদ্ধ থাকছে, বাস্তবে তার কোনও যাথার্থ্য থাকছে না। পুঁথির বিদ্যার বোঝা আজকের ছাত্রসমাজ বুঝে ফেলেছে। তার ফলে তাদের হতাশা বিদ্রোহ বিহ্বলতা বিক্ষোভ আজ নানা ভাবে প্রকাশ পেয়ে সংবাদপত্রগুলিকে খোরাক জোটাচ্ছে। এজন্যে সুনীতিকুমার এখন বহুল ঘরে পরীক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন, ছাত্রসমাজকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। রাতারাতি বিপ্লব সাধনের প্রয়াস থেকে বিরত হবার জন্যে কোনও বিনয়ই যথেষ্ট বিনয় নয়। এখনও ভুল শোধরাবার সময় আছে। ছাত্রসমাজের উপর নতুন কোনও পরীক্ষা না চালিয়ে আমাদের এখনই পূর্বে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা উচিত। সেখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে, ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে নতুন ও সুফলদায়ী শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে হবে।

ছাত্রসমাজের মান অবনত হবার অপর কারণ, সুনীতিকুমার নির্দেশ করেছেন, দলীয় রাজনীতি। এটা একটি বিতর্কিত বিষয়। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে দেশে দেশে রাজনৈতিক অগ্রগতির মূলে ছাত্রসমাজের একটা খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ভারতে যখন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখন দলীয়

রাজনীতির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতের মতো রাজনীতি-অচেতন দেশে দলীয় রাজনীতির সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবেই। আজকের ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে রাজনীতি-চেতন একথা যাইবে বেকে যতটা সত্য ভিতর থেকে ততটা নয়। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, সব কিছুকে প্রথমেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিচার করবে। কিন্তু বিচারের বদলে ছাত্রসমাজ এক অন্ধ বিশ্বাসেই আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যা থেকে বিচার করার ক্ষমতা জন্মায় তার নাম যুক্তি এবং যুক্তি শব্দটা এসেছে যুক্ত হওয়া থেকে, যেমন জার্মান দার্শনিক হেগেল দেখিয়েছেন যে Vernuft এসেছে vernehmen থেকে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সত্যের যোগ নেই। খুঁটিয়ে দেখলে তাদের এই যুক্তিহীন বিশ্বাসের কারণ হলো তাদের মনন দেউলে হয়ে গেছে। আজ যাঁরা দলীয় রাজনীতির নেতা তাঁদের কর্মপন্থার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বাগ্রে ছাত্রসমাজের মনেই প্রশ্ন জাগার কথা। কিন্তু সে প্রশ্ন কি তাদের মনে সত্যিই জাগছে ?

ছাত্রসমাজ যে এতখানি নেতাদের প্রতি জিজ্ঞাসাহীন সন্দেহহীন তার কারণ তাদের মনন দেউলে হয়ে গেছে একথা বললে সমস্যাটাকে খুব সহজ করে দেখা হবে। তাদের এই দশা গোটা সমাজেরই একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। এবং এরও পেছনে আছে আজকের শিক্ষাব্যবস্থা—যা ছেলেমেয়েদের এক একটি অভ্রান্ত ও চলন্ত ক্ষুদ্র বিশ্বকোষে পরিণত করার জন্যে বদ্ধপরিকর, যা ছাত্রাবস্থায় ছাপার হরফের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে প্ররোচনা দেয়, যা বাস্তবজীবন থেকে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন, যা বিপুল পাঠক্রমের চাপে ছাত্রসমাজের জিজ্ঞাসু মনকে দমিত করে রাখে। যে-শিক্ষাব্যবস্থা ছেলেমেয়েদের মনে স্বাধীনভাবে সত্যকে সন্ধান করে নেওয়ার আগ্রহ ও ক্ষমতা জাগায় না তাকে বাতিল করতে হবে বিনা দ্বিধায়। সুনীতিকুমার তাঁর ভাষণে যেসকার জন্যে যে-শিক্ষাব্যবস্থা ও যে-পাঠক্রম প্রস্তাব করেছেন তা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সহজসাধ্য সাধন করবে। এবং তা সাধিত হলে সাম্প্রতিক দলীয় রাজনীতির রাহুগ্রাস থেকে ছাত্রসমাজ নিজেকেই মুক্ত করে নেবে, তখন এই ছাত্রসমাজই হবে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক।

আমরা, যারা প্রতি পদে ছাত্রসমাজের সমালোচনা করি, ভুলে যাই যে এই সমালোচনার প্রকৃত লক্ষ্য আমরাই, কেননা ছাত্রসমাজের সামনে আমরা কোনও আদর্শ স্থাপন করিনি। খবরের কাগজে যাঁদের নাম দিনের পর দিন বের হয়, যাঁদের কর্মজীবন সর্বদা আমাদের মনে পড়ে তারা কারা ? কী আছে তাঁদের মধ্যে যা দিয়ে ছাত্রসমাজ উদ্বুদ্ধ হতে পারে ? যাঁদের কৃপা লাভ করার জন্যে আমরা ঘুরে মরি তাঁদের জীবনে ও চরিত্রে অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো কোনও বস্তু আছে কি ? আমরা যতখানি ছাত্রদের সমালোচনা করি তার এক কণাও সমানুভূতি বা সহানুভূতি ছাত্রদের প্রতি আমাদের আছে কি ? থাকলে আমরা তাদের নিয়ে গিনিপিগের মতো পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাতাম কি ? সুনীতিকুমারের ভাষণে এই প্রশ্নটাই প্রচ্ছন্ন আছে যে আজকের ছাত্রসমাজ, যা ব্যাপক অর্থে, তরুণ সমাজের যে সব আচরণের কথা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠে ও চারপাশে দেখে আমাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে প্রকৃতই দায়ী কে ?

"পুরুষোত্তম-বিশ্ব পচা গলা এই জগতের বাহিরে নয় ; সেই বিশ্ব এই বিশ্বেরই পুরুষোত্তম-অগ্নিতে হজম-হওয়া পুরুষোত্তম-রূপ। পুরুষতত্ত্ব স্তরকে পুরুষোত্তম স্তরের কাছে সমর্পণ করিলেই এই স্তরের সব বন্ধন খুলিয়া যায়, এই স্তরের সব কিছু মুক্তির অগ্নিতে জারিত হইয়া এই স্তরেরই বুক চিরিয়া (বুঝায়) ভাগবত রূপে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়, যেমন হংসীমাতার বুকের তাপ পাইয়া ডিম হইতে ছানা বাহির হয়।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

প্রার্থনকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭৬)

…নূতন যুগের আদর্শে পৌঁছাতে, নিত্যগোপাল, তোমার ঐ চরিত্র-নৌকা রেখে গেছ…গৌরাঙ্গ বাদুড় পা কি বলব জানিনা—নিত্যগোপালকে পেয়েছিলাম। ওঁর পায়ে মাথা পেতে দিয়ে বলেছিলাম, আমি তোমার কাজ মাথা পেতে নিলাম…। কিন্তু আমার দিন তো শেষ হয়ে এল—তোমরা যদি সে ভার নিতে, আমি শান্তিতে মরতে পারতাম…. দীক্ষা দিয়ে তো দায়িত্বই দিতে চেয়েছি—নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করার দায়িত্ব… মৃত্যুর গর্জন কি ভয় হতে শুনতে পাও না? সে তো এসে পড়ল—নূতন জীবন-দর্শন ছাড়া এ মৃত্যুকে face করবে কেমন করে?…কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি তো অস্ত্র ধরেন নি, তিনি যোগেশ্বর—সব যোগের কৌশল তিনি দেবেন—অস্ত্র ধরতে হবে তোমাদের, আমাকে।… নিত্যগোপালের কাছে এসে সে সুযোগ পেয়েছ—এ সুযোগ নষ্ট করো না…। বিশ্বনাগরিক যদি আমার বুকে না থাকতেন তবে এতগুলি ক্ষেত্র গ্রহণ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব হত?…বিশ্বকল্যাণ সভা—সত্যব্রত সমিতি—বেয়াল্লিশের সেবা…কংগ্রেস আন্দোলন…স্বরাজসেবক সঙ্ঘ…গৌরাঙ্গ পোদ্দী…(নিত্যগৌরবানন্দ সে গৌরাঙ্গ নাম দিয়েছেন) …বৃন্দাবনে ২য় বৎসর…স্বপ্নে মহাপ্রভু বললেন, বাংলায় যা, কাজ আছে…বাংলায় এসে নবদ্বীপ আইন অমান্য… ছেলেদের সঙ্গে কীর্তনগাহিতে রং বেরং করাকে ঠাকুরের সেবায় লাগাবার চেষ্টা…২৩।২ শানপুর রোডে নরনারায়ণ আশ্রম—সে আশ্রম আজ এখানে…। ইচ্ছা হয় ঠাকুর, আমাকে দিয়ে তোমার কাজ করিয়ে নাও। ডেকে যখন এনেছ শক্তি দাও। আজ সব পথহারা—অসীমের মাঝে পথ খুঁজে নিতে হবে—পথ আজ অসীমের চরণতলে—সীমার মধ্যে পথ নেই—আমেরিকা ইংল্যাণ্ড পাকিস্তান কেউ পথ খুঁজে পাচ্ছে না…এ তো ইংরেজের অস্ত্র-কৌশল নয়—নিত্যগোপাল, তুমি দেবে কৌশল—আমি অস্ত্র ধরব—তোমার অপর অর্ধেক আমি …গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং…আমার বুকের রক্তমাংসে তোমার অগ্নির বীজকে আমি ফুটিয়ে তুলব…। নিত্যগোপাল, আশীর্বাদ কর—যে সুযোগ দিয়েছ, সে সুযোগ যেন সার্থক করতে পারি…। ওগো আমার আমি… ক্ষুদ্র সুযোগ তুমি দাও নি—তুমি আমি আমি তুমি। ধরার ধূলি—এ জগৎ—আমার বিচরণ ক্ষেত্র… একটুও এগিয়ে দিয়ে যেতে পারব না?

১১, ২, ৫৭। উপনিষৎ ব্রহ্মকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করেছে—অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্—ঈশো…। এ অগ্নি জীবন্ত অগ্নি—অগ্নি না থাকলে সমস্ত সংসার নিভে যায়—…। হজম করা দরকার।…ভাগবত অগ্নিকে ভক্তি বলেছেন।…তিনি বলেছেন আমি বৈশ্বানর হয়ে সব পাক করি…। পেটের অগ্নি দিয়ে খাদ্য বস্তু হজম করতে হয়, জীবনের অগ্নি দিয়ে ঘটনাপুঞ্জ ইত্যাদি হজম করতে হয়।…কারো কারো জীবনে জীর্ণাগ্নি—কেউ কেউ মন্দাগ্নি… মন্দাগ্নি হলে যা দিয়ে জীবন গড়ে সেই খাদ্যই রোগ দেয়—তখন অন্ন ফেলে পেট কামড়ায়—অগ্নই আগুনের উপরে যেতে চাইছে।…ভগবানরূপ অগ্নিকে নিয়ে থাকলে বিশ্বটা হজম হয়ে যেত।…এ যেন আগুনের পূজা করত—আগুনের পূজা করলে আয়ু বাড়ে…। বিশ্ব হজম করবার জীবনীশক্তি বাড়াতে হবে…। আগুন দিয়েই তো আগুন জ্বালায়—যার জীবনে অগ্নি তার মধ্যে থাকলে আমার জীবনে আগুন জ্বালাতে পারি…। জীবন self stoking—নিজের আগুন নিজে জ্বালায়…। আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে ও দুই একজন

চলবে ...জীবের জীর্ণ রোগ—তাই সংসার হজম হয় না—তাই অত চটাচটি—অত অহংকার...। সংসারকে হজম করতে না পারলে সংসার বেরিয়ে যাবে—কিন্তু খুব কষ্ট দিয়ে যায়...। জ্বালানকে কাঠপাথর দিয়ে মোটা করি—চাল ডাল কি মানুষের গায়ে লেগে থাকে?—এগুলি জীবনীশক্তি রূপে আসে···। আন্তরাল হজম হয়ে যখন জীবনীশক্তি হতে পারে না, তখন যেমন তা কষ্ট দেয়, তেমনি স্ত্রীপুত্র সংসার টাকাকড়ি জীবনীশক্তিরূপে হজম হয়ে না এলে বড় কষ্ট দেয়···। এই সমস্ত হজম করাতে পারে শুধু প্রেম···যা কিছু নিজের বলে নিতে না পারি তা হজম করা যায় না...। মাত্রা রাখা কী যে কঠিন...। জগৎকে চুকিয়েও কিন্তু জগৎ হজম করার শক্তি নেই। নিতাগোপাল এই পরিপাক শক্তির খবর রেখে গেছেন।···এতদিনের সন্ন্যাসীরা বাইরে থেকে খুব অল্প ভিতরে নিয়েছে···তারা দৈহিক মানসিক সেট রোগা—পাছে হজম না হয়।···ঠাকুর, তুমি বিপদে ফেলেছ আমাকে···নবদ্বীপে আমাকে বললে, সংসারে যাও, কাজ আছে...। আমার মতো লোক লোকজনকে দিয়ে তুমি কি কাজ করাবে? আমার মতো নিরীহ মানুষটাকে কেনই বা তুমি মানুষকে ভালবাসবার মন দিলে, কেনই বা কিছু করবার ক্ষমতা না দিয়ে এই অবস্থায় রাখলে...অবশ্য তোমার বুদ্ধির উপর কথা বলি না···। তুমি বিশ্বনাগরিক হতে চাও, আমিও বিশ্বনাগরিক হব···আমি সংসারকে নিয়ে সন্ন্যাসী হব—সেই সন্ন্যাসী সব কিছু পরিপাক করে যে বিরাট প্রাণের অধিকারী হয়েছে, আমি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজ বেয়াল খুশীটুকু নিয়ে জীবন কাটাব না···—হোক শুরুপাক। কিন্তু তোমার কাছে তো শুরুপাক কিছু নাই···আমাদের শিবানী বিড়ালী মাছের কাটা খেয়ে হজম করে—তাহলে আমার হজমশক্তিই বা থাকবে না কেন? সেই জীবনী-শক্তি আমাকে দাও যে শক্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ সব অবস্থাকে হজম করতে পারি।...তোমার বিশ্বনাগরিক মন্ত্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক···বাইরের সব কিছু আমার মধ্যে হজম হয়ে জীবনীশক্তিতে পরিণত হোক··· সংসারের লোক তাড়তাড়ি স্ত্রীপুত্র চুকিয়ে হজম করতে না পেরে বই পাচ্ছে—এগুলি বাইরে থাকে আসবাবপত্র হয়ে যাচ্ছে অথচ তুমি ব্যবহারের, তুমি পরমাত্মীয় হয়েও। এই যুগল মিলন আমার জীবনে আবার্ভূত হোক...। জগন্নাথ নিত্যগোপাল

১৯. ২. ৫৭—প্রত্যাশাধিতা বলে যার কৃপার এক কৃপা ভিক্ষেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁর সম্বন্ধে একটা নাটক লিখেছেন। তাতে আছে মুসলমানের অত্যাচারে পঞ্চর বলে ব্রাহ্মণের কাছে প্রত্যাশা আসছে—পঞ্চর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, বলত কল্যাণী, এরা আমার কাছে আসে কেন? আমি এদের কি করতে পারি? কল্যাণী বলল, পার নিশ্চয়ই। পঞ্চর বলল, পারি? আচ্ছা, তবে পারি।...গুরুভাই নিতাইবাবু বললেন, আমাকে, পঞ্চর, বেদান্তের ভাষ্য তুমি লিখতে পারবে, লিখো। চমকে উঠলাম—আমি বেদান্তের ভাষ্য লিখতে পারি?... পেয়েছি। তিনি লিখিয়েছেন—একটা নূতন চিন্তা—যা আজকের জিজ্ঞাসা তারই উত্তর রয়েছে সেই ভাষ্যে।... কিন্তু আজ ভাবি, কেন অবিকৃত ভারত গঠনের মন্ত্র আমি পেলাম...?...আমার এ স্থান যদি প্রতক্ষিত সন্ন্যাসীর আড্ডা হতো—মানুষ আসতো...। যদি সংসারীর বিশ্বের আড্ডা হতো—মানুষ আসতো।...আমার জীবন-ধারা বিচিত্র—মানুষের বুঝতে করা যাতে পড়ে না—তাই কেউ নাগাল পায় না। আমি বেদান্তের সূত্র নিয়ে গর্জন করে শুষ্ক বিশ্লেষণ করি, আবার ওরই মধ্যে ভগবৎ-প্রসঙ্গে মানুষকে ভালবাসার প্রসঙ্গে আমার চোখে জল পড়ে, আমি যারা অত্যন্ত ছোট বলে পরিচিত তাদের সঙ্গে একত্র ছেঁড়া মাদুরে বসে তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশি, আবার আমার বেদান্তের কথাও তাদের বলি, আমি দাঁড়িয়ে ওদের বেড়া বাঁধা দেখি—এতে লোকে কি আমার সম্মান করে? করে না—তারা জানে এটা বিধবী লোকের, সংসারীর কাজ—বড়লোকও নয়—সন্ন্যাসীরও নয়···। নিজের লোকেরাই কি করে? করে না···। পিতার বিত্ত ভ্রাতারা ভাইরা নিল—কিছু বলি নি...। কত না বলার কথা আছে।···সকলকে

আমি মাতৃসর্বস্ব পিতার মত প্রাণ দিয়ে আবরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম ..কেন? শুধু এই গঠনের ঘরে দেবার জন্য...। টাকার জন্য আমি কাউকে ডাকি নি · বুকের মধ্যে একটা কথা পেয়েছিলাম—বুদ্ধিতে যাকে দেখতে পাই বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম—তাকেই মানুষের মধ্যে উপস্থাপিত করবার জন্য ডেকে-ছিলাম...। যারা এসেছ তারা যদি এই আদর্শের সঙ্গে একীভূত হতে না পার, তাহলে স্বতন্ত্র স্বার্থ নিয়ে, স্বতন্ত্র আমি নিয়ে যে যার ব্যক্তিগত প্রয়োজন রেখে কেউ এখানে থেকো না... দিয়েছেন যখন এ দায়িত্ব, নিশ্চয়ই পারি কিছু করতে ...মেয়েদের দশভুজা দুর্গা দেখতে চেয়ে ছিলাম...। যদি গণেশের মত চার হাত কালী বিকুর হতো...'আমি' যদি দিতে পারত, তাহলে হতো...। বীজ বুনে গেলাম,...হবেও হয়ত, এ আদর্শ, এ তত্ত্ব মানুষের কাছে পৌঁছোবেও হয়ত, তবে আমি সেটা দেখে যেতে পারলাম না...। কিন্তু আর মানুষ নিয়ে টানাটানি করতে চাই না·· উমাশিশীর সব অলঙ্কার নিঃশেষ করে দিয়ে ছিলাম এই মহাযজ্ঞ দিবার জন্য...। নিতাইবাবুর কাছে সেই মহাযজ্ঞ রেখে গিয়েছিলাম...তাই নিয়েই আজও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমার যাযার পূজা হয়নি সমাপন।...কেউ আমার জন্য এখানে দুখে নেই—কেননা কারো 'খেয়াল' আমি পূরণ করি নি... ...তাই খেতে তো আসি নি—এসেছি সেই তত্ত্ব আস্বাদন করতে যার মধ্যে সর্ব কৃত আত্মা হয়ে যায়···রসগোল্লা খাওয়ার সময় রসগোল্লা যেমন আত্মা হয়ে যায়, তেমনি সবলকে যদি আত্মা করতে পারতাম···পারলাম না। কে তার 'আমি'কে আমার জীবনে লয় করে দিয়ে আত্মা হবে? সংসারে কেউ সুখে নেই···। যারা এসেছ তাদের সব দিক দিয়ে সুস্থ রাখার কথা ভাবি···চিকিৎসা দেবার ভাবনাও ভাবি···। আছ যারা, আমার তত্ত্ব জীবনের সঙ্গে এক হও ·· দু মুঠ অন্ন পেয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না।...এসেছিলাম যখন মকড়দহের মধ্যে এসেছিলাম ঠাকুর তো ব্যবস্থা করেছেন। ...তোমাদের আপন করে নিতে চেয়েছি···কিন্তু তোমরা আমাকে বুঝতে পারলে না···তাই আমার সঙ্গে না মিললেই মুখ ভার করে আছে, এমনও হচ্ছে আমি সবই দেখি।··কিন্তু কালীতে প্রাণভরা তাই-এর মত মিল নেই।··কী আর বলব—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি দিয়েছ যখন শক্তি দাও। যারা আছে, তারা নিজেদের উপরেও রাগ করে আমার উপরেও করে, ঘটনার উপরেও রাগ করে। ঘটনার উপরে রাগ করলেও লাভ নাই—কেননা তাতে ঘটনাকেও আয়ত্তে আনা যায় না···। নিতাইগোপাল, কেঁদে কেঁদে গেলাম—এ প্রাণ তো মানুষকে বোঝাতে পারলাম না...। মানুষকে আমি কেমন করে ভালবাসি, বিশ্বাস করি তা আমি কেমন করে বোঝাব? ·· একজনের জমি একদিনে একত্র কিনলাম—আজ শুনি ঐ জায়গাই আমরা ১২৫৲ টাকায় কিনি, পাশের লোক ১০০৲ টাকায় কেনে।...আমি বেদান্তের নূতন রূপ পেয়েছি···আর আমার কিছু নেই।...১৯২০ থেকে এই বেদান্ত মাথায় নিয়ে চলেছি...tour-এ যেতাম, স্ত্রী উমাশিশীকে বলে যেতাম ঘরে আগুন লাগলে বেদান্ত নিয়ে বের হয়ো।···নিতাইগোপাল,...এই নূতন বেদান্তের পথে চলি তত আপন পর হয়ে গেল।.. নারায়ণ পেয়ে-ছিলাম...মানুষ মানুষ করে সারা জীবন কেঁদে গেলাম। মানুষ এলে কত আনন্দ হয়...। চিনু আসবে বলে গেল ···কত অপেক্ষা করলাম।...এখানে কেউ থাকিতে নেই... থাকিতে থাকলে আমি টের পেতাম।...[প্রণাম করে] একটী প্রণাম...পুরুষোত্তমানন্দের একটী প্রণাম নাও।··· আমায় ফেলে যেতে কারো কোন দুঃখ লাগে না।...

১৪. ২. ৫৭। ঐ ঐ। কদিন থেকে একটী কথা মনে হচ্ছিল—জড় আর জীবের পার্থক্য—ছোটদের বইতে আছে। জড় বাইরে থেকে বাড়ে, জীব ভেতর থেকে।···

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

— ১৯৫৪ —

(৬৮)

কাজেই সেখানে আমি-অবলম্বনে সাধন তখন চলিত, বর্ণাশ্রম চলিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানের মানুষ বিশ্ব-সমস্যার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই সকল সমস্যার সামনে দাঁড়াইয়া তাহাকে সমাধান খুঁজিতে হইবে। সমস্যা এড়াইয়া চলা আজ অসম্ভব। কামিনী-কাঞ্চন এড়াইয়া সাধন তাই একদিন চলিলেও আজ আর সম্ভাবনা নাই। এত বড় অনটনের মধ্যে কাঞ্চন-ত্যাগের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কামিনী-শক্তি আজ পুরুষদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, কোথায় পালাইবে? পালাইবার পথ নাই। কিন্তু 'আমি'-বোধ নাশ নাই কামিনী-কাঞ্চনকে পরিপাক করিতে। তাই শরণাগত হওয়া ছাড়া পথ আছে কি? আবেইন যত জটিল, শরণাগতির প্রয়োজনও তত বেশী। সরল আবেইনে মনে করা যাইতে পারে যে, আমি বুঝি মীমাংসা আনিতে পারিব। যে পর-বৈরাগ্যদ্বারা কামিনী-কাঞ্চনকে পরিপাক করা যায়, তাহা আনিয়াছেন শ্রীনিতাগোপাল। এত বড় দুঃসাহসিক experiment করিয়া তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহাকে আবাহন করিতে হইয়াছে—'I am a cosmopolitan'। যিনি বিশ্বরূপ, তিনিই মদনমোহন।...ঠাকুর এই বিরাট expeiment করিয়া একা, আমিও এই expeiment করিয়া একা। জটিল কুটিল আবেইনের মাঝে ব্রহ্ম-জ্ঞান দিয়া নিতাগোপাল যত।

৬ই জুলাই।

ঠাকুর, আমার জটিল কুটিল আবেইনের মাঝে তুমিই শরণ। আমার 'আমি' এতবড় জড়ের মাঝে কিছুতেই কোন সমাধান আনিতে পারিবে না। সহজ সরল আবেইন হইলেও বরং 'আমি'-র একটা স্থান থাকিতে পারিত। কিন্তু জড়ের মাঝে শরণাগত হইয়া ছাড়া 'আমি'-র আর কোনও উপায় আছে কি? তাই কুরুক্ষেত্রের বুকে তুমি ডাকিয়া বলিয়াছিলে, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। জটিল-বিক্ষুব্ধ এই তরঙ্গায়িত সংসার-সমুদ্রের মাঝে আমার 'আমি' কি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কোনও সমাধান দিতে পারিবে? তুমিই আমার এই জটিল জীবনের সমাধান। আমার সমাধান-মূর্তি নিতাগোপাল, আমাকে আত্মসাৎ কর। তোমার করুণাধারা চরণের মাঝে আমার নির্বাণ লাভ হউক। আমি তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া যাইব, মুছিয়া যাইব, তোমার প্রজ্বলিত জীবনের মাঝে নিভিয়া যাইব। সকল জটিল কুটিল আবেইন সহিত আমাকে আমি তোমার চরণ তলে নিবেদন করিতেছি। তোমার জয় হউক।...সন্ধ্যার পর মানব সিংহ আসে। তাহার সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন আলোচনা হয়। শ্রাবণ মাসের লেখা 'শ্রীনিতাগোপাল ও রবীন্দ্রনাথ-শ্রীঅরবিন্দ' প্রবন্ধটীর কিছুটা শোনান হয়।...মুহুরার কর্মকার আসে। তাহার কাছেও পড়া হয়। জিন্স্-এর লেখা 'The old physics' ইত্যাদিও পড়া হয়।...

৭ই জুলাই

ঠাকুর, তোমার বিশ্ব আমার চতুর্দিকে হইতে সরিয়া গিয়া এক মহাশূন্যের সৃষ্টি করিয়াছে। যাহারা কাছে আসিয়াছিল, তাহারা কি জানি কেন দূরে সরিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহারাও প্রাণ খুলিয়া কাছে নাই। আমার চতুর্দিকে মহাশূন্য বিরাজিত। সেই শূন্যের মধ্যে তুমি আমি এক নূতন সৃষ্টি গড়িয়া তুলিবার জন্য ধ্যান-

ময়। আমার স্বামী, তুমি ছাড়া আমার কিছু নাই। যত দিন যাইতেছে বুঝিতেছি তুমিই নবীন সৃষ্টি গড়িয়া তুলিবার মন্ত্র লইয়া আসিয়াছ। তোমার সৃষ্টি-মন্ত্র তোমার শিষ্যগণ নিল কৈ? অতীত বিশ্ব প্রেত প্রায় বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। তুমি সেখানে প্রাণ আনান কর। প্রেতাকার বিশ্ব দিব্যাকারে গড়িয়া উঠিবে আমি তোমার 'পরা' শক্তি-রূপে জাগিত হইব। তোমার সৃজনী শক্তি আমার দেহ প্রাণ মনে সঞ্চারিত হউক। বেলু ১টার বাহির হইয়া, বাস, হাইটার্স বিল্ডিং ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী হইয়া অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরী 'শ্রীঅরবিন্দের সাধন' ও 'শান্তিনিকেতন' কিনিয়া সন্ধ্যায় ফেরে। বৈকালে নীলুর চিঠি আসিয়াছে সে তৃতীয় বিভাগে ফুল ফাইনাল পাশ করিয়াছে এবং নীরার বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নীলুর পাশের খবর শুনিয়া খুব ভাল লাগিল। সঞ্জয় তার ছিল মূঢ়, প্রাণপণ করিয়াছে। সংসারের একমাত্র ছাড়িয়া আর্থিক ও পারীরিক শত অসুবিধা লইয়া সে যাহা করিয়াছে তাহাতে বাহাদুরী আছে। তাহাকে কাছে পাইলে কাজ হইত। একবার আসিয়াছিল। কিন্তু থাকিতে পারিল কই? প্রবেশ সংখ্যায় যে সব লেখা রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের তোলা হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে অনেক ভুল ছিল। নূতন বই দেখিয়া তাহা সারিয়া দেওয়া হইল।...'সমন্বয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৩১৫ সালে পৌষ মাসে। আর ঠাকুর লিখিয়াছেন অন্যূন: ১২৯০-এ। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে নিত্যগোপালই সকলের পূর্বে অত্যাচ্চ সমন্বয়ের বার্তা মানুষের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ের একদেশ মাত্র প্রচার করিয়াছেন—সর্বধর্মসমন্বয়—কালী কৃষ্ণ আল্লা যীশু সমন্বয়। নিঃসন্দেহে শ্রীনিত্যগোপালেই সমন্বয় যুগ। এ যুগ তাঁহারই যুগ।.. তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমান যুগ বিবর্তিত হইতেছে। তাঁহার কাজ ধীরে ধীরে হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

৮ই জুলাই

ঠাকুর, আমার সকল ধন আমাকে ছাড়িয়াছে, সকল সম্প্রদায় এমন কি তোমার সম্প্রদায় পর্যন্ত আমার পর হইয়া গিয়াছে। সকল দল লইয়া যে এক অখণ্ড দল, আমি সেই দলে থাকিতে পারি। কিন্তু সেই দল কোথায়? তোমাকে লইয়া তো তোমার সম্প্রদায়ই আজ বিপন্ন। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস-কৌলীন্যে বিভোর, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-কৌলীন্যে মত্ত। কে বলিল 'সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য হেয় এ বোধও 'বন্ধন'? কে বুঝিল, 'বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ নাই'? কেন তাহারা আমাকে চাহিবে? তাহাদের যে 'দেশা' বন্ধ হইয়া যায়। কুলী মিলিতেই অসুবিধা হয়। সন্ন্যাস ও ব্রাহ্মণত্ব একটী vested interest হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ তুমি আসিয়াছিলে সাম্য মৈত্রীর বাণী লইয়া। তুমি সর্ব উপাধির আবরণ ভেদ করিয়া একটী সমগ্র মানুষ রূপে সকলকে গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছিলে। কোথায় তুমি তোমার আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে? কে তোমাকে সগৌরবে স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে?... প্রায় ১টায় সুশীলা ভাবিনীবাবু আসেন। এখনও কি করা কর্তব্য স্থির হয় নাই।...আজ 'শ্রীঅরবিন্দের সাধন' হইতে পূর্ণযোগের তাৎপর্য ও 'পূর্ণ-যোগের সাধন প্রণালী' পড়ি। সিদ্ধান্ত অংশ মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু মায়া অবিদ্যার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি, কেন অপরা প্রকৃতির ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া পরাপ্রকৃতির ক্ষেত্রে যাইতে হইবে, অপরা প্রকৃতি কেমন করিয়া পুরুষোত্তমের অংশ জীবাত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিল, এখন অপরা প্রকৃতির এই কর্ম সম্বন্ধে পুরুষোত্তমের কি attitude হইবে, উহা কি পুরুষোত্তম অনুমোদিত না পুরুষোত্তম সে সম্বন্ধে উদাসীন ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা নাই। নিত্যদর্শন ইহার স্পষ্ট সহজ মীমাংসা দিয়াছে। মায়া অবিদ্যা দুই-ই তাঁহার শক্তি। অবিদ্যা কর্মশক্তি, বিদ্যা জ্ঞানশক্তি। 'বিদ্যা-অবিদ্যা যে তনু'। অবিদ্যার ক্ষেত্রকে বিদ্যা দ্বারা create করিয়া চলিতে হইবে। 'বহু'র দিকই অবিদ্যার দিক, একের দিকই বিদ্যার দিক। বিদ্যা-অবিদ্যা দুই-ই সনাতনী, অবিনাশিনী। ১০টায় উপরে আসি।...আজ ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী কল্য ১৫ই জুলাই হইতে যেমন প্রথা পশ্চিমবঙ্গ হইতে উঠিয়া গেল—আধিকার পত্রিকায় এই খবর বাহির

হইয়াছে।

১৪ই জুলাই

ঠাকুর, তুমি আমার সব—'সর্বাণি সর্বম্', আমার দেহ প্রাণমন, ধনজন, সহায় সম্বল সব তুমি। তুমি ছাড়া 'আমার' বলিতে আর কিছু নাই। তুমিই দ্রষ্টা-দর্শন সমন্বিত, ভোক্তা-ভোগ-ভোগ্য সমন্বিত, পরিপূর্ণ জগন্নাথ, জগদ্বন্ধু, নীলাচল—তুমি বিশ্বরূপে প্রসাদরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য সবস্বরূপরূপ রথ যাত্রায় বাহির হইয়াছ। আজ আমার পুনর্যাত্রা। ব্রহ্মানন্দ হইতে বিজ্ঞানানন্দে বা প্রজ্ঞানানন্দে এবং বিজ্ঞানানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দে—ইহাই তো তোমার পুর্ণযাত্রা। তোমার পদধূলি চুম্বন করিয়া ধন্য আজ শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিবে। সাম্য-মৈত্রীর ক্ষেত্রই তোমার শ্রীক্ষেত্র। অন্নগত সাম্য, প্রাণসাম্য, মনসাম্য, বিজ্ঞানসাম্য, আনন্দসাম্যই তো তোমার ক্ষেত্রে ঘনীভূত। আমার আবেষ্টন তোমার পরশ পাইয়া গড়িয়া উঠুক 'প্রসাদ' রূপে।...'অরবিন্দের সাধনা' কিছুটা পড়ি। প্রতিভা 'শান্তিনিকেতন' হইতে পড়িয়া শুনায়। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকিয়া মাকে পায় না। মাকে ছাড়িয়াই মাকে পায়। প্রসব বেদনার মধ্যে আসে ভিতরে নাড়ীর টান। আবার বাহির হইবার জন্য প্রবল টান—বিপরীতমুখী টান। বাহিরে সন্তান আসিতে চায়, কিন্তু সে তো বাহিরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তবুও তাহাকে বাহির হইতেই হইবে, নইলে তাহারও মৃত্যু, মায়েরও মৃত্যু। মুক্তিতে মানুষ ও বিশ্ব দুই-ই মুক্ত হয়

১৫ই জুলাই

১১ বৎসর পর আজ প্রকাশ্য বাজারে প্রথম ৵১ সের চাউল ক্রয়—৵১০ আনা দাম। ঠাকুর, সঙ্গী আমার, দুর্যোগময় এই পথ-চলার মধ্যে তুমি আমার সঙ্গী। আমি তোমার সঙ্গ চাই-ই। তোমার বিশ্ব ভুবনের মাঝে দাঁড়াইয়া সকলের পাওয়ার সঙ্গে পাওয়া মিলাইয়া আমি তোমার সঙ্গে থাকিতে চাই। আমার মত করিয়া তোমায় চাহিলে তো তোমার 'জগন্নাথ' রূপের কোনও অর্থ হয় না। আমি তোমার মত করিয়া, তোমার বিশ্বের মত করিয়া তোমাকে পাইতে চাই। তোমাকে সত্য করিয়া পাইতে হইলে 'আমি'-র বাধা থাকিলে তো পাওয়া হইবে না। আমি প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গ পাইতে চাই। নির্বিকল্প না হইলে, নিজের সর্ব সংস্কার মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে কি করিয়া সত্যের সঙ্গে দেখা হইবে? বস্তু তাহার নিজ সত্তা আড়াল করিবে, যদি আমি আমার পরিচ্ছিন্ন 'আমি' লইয়া তাহার কাছে হাজির হই। আমার 'আমি'-র ছাপ সে নিতে চাহিবে কেন? নিত্যগোপাল, সিদ্ধ তোমার চিহ্নে চিহ্নিত হউক। তোমার বিশ্বের জয় হউক। দুইদিন ঘুরিয়া আজ এই বাজার হইতে ৵১ সের চাউল ৵১০ আনায় কিনিয়া আনা হয়। বাজার হইতে চাউল কেনার যে বাধা ছিল ১১ বৎসর পর তাহা ১৫ই জুলাই অপসারিত হইয়াছে। মুক্তির আনন্দ যে কি তাহা আস্বাদন করিলাম। শান্তি বাবুনীকে বিদায় দেওয়া হইল; নূতন বাবুর্চী বৈকাল হইতে—নাম সুন্দরী নিযুক্ত—হইল। ৪টায় টালীগঞ্জের ইন্দুলেখা রায় চৌধুরাণী অমৃতালহ আসেন। শান্তিনিকেতন হইতে প্রথম অংশ রেণু পাঠ করিয়া শোনায়। রবিবার পাঠ হইতেছে বলিয়া আসিয়াছিল। আগামী মঙ্গলবার শতবার্ষিকী কার্যকরী সমিতির সভা ৬।০টায় হইবে। নোটিশ হস্তগত করাইতে আসিয়াছিল। হস্তগত করিয়া দেই।

১৬ই জুলাই

ঠাকুর, তোমার দেহ, বিশ্বদেহ ও আমার দেহের মধ্যে 'যোগ' স্থাপিত হউক, তোমার প্রাণ-মন ও আমার প্রাণ মনের মধ্যে যোগ স্থাপিত হউক—কর্মে জ্ঞানে ভক্তিতে তোমার আমার যোগ গড়িয়া উঠুক। আমি যোগী হইব, তুমি আমি মিলিয়া একাকার হইব, বিচ্ছেদের জ্বালা, পৃথক্‌ত্বের বেদনা ঘুচিয়া যাউক। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি এক 'unification' এ অদ্বৈত হইব। তোমার বড় যা কিছু সব আমার হউক, আমার ছোট যা কিছু সব তোমার হউক। তোমার আমার জীবনে 'বিনিময় ধর্ম' স্থাপিত হউক, জীবন-বরণ হউক। তোমার জীবন আমার জীবন গড়িয়া গিয়া এক হউক। সারাদিনই 'শ্রীঅরবিন্দের সাধনা' পড়ি। এই সাধনায় প্রাণ ও হৃদয়ের স্থান কোথায়।

ইহা রক্তহীন (bloodless)। অতিমানসের মধ্যে কোনও ঘাপাঘাপি নাই? সৃষ্টি তো হইবে ভাগবত মনের (?) সে জন্য কোনও বেদনা নাই। অরবিন্দের সাধনায় ও তাঁহার জীবনে প্রাণের স্থিত অতি অস্ফুট। সর্ব সমন্বয়ের কথা উহারা বলেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে নাস্তিক্যবাদ ও বৌদ্ধ দর্শন কি সমন্বিত হইয়াছে? একত্বের গৌরবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা শঙ্কর-দর্শনের অনেকখানি অগ্রগামী দর্শন। শ্রীনিত্যগোপাল ইহা হইতেও অগ্রগামী দর্শনের খবর দিয়াছেন। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ জীবাত্মা কেমন করিয়া 'অবিদ্যা'র স্পর্শে কলুষিত হইল? অবিদ্যা কোথায় ছিল? অবিদ্যা কি এমনই শক্তিশালী যে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধকেও (?) আনিতে পারে? এই সব প্রশ্নের উত্তর এখানে নাই। এখানে 'hierarchy' মানা হইয়াছে, reasoning-in-a circle আছে। যুক্তির অবতারণা ইহারা করেন বটে, কিন্তু জটিলতা যেখানে সেখানেই শাস্ত্রের দোহাই দেন। চেতনাই মূল্য স্থান লাভ করিয়াছে, জড় গৌণ। জড় চেতনারই অভিব্যক্তি। জড়ের কোন স্বয়ং মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রেণু বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। চিরানন্দ আসে সভলে। হিসাবে কি গরমিল হইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য। তাহারই ভুল হইয়াছে। তারিণীবাবু সারাদিনেও আসিলেন না।

১২ই জুলাই

ঠাকুর, সাথী আমার, আমাকে নিরঞ্জন কর, তোমার লীলা-সাথী, লীলা-সহচর হইবার অধিকার প্রদান কর। আমার জীবনের প্রতি স্তরের সাথী তুমি, প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথী তুমি, তুমি আমার জীবনের মূল আধার। তোমার রস পান করিয়া আমি বাঁচি, চলাফেরা করি। আমার মাথা গুঁজিবার স্থান ঐ চরণ। তোমার বুকেই আমার লুকাইবার স্থান। ওগো মহাসাগর, তোমার মাঝে আমি ডুবিয়া যাইব, মুছিয়া যাইব। তোমার আমার ব্যবধান তিরোহিত হউক। তুমি আমার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ, আমিও তোমাকে সৃষ্টি করিয়া চলিব। তোমার সৃষ্টি ও আমার সৃষ্টি মিলিয়া এক দিব্য ভাগবত সৃষ্টি এই ধরার বুকে অমিয়া উঠিবে। সুদর্শনের জন্য আমার লেখাটা রেণু আজ লেখে। আজ আর রেণু বাহির হয় না।...তারিণীবাবু আসিল না দেখিয়া প্রতিভাকে দিয়া আজিকার কার্যকরী সমিতির সভায় যোগদান না করার চিঠি পাঠাইয়া দেই। তাহাতে লিখিলাম, 'বিশেষ কারণে অদ্যকার কার্যকরী সমিতির সভায় যোগদান না করিতে পারায় জন্য আমি দুঃখিত। ...মঠের লোকেরা কেবল 'প্রসাদ' চিনে। কোন তত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন নাই। এইবারকার গুরুপূর্ণিমায় জন্য ৩৫০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। গুরুপূর্ণিমার সভা করিবার ইচ্ছা ছিল। কে করিবার জন্য বসিয়া আছে? ...ঠাকুর কোথায় তুমি? আমাকে কে একা রাখিলে? তোমার মত কাহার জীবন আছে? অথচ তুমিই রহিলে আড়ালে? কি আর আমি করিব?...

১৩ই জুলাই

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থাক। আমার সকল চিত্তবৃত্তি, সকল কর্ম, সকল জ্ঞান ও সকল প্রীতি তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলুক। আমার আর কি আছে তুমি ছাড়া? তোমাকে বুকে করিয়া বরদানা হইয়া ছিলাম দুনিয়ার বুকে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে। তোমাকে যার তার হাতে হারাইয়া ফেলিলাম। কি বেদনা আমার! উহারা কি কিছু করিবে? তোমার নামে এক উৎসব করিয়া শুধু খাইবে, খাইবে। ইহাই তো এতদিন করিয়া আসিয়াছে। এত প্রয়োজন ছিল বিশ্বের তোমাকে দিয়া। বিশ্বের কাছে তোমাকে পৌঁছাইতে পারিলাম না। এত কথা, এত তত্ত্ব, এত লেখা কাহার আছে? তবুও তুমিই রহিলে অপরিচিত। বিশ্বে যে সব চেয়ে 'আপনার', তাহাকেই বুঝি বিশ্ব কম চেনে।

ক্রমশঃ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় অন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আবৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

একোনচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকানুসারে 'ব্রহ্মৈবাস্মীতি'। বাসনা করিলেই যদি আমি-ব্রহ্ম বোধ হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না। ঐ প্রকার বাসনাদ্বারা আমি-ব্রহ্ম বোধ হইতে পারে যদি স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে অবিদ্যার এক প্রকার বিকাশ বাসনা-দ্বারা বা সাহায্যে আত্মজ্ঞান বা আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইতে পারে স্বীকার করা যায়। অবিদ্যার বিকাশ বাসনার সাহায্যে আমি-ব্রহ্ম এই জ্ঞান যদি হইতে পারে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অন্ধকার দ্বারা আলোক দর্শন করা যায়, ইহা স্বীকার করা হয় না কেন?

চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তত্রিংশ, অষ্টত্রিংশ, একোন-চত্বারিংশ, চত্বারিংশ, একচত্বারিংশ ও দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে অদ্বৈততার পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, ঐ সকল শ্লোকের কোনটিতেই শঙ্করাচার্য্য আত্মা বা পরমাত্মার সহিত নিজের একতা বা অভেদত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনিই ঐ গ্রন্থের সপ্তত্রিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্তধীঃ।"

'ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্তধীঃ' বলায়, আমি-আত্মার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। ঐ শ্লোকাংশমতে বোঝা যায়, শঙ্করাচার্য্য যেন ঐ শ্লোকাংশে আপনি ব্যতীত অন্য কোন আত্মার বিষয় বলিতেছেন। আত্মবোধের অষ্টত্রিংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্মলাকাশবৎ সদা।"

উক্ত শ্লোকেও শঙ্করাচার্য্য, আমি-আত্মা নিজে আমি-আত্মাকে নির্মলাকাশবৎ সর্বদা ভাবনা করি, বলেন নাই। সুতরাং উক্ত শ্লোকেও অদ্বৈততার অভাব। একোন-চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"রূপবর্ণাদিকং সর্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণ চিদানন্দ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতি॥"

উক্ত শ্লোকে পরমার্থবিৎ সমস্ত রূপ-বর্ণাদি পরিহার করত পরিপূর্ণ চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থান করেন বলায় উক্ত

শ্লোকেও অদ্বয়োপাধি-বিশিষ্ট শঙ্করাচার্য্যোক্ত সহিত পরিপূর্ণ চিদানন্দ স্বরূপের সহিত তাঁহার অভেদত্ব বা ঐক্য বুঝিবার কোন কারণ নাই। সেই জন্য উক্ত শ্লোকেও অদ্বৈততার অভাব বুঝিতে হইবে। চত্বারিংশ শ্লোকে—

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দ স্বরূপত্ব তস্মাতে স্বয়মেব হি ॥"

বলায় বুঝিতে হয়, জ্ঞাতৃ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, এই যে তিন প্রকার প্রভেদ, ইহারা পর আত্মাতে দৃষ্ট হয় না। কারণ পরাত্মা যেমন, ঈশ্বর এক প্রকারতাই বিদ্যমান। সুতরাং সেইজন্য তাঁহাকে জ্ঞাতৃত্ব বলা যায় না, সেইজন্য তাঁহাকে জ্ঞানও বলা যায় না, সেইজন্য তাঁহাকে জ্ঞেয়ও বলা যায় না। ঐ তিনের কোনটিও তাঁহাতে বলা যায় না বলিয়া তিনি অবশ্যই অজ্ঞাতৃ, তিনি অবশ্যই অজ্ঞান, তিনি অবশ্যই অজ্ঞেয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাও স্বীকার করা হয়। কোন কিছুতে বিদ্যমান থাকা বা থাকায় এবং কোন কিছু এক বস্তু নহে সেইজন্য কোন কিছুতে বিদ্যমান থাকা বা থাকায় এবং কোন কিছু অভেদও বলা যায় না। 'জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে' বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞাতৃ জ্ঞান জ্ঞেয় এবং পরাত্মা বা পরমাত্মা অভেদ বলা যাইতে পারে না। কারণ চত্বারিংশ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মাতে জ্ঞাতৃ বা জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ ভেদ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। যাঁহাতে ঐ ত্রিবিধ ভেদ বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না বলা হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই স্বয়ং ঐ ত্রিবিধ ভেদ বা পার্থক্য নহেন। শঙ্করাচার্য্য জ্ঞাতৃ, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয়কে ভেদ, প্রভেদ বা পার্থক্য বলিয়াছেন বলিয়া ঐ তিনের কোনটিকে শঙ্করাচার্য্যের এবং অন্যান্য অদ্বৈতবাদীদিগের মতে আত্মা বলা যায় না। অদ্বৈতমতে আত্মার বহু-প্রকারতা নাই। সেই জন্য ঐ তিনকে অনাত্মা অবিদ্যারই তিন প্রকার বিকাশ বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য উক্ত চত্বারিংশ শ্লোকে স্বয়ং পরাত্মাও স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্যের সহিত ঐ পরাত্মা-চিদানন্দেরও অভেদত্ব উক্ত শ্লোকানুসারে প্রতিপন্ন করা যায় না। সেইজন্য উক্ত-শ্লোকেও অদ্বৈততা নাই বলিতে হয়। এক চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতির্জ্বালা সর্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা-অরণিতে জ্ঞানাগ্নি আছে। ধ্যানদ্বারা তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই আত্মারণি হইতে প্রকাশিত জ্ঞানাগ্নি সমস্ত অজ্ঞান-কাষ্ঠই দহন করে। অতএব অদ্বৈতমতে ধ্যানও হেয় নহে। সে মতে ধ্যান-সাহায্যেই আত্মারণি হইতে জ্ঞানাগ্নি প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতে ধ্যানদ্বারা জ্ঞানও আত্মা হইতে প্রকাশিত হয়। সেই ধ্যানদ্বারা প্রকাশিত জ্ঞানই সমস্ত অজ্ঞান-কাষ্ঠ দহনেরও কারণ হয়। চকমকির পাথরেও অব্যক্তভাবে অগ্নি আছে, অথচ চকমকির পাথর ও তাহার মধ্যস্থিত অগ্নি অভেদ বা এক পদার্থ নহে। ঐ প্রকারে আত্মারণি ও তাহার মধ্যস্থিত অগ্নি অভেদ বা এক বলা যাইতে পারে না। উক্ত চত্বারিংশ শ্লোকের মন্তব্যেও মীমাংসিত হইয়াছে পরাত্মা এবং জ্ঞান অভেদ নহে। আত্মারণি বলিলে আত্মার একপ্রকারতা বা অদ্বৈততা প্রতিপাদিত হয় না। কারণ আত্মাকে অরণি বলিলেই আত্মার দ্বি-প্রকারতা স্বীকার করা হয়। অরণি অর্থে অগ্নি-সম্পন্ন কোন প্রকার কাষ্ঠ স্বীকার করিলেও দ্বি-প্রকারতা স্বীকার করা হয়; কারণ সেই কাষ্ঠ এবং তন্মধ্যস্থ অগ্নি, এই ত দ্বি-প্রকার। অরণি অর্থে, চকমকির পাথর স্বীকার করিলেও দ্বিপ্রকারতা স্বীকার করা হয়, এক প্রকার চকমকির পাথর এবং অন্য প্রকার মন্থনস্থ অগ্নি। অতএব আত্মাকে অরণি কহিলেও অদ্বৈততা, সেই আত্মা শব্দ দ্বারায় স্বীকার করা হয় না। শঙ্করাচার্য্য উক্ত একচত্বারিংশ শ্লোকে 'আত্মারণৌ' বলায়, তিনি নিজেই আত্মারণি, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। সুতরাং সেইজন্যও উক্ত একচত্বারিংশ শ্লোকে অদ্বৈততা বা অভেদত্ব নাই। দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আকৃষ্যৈনেব যোগেন পূর্ণত্বং তিমিরে হৃতে।
তত্র আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥"

যে সময় সূর্য্য-প্রকাশ দর্শন করা যায়, সে সময় সূর্য্যালোকও দর্শন করা যায়। সূর্য-প্রকাশের পূর্ব্বেও সূর্য্যে আলোক থাকে। তবে তিনি যতক্ষণ না আমাদের দৃষ্টি-গোচর হন, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার আলোক দেখিতে পাই না। তজ্জন্য, বলিতে পারি না, সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বে আলোকবিহীন থাকেন। সূর্য্য-নামক অন্ধকার, সূর্য্যোদয়ে তিরোহিত হয়, কোন শাস্ত্রেও নাই, কোন জ্যোতিষেও নাই। জ্যোতিষ এবং অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে সূর্য্যালোকে অন্ধকার দূর হয় বটে, কিন্তু সে অন্ধকার সূর্য্য-নামক নহে। উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে আকাশস্থ সূর্য্য তিমির নাশ করেন বুঝা যায়, কিন্তু আত্মা-সূর্য্য বা অংশুমান কি প্রকারে তিমির বা অন্ধকার দূর করেন তাহা, দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হয় নাই। যদি আত্মা-সূর্য্য অজ্ঞান-অন্ধকার তিরোহিত করেন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থান কোথা, তাহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। যদি বলা যায় হয়, সেই অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থান আত্মা, তাহা হইলেও তাহা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ চত্বারিংশ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে 'জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ত্রয়ঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।' পরাত্মাতে জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ ভেদ বা বিভিন্নতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই পরাত্মাতে বা আত্মাতে অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থানই বা কি প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইবে? শঙ্করাচার্য্যের মতে যে পরাত্মা বা আত্মার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ নাই, যাঁহাতে জ্ঞানরূপ আলোকের বিদ্যমানতা নাই, তাঁহাতে অজ্ঞান-অন্ধকারের বিদ্যমানতাই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? তবে আত্মা-সূর্য্য বা অংশুমান কোথাকার অন্ধকার হৃত বা বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হন? অপরন্তু উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে অংশুমান সূর্য্যের সহিত আত্মার তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া, আত্মা-সূর্য্যে বা অংশুমানে কোন-কালেই অজ্ঞান-অন্ধকারের অবস্থিতি স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচরে হইবার পূর্ব্বেও তাঁহাতে আলোকাভাব থাকে না। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে হইবে, আত্মা-সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত বা আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেও তাঁহাতে জ্ঞানালোকের অভাব থাকে না, সুতরাং তাঁহাতে অজ্ঞান-অন্ধকারের বিদ্যমানতা থাকিতে পারে না। যেমন এক সঙ্গে আলোক এবং অন্ধকারের প্রকাশ কখনই থাকিতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানাজ্ঞানের প্রকাশ এক সঙ্গে কখনই থাকিতে পারে না। উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে, আত্মাকে অংশুমানের সঙ্গে তুলনা করায় অনেকে বলেন, অংশুমানের যেমন অংশু বা আলোক আছে, তদ্রূপ আত্মাংশুমানেরও জ্ঞানাংশু বা জ্ঞানালোক আছে, কিন্তু উপরোক্ত চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে তাহা স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উক্ত শ্লোকমতে জ্ঞান নামক ভেদ বা পার্থক্য, পরাত্মা বা আত্মাতে নাই, সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মার জ্ঞানাভাব স্বীকার করিতে হয়। পরমাত্মাতে জ্ঞানাভাব স্বীকার করিলে কেহ কেহ বলেন, তবে সেই পরমাত্মাতে বা পরাত্মাতে অজ্ঞানেরই কি বিদ্যমানতা স্বীকার করা যাইবে? তাহাও নানা উপনিষৎ বেদান্ত এবং বেদান্ত-প্রতিপাদক নানা গ্রন্থানুসারে স্বীকার করা যায়; কারণ এই সকল গ্রন্থমতে অজ্ঞানটা বিকার। ঐ সকল গ্রন্থমতে আত্মা, পরাত্মা, বা পরমাত্মা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন এবং নির্ম্মল; সুতরাং সেই নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-নির্ম্মলতার সহিত বিকার-অজ্ঞানের কোন সংস্রবই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সেই নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-নির্ম্মলাত্মাকে অজ্ঞানাতীতও বলিতে হয়। উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে, সেই আত্মার সহিত শঙ্করাচার্য্য নিজের অভেদতা প্রতিপন্ন করেন নাই। তজ্জন্য ঐ আত্মার সহিত শঙ্করাচার্য্যের অভেদতা বা ঐক্যও স্বীকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

একচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,

"আত্মাত্বং সততং প্রাপ্তোঽপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা।"

উক্ত শ্লোকাভাসে সতত আত্মা প্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্যার দ্বারা তিনি অপ্রাপ্তবৎ বলা যায় না। কারণ, কে সতত আত্মা প্রাপ্ত হইয়াও, অবিদ্যা দ্বারা সেই আত্মাকে অপ্রাপ্তবৎ বোধ করেন? যিনি ঐ প্রকার বোধ করেন, তিনি কি আত্মা ব্যতীত অপর কিছু? যিনি ঐ প্রকার বোধ করেন, তিনি নিশ্চয়ই আত্মা ব্যতীত অপর কিছু নহেন। সে সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকে—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে,
মৃদো ঘটাদীনি ভাণ্ডানং সর্ব্বমীক্ষতে॥"

যখনই প্রমাণ করিতেছে, ভ্রান্তিবশতও কি নিজে থাকিতে, কাহারও নিজে নাই বোধ হয়? তাহা কখনই হয় না। তবে আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ত্রি-চত্বারিংশ শ্লোকে—

"আত্মা তু সততং প্রাপ্তোঽপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া,
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা॥"

কি অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে? শঙ্করাচার্য্যের মতেও আত্মা, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল প্রভৃতি। সুতরাং সেই আত্মার কখন ভ্রান্তি হয়, স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সেই আত্মার আত্মজ্ঞান কখন লুপ্ত থাকে, অপ্রকাশ থাকে বা থাকে না, স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য কখনই সতত-প্রাপ্ত আত্মা, সেই সতত-প্রাপ্ত-আত্মা অপ্রাপ্তবৎ-বোধ, অবিদ্যা প্রভাবেও হইতে পারেন না। কারণ, নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-নির্ম্মল-নিত্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন-আত্মার উপর কখনই অবিদ্যার প্রভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই জন্য উক্ত ত্রি-চত্বারিংশ শ্লোকের শেষ চরণাভাসের 'তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা'ও বলা যাইতে পারে না। আর শঙ্করাচার্য্যেরই আত্ম-নাত্মবিবেকাভাসের ঐ অবিদ্যার নাশও হয় স্বীকার করা যায় না। উক্ত গ্রন্থে অবিদ্যাকেও অনাদি বলা হইয়াছে। অনাদি যাহা ন্যায়ত তাহার নাশ, স্বীকারই করা যাইতে পারে না। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মও অনাদি—সে মতে তাহার কি নাশ স্বীকার করা হয়? তবে আত্মবোধ গ্রন্থে অনাত্ম-বিনাশই বা নাশ হয়, স্বীকার করা হইয়াছে কেন? আমি-আত্মা, আপনাকে কখন প্রাপ্তও হই না এবং কখন অপ্রাপ্তও হই না। আমার পক্ষে আমি ত সততই রহিয়াছি। তবে আমি-আত্মার, আমি-আত্মাকে প্রাপ্ত হইবারই বা প্রয়োজন কি? আমি-আত্মার পক্ষে আমি-আত্মা সতত রহিয়াছি বলিয়া, আমি-আত্মাকে আমি-আত্মার কখনই অপ্রাপ্তবৎ বলিয়া বোধ হয় না। ঐ প্রকার বোধ হইতেই পারে না, ঐ প্রকার বোধ হওয়া বলা বৃথা প্রলাপ; কারণ ঐ প্রকার বলাও অসত্য। আমি-আত্মা ব্যতীত অপর কোন্ বস্তু, আমি-আত্মা প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত হইতে পারি? আমি-আত্মা আপনাকে প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত হইতে পারি না।

দ্বি-চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুশ্চত্বারিংশ

হইয়াছে,—

"স্থানৌ পুরুষবদ্ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে॥"

স্থাণুও ভ্রান্তিবশত আপনাকে পুরুষবোধ করে না, সুতরাং ব্রহ্ম বা ব্রহ্মও ভ্রান্তিবশত আপনাকে জীব-বোধ করেন, স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম আপনাকে কখন ভ্রান্তিবশত জীব-বোধ করেন স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন প্রভৃতিও বলা যায় না। নিবিড় অন্ধকার রাত্রে একজন মনুষ্যের দূরস্থ স্থাণু-দর্শনে তাহাকে আপনি ব্যতীত অপর কোন-মনুষ্য বা পুরুষ-বোধ হইতে পারে সত্য; কিন্তু যে জীব ভ্রান্তিবশত ব্রহ্মকে জীব বোধ করেন, সেই কল্পিত জীবটি মিথ্যা স্বীকার করিলেও, যে জীব সেই ব্রহ্মকে কল্পিত জীব দর্শন করেন, সেইজন্য তিনি স্বয়ং কল্পিত বলিয়া কখনই প্রতিপন্ন হইবেন না। কারণ যে মনুষ্য বা পুরুষ নিবিড় অন্ধকার রাত্রে দূরস্থ কোন স্থানকে ভ্রান্তিক্রমে আপনি ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য বা পুরুষবোধ করে তাহার সেই ভ্রান্তি অপনীত হইলে স্থাণুকে, স্থাণুই দর্শন করে বটে।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব বিগত ২৪শে কার্তিক ১৩৭৫ (ইং ১০ই নভেম্বর ১৯৬৮) রবিবার কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৬-তম জন্মতিথি উৎসব তাঁহার পুণ্য সমাধি নরনারায়ণ আশ্রমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আশ্রম-দেবতা শ্রীশ্রীবিজ্ঞানগোপালদেবের পূজা অন্তে আশ্রমস্থ শিশুবিদ্যালয়ের শিশুগণসহ প্রায় তিনশত লোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে। বিকাল ৪টায় সভায় শ্রীমৎ স্বামিজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করা হয়। জনাব রেজাউল করীম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহুলোকের অভিভাষণ বর্তমান এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। ইহা ছাড়া শ্রীঅনাদিনাথ সিংহ ত্রিপিটাক, মৃণালিনী মহাবিদ্যালয়, তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠে শ্রীমৎ স্বামিজীর রাজনৈতিক জীবনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে স্বামিজীর বক্তৃতা আধ মাইল দূর হইতেও স্পষ্ট শোনা যাইত এমনই ছিল তাঁহার গলার স্বরের volume, এবং কয়েকহাজার লোক নিঃশব্দ মনোযোগ লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ বক্তৃতা শুনিত।

সভাপতি জনাব করীম সাহেব বলেন যে শ্রীমৎ স্বামিজী ছিলেন বিপ্লবী সন্ন্যাসী, একাধারে দার্শনিক; রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন অক্লান্ত কর্মী তেমনি অনুপ্রেরণা-দাতা, জীবনের নূতন মূল্যবোধে সমাজ-সংস্কারক, নূতন যুগের নূতন সন্ন্যাসী, নূতন গৃহস্থও—তিনি একজন নূতন মানুষ।

শ্রীমৎ স্বামিজীর এই জন্ম-উৎসব ক্ষণে সর্বসাধারণের কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, শ্রীমৎ স্বামিজী ব্রহ্মসূত্র গীতা ও এগারখানা উপনিষদের গতিধর্মাত্মক ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে এ পর্যন্ত ব্রহ্মসূত্র ও নয়খানা উপনিষৎ ছাপা হইয়াছে, কিন্তু গীতা এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষৎ এ পর্যন্ত ছাপা হইয়াছিল না। আমরা অর্থের সংস্থান এখন পর্যন্ত করিতে পারি নাই—তবু অসীম সাহসের সঙ্গে গীতা ছাপানো আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতাতে কাজ অবশ্যই হইবে বিশ্বাস রাখি—সকলের নিকট আবেদন তাঁহারা যেন যিনি যাহা পারেন সাহায্য পাঠাইয়া দেন। যুগান্তকারী এই নবীন চিন্তাধারা যদি মুদ্রিত না হইয়া বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার একটী অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হইবে—বিভ্রান্ত মানুষের চলার পথরেখা যাহা ফুটিয়া উঠিতে পারিত এই চিন্তাধারার প্রকাশে, তাহা আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। জীবন-পথিক একবার ভাবিয়া দেখুন সর্ব সমন্বয়ের পথরেখাটী কি। আমরা সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

খেলারী, পালামৌ—২৭শে কার্তিক ১৩৭৫ (ইং ১৩ই নভেম্বর ১৯৬৮) রবিবার স্থানীয় যুবসঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার মহাশয়ের মাঠাপুরস্থ "কবিতা-নিলয়" এর মুক্ত প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৬ তম স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নরনারায়ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা 'উজ্জীবনায়ত' হইতে নানান প্রবন্ধকারদ্বারা স্বামীজির জীবনী সংগ্রহ করে স্বামীজীর বাল্যকাল হইতে জীবিতকাল ব্যাপী কর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচরণের আলোক প্রকাশ করেন অনিলবাবু তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে। তারই হিন্দী অনুবাদ পাঠ করেন শ্রীবলি কিশোর সিংহ।

বৈকালিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য অতিথির সমাবেশ হয়। তাতে স্বামীজির ত্যাগ, নিষ্ঠা, অসীম গুরুভক্তি, দেশ-সেবা সমাজ তথা গ্রামোন্নয়ন বিষয়ের তথা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আলোচনা হয়।

সভাপতি নবীনচন্দ্র ঝা মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ছন্দোবদ্ধ ও সাদি পুষ্পমাল্য মধ্যে সভার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করেও স্বামীজি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতেও উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে সভাপতি বর্ণনা করেন।

বাল-গোপাল বা শিশুদের দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পায়েস (মিষ্টান্ন) (ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব ঠাকুরকে নিবেদন করে) আদি বিতরিত হয়। বড়দের খিচুড়ীভোগ এবং মিষ্টান্ন

পরিবেশিত হয়।

পঁচিশ জন অক্ষম (অশক্ত) ব্যক্তিকে ঘৃত (বস্ত্র) বিতরিত হয়। চা-পান-বিড়ি অথবা যে কোন মাদকদ্রব্য বর্জন ও বেদ উপনিষদের দুই সংস্করণ নিয়ে সভার কার্য শেষ হয়:—ব্যক্তি সমাজদ্বারা কর্তৃক সংসার প্রেরিত।

গীতাজয়ন্তী:—বিগত ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩—১লা অগ্রহায়ণ ১৩৯০ শুক্রা একাদশীতে শ্রীশ্রীগীতাজয়ন্তী দিবস ছিল। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার অবধূত তাঁর নিয়মিত প্রতি শনিবার পাঠ করেন শ্রীমতী সুনীতি চক্রবর্তী তাঁহার বালী গ্রামে প্রস্থাপিত গীতা-সঙ্ঘে। অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ জন বয়স্কা মহিলা প্রতি সপ্তাহে গত কয় বৎসর ধরিয়াই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের লেখা গীতার নূতন ধরণের ভাষ্য শুনিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা গত তিনচার বৎসর ধরিয়াই গীতাজয়ন্তী উৎসব সাধ্যমত পালন করিয়া থাকেন। এ বৎসরও মহিলারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া সকলে মিলিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের, সমন্বয়মূর্তি শ্রীশ্রীনিতাগোপালের এবং শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের পূজা অন্তে খিচুরী বা লুচি প্রসাদ বিতরণ করেন। দুপুরে এবং বিকালে সভার পরে মিলিয়া দুই শত জন মানুষ প্রসাদ পাইয়াছিল। অতঃপর বিকাল ৫টাতে প্রায় ৭০।৮০ জন প্রধানতঃ মহিলার সমাবেশে বর্তমান যুগ-চেতনায় গীতার শিক্ষা আলোচনা করা হয়। শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী, শ্রীসার্বভৌমাব বিশ্বাস ও শ্রীরেণু মিত্র শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রস্থাপিত বাস্তব জীবনে জড়ের দাসাদাস সত্যতা স্বীকার করিয়াও যে ভাগবত জীবন, উচ্চ জীবন, দিব্য জীবন যাপন করা যায়, এই কথা বিশদভাবে আলোচনা করেন। সংসারকে অতি মূল্য দিয়া সংসারের আসক্তি বিদ্বেষের আবর্তে নিজের অহংকে প্রস্থাপন করা কিংবা সংসারকে মিথ্যা বলিয়া মানুষের কথা হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া মনে মনে কোণে যে-জীবন, যাহাতে নিজের ব্যক্তি-অহং-এরই প্রতিষ্ঠা—এই উভয়ই কেবলমাত্র আংশিক দৃষ্টির ফল নয়—এই উভয় মনোবৃত্তিই মানুষের সকল অশান্তির মূল। বস্তুজগৎ ও তাহার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জটিলতা সব স্থানেই আছে, থাকিবে—কিন্তু কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বস্তু-জগৎকে পুনর্বিন্যাস করিয়া জটিলতাকে পুরুষোত্তম তথা সর্বভূতকল্যাণময় জীবন যাপনের অভিমুখী করা যায়—সমস্ত গীতাশাস্ত্রের ইহাই প্রতিপাদ্য। তাহারই পথ প্রস্থাপন করিতে পুরুষোত্তম বলিলেন,

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।
এবং জ্ঞানেবমিমুক্তৈস্তু বিদ্বদ্ভিনিত্যমৈস্তথন্।
আত্মবদ্ভিবিবেকাত্মা প্রলাপমিবগচ্ছতি॥

'সংক্ষেপে শান্তি পাওয়ার কথা গীতায় নাই; ভ্রমণ ভ্রম নয়, বুদ্ধিভ্রংশই ভ্রম। ভ্রমণের তাৎপর্য বিশ্বের সকল ঘটনার মধুর সহিত পরিচিত হওয়া; যাহার যে মূল্য নাই তাহাকে সেই মূল্য দেওয়া এবং যাহার যে মূল্য আছে তাহাকে সেই মূল্য হইতে বঞ্চিত করাই গীতা-মতে কুপণতা। কর্ম-সন্ন্যাসে কর্ম-পরিহারই একটা কৌশলমাত্র, ঢং মাত্র; ভক্তি হইতেছে পুরুষোত্তম ছাড়া সব কিছুকে দ্বিতীয়বার পড়িবার পরিশ্রম; 'মানুষ' পুরুষোত্তমের সাযুজ্যের অধিকারী; যাহারা পরিবর্তী তাহারাই আর্য। এই আর্য-পথ হইতে পলাইয়া গিয়াছে তাহারাই যাহারা পুরুষোত্তম-ছাঁচে গড়া বিশ্বের নিত্য শুচিরূপ না দেখিয়া, হজম করিতে না পারিয়া এবং স্নেহ-বুদ্ধিতে অশুচি দেখিয়া ঘেন্নায় ক্রোধে পলাইয়া বাঁচিবার জন্য দূরে সরিয়া গেল, গতিহীন হইল। জীবন্ত মনই অনার্য"—এইগুলি হইতেছে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিতাগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-ভাষ্যের গীতার দৃষ্টিভঙ্গি।

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া জীবনকে গ্রহণ করিতে হইলে গীতাবক্তা পুরুষোত্তমের সমগ্র জীবনখানাকে অনুধাবন করিতে হইবে—কেননা এই জড়ের রাজ্যের প্রবেশদ্বার তিনি। তিনিই সমগ্র ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াও অবিনাশীর আত্মা। এইভাবে কৃষ্ণকে না বুঝিলে কৃষ্ণনাম যেন আমরা না লই। ভারতবর্ষ তথা বাঙলা দেশের শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশ জন মানুষ কোন না কোন মহাপুরুষের সম্প্রদায়ে দীক্ষিত অথচ আমাদের বাস্তব জীবন এমন নোংরা কেন? কেন আমরা কিছুই গড়িতে পারিলাম না? কেননা আমাদের বাস্তব জীবন ও অধ্যাত্মজীবন আলাদা, বাস্তব জীবনকে কর্মে জ্ঞানে ভক্তিতে প্রেমে সর্বভূতকল্যাণময় করিবার কোন সাধনা আমাদের আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেয় না, আমরা সর্বত্রই নিজ অহংকে রকমফের করিয়া প্রস্থাপন করিয়া চলিয়াছি, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ আমাদের ভাবুকতাই আনিয়া দিতেছেন, জীবনকে পরিশুদ্ধির পথে নিতেছেন না। কিন্তু এভাবে আর চলা চলিবে না। বিশ্বের আগ্রহ জীবন-চেতনা জয়ের পথ পাইবে।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগাইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ প্রতিষ্ঠিত

উজ্জ্বলভারত

বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

একবিংশ বর্ষ (মাঘ ১৩৭৪—পৌষ ১৩৭৫ ; ১৯৬৮)

বর্ষসূচী

অবধূত পরং কুমার
হৃষীকেশ বে

অমর নাট্যকার উৎপেল
অনিলকুমার সমাদ্দার

আজ অশ্রদ্ধা সর্বত্রই
মলিনীনিগোপাল গুহ

আমাদের কথা
সম্পাদিকা

এক কৌটা জীবিজল
মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

একানব্বই বৎসর বয়স্কের দৈনন্দিন দিনযাপন
বন্ধুবর

এলোপাথাড়ি ১৮৯
শ্রীমান

কথাকলি ৮১,১৮৮
নিশিকান্ত মজুমদার

কঠোপনিষৎ ১০৬
নচিকেতা ভরদ্বাজ

কাঁঠালতুতে আটমুড়ু
গায়ত্রী বসু

কার্ডিন্যাল নিউম্যানের ধর্মাস্তর গ্রহণ
রেজাউল করীম

জাতীয় জীবনের আর একটি সমস্যা
শ্রীভারতী

জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিতাগোপাল
রেণু মিত্র

জ্ঞানী কে ?
সুধাংশু দাশগুপ্ত

দশপ্রহরিণী
হৃষীকেশ কাব্যতীর্থ

দুর্গাপূজার কথা
রেণু মিত্র

পুস্তক পরিচয় : রক্তকমল
কালীন ও ক্ষেত্রজ

প্রকৃতি ও মানুষ
শান্তশীল দাশ

প্রার্থনাকালীন ভাবনা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

বিশ্বময়ী
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ
মনোরঞ্জন গুপ্ত

ভারতীয় ক্ষনিবাদ ও ফরাসী সিম্বলিজম্
মনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের মাটিতে মার্কসীয় দর্শন ১০৬
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভিন্সেন্ট্রিয়াস ও গ্রিনির পত্রাবলী
নিকুঞ্জবিহারী দাস

মনোমাতি-প্রশস্তি
শ্রীভারতী

মাতৃ-উদ্বোধন
মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

মানবসমাজ-তত্ত্ব ও শিক্ষা ৫৩
সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

যাত্রামুহূর্তী ২২৯
কালীবিজয় সেনগুপ্ত

যুগসমস্যায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
স্নেহ মিত্র
রাধারাণী
শ্রীশ্রীনিতাগোপাল
লাঞ্ছনলাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শক্তি-স্তুতি
শ্রীশ্রীনিতাগোপাল
সোপেনহায়ের দুঃখবাদ
শৈলেন্দ্রকুমার রায়
শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্র
সুবোধকুমার সেনগুপ্ত
শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রের পুনরাবৃত্তি
সুবোধকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীকৃষ্ণ-অবতরণ—জন্মাষ্টমী : রাধারাণী
স্নেহ মিত্র
শ্রীগৌরাঙ্গ ও সাম্যবাদ
হরিদাস সাহা
শ্রীনারদ
হরধরজন কাব্যতীর্থ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী
(১৯৪৪) ২৩৩
সমগ্রতায় সাধনা ১৬০
সন্তোষকুমার অধিকারী
সাময়িকী : পট পরিবর্তন
আশ্রম সংবাদ
জোলপুর্ণিমা
বুদ্ধ পূর্ণিমা
রবীন্দ্রজয়ন্তী ও সমাজ-জীবন
বিশ্ব-পরিস্থিতি ও মার্কসবাদ
যো মাং জয়তি সংগ্রামে
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব,
গীতা-জয়ন্তী
সাহিত্যে আধুনিকতা
সন্তোষকুমার অধিকারী
সিদ্ধান্ত দর্শন ৩৭, ৬৬, ৯০, ১২০, ২৩৭
শ্রীশ্রীনিতাগোপাল
সৃজন-ক্ষমতা
গায়ত্রী বসু
স্কোটবাদ
মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ : ৮০তম জন্মদিন
সুনীতি চক্রবর্তী
স্বামিজী স্মরণে
খোন্দকার আউল করীম
হারানো দিন (২)
শ্রীমান

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

কৃষাকে কৃষির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, কৃষিহীন কৃষার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—মানুষ কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

14 JAN 1969

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অনুবাদ ও ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
বৃহৎকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। ধর্মের পূর্ণরূপ
১১। গীতাজয়ন্তী
১২। উজ্জ্বলকারক (পুস্তিকা)
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মুদ্রিত হইতেছে)
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির ভূমিকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিক্ষা সুধার কথা ০·৩১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৪·০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল ০·৬২
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩·০০
৪। রবীন্দ্র-স্মরণ ৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

প্রতি সংখ্যা ৮০ পয়সা, বার্ষিক পাঁচ টাকা